কিশোরসমগ্র

১

শাহরিয়ার কবির

সময় প্রকাশন

কিশোরসমগ্র ১
শাহরিয়ার কবির
© অর্পণ শাহরিয়ার

দ্বিতীয় মুদ্রণ : ডিসেম্বর ২০০৬
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০০০

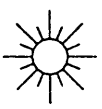
সময়

সময় ১৯১

প্রকাশক
ফরিদ আহমেদ
সময় প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

বর্ণ বিন্যাস
ডানা প্রিন্টার্স লিমিটেড
গ-১৬ মহাখালী, ঢাকা-১২১২

মুদ্রণ
সালমানী প্রিন্টার্স, নয়াবাজার, ঢাকা

মূল্য : তিন শ টাকা মাত্র

KISHORSHOMOGRO 1 (A Collection of juvenile Novel & Stories) by Shahriar Kabir. First Published : Book Fair 2000, 2nd Print : December 2006 by Farid Ahmed, Somoy Prakashan, 38/2ka Banglabazar, Dhaka.

Website : www.somoy.com Email : f.ahmed@somoy.com

Price : Tk. 300.00 Only

ISBN 984-458-191-5 Code : 191

উৎসর্গ

মুহম্মদ জাফর ইকবাল
ও
ইয়াসমিন হক

লেখকের অন্যান্য বই

পুবের সূর্য ❑ হারিয়ে যাওয়ার ঠিকানা ❑ নুলিয়াছড়ির সোনার পাহাড় ❑ একাত্তরের যীশু
আবুদের এ্যাডভেঞ্চার ❑ কমরেড মাও সেতুঙ ❑ জনৈক প্রতারকের কাহিনী
ওদের জানিয়ে দাও ❑ সীমান্তে সংঘাত ❑ নিকোলাস রোজারিওর ছেলেরা
আনোয়ার হোজার স্মৃতি ঃ রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে ❑ হানাবাড়ির রহস্য ❑ মওলানা ভাসানী
মিছিলের একজন ❑ পাথারিয়ার খনি রহস্য ❑ মহা বিপদসংকেত ❑ নিশির ডাক
বার্চবনে ঝড় ❑ ক্রান্তিকালের মানুষ ❑ বিরুদ্ধ স্রোতের যাত্রী ❑ রাজপ্রাসাদে ষড়যন্ত্র
কয়েকটি রাজনৈতিক প্রতিবেদন ও সাক্ষাৎকার ❑ কার্পেথিয়ানের কালো গোলাপ
বহুরূপী ❑ অন্যরকম আটদিন ❑ চীনা ভূতের গল্প ❑ অন্তরঙ্গ হুমায়ূন আহমেদ
অনীকের জন্য ভালবাসা ❑ বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার চালচিত্র ❑ গণআদালতের পটভূমি
একাত্তরের পথের ধারে ❑ লুসাই পাহাড়ের শয়তান ❑ বাভারিয়ার রহস্যময় দুর্গ
সাধু গ্রেগরির দিনগুলি ❑ আলোর পাখিরা ❑ বাংলাদেশে মৌলবাদ ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়
হাত বাড়ালেই বন্ধু ❑ জাহানারা ইমামের শেষ দিনগুলি ❑ ঘাতকের সন্ধানে ❑ মরু শয়তান
রত্নেশ্বরীর কালো ছায়া ❑ ভয়ঙ্করের মুখোমুখি ❑ একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা
❑ শেখ মুজিব ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ❑ রবিনের বিজয় ❑ অপহরণ
❑ মুক্তিযুদ্ধের বৃত্তবন্দী ইতিহাস ❑ নির্বাচিত রচনাবলী

সূ চি প ত্র

পুবের সূর্য
১৩

নুলিয়াছড়ির সোনার পাহাড়
১২৯

হারিয়ে যাওয়ার ঠিকানা
২২৯

বহুরূপী
৩০৫

হানাবাড়ির রহস্য
৩৮১

ভূমিকা

রচনাসমগ্র প্রকাশের ব্যাপারে আমার সবসময় সংকোচ ছিলো। আগে দেখেছি কোন লেখক মারা গেলেই রচনাসমগ্র প্রকাশ করা হয়। কিংবা লেখক যদি হন খুবই প্রবীণ, যিনি লেখালেখি ছেড়ে দিয়েছেন বা ছেড়ে দেয়ার পর্যায়ে চলে গেছেন— তাঁরও রচনাসমগ্র প্রকাশ যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে লক্ষ্য করছি আমাদের এমন সব জনপ্রিয় লেখকের রচনাসমগ্র প্রকাশিত হচ্ছে যাঁদের বয়স পঞ্চাশ পেরোয়নি।

গত কয়েক বছর ধরে প্রকাশকরা ধরেছেন আমার রচনাসমগ্র বের করবেন, যা আমার জন্য খুবই অস্বস্তির ব্যাপার। নানা কথা বলে তাঁদের অনুরোধ ফিরিয়ে দিয়েছি। বয়সের কথা বলে পার পাওয়া যায়নি, কারণ তাঁরা নাম উল্লেখ করে বলেছেন আমার কমবয়সী লেখকদেরও রচনাবলী বেরুচ্ছে।

শেষে রাজী হতে হলো বন্ধু মুনতাসীর মামুনের কথায়। মামুন বললো, 'তোমার তো টাকার দরকার। রচনাসমগ্র বেরুলে একসঙ্গে অনেকগুলো টাকা পাবে।' মামুনেরও কিশোর রচনাসমগ্র বেরিয়ে গেছে। অগত্যা মত দিতে হলো সংকোচ সত্ত্বেও।

ছোটদের জন্য লেখালেখি শুরু করেছি রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই সম্পাদিত 'কচি ও কাঁচা' পত্রিকায়। প্রথম গল্প বেরিয়েছিলো ১৯৬৭ সালে, প্রায় তেত্রিশ বছর আগে। তখন স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে মাত্র কলেজে ঢুকেছি।

দাদাভাইর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন জগন্নাথ কলেজে আমাদের বাংলার অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান, বর্তমানে যিনি জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক। জামান স্যার 'কচি কাঁচার মেলা'র অন্যতম উদ্যোক্তা, 'কচি ও কাঁচা'র সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য। সেবার তিনি 'সূর্যমুখী' নামে ছোটদের জন্য একটা গল্পের সংকলন বের করবেন। আমাকে বললেন লেখা দিতে। এর আগে বড়দের জন্য দু একটা গল্প এখানে সেখানে ছাপা হয়েছিলো, কিন্তু কখনও ভাবিনি ছোটদের জন্য লিখবো। জামান স্যারকে বলেছিলাম, আমাকে দিয়ে ছোটদের লেখা হবে না। কিন্তু তাঁর পিড়াপিড়িতে শেষ অবধি 'সূর্যমুখী'র জন্য একটা গল্প ওঁকে দিয়েছিলাম। এর কিছু দিন পর জামান স্যার বললেন, 'তোমার গল্পটা ভালো হয়েছে। দাদাভাই সূর্যমুখীতে ছাপার আগে ওটা কচি ও কাঁচায় ছাপতে চান। তোমার কি কোন আপত্তি আছে?'

আপত্তি থাকার প্রশ্নই ওঠে না। জামান স্যার বললেন, 'তুমি তাহলে দাদাভাইর সঙ্গে দেখা কর কচি কাঁচার অফিসে। তিনি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান।'

'কচি ও কাঁচা'র দফতর ছিলো ৬৭ পটুয়াটুলিতে, 'বেগম' ও 'সওগাত' পত্রিকাও ওখান থেকে বেরুতো। 'বেগম' সম্পাদনা করতেন দাদাভাইর স্ত্রী নূরজাহান বেগম আর 'সওগাত' সম্পাদনা করতেন দাদাভাইর শ্বশুর মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন। আমরা তখন থাকতাম কুমারটুলিতে— বাড়ি থেকে পাঁচ মিনিটের পথ। সেদিন সন্ধ্যায় দাদাভাইর সঙ্গে দেখা করলাম।

দাদাভাই মোটেই বাকপটু ছিলেন না, কিন্তু দু তিন ঘণ্টা কথা বলে আমাকে শুধু 'কচি ও কাঁচা'য় নিয়মিত লেখার ব্যাপারেই রাজি করাননি, তাঁকে কথা দিয়েছিলাম 'কচি

ও কাঁচা' প্রকাশনার কাজেও তাকে সহযোগিতা করবো।

দাদাভাই হাতেকলমে শেখালেন লেখা কিভাবে সম্পাদনা করতে হয়, কিভাবে প্রেসে কপি পাঠাতে হয়, কিভাবে প্রুফ দেখতে হয়, কিভাবে মেকাপ করতে হয়, কিভাবে ছবি সম্পাদনা করতে হয় এবং কিভাবে পত্রিকা বেরুলে গ্রাহকদের হাতে পৌঁছোতে হয়। রীতিমতো নেশা ধরে গিয়েছিলো। বড় বড় সব লেখকের সঙ্গে পরিচয় হলো দাদাভাই আর 'কচি ও কাঁচা'র সুবাদে। কাজ করতে করতে রাত এগারটা বারটা বেজে যেতো, বাড়ি ফিরে বকুনি খেতে হতো, কিন্তু নেশা কাটেনি।

বছর না ঘুরতেই দাদাভাই 'কচি ও কাঁচা'র উপদেষ্টামণ্ডলী ঢেলে সাজালেন। বয়োজ্যেষ্ঠ বেগম সুফিয়া কামালের নাম ছিলো সবার উপরে, আর বয়োকনিষ্ঠ আমার নাম ছিলো সবার নিচে। বিখ্যাত সব লেখক শিল্পীদের সঙ্গে নিয়মিত আমার নাম ছাপা হতে লাগলো। এভাবেই দাদাভাইর সঙ্গে রচিত হয়েছিলো কৃতজ্ঞতা আর শ্রদ্ধার অটুট বন্ধন। যখনই সুযোগ হয়েছে দাদাভাইর প্রতি সেই কৃতজ্ঞতা আর শ্রদ্ধার কথা উল্লেখ করেছি।

ছোটদের জন্য আমার প্রথম গল্পের বইটি উৎসর্গ করেছিলাম চারজনকে। এঁরা হলেন রোকনুজ্জামান খান, এখলাসউদ্দিন আহমেদ, শামসুজ্জামান খান ও হাশেম খান। এখলাস ভাই, জামান স্যার আর হাশেম ভাই— তিনজনই ছিলেন দাদাভাইর খুব কাছের মানুষ। শুধু আমি নই, আমরা যারা একসঙ্গে লেখালেখি শুরু করেছিলাম তাদের ভেতর মুনতাসীর মামুন আর আলী ইমাম এখনও লিখছে, যাদের লেখক হওয়ার পেছনে প্রধান কৃতিত্ব দাদাভাইর।

সেই সময় 'কচি ও কাঁচা' ও 'টাপুর টুপুর'কে ঘিরে এক ঝাঁক তরুণ ও ক্ষমতাবান লেখকের আবির্ভাব ঘটেছিলো, যারা ছিলো তাদের পূর্বসূরীদের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের; দুঃখের বিষয় তাদের অনেকেই আর লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত নেই। দাদাভাই নতুন লেখক সৃষ্টির ক্ষেত্রে সর্বদা উদ্যমী ছিলেন।

মাত্র কদিন আগে দাদাভাই আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। কিশোর রচনাসমগ্রের প্রথম খণ্ডের ভূমিকা লিখতে গিয়ে বার বার দাদাভাইর কথা মনে হচ্ছে। দাদাভাই না থাকলে, 'কচি ও কাঁচা' না থাকলে হয়তো কোনদিনই ছোটদের জন্য লিখতাম না।

দাদাভাই জানতেন কিভাবে নতুন লেখকদের উৎসাহ দিতে হয়। যারা লেখা পড়ে চিঠি লিখতো প্রশংসা করে, দাদাভাই সেগুলো পত্রিকায় ছেপে দিতেন। শুধু গল্প নয়, প্রবন্ধ কিংবা ফিচারও লিখতে হয়েছে দাদাভাইর অনুরোধে। 'কচি ও কাঁচা'র এমনও সংখ্যা আছে যেখানে নামে বেনামে গল্প, প্রবন্ধ, ফিচার সবই ছাপা হয়েছে।

'কচি ও কাঁচা' আর ইত্তেফাকের 'কচি কাঁচার আসর' ছাড়াও তখন এখলাসউদ্দিন আহমেদের 'টাপুর টুপুর' পত্রিকায়ও নিয়মিত লিখাম। 'টাপুর টুপুর' ছিলো অপেক্ষাকৃত পরিণত কিশোর কিশোরীদের জন্য, কিছুটা বাম রাজনীতির প্রভাব ছিলো, কিন্তু 'কচি ও কাঁচা' ছিলো রাজনীতি থেকে বহু দূরে। কচি ও কাঁচায় বেশি লিখতাম রহস্য ও এ্যাডভেঞ্চারধর্মী গল্প যা এই পত্রিকার ক্ষুদে পাঠকরা বেশি পছন্দ করতো। মনে আছে বয়স উনিশ না পেরুতেই দাদাভাইর কল্যাণে লেখক হিসেবে পরিচিতি জুটে গিয়েছিলো।

একাত্তরে যখন মুক্তিযুদ্ধে যাই তখন আমার বয়স একুশের নিচে। মেজদা জহির রায়হান যখন খবর পেলেন আমি ফ্রন্টে তখন কলকাতায় ডেকে পাঠালেন। বললেন, কলকাতায় অনেক কাজ, তাঁর কাছে থাকতে। তিনি তখন মুক্তিযুদ্ধের ওপর ছবি বানাবার পরিকল্পনা করছেন। এর দু বছর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার পাশাপাশি ছবি বানানো শেখার জন্য মেজদার সহকারী হিসেবে কাজ করেছি। বড়দা শহীদুল্লা কায়সার অবশ্য আমার ছবিতে কাজ করার ব্যাপারটা পছন্দ করেননি। তিনি আমাকে লেখক আর সাংবাদিক বানাবার ব্যাপারে বেশি আগ্রহী ছিলেন।

কলকাতায় মেজদার খুব আর্থিক অনটন ছিলো। তাঁর বন্ধু চিত্রপরিচালক হরিসাধন দাসগুপ্ত আর লেখক দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দুজন প্রকাশক ঠিক করে দিয়েছিলেন যাঁরা তাঁর বইগুলো কলকাতায় ছেপেছিলেন। দীপেনদা আমার লেখাও কলকাতার বিভিন্ন পত্রিকায় ছেপে অর্থপ্রাপ্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

আনন্দবাজারে একদিন লেখা দিতে গিয়ে পরিচয় হলো আমার প্রিয় লেখক শিবরাম চক্রবর্তীর সঙ্গে। শিবরামদা পরিচয় করিয়ে দিলেন এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানির মৃণাল দত্তের সঙ্গে। মৃণালদা আর তাঁর স্ত্রী গীতাদি ছোটদের জন্য চমৎকার দুটি পত্রিকা বের করতেন 'রোশনাই' আর 'ঝুমুঝুমি' নামে। 'ঝুমঝুমি' একেবারে ছোটদের জন্য, 'রোশনাই' কিশোরদের জন্য। মৃণালদার কথায় 'রোশনাই'তে লিখলাম। সবাই বেশ প্রশংসাও করলেন। সে সব শুনে মৃণালদা এক অসম্ভব প্রস্তাব করলেন। বললেন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ওপর ছোটদের উপযোগী উপন্যাস লিখতে হবে।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছে চার মাসও হয়নি, ভেবে পেলাম না কী লিখবো! মৃণালদা বললেন, 'রোশনাই'-এর শারদীয়া সংখ্যায় উপন্যাসটা ছাপবেন, পরে ওটা বই আকারে বের করবেন। ছোটদের জন্য বিখ্যাত লেখকদের অনেক বই মৃণালদারা বের করেছেন, যাঁদের ভেতর শিবরাম চক্রবর্তী আর লীলা মজুমদারের মতো লেখকরাও রয়েছেন। এই সব বিখ্যাত লেখখদের তালিকায় নাম ছাপার লোভেই রাজী হয়ে গেলাম উপন্যাস লিখতে। মৃণালদা পাঁচশ টাকা অগ্রিম দিলেন। তখন কলকাতায় পাঁচশ টাকা মানে অনেক টাকা।

মূলত মৃণালদার আগ্রহের কারণেই 'পুবের সূর্য' লিখেছিলাম, যেটি ছিলো মুক্তিযুদ্ধের ওপর প্রথম কিশোর উপন্যাস। বাহাত্তরে 'পুবের সূর্য' কলকাতা থেকে ছাপা হয়ে ঢাকার বাজারে আসে। কাগজে তখন এটা নিয়ে বেশ আলোচনাও হয়েছিলো।

চুয়াত্তরে পত্রিকার এক সংবাদে দেখলাম এর আগের বছর বাংলাদেশ থেকে শিশু কিশোরদের জন্য একটি বইও বেরোয়নি। — ততদিনে 'কচি ও কাঁচা' ও 'টাপুর টাপুর'-এর মতো অসাধারণ দুটি পত্রিকা অর্থাভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। ছোটদের জন্য মাঝে মাঝে ইত্তেফাকের 'কচি কাঁচার আসর,' দৈনিক বাংলার 'সাত ভাই চম্পা' আর বাংলা একাডেমীর 'ধান শালিখের দেশে' লিখি। বেশি লিখতাম দৈনিক গণকণ্ঠ আর সাপ্তাহিক বিচিত্রায়— সব বড়দের জন্য। ছোটদের জন্য বই বেরুচ্ছে না দেখে মন খারাপ হয়ে গেলো। সে বছরই ঠিক করলাম ছোটদের জন্য লিখতে হবে।

লেখালেখি যখন শুরু করেছিলাম তখনই এটা মাথায় ছিলো— আমি লিখবো

আমার মতো আর এমন লেখা লিখবো যা আমার আগে বাংলাদেশে কেউ লেখেনি। স্কুলে থাকতে এ্যাডভেঞ্চার পড়া শুরু করেছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে উঠে পড়লাম সোভিয়েত সাহিত্য। রুশ সাহিত্য নয়, সোভিয়েত সাহিত্য যা আমার সামনে ভাবনার নতুন দুয়ার খুলে দিয়েছিলো। রাজনীতি যে শিশু কিশোর সাহিত্যের ভেতর থাকতে পারে এটা সোভিয়েত সাহিত্য পড়ার আগে আমার ধারণা ছিলো না। বাংলা শিশু কিশোর সাহিত্যে আমি যে ভিন্নধারা সৃষ্টি করেছি এর জন্য সোভিয়েত সাহিত্যের কাছে ঋণের অন্ত নেই।

'নুলিয়াছড়ির সোনার পাহাড়' আর 'হারিয়ে যাওয়ার ঠিকানা' বই আকারে বেরিয়েছিলো ১৯৭৬ সালে। নুলিয়াছড়ি অবশ্য এর আগে 'ধান শালিখের দেশে' শিল্পী হাশেম খানের অসাধারণ অলংকরণ সহ বেরিয়েছিলো। যদিও প্রথম দিকের লেখার ভেতর আমার এবং অনেক সমালোচকেরও মতে 'হারিয়ে যাওয়ার ঠিকানা' অনেক পরিণত লেখা কিন্তু 'নুলিয়াছড়ি ...' আমাকে জনপ্রিয়তা আর খ্যাতি দুই-ই এনে দিয়েছিলো। '৭৮-এ লাইপজিগ আন্তর্জাতিক গ্রন্থমেলায় 'নুলিয়াছড়ি ...' সে বছর বিশ্বের সেরা পাঁচটি কিশোর সাহিত্যের একটি হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছিলো।

'হানাবাড়ির রহস্য' আর 'বহুরূপী' প্রথমে ছিলো গল্প। প্রথমটি 'রাজবাড়ির রহস্য' নামে 'কচি ও কাঁচা'য় বেরিয়েছিলো, দ্বিতীয়টি বেরিয়েছিলো 'সাত ভাই চম্পা'য়। প্রথম লেখার সময়ই ভেবেছিলাম এগুলো উপন্যাস হতে পারে, পরে তাই হয়েছে। 'বহুরূপী' লেখার সময় খুবই মজা পেয়েছিলাম। এখনও ভাবি ওদের নিয়ে আরো লেখার কথা।

'কিশোর রচনাসমগ্র'র প্রথম খণ্ডে রয়েছে আমার প্রথম পাঁচটি উপন্যাস, যেগুলোর আঙ্গিক আর বিষয়বস্তু সবই অন্যরকম। যদিও আমি এখন আর 'পুবের সূর্য'-র ভাষায় ছোটদের জন্য লিখবো না কিন্তু তখন মনে হয়েছিলো আমি মুক্তিযুদ্ধের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে লিখছি, ভাষায়ও গাম্ভীর্য থাকা দরকার।

তখন যারা 'নুলিয়াছড়ি ...' বা 'হারিয়ে যাওয়া ...' পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলো এখন তাদের ছেলেমেয়েরা সেসব বই পড়ে। আমার এখনকার পাঠকদের বাবা মায়েরা অভিযোগ করেন আমি আর আগের মতো লিখি না। অনেকে বলেছে আবির-বাবু কিংবা আবু-বিজুদের নিয়ে সিরিজ লেখার জন্য। সিরিজ লেখার ব্যাপারে কখনও মন থেকে সায় পাইনি। কখনও যদি মনে হয় নতুন কিছু লিখতে পারছি না তখন সিরিজের কথা ভাববো।

নতুন শতাব্দীর শুরু হচ্ছে আমার রচনাসমগ্র দিয়ে। নতুন করে পড়তে গিয়ে মনে হচ্ছে নতুন শতাব্দীর নতুন পাঠকদের ভালো লাগবে তো এসব লেখা!

শা. ক.
বইমেলা, ২০০০

পুবের সূর্য

অলংকরণ : বিমল দাস

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিলো বাবু।

বিশাল গোলাপ বাগানের আকাশে রুপোলি থালার মতো ঠান্ডা ভেজা ভেজা চাঁদটা ঝুলছে। সরল ইউক্যালিপ্টাস গাছগুলো শ্বেত পাথরের থামের মতো বাড়িটাকে ঘিরে রেখেছে। অজস্র লাল গোলাপে ছেয়ে আছে সারা বাগান। জ্যোৎস্নার বাগানে গুচ্ছ গুচ্ছ রক্তগোলাপ। চারদিক নরম কুয়াশার চাদরে ঢাকা।

বাবুর স্বপ্ন আরো গভীর হলো। তার ইচ্ছাগুলো এক-একটি গোলাপে পরিণত হয়ে ছড়িয়ে পড়লো জ্যোৎস্নার কুয়াশায়। দূরে কুয়াশা জমাট বেঁধে বরফ হয়ে আছে। গোলাপেরা সেই বরফের গায়ে গেঁথে রইলো। ধবধবে সাদা বরফের গায়ে জ্বলজ্বল করতে লাগলো পদ্মরাগ পাথর হয়ে। তারপর হঠাৎ পাথরগুলো জীবন্ত হয়ে কাছে আসতে লাগলো।

সবিস্ময়ে বাবু লক্ষ্য করলো তার স্বপ্নের পাথরগুলো নেকড়ের চোখে রূপান্তরিত হয়েছে। কুয়াশার জমাট সাদা বরফে ধারালো থাবার ছাপ রেখে নেকড়ের দল এগিয়ে আসতে লাগলো নিঃশব্দে। পদ্মরাগ চোখগুলোতে গোলাপের ভালোবাসার বদলে একরাশ হিংস্রতার ছায়া দেখলো সে।

অসম্ভব আতঙ্কে বাবু আরো দেখলো, কতগুলো কালো মেঘ রুপোলি চাঁদটাকে ঢেকে দিয়েছে। মাইলের পর মাইল অতল অন্ধকার। কালো আলকাতরার মতো অন্ধকারের ঢেউগুলো ওকে ডুবিয়ে দিতে চাইলো। বাবু কোন শব্দ করতে পারলো না।

ঠিক তখনই আকাশে বিদ্যুৎ চমকালো। গোলাপ বাগানে ঝড় এলো। একদল বুনো মোষের মতো ক্ষিপ্ত বাতাস অন্ধকারের পর্দা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে ছুটে গেলো। এক মুহূর্তে সব কিছু এলোমেলো হয়ে গেলো। শান্ত ইউক্যালিপ্টাস গাছগুলো অশান্ত হয়ে উঠলো। আর গোলাপের পাপড়িগুলো শাঁ শাঁ বাতাসে উড়ে যেতে লাগলো।

আবার বিদ্যুৎ চমকালো। আকাশ চিরে চাবুকের মতো নেমে এলো জানালার কাচে। বাজ পড়লো পৃথিবী কাঁপিয়ে। জানালার কাচগুলো ঝনঝন করে বুঝি গুঁড়ো হয়ে গেলো। আবার বাজ পড়লো। তারপর একটার পর একটা শব্দের গর্জন হতেই থাকলো। থরথর করে কাঁপতে লাগলো বাবুর ঘরটা, গোলাপ

বাগানে 'হিমানী' নামের ছোট্ট বাড়িটা।

কে যেন ওর নাম ধরে ডাকছে। বাবু চমকে উঠলো। কী ভীষণ দুঃস্বপ্ন! ঘরে নীল বাতির নরম আলো ছড়িয়ে আছে। দেয়ালজোড়া জানালাগুলো ভারী পর্দা দিয়ে ঢাকা, মাথার উপর শাঁ শাঁ করে ফ্যান ঘুরছে। অথচ বাবুর জামাটা ঘামে ভিজে গায়ের সাথে লেগে আছে।

দরজায় আবার শব্দ হলো। বাবা ডাকছেন, 'বাবু দরজা খোল শিগগির।'

বাইরে ঘন কালো অন্ধকার। আবার বাজের শব্দ হলো। ঘুমের ঘোরে উঠে দরজা খুললো বাবু। বাবা ওর হাত চেপে ধরলেন। টেনে ড্রইংরুমে নিয়ে এলেন। চাপা গলায় বললেন, 'শুনতে পাচ্ছো না বাইরে কী হচ্ছে?'

বাইরে তাকিয়ে দেখলো বাবু। আকাশে অসংখ্য তারার মিছিল। এতটুকু মেঘ নেই। বাবা বললেন, 'যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে।'

ড্রইংরুমে অন্ধকারে বসে আছে ভাইয়া, ভাবী আর ওদের ছোট্ট মেয়ে হিমি।

কেউ কোন কথা বলছে না। তখনও বাবু স্বপ্নের ঘোরে আচ্ছন্ন। বুঝতে পারলো না বাবা কী বললেন।

আবার বাজের ভয়ঙ্কর শব্দে জানালার কাচগুলো ঝনঝন করে কেঁপে উঠলো। ভাইয়া বললো, 'কামানের শব্দ।'

তারপর অবিরাম মেশিনগানের গুলির শব্দ। মাঝে মাঝে রাইফেলের শব্দ। বৃষ্টির মতো মেশিনগানের শব্দের নিচে রাইফেলের শব্দ হারিয়ে গেলো। সবকিছু ছাপিয়ে কামানের গর্জন শোনা গেলো বারবার।

বাইরের জমাট অন্ধকারে সবকিছু হারিয়ে গেছে। শ্বেতপাথরের থামের মতো ইউক্যালিপ্টাস, গোলাপের বিশাল বাগান, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সারা শহর অন্ধকারের ঘন কালো চাদরের নিচে ঢাকা পড়ে গেছে। শুধু দক্ষিণের আকাশে কামান গর্জনের আগের মুহূর্তে বিদ্যুতের মতো আলোর রেখা ঝলসে উঠছিলো।

ভাবী বললো, 'আরো দক্ষিণে সরে এসেছে।'

এমন সময় বাইরে পাঁচিলের ধার থেকে কে যেন চাপা গলায় বাবাকে ডাকলো, 'সিদ্দিক সাহেব, একবার বাইরে আসুন।'

বাবা ব্যস্ত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ভাইয়া আর বাবু সঙ্গে গেলো। অন্ধকারে গলা শুনে বুঝলো, বনানীর জামান সাহেব। আওয়ামী লীগের একজন স্থানীয় নেতা। উত্তেজিত গলায় বাবাকে বলছেন, 'অবস্থা খুব খারাপের দিকে মোড় নিয়েছে। পাঞ্জাবি সৈন্যরা রাজারবাগ পুলিশ হেড কোয়ার্টার আক্রমণ করেছে। ভয়ানক যুদ্ধ চলছে সেখানে।'

'আপনাদের সংগ্রাম পরিষদের খবর কী?' জানতে চাইলেন বাবা।

'আমরা এখনো কোন নির্দেশ পাইনি।' জামান সাহেব আগের মতো উত্তেজিত— 'রাতে ব্যারিকেড দিতে বলেছিলো। শেষ নির্দেশ পেয়েছিলাম রাত

নটায়। তারপর থেকে আর যোগাযোগ করতে পারছি না। বঙ্গবন্ধু সম্ভবত বেতার ভাষণ দেবেন।'

'আপনারা কী করবেন ঠিক করেছেন?'

'আমরা তৈরি হয়ে আছি। ঘর থেকে কেউ বেরুবেন না। সকালে সব খবর পাওয়া যাবে।' এই বলে অন্ধকার পথে চলে গেলেন জামান সাহেব। ঘরে ফিরে বাবাকে খুব উদ্বিগ্ন মনে হলো— 'বন্দুক ছাড়া পুলিশের কাছে কোন অস্ত্রই নেই। কী দিয়ে ওরা লড়ছে?'

ভাইয়া বললো, 'সংগ্রাম পরিষদ থেকে ওদের নিশ্চয়ই অস্ত্র দেওয়া হয়েছে। মাঝে মাঝে রাইফেলের শব্দ শোনা যাচ্ছে।'

মেশিনগানের একটানা কর্কশ শব্দ ভীষণ বৃষ্টির মতো হাড় ফুটো করে বুকের ভেতরে ঢুকে যাচ্ছিলো। বিরামহীন সেই ভয়াবহ শব্দের ভেতর আরো ভয়াবহ কামানগুলো গর্জন করছিলো। রাইফেলের প্রতিরোধের শব্দ একেবারেই স্তিমিত। মেশিনগানের শব্দ আরো জোরালো হলো। এরপর দক্ষিণের আকাশটা ধীরে ধীরে লাল হতে লাগলো।

ঘরের সবাই সেদিকে তাকিয়ে চমকে উঠলো। দক্ষিণ থেকে পশ্চিমের সারা আকাশ লাল হয়ে গেছে। দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে।

ভাইয়া উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে বললো, 'ওরা ইউনিভার্সিটিতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।'

ভাবী বললো, 'ইপিআরদের হেডকোয়ার্টার ওদিকে। প্রথম গুলির শব্দ আমি ওদিক থেকেই শুনেছিলাম।'

ভাইয়া বললো, 'হলের ছাত্ররাও গুলি করতে পারে। মার্চের দু'তারিখে ওরা কারফিউ ভেঙে বেরিয়ে এসেছিলো...।'

বাবা হঠাৎ ওদের থামিয়ে দিলেন— 'চুপ, কান পেতে শোনো। দূরে মনে হচ্ছে কেউ শ্লোগান দিচ্ছে।'

মেশিনগানের প্রচন্ড কর্কশ শব্দের জন্যে কিছুই শোনা যাচ্ছে না— তবু ওরা সবাই কান পেতে রইলো। বিকট শব্দের মুহূর্তের বিরতিতে ওরা শুনলো সেই শ্লোগানের শব্দ। বহু দূরে পুরোনো ঢাকা থেকে একটা অস্পষ্ট কোলাহলের মতো ভেসে আসছে।

বাবু কাঁপা উত্তেজিত গলায় বললো, 'জয় বাংলা বলছে!'

বাতাসে টুকরো টুকরো হয়ে বহুদূর থেকে শ্লোগানের সেই শব্দগুলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছিলো। বিচ্ছিন্ন কিছু শ্লোগান, কিছু প্রতিরোধের শব্দ শুনলো ওরা। 'শ্রমিক কৃষক অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো। এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা'— এই ধরনের টুকরো টুকরো শ্লোগানের শব্দ সমুদ্রের উত্তাল ঢেউয়ের মতো থেকে থেকে গর্জে উঠছিলো, আবার কামান আর

মেশিনগানের নারকীয় শব্দে তলিয়ে যাচ্ছিলো। মুহূর্তের জন্য বিরতি নেই সেই দানবিক শব্দের। পৃথিবীর সকল প্রতিবাদের শব্দকে গলা টিপে ধরার দুরন্ত স্পর্ধা নিয়ে গর্জন করছিলো কতগুলো মেশিনগান। তারপর একসময় শ্লোগানের শব্দ থেমে গেলো।

বাবা বললেন, 'রেডিয়োতে ঢাকা ধরো। কিছু বলতে পারে।'

ভাবী রেডিয়োর চাবিটা ঘুরিয়ে দিলো। কোনো শব্দ নেই কোথাও। ভাইয়া ওয়েভ বদল করে বার বার চাবি ঘোরালো। বিদেশী কোন স্টেশনে গান হচ্ছে। কোথাও আনন্দের সঙ্গীত বাজছে। ঢাকা কিংবা চট্টগ্রামে কোন সাড়াশব্দ নেই। ভাইয়া আপন মনে বললো, 'এখানে এ রকম একটা ভয়াবহ ব্যাপার ঘটে যাচ্ছে অথচ পৃথিবীর কেউ জানতেও পারছে না।'

ভাবী বললো, 'আর্মি বোধহয় রেডিয়ো স্টেশন দখল করে নিয়েছে!'

'তবু রেডিয়োটা খুলে রাখো।' শান্ত গলায় বললেন বাবা।

মেশিনগানের একটানা শব্দটা কিছু কমেছে। কিছুক্ষণ পরে বাবা বিড়বিড় করে বললেন, 'শ্লোগানের শব্দ একেবারেই থেমে গেছে।'

বাবু বললো, 'সবাই ছাদে উঠে শ্লোগান দিলে কেমন হয়? প্রত্যেক বাড়ি থেকে শ্লোগান দিলে ওরা ভয় পেয়ে যাবে।'

বাবা ওকে ধমক দিলেন— 'পাগলামো কোরো না।'

বাবু চুপ করে গেলো। ভাবীর কোলের কাছে চার বছরের হিমি ঘুমিয়ে পড়েছে। ভাইয়া বললো, 'বড়দারা এ রকম শ্লোগান দিয়েছিলো চুয়ান্ন সালে। যখন বলা হলো একুশে ফেব্রুয়ারিতে মিছিল করতে দেবে না, প্রত্যেকটা ছাদ থেকে সেই রাতে শ্লোগানে সবাই ফেটে পড়েছিলো—রাষ্ট্রভাষা বাঙলা চাই বলে।'

বাবু বড়দার কথা ভাবলো। যিনি ঢাকার একটি দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক, কমিউনিস্ট পার্টির একজন নেতা; থাকেন পুরোনো ঢাকায়। বললো, 'বড়দাকে একটা টেলিফোন করলে হয়।'

কেউ ওর কথার জবাব দিলো না। কিছুক্ষণ পর ভাবী শুধু বললো, 'টেলিফোন ডেড।'

রাত বাড়তে লাগলো। মেশিনগানের শব্দ দূরে সরে গেছে। রাইফেলের শব্দ একেবারেই শোনা যাচ্ছে না। হঠাৎ ধপ করে একটা শব্দ হলো। সবাই একসঙ্গে চমকে উঠলো। বাইরের পাঁচিল টপকে কেউ ভেতরে ঢুকেছে। বাবা ইশারায় সবাইকে থামিয়ে দিলেন।

কোথাও এতটুকু শব্দ নেই। মনে হলো কেউ হাঁটছে বাগানে। বাবা ভাইয়াকে যেতে ইশারা করলেন। চাপা গলায় বললেন, 'সাবধানে যাও।'

বাবুও সঙ্গে যেতে চাইলো। বাবা আবার চাপা গলায় ধমক দিলেন, 'তুমি কোথায় যাচ্ছো?'

একটু পরে একজন লোককে সঙ্গে নিয়ে ভাইয়া ঘরে ঢুকলো। নিচু গলায় বললো, 'ইপিআর-এর লোক গুলিতে জখম হয়েছেন।'

বাবা উঠে দাঁড়ালেন। বাবুকে বললেন, 'জানালার সবগুলো পর্দা টেনে দাও।'

বাবু পর্দা টেনে জানালাগুলো আগাগোড়া ঢেকে দিলো। বাবা লাইটের সুইচ টিপলেন। একরাশ আলোয় ঘর ভরে গেলো। সেই আলোতে ওরা সবাই দেখলো ইপিআর-এর লোকটাকে। পরনে পায়জামা, গায়ে বুশ সার্ট, খালি পা। ডান কাঁধে রাইফেল ঝোলানো। বাঁ-হাত রক্তে ভেসে যাচ্ছে। সাদা জামাটা লাল জবজবে হয়ে উঠেছে। 'খুব মারাত্মক নয়। একটু ড্রেসিং দরকার। আমার নাম জাহেদ আহমেদ, ইপিআর-এর একজন ক্যাপ্টেন।' নিজের পরিচয় দিলেন তিনি।

বাবা ব্যস্ত গলায় বললেন, 'আপনি বসুন। এক্ষুনি ব্যবস্থা করছি। বৌমা একটু গরম পানি আনো।'

ভাবী চলে গেলো। বাবা উদগ্রীব হয়ে জানতে চাইলেন, 'খবর বলুন।'

ক্লান্ত গলায় ক্যাপ্টেন বললেন, 'রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ আর্মি হঠাৎ চড়াও হয়ে আমাদের পিলখানার ব্যারাক ঘিরে ফেলে। তারপর মেশিনগান দিয়ে এলোপাথাড়ি গুলি করেছে। আমাদের লোকেরা সবাই ঘুমিয়ে ছিলো।' ক্যাপ্টেন একটু থেমে বললেন, 'এক গ্লাস পানি খাবো।'

বাবু ফ্রিজ খুলে একটা কোকাকোলার বোতল বের করে গ্লাসে ঢেলে এগিয়ে দিলো। কয়েক চুমুকে গ্লাসটা শেষ করে ক্যাপ্টেন বললেন, 'খুব কম লোকই পালাতে পেরেছে। বাধা দেয়ার চেষ্টা করেছিলাম। শেষে দেখলাম কয়েকটা রাইফেল দিয়ে ওদের মেশিনগানের মুখোমুখি হওয়া বোকামি ছাড়া আর কিছু নয়।'

ভাবী একটা বাটিতে করে গরম পানি আনলো। বরিক পাউডার ছিটিয়ে ওতে তুলো ভিজিয়ে ক্যাপ্টেনের হাতের জখমটা আস্তে আস্তে ধুয়ে দিলো। তারপর ব্রান্ডেজ এনে বেঁধে দিলো ভালো করে। "আপনি একটু বসুন।' এই বলে ভাবী ভেতরে গিয়ে এক গ্লাস দুধ আর কিছু জ্যাম মাখানো বিস্কিট এসে ক্যাপ্টেনের সামনে রাখলো।

বাবা বললেন, 'আপনি এখন কোথায় যাবেন?'

বিস্কিট চিবুতে চিবুতে ক্যাপ্টেন বললেন, 'চট্টগ্রাম। সেখানে বেঙ্গল রেজিমেন্ট-এর সঙ্গে যোগ দেবো।'

বাবা বললেন, 'ঢাকা ক্যান্ট-এর বেঙ্গল রেজিমেন্ট যারা ছিলো তাদের কোন খবর জানেন?'

ক্যাপ্টেন একটু ভেবে বললেন, 'ওদের সম্ভবত আন-আর্মড করে রাখা হয়েছে।'

বাবাকে বিচলিত মনে হলো— 'ওদের কেউ কি পালাতে পারেনি?'

ক্যাপ্টেন বললেন, 'এ মুহূর্তে বলতে পারছি না। আপনার পরিচিত কেউ আছে নাকি সেখানে?'

'আমার ছোট ছেলে। টেনথ্ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে রয়েছে।'

ভাবী বললো, 'সেদিন বাবলুকে এত করে বললাম যেয়ো না। বললো পালিয়ে কেন আসবো। বেরুতে হলে অস্ত্র নিয়েই বেরুবো।'

ক্যাপ্টেন ম্লান হাসলেন— 'ছেলেমানুষ! কত বয়স ওর?

বাবা বললেন, 'সতেরো।

'নিশ্চয়ই ট্রেনিং-এ ছিলো?' জানতে চাইলেন ক্যাপ্টেন।

ভাইয়া জবাব দিলো, 'ন্যাশনাল সার্ভিস কোরের ট্রেনিং-এ গিয়েছিলো। ওদের ব্যাচে ছ'শ ছেলে আছে।'

বাবা ক্যাপ্টেনকে বললেন, 'আপনি চাটগাঁ যাচ্ছেন কীভাবে?'

ক্যাপ্টেন একটু ভেবে বললেন, 'ব্রাহ্মণবাড়িয়া হয়ে ইন্ডিয়ার ওপর দিয়ে যেতে হবে। কুমিল্লা ক্যান্ট সম্ভবত আর্মির দখলে।'

বাবা অবাক হলেন— 'ইন্ডিয়ার ওপর দিয়ে যেতে দেবে?'

'ওদের সিক্যুরিটি ফোর্সের সঙ্গে আলাপ করে নেবো।'

দেয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং করে চারটার ঘন্টা বাজলো।

ক্যাপ্টেন বললেন, 'চলি তাহলে। অনেক দূর যেতে হবে।'

বাবা মাথা নাড়লেন— 'আসুন।' দাঁড়িয়ে হাত মেলালেন। তারপর ক্যাপ্টেনের পিঠে হাত রেখে বললেন, 'ভালো থাকুন।'

ক্যাপ্টেন বেরিয়ে গেলেন। বহুক্ষণ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন বাবা।

বাগানের অন্ধকার পথে ক্যাপ্টেন হারিয়ে গেলেন।

ভাইয়া ভাবীকে জিজ্ঞেস করলো, 'বাবলু তো গত রোববারের আগের রোববারে এসেছিলো, তাই না?'

ভাবী একটু ভেবে মাথা নাড়লো— 'হ্যাঁ।'

বাবু বললো, 'ও বলেছিলো, গত রোববার যদি না আসে ধরে নিতে হবে ওদের খুব অসুবিধে হচ্ছে!'

শেষ রাতে মেশিনগানের তান্ডব আগের চেয়ে অনেক কমে গিয়েছিলো। তবু সে রাতে ওরা কেউ ঘুমোতে পারেনি। ছোট্ট হিমিও বার বার জেগে উঠেছে। পোষা কুকুর কেটি আর টম সোফার কাছে গুটি-সুটি মেরে বসেছিলো। ওদের চোখেও ভয়ের ছায়া। কেউ বুঝতে পারছে না অন্ধকার শহরে কি ঘটছে! বাবু শুধু বার বার ভাবলো বাবলুর কথা। আর মিনুর কথা। বাবলু সম্ভবত ক্যান্টনমেন্ট। মিনু রাজারবাগ। ওদের জন্যে ভীষণ ভয় হলো বাবুর।

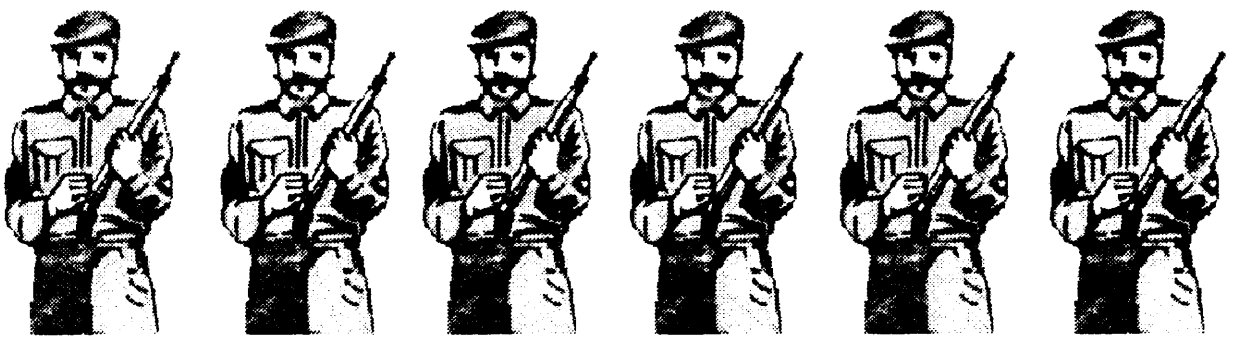

সে রাতে বাবলু ছিলো ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে। টেনথ্ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের নতুন রিক্রুট— ওরা ছ'শ ছেলে। সারা রাত ওদের চোখেও ঘুম ছিলো না।

ওদের সবার বয়স সতেরো থেকে আঠারোর ভেতর। কলেজে ওরা ইন্টারমিডিয়েট পড়তো। গত জানুয়ারিতে সবাই এখানে এক বছরের সামরিক প্রশিক্ষণ নিতে এসেছে। তিনটি কোম্পানিতে ভাগ করা ছ'শ ছেলে। ট্রেনিং-এর কোর্স অনেকটা এগিয়ে গেছে। রাইফেল, স্টেনগান, মেশিনগান, গ্রেনেড আর মর্টারের ব্যবহার শেখা শেষ। ম্যাপিং-এর ক্লাশ সবে শুরু হয়েছে। সেদিন হঠাৎ হাবিলদার মেজর সুলতান আহমদ বললেন, 'তোমাদের ক্লাশ কিছুদিনের জন্য বন্ধ থাকবে।'

জিওসি সায়েবজাদা ইয়াকুব খান কদিন আগে রিজাইন করেছেন। সারা ক্যান্টনমেন্টে চাপা গুঞ্জন। শহরের গায়ে লাগানো হলেও ভেতরে বসে বোঝার উপায় নেই বাইরে কী ঘটছে।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া মার্চের এক তারিখে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বাতিল করেছেন। বাবলুরা সে খবর শুনেছে রেডিওতে। তিন তারিখে অধিবেশন হবার কথা ছিলো। আরো খবর পেয়েছে— সারা শহর বিক্ষুব্ধ। প্রেসিডেন্টের বেতার ভাষণ কেউ সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। দশ তারিখে প্রেসিডেন্ট গোল টেবিল বৈঠক ডেকেছেন।

আওয়ামী লীগ আর ন্যাপ সারা প্রদেশ জুড়ে হরতাল ডেকেছে। শহরে কারফিউ জারি করা হয়েছে। পাঞ্জাবি সৈন্যরা টহল দিচ্ছে। তারপর খবর শুনলো ছাত্ররা কারফিউ ভেঙে রাস্তায় মিছিলে নেমেছে। সৈন্যরা মিছিলের ওপর গুলি করেছে। অনেক ছাত্র মারা গেছে। এ সমস্ত ঘটনা ঘটেছে মার্চের দু'তারিখে।

এর পরের ঘটনাগুলো খুব তাড়াতাড়ি বদলে যেতে লাগলো, যার জন্যে আগে থেকে কেউ প্রস্তুত ছিলো না। তিন তারিখে ছাত্ররা পল্টন ময়দানে সভা করলো। তারা বললো, 'এখন থেকে পূর্ব বাংলা স্বাধীন। এ দেশের নাম এখন বাংলাদেশ।' তারপর ওরা স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা ওড়ালো। সবুজ পতাকা। মাঝখানে সূর্য, যার ভেতর বাংলাদেশের সোনালি মানচিত্র আঁকা! ছাত্ররা জাতীয় সঙ্গীত ঘোষণা করলো— আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।'

রাতে রিফ্রেশমেন্ট রুমের টেলিভিশনে বাবলুরা সেই মিটিং-এর ছবি দেখেছে। পল্টনের ময়দান লোকে লোকারণ্য। যখন শেখ মুজিব বক্তৃতা দিতে উঠলেন, সারা মিটিং শ্লোগানে ফেটে পড়লো— 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু!'

শেখ মুজিব বক্তৃতা দিলেন। বললেন, শান্তিপূর্ণ হরতাল চালিয়ে যেতে। কঠোর ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হতে। সাত তারিখে রমনার মাঠে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেবেন।

বাবলুদের রাত দশটা পর্যন্ত টেলিভিশন দেখতে দেয়া হয় তারপর ঘুমোতে যেতে হবে। ঘুম কি আসে! উত্তেজনায় সবাই দপদপ করে জ্বলছে। কেউ বললো, 'এবার সত্যিই স্বাধীনতা আসছে।' একজন বললো, 'ক্যাপ্টেন করিমের কথা শুনেছিস! পাজিটা বাঙালি হয়েও বলে কিনা ও-সব আওয়ামী লীগের স্বপ্নমাত্র। আর্মি পাকিস্তানকে কিছুতেই ভাঙতে দেবে না।'

কয়েকজন একসঙ্গে বললো, 'বেইমান!'

বাবলু সবই শুনতো। ভাবতো কীভাবে স্বাধীনতা আসবে। এখানে ওর অনেক বন্ধু। সবাই ওরা স্বাধীনতা চায়। পশ্চিমাদের সঙ্গে এক থাকা আর কিছুতেই সম্ভব নয়। এই সেনাবাহিনীতেই তো ওরা দেখেছে বাঙালি অফিসার হাতে গোনা যায়। তাও একেক জনের প্রমোশন আটকে থাকে বছরের পর বছর।

জিওসি সায়েবজাদা ইয়াকুবকে পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। তিনি নাকি এই অপারেশনের বিরুদ্ধে ছিলেন। তাঁর জায়গায় এসেছেন খাদেম হোসেন রাজা। পাঁচ তারিখে আবার প্রেসিডেন্টের বেতার ভাষণ শোনা গেলো। আওয়ামী লীগ আর শেখ মুজিবের ওপর যথেষ্ট ক্ষুব্ধ মনে হলো ইয়াহিয়াকে। পঁচিশ তারিখ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে। তিনি যে কোন দিন ঢাকা আসছেন।

বাবলুরা দেখলো, রেজিমেন্ট-এর পর রেজিমেন্ট সৈন্য আসছে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে। উড়োজাহাজ বোঝাই করে অস্ত্র আসছে। ওদের ট্রেনিং বন্ধ হয়ে গেলো। কাজ হলো অস্ত্র গুদামে নেয়া আর ট্রেঞ্চ খোঁড়া। শহরে ভীষণ উত্তেজনা। অসহযোগ আন্দোলন চলছে। স্কুল কলেজ অফিস আদালত সব বন্ধ, সারাদিন শুধু মিছিল আর বিক্ষোভ। বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে সারা বাংলাদেশ। রাতে শহরে কারফিউ থাকে। কেউ সেই কারফিউ মানে না। কারফিউ ভেঙে মিছিল বেরোয়। মিছিলের ওপর গুলি চলে নির্বিচারে। রক্তে ভেসে যায় শহরের রাস্তা। তবু মিছিল চলে অবিরাম।

সাত তারিখ মিটিং-এর দিন বাবলুরা ভয়ানক একটা কিছু ঘটবার জন্যে তৈরি হয়ে থাকলো। ভোর না হতে দেখলো দূর দূরান্তের গ্রাম থেকে সবাই মিটিং-এ যোগ দেয়ার জন্য আসছে, ট্রাকে বাসে বোঝাই হয়ে। সমুদ্রের

ঢেউয়ের মতো শুধু মানুষের মিছিল। সবার মুখে একই শ্লোগান— 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।'

ক্যান্টনমেন্টের জাঁদরেল পশ্চিমা অফিসাররা ভয় পেয়ে গেলো। জেনারেলদের জরুরি বৈঠক বসলো। বাঙালি সৈন্যদের ওরা রীতিমতো সন্দেহের চোখে দেখছে। ওদের কোন কাজের দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে না। সেদিন কিছু অবাঙালি সৈন্যকে পাঠানো হলো শহরে। বেশির ভাগ রইলো ক্যান্টনমেন্টের পাহারায়।

খবরের পর খবর আসতে লাগলো। রমনার ময়দানে পাঁচ লাখ মানুষ জমা হয়েছে শেখ মুজিবের ভাষণ শোনার জন্য। সবার হাতে লম্বা বাঁশের লাঠি। অনেকের লাঠির মাথায় বর্শার ফলক বসানো। পাঞ্জাবি অফিসাররা ভয় পেলো—ওরা ক্যান্টনমেন্ট ঘেরাও করবে নাতো!

ব্যারাকে বসে গভীর উত্তেজনায় সময় কাটছিলো বাবলুদের। দু'একজন বাইরে থেকে টুকরো টুকরো খবর আনছিলো। বাবলু বললো, 'ওরা যদি ক্যান্টমেন্ট ঘেরাও করে তাহলে বাধা দেওয়া অসম্ভব।'

রশিদ বললো, 'ওরা পাঁচ লাখ, কত মারবে?'

বাবলু জোর গলায় বললো, 'মারলেই হলো? আমরা কি চুপচাপ এভাবে বসে থাকবো? এম্যুনেশন ডাম্প উড়িয়ে দেবো না!'

হাসান বললো, 'ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের পতন মানে বাংলাদেশ আমাদের দখলে।'

ওরা সবাই বারুদের মতো জ্বলছিলো। সবাই উদগ্রীব হয়ে বসেছিলো ভীষণ একটা কিছু ঘটবার অপেক্ষায়। শেষ অবধি ওরা যা ভেবেছিলো তার কিছুই হলো না। ট্রাকে বাসে গ্রামের সবাই আবার—'জয় বাংলা' শ্লোগান দিতে দিতে ফিরে গেলো। রাতে রেডিয়োর খবর শুনলো। শেখ মুজিব সামরিক সরকারকে চার দফা প্রস্তাব দিয়েছেন, যেগুলো না মানলে তিনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে বসবেন না।

রশিদ ক্ষুব্ধ হয়ে বললো, 'বয়ে গেছে প্রস্তাব মানতে। দেখো, আমি বলে দিলাম শেখ মুজিব শেষ পর্যন্ত ইয়াহিয়ার সাথে আপোস করবেন।'

'অসম্ভব!' রেগে গেলো বাবলু—'আপোসই যদি করবেন তাহলে গোলটেবিলে বসতে রাজি হলেন না কেন?'

হাসান এদের ভেতর অনেকটা ধীর স্থির। বললো, 'আমার মনে হয় শেখ মুজিব আপোস করে মিনিস্ট্রি ফর্ম করলেই ভালো করতেন। আগে ক্ষমতায় বসে পরে ইচ্ছেমতো যা খুশি করা যেতো। নইলে দেখো প্রতিদিন মানুষ মরছে। আর এটা চলতেই থাকবে।'

শফি বললো, 'খুব বুঝেছো। ক্ষমতা ওরা মুজিবকে কোন অবস্থাতেই দেবে

না। সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণা না করলেও মুজিব বলে দিয়েছেন এটা স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

সেদিন রাতেই হাবিলদার মেজর সুলতান আহমেদ এলেন ওদের কাছে। বললেন, 'চট্টগ্রাম থেকে ব্রিগেডিয়ার মজুমদার নির্দেশ পাঠিয়েছেন। যে কোন মুহূর্তে বিদ্রোহ ঘোষণার জন্যে সবাই যেন প্রস্তুত থাকে।'

আবার সবাই উদ্দীপ্ত হলো। একজন বললো, 'এখানকার বাঙালি অফিসাররা সবাই কি জানেন?'

'না।' বুড়ো হাবিলদার মেজর সাবধান করে দিলেন— 'কমিশনড অফিসারদের অনেকেই আমাদের দলে নেই। ক্যাপ্টেন করিমকে তো তোমরা দেখেছো। ওর মতো অনেক আছে। তবে এটা মনে রেখো বেইমানদের আমরা কখনো ক্ষমা করবো না।'

তখন থেকে এক ভীষণ উত্তেজনার সময় কাটতে লাগলো ওদের। শেখ মুজিবের ডাকে অসহযোগ আন্দোলন চলছে সারা দেশ জুড়ে। চিফ সেক্রেটারি, চিফ জাস্টিস থেকে শুরু করে সবাই সে আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন। গভর্নর হয়ে এসেছিলেন টিক্কা খান। চিফ জাস্টিস টিক্কা খানের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে অস্বীকার করলেন।

হাবিলদার মেজর বললেন, 'টিক্কা খানের মতো ভয়ানক লোক আর্মিতে দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া যাবে না। একে যখন পাঠিয়েছে তখন বুঝতে হবে দাবার ছকে এটাই ইয়াহিয়ার শেষ চাল।'

গভীর আগ্রহ নিয়ে সবাই অপেক্ষা করতে লাগলো। যে কোন সময়ে নির্দেশ আসবে বিদ্রোহের। সবাই সেই বিদ্রোহের অপেক্ষা করছে।

বাবলু চোদ্দ তারিখে লুকিয়ে বাড়ি গিয়েছিলো। অন্য সময়ে রোববারে ওদের ছুটি থাকে। অথচ সেদিন চারদিকে কড়া পাহারা। নোটিশ দেয়া হয়েছে কেউ ক্যান্টনমেন্টের বাইরে যেতে পারবে না।

যাবার সময় ট্রেনার হাবিলদার রহমান বাবলুকে সাবধান করে দিয়েছেন— 'ধরা পড়া মানে কোর্ট মার্শাল।'

বাড়িতে সবাই বাবলুকে বললো, থেকে যেতে। বাবা বললেন, 'খুব খারাপ সময় আসছে।' বাবলু কারো কথা শোনেনি। ও নিজেও জানে খারাপ সময়টা কি। বাবুকে সব খুলে বলেছিলো। দু'বছরের বড়ো ভাইটির কাছে বাবলু বন্ধুর মতো অন্তরঙ্গ।

চোদ্দ তারিখের পর বাবলু আর বাড়ি যেতে পারেনি। পনেরো তারিখে প্রেসিডেন্ট ঢাকা এলেন। মুজিবের সাথে আলোচনায় বসলেন। অসহযোগ আগের মতো চলতে থাকলো। সৈন্যরাও নির্বিচারে গুলি চালিয়ে যেতে লাগলো। শহরে বিক্ষেভের পর বিক্ষোভ। শিল্পী সাহিত্যিকরা সংগ্রাম শিবির গঠন করলেন।

সামরিক বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীরা সংগ্রাম কমিটি করলেন। তেইশে মার্চে ইসলামী প্রজাতন্ত্র দিবস পালনের বদলে সব জায়গায় প্রতিরোধ দিবস পালন করা হলো। পাকিস্তানের তেইশ বছরের ইতিহাসে সেদিন প্রথম সকল সরকারি আর বেসরকারি ভবনে পাকিস্তানি পতাকার বদলে বাংলাদেশের পতাকা উড়লো।

তেইশ তারিখে বাবলুরা একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার লক্ষ্য করলো। অবাঙালি অফিসারদের মধ্যে কেমন যেন একটা চাপা উল্লাস। অসহযোগের দীর্ঘ সময় ক্যান্টনমেন্টের সৈন্যদের শুধু ডাল রুটি খেয়ে থাকতে হয়েছে। স্টোরের জমানো মাংসে অল্প কদিন চলেছিলো। মাছ, তরকারি একেবারেই জোটেনি। ডাল, রুটি, আর আলু সেদ্ধ—বাবলুরা তাই খেয়েছে। অবাঙালি সৈন্য অফিসার সবাই বিরক্ত, কিছুটা বিষণ্ণও বটে। এই প্রথম ওদের উল্লসিত হতে দেখে বুড়ো হাবিলদার মেজর বললেন, 'বদমাইশরা নিশ্চয়ই কোন ষড়যন্ত্র করছে।'

আরো এক খবর পেলো ওরা। চট্টগ্রাম বন্দরে অস্ত্র বোঝাই হয়ে যুদ্ধ জাহাজ সোয়াত এসেছে। চট্টগ্রামের মানুষ সেই অস্ত্র নামাতে দিচ্ছে না। বন্দর থেকে আগ্রাবাদ পর্যন্ত সারা পথে শুধু ব্যারিকেডের পর ব্যারিকেড, সৈন্যরা ভাঙতে পারেনি।

টান টান উত্তেজনার ভেতর দিয়ে চব্বিশ তারিখ কাটলো। পঁচিশ তারিখ সবখানে চাপা গুজব। ইয়াহিয়া-মুজিবের বৈঠক ব্যর্থ হয়েছে। সন্ধ্যেয় সামরিক বিমান ঘাঁটি থেকে গোপনে প্রেসিডেন্ট করাচি চলে গেছেন।

টেলিভিশনে রাত নয়টার খবর শুনে বাবলুরা শুতে যাবে, হঠাৎ লক্ষ্য করলো ওদের ব্যারাক ঘিরে রেখেছে অসংখ্য অবাঙালি সৈন্য। এম্যুনেশন ডাম্প-এ কড়া পাহারা বসেছে। ওদের একজন জিজ্ঞেস করলো, 'কী ব্যাপার।'

প্রচন্ড ধমক খেলো— 'শুতে যাও।'

তারপরই ওরা চমকে উঠলো। ওদের ব্যারাক থেকে কনভয়ের পর কনভয় সৈন্য শহরের দিকে যাচ্ছে। গুনতে গুনতে দিশেহারা হয়ে গেলো বাবলু। সবার চোখে মুখে একরাশ ভয় আর বিস্ময়ের ছাপ— 'এত সৈন্য কোথায় যাচ্ছে?' ব্যারাকে ফিরে লাইট নিবিয়ে ওরা বসে রইলো। রশিদ বললো, 'নিশ্চয়ই সংগ্রাম পরিষদের লোকেরা ক্যান্টনমেন্ট ঘেরাও করার জন্য এসে গেছে।'

গভীর উদ্বেগ আর উত্তেজনায় সময় কাটতে লাগলো। প্রথমেই ওরা শুনলো মর্টারের শব্দ। খুব কাছেই হলো শব্দটা। বাবলু বললো, 'বনানী।' তারপর আর কোন শব্দ নেই। রাত তখন সোয়া এগারোটা। কিছুক্ষণ পরই মেশিনগান আর মর্টারের গোলার অবিরাম শব্দে সবাই চমকে উঠলো। ট্যাঙ্ক, মেশিনগান আর মর্টারের সম্মিলিত গর্জন ওদের ভীষণ এক যুদ্ধক্ষেত্রের কথা মনে করিয়ে দিলো।

একটা ঘরের ভেতর ওরা তিরিশজন বসেছিলো। বাইরে টহল দিচ্ছে পাঞ্জাবি সৈন্য। তখনও সৈন্য বোঝাই করে ট্রাকগুলো একের পর এক বেরিয়ে যাচ্ছে।

শফি বললো, 'শব্দটা লক্ষ্য করো। এতক্ষণ একতরফা হচ্ছিলো। এখন মনে হয় পাল্টা আক্রমণ শুরু হয়েছে।'

সবাই কান পেতে শুনলো। 'রাইফেলের শব্দ না?'

শফি বললো, 'রাইফেল আছে। বন্দুকও আছে বলে মনে হচ্ছে।'

ওরা আরো মনোযোগ দিয়ে শুনলো। একটানা মেশিনগানের গর্জনের ফাঁকে ফাঁকে বন্দুক আর রাইফেলও গর্জে উঠছে। তবে সেই শব্দের সংখ্যা খুবই কম। মেশিনগানগুলো সব কটা যেন পাল্লা দিয়ে গোলাবর্ষণ করছে।

বাবলু বললো, 'হেভি মেশিনগান।'

শফি বললো, 'সব মাটির সাথে মিশিয়ে দিচ্ছে।'

হাসান বললো, 'শব্দটা আমার মনে হয়ে রাজারবাগের দিক থেকে আসছে। পুলিশ বোধ হয় বিদ্রোহ করেছে।'

চারপাশে আতঙ্কের অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে। সারা শহর অন্ধকার। দক্ষিণের আকাশ থেকে কখনও শুধু বিদ্যুতের ঝলকের মতো আলো দেখা যাচ্ছে। ওরা যুদ্ধের ছবি দেখেছে টেলিভিশনে। মনে হলো তেমনি একটা যুদ্ধক্ষেত্রের নিরব দর্শক ওরা, দর্শকও নয়—শ্রোতা। শুধু শুনছে আর অনুভব করছে তার ভয়াবহতা।

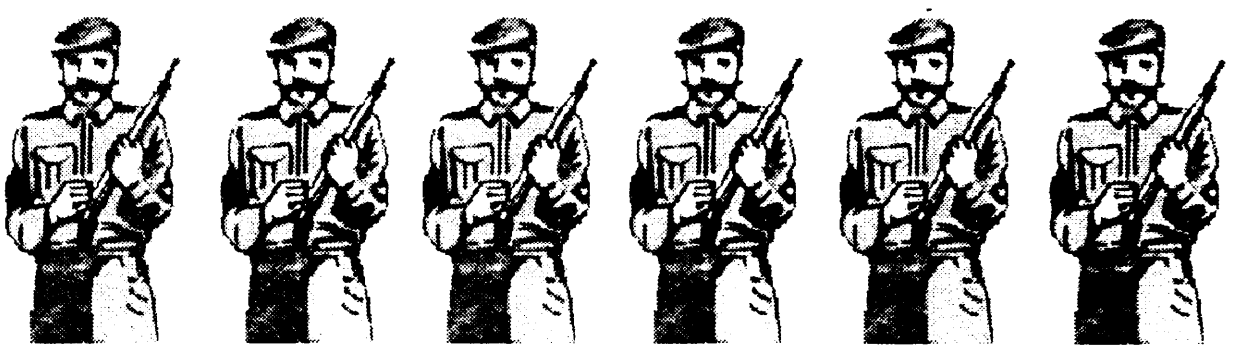

যুদ্ধ চলছিলো রাজারবাগ পুলিশ হেডকোয়ার্টারে। উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বিরাট মাঠ। ঢুকতে গেলে একপাশে বড়ো একটা পুকুর। নারকেল গাছের সারি তার চারপাশে। পুকুরের পরই বিশাল প্যারেড গ্রাউন্ড, ডান পাশে ব্যারাক।

ব্যারাকের পুলিশেরা অতর্কিত আক্রমণের জন্যে এতটুকু প্রস্তুত ছিলো না। রাত এগোরোটা নাগাদ আর্মির একদল গিয়েছে ইপিআর হেডকোয়ার্টার আর ইউনিভার্সিটির দিকে, অপর দল এসেছে রাজারবাগ। ওরা যখন একেবারে গায়ের ওপর এসে পড়েছে তখনই ব্যারাকের পুলিশেরা খবর পেলো। সন্ধ্যে থেকে অবশ্য একটা চাপা গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিলো— রাতে আর্মি এ্যাটাক করতে পারে, কেউ তখন গুরুত্ব দেয়নি। কোন কারণ খুঁজে পায়নি—আর্মি হঠাৎ কেন ওদের আক্রমণ করবে!

ওরা তৈরি হলো শেষ মুহূর্তে। তখন ইউনির্ভাসিটির দিকে প্রচন্ড শেলিং

হচ্ছে, মগবাজারের ওদিকে সাঁজোয়া গাড়ির শব্দ শোনা যাচ্ছে। হাতের কাছে বন্দুক আর রাইফেল ছাড়া কিছুই ছিলো না। তাই নিয়ে বাঙালি পুলিসরা প্রতিরোধের জন্যে প্রস্তুত হলো।

ব্যারাকের সঙ্গে প্রায় লাগানো রাস্তার ওধারে তেতালা বাড়িটা ছিলো মিনুদের। ও আর বাবু ইউনিভার্সিটিতে একই ক্লাশে পড়ে। দু'জন চমৎকার বন্ধু।

তখনও মিনুদের বাড়ির কেউ ঘুমোয়নি। রাত সাড়ে দশটা। মিনু বাবুর কথা ভাবছিলো। কাল রানার পত্রিকার অফিসে ও দেখা করতে বলেছে। ওরা দু'জন সাপ্তাহিক রানার-এর সহকারী সম্পাদক।

মিনু ভাবছিলো বাবুকে বলবে ওর ডায়েরিটা পড়তে দিতে। দেখবে বাবু ওর কথা কতখানি ভাবে। ঠিক তখনই তীক্ষ্ণ শব্দে নিচের তলার কলিং বেলটা বেজে উঠলো।

মিনুর মা আর বাবা পাশের ঘরে বসে কথা বলছিলেন। ওর বড় ভাই শওকত এখনও ফেরেনি। কদিন ধরে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকাতে ও রাত করে বাড়ি ফিরছে।

কলিং বেলটা একটানা বেজেই চললো। বাবা নিচে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে কতগুলো লোক ঘরে ঢুকলো। কারো পরনে পায়জামা গেঞ্জি। কারো লুঙ্গি শার্ট। সবার হাতে বন্দুক আর রাইফেল। একজন ব্যস্ত গলায় বললেন, 'আমরা পুলিস হেডকোয়ার্টার থেকে আসছি। আপনাদের তেতালায় কে থাকে?'

মিনুর বাবা অবাক হয়ে বললেন, 'কেউ না। ভাড়াটে চলে যাওয়াতে মাসখানেক খালি পড়ে আছে।'

ভদ্রলোক বললেন, 'ঠিক আছে। আপনারা সবাই নিচে চলে যান। আজ রাতে এখানে আর্মি এ্যাটাক করবে।'

মিনুর বাবা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন— 'আর্মি এ্যাটার্ক! কেন?'

'জানি না।' ভদ্রলোক একটু অসহিষ্ণু হলেন— 'ওরা বেরিয়ে পড়েছে। এক্ষুণি এলো বলে। আমরা কজন এখান থেকে ডিফেন্স দেবো।'

'আমাদের বেসমেন্টে হলরুম আছে একটা। ওখানে যাবো?'

'তাহলে আরও ভালো। ঝটপট ঢুকে পড়ুন।' ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়ে তেতালায় উঠে গেলেন।

দরজার কাছে অবাক হয়ে দাঁড়িয়েছিলো মিনু। পেছনে মা। মায়ের মুখটা কাগজের মতো সাদা হয়ে উঠেছে। বাবা বললেন, 'কিছু খাবার নিয়ে এক্ষুনি নিচের কামরায় চলে যাও!'

মা দরজা ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। একটুও নড়লেন না। শুধু বললেন, 'আমার শুকু!'

বাবা থমকে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, 'এদিকে গন্ডগোল শুনলে শওকত নিশ্চয়ই ওর কোন বন্ধুর বাড়িতে থেকে যাবে।'

মিনু ঘরে ঢুকে ফ্রিজ খুলে হাতের কাছে যা পেলো, নিয়ে নিচে নেমে এলো। শওকত তার বন্ধুদের নিয়ে মাঝে মাঝে এ ঘরে টেবিল টেনিস খেলে। লম্বা টেবিল আর কয়েকখানা চেয়ার রয়েছে একদিকের দেয়ালে।

মাকে নিয়ে একটু পরে মিনুর বাবা এলেন। দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে চেয়ারে এসে বসলেন। আপন মনে বললেন, 'কিছুই বুঝতে পারছি না। আর্মি কেন অ্যাটাক করতে আসবে!'

টেবিলে খাবারগুলো রাখতে রাখতে মিনু বললো, 'বাবু সেদিন বলছিলো, বেঙ্গল রেজিমেন্ট নাকি যে কোন সময়ে বিদ্রোহ করতে পারে।'

ওর বাবা বিড়বিড় করে বললেন, 'কিছুই বুঝতে পারছি না।'

তখনও ওদের খাওয়া হয়নি। মা পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে বসেছিলেন। মিনু জোর করে বাবা মাকে কিছু খাওয়ালো। নিজেও খেলো। ওর কাছে পুরো ব্যাপারটা ভীষণ অস্বাভাবিক মনে হচ্ছিলো। ও ভাবছিলো, কাল রানার-এর বাবুর সঙ্গে দেখা করবে। আগামী সংখ্যার লেখাগুলো এখনো ঠিক করা হয়নি। আর্ট কলেজে গিয়ে নবী ভাইকে দিয়ে কটা কার্টুন আঁকিয়ে নিতে হবে। রানার-এর ব্যাপারে নবী ভাইর আগ্রহ কম নয়।

হঠাৎ শুনলো দূরে কামানের গর্জন। ওরা সবাই একসঙ্গে চমকে উঠলো। মা আরো ফ্যাকাশে হয়ে গেলেন। বাবা বিভ্রান্ত। তারপর আবার সব কিছু শান্ত। অস্বাভাবিক রকম শান্ত। রাত এগারোটার পরও ওদের সামনের রাস্তা দিয়ে বাস, স্কুটার, আর গাড়ি অবিরাম শব্দ করে চলে। দূরে চায়ের দোকানে লাউড স্পিকারে হিন্দি ছবির গান বাজে। আরো দূরে আলো ঝলমল কমলাপুর স্টেশন। সারারাত দিনের মতো ব্যস্ত, আলোতে উজ্জ্বল হয়ে থাকে। আজ সমস্ত শব্দ আর কোলাহল এক অস্বাভাবিক আতঙ্কে নিস্তব্ধ হয়ে গেছে।

কামানের শব্দের পর মিনিট পনেরোর মতো কাটলো। তারপরই শুরু হলো মেশিনগানের ভয়াবহ শব্দ। অবিরাম একটানা গুলিবৃষ্টি হতে লাগলো। ওপরের তলায় ঝনঝন করে জানালার কাচ ভাঙার শব্দ হলো। ভারী কিছু পড়ার শব্দ শোনা গেলো। সেই সঙ্গে রাইফেলের শব্দ। তেতালা থেকে পুলিসের লোকেরা পাল্টা গুলি চালালো।

তারপর শুধু মেশিনগান আর রাইফেলের অবিরাম গর্জন। থেকে থেকে মর্টারের বিস্ফোরণে পুরো বাড়িটা থরথর করে কেঁপে উঠছিলো। কিছুক্ষণ আগের অস্বাভাবিক নিরবতা প্রচন্ড আক্রোশের শব্দে ফেটে পড়লো।

মাটির নিচের ঘরটায় ওরা তিনজন তিনটে পাথরের মূর্তি হয়ে বসেছিলো। কারো মুখে কোন কথা নেই। দেখলে মনে হবে বহু বছর ধরে ওরা ঠিক এভাবে

বসে আছে।

হঠাৎ মিনুর মা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন— 'আমার শওকত! ও বাড়ি ফিরবে কী করে?'

মিনুর বাবা চাপা গলায় বললেন, 'চুপ করো। বললাম তো ও এখন ফিরবে না। ওদিকে কোথাও থেকে যাবে।'

মিনু মার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। ওর গলা কাঁপছিলো— 'ছেলেমানুষি করছো কেন মা! ভাইয়া যেখানে থাকুক ভালো আছে। তুমি চুপ করো।'

মা চুপ করলেন। কিন্তু তাঁর কান্না থামলো না। শব্দ না করে তিনি অঝোরে কেঁদে চললেন।

রাত আরো গভীর হলো। রাইফেলের শব্দ কমে আসছিলো। আর মেশিনগানের শব্দ জোরালো হচ্ছিলো। শব্দের এতটুকু বিরাম নেই। ওপর তলায় রাইফেলের শব্দ এক সময়ে একেবারেই থেমে গেলো। অন্য কোন জায়গা থেকে একটা দুটো রাইফেল কিছুক্ষণ পর পর শব্দ করছিলো। মেশিনগানের প্রচন্ড হিংস্র শব্দ সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোকে থামিয়ে দিলো।

শেষ রাতে দরজায় কে যেন ধাক্কা দিলো। উঠে দরজা খুললো মিনু। রাতের সেই ভদ্রলোক। সারা জামা রক্তে লাল। দরজা ধরে দাঁড়ালেন। বললেন, 'আমরা আর পারলাম না। চলে যাচ্ছি। দোতালার ঘরে কিছু বন্দুক আছে। ওগুলো সরিয়ে ফেলুন।'

কথা শেষ করে ভদ্রলোক আর দাঁড়ালেন না। দরজায় রক্তাক্ত হাতের ছাপ রেখে চলে গেলেন। বাইরে তখনও মেশিনগানের শব্দ হচ্ছে।

মা তেমনি নিশ্চল বসে রইলেন। বাবার সঙ্গে দোতালার ঘরে এলো মিনু। বাবা দেয়াশলাই জ্বাললেন। তাঁর হাত কাঁপছিলো। প্রত্যেকটা ঘর বিধ্বস্ত। কিছুক্ষণ আগের পরিচিত ঘরগুলোর সঙ্গে এ ঘরগুলোর কোনো মিল নেই। সারা দেয়াল গুলির আঘাতে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। জানালার একটাতেও কাচ নেই। ড্রেসিং টেবিলের বড়ো আয়নাটা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে মেঝেতে ছড়িয়ে রয়েছে। ঘরময় শুধু ভাঙা কাচ।

পায়ের নিচে ঠান্ডা চটচটে কী যেন মনে হলো। আলো নিচু করে ধরলেন মিনুর বাবা। দেখলেন কাঁচা রক্ত ছড়িয়ে আছে মেঝেতে, জানালার গ্রিল-এ, দেয়ালের গায়ে। পর্দার মাঝে ছোপ ছোপ রক্তের দাগ।

বাবা কাঁপা গলায় বললেন, 'সাবধানে পা ফেলো।'

বন্দুক আর রাইফেলগুলো জানালার কাছে পড়েছিলো। রাইফেলের গায়েও রক্তের দাগ। মিনু বললো, 'এতগুলো রাখবো কোথায় বাবা?'

বাবা একটু ভাবলেন। বললেন, 'ছাদের পানির ট্যাংকে ডুবিয়ে রাখবো।'

মিনু শুনলো। বাবা পনেরোটা রাইফেল আর বন্দুক নিয়ে ছাদে গেলেন।

অন্ধকারে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে গিয়ে বারবার হোঁচট খেলেন। মিনু বললো, 'আলোটা জ্বালবো বাবা?'

'না।' বাবার গলা কাঁপছিলো— 'অন্ধকারই থাকুক। আলো মানে বিপদ ডেকে আনা।'

কি অস্বাভাবিক পরিবর্তন, মিনু ভাবলো। অন্ধকারই এখন পরম বন্ধু। আলো মানে ভয়, আলো মানে মৃত্যু!

আবার ওরা নিচের ঘরে এলো। ভোর হয়ে গেছে। ঘড়িতে ছটার ঘন্টা বাজলো। কোথাও এতটুকু শব্দ নেই। মিনুর মনে হলো ভোরের পাখিগুলো সব মরে গেছে। নয়তো ডাকতে ভুলে গেছে।

বাবা বললেন, 'এ বাড়ি ছেড়ে আমাদের চলে যাওয়া উচিত।'

'না'। মার গলা শুনে মিনু চমকে উঠলো। ভীষণ শান্ত গলায় মা বললেন, 'শওকত ফিরে না আসা পর্যন্ত এ বাড়ি ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না।'

বাবার দিকে তাকালো মিনু। বাবা মাথা নিচু করলেন। বিড়বিড় করে কী যেন বললেন।

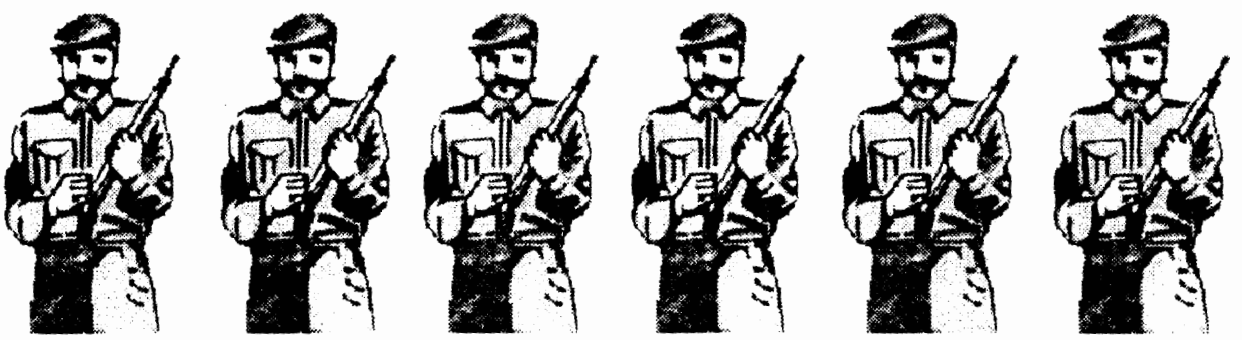

অনেকগুলো মৃতদেহের ভিড়ে শওকত নিজেও একটা মৃতদেহ হয়ে পড়ে ছিলো। স্কোয়াশ স্পোর্টিং ক্লাবের জানালা দিয়ে ভোরের আলো গড়িয়ে পড়েছে। রোদের আঁচ লাগলো ওর মুখে। চোখ মেলে তাকালো। কেমন যেন ঝাপসা মনে হলো। ভালো করে চোখ রগড়ে আবার তাকালো। সবকিছু দেখে চমকে উঠলো শওকত।

তাহলে সে বেঁচে আছে! এই বিস্ময়টাই সবচেয়ে বড় হয়ে তাকে আঘাত করলো। নিজেকে দেখলো বার বার। না স্বপ্ন নয়। স্কোয়াশ ক্লাবের সেই ঘরটাই—কাল রাতে ওরা যেখানে ছিলো। কাঁধের কাছে চিনচিনে একটা যন্ত্রণা অনুভব করলো শওকত। চেয়ে দেখলো রক্ত জমে আছে বেশ কিছুটা জায়গা জুড়ে। অল্প অল্প রক্ত এখনও বেরুচ্ছে।

আবার তাকালো চারপাশে। সবাই যেন ঘুমিয়ে আছে। নাসিম, কামাল, ইরফান আর বিপ্লব। ওদের এ ঘুম আর কোনদিন ভাঙবে না। কামালের গায়ে হাত দিয়ে দেখলো। সারা শরীর শক্ত হয়ে গেছে।

পুরো ব্যাপারটা শুরু থেকে ভাবাবার চেষ্টা করল শওকত। রোজকার মতো ওরা সবাই স্কোয়াশ ক্লাবে সন্ধ্যেটা কাটাতে এসেছিলো। সারাক্ষণ হৈ চৈ করে কাটিয়েছে। দশটার দিকে ক্লাবের দারোয়ান এসে বললো, 'শহরের অবস্থা ভালো মনে হচ্ছে না। ক্লাব বন্ধ করে দেবো।'

ওরা বেরিয়ে পড়লো। সারা শহরে অস্বাভাবিক নিরবতা। হাঁটতে হাঁটতে ওরা গুলিস্তানের সামনে এলো। থমকে দাঁড়ালো চৌরাস্তার মোড়টায়। রাস্তায় কোন লোকজন নেই। দোকানের আলো ঝলসানো বিজ্ঞাপনগুলো অন্ধকার। রাত বারোটা একটা অবধি ব্যস্ত জিন্না এভিন্যুতে দশটার ভেতরই মধ্যরাতের নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে। বেশিরভাগ লাইটপোস্টে আলো নেই। প্রায় অন্ধকার সামনের রাস্তাগুলো খাঁ খাঁ করছে। কোথাও কোন মানুষের সাড়া শব্দ নেই।

ওরা ভীষণ অবাক হলো। ঠিক সেই মুহূর্তে সৈন্যভর্তি একটা লরি সাঁ করে ওদের পাশ কাটিয়ে চলে গেলো। চমকে উঠলো সবাই। ইরফান বললো, 'ব্যাপারটা কেমন যেন গোলমেলে মনে হচ্ছে আমার।'

কামাল বললো, 'আমি বাড়ি যাবো কীভাবে? বাস বন্ধ। একটা স্কুটার পর্যন্ত নেই।'

বিপ্লব বললো, 'এমন তো হবার কথা নয়। কোথাও হয়তো কোন গন্ডগোল হয়েছে।'

নাসিম বললো, 'আমার মনে হয় এখন আমাদের না যাওয়াই উচিত। চলো, আজ রাতের মতো ক্লাবে থেকে যাই।'

শওকত বললো, 'সেই ভালো। চলো ক্লাবে ফিরে যাই।'

ওরা ফিরে এলো। দারোয়ান তখন সামনের দরজায় তালা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলো। নাসিম বললো, 'তালা বন্ধ করো না। আমরা আজ রাতটা এখানেই কাটাবো।

দারোয়ান মাথা নেড়ে সায় জানালো— 'শহরের অবস্থা আমারও ভালো মনে হচ্ছে না।'

ভেতরে গিয়ে দরজা খুলে আলো জ্বালিয়ে দিয়ে দারোয়ান বললো, 'আমি কাল সকালেই আসবো।'

আবার ওরা আগের জায়গায় গিয়ে বসলো। কামাল বললো, 'তাসের প্যাকেট দুটো নামাও। রামি খেলে দিব্যি রাতটুকু কাটিয়ে দেয়া যাবে।'

নাসিম তাস বের করে আনলো। সবাই খেলায় বসলো। অথচ খেলাতে ওদের কারোই মন ছিলো না। খেলতে গিয়ে সবাই বার বার ভুল করলো। বিপ্লব বললো, 'কামাল, তখন গন্ডগোলের কথা কী বলছিলে?'

কামাল কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো, 'কোথাও গুলিগোলা হয়েছে হয়তো।'

ইরফান বললো, 'তাই বলে জিন্না এভিন্যুর মতো জায়গায় একটা স্কুটার

পাওয়া যাবে না, এটা কেমন কথা! রাত দুটোর পরও এখান থেকে স্কুটার নিয়ে বাড়ি ফিরেছি।'

বিপ্লব বললো, 'ভুলে যাচ্ছো কেন, এখন অসহযোগ আন্দালন চলছে। সিনেমা টিনেমা সব বন্ধ। কদিন ধরে দশটার পর এমনিতেই রাস্তাঘাট ফাঁকা হয়ে যায়।'

নাসিম বললো, 'তাই বলে আজকের মতো নয়। কাল আমি সাড়ে দশটায় বাসে করে বাড়ি ফিরেছি।'

ইরফান বললো, 'আজ সত্যিই একটু অন্য রকম মনে হচ্ছে। যাকগে ও সব। এক রাত বাইরে কাটানো এমন কোন ব্যাপার নয়। তাছাড়া আমরা কেউ বাচ্চা ছেলে নই যে, বাড়ি না ফিরলে একেবারে কান্নাকাটি পড়ে যাবে।'

শওকত বললো, 'কী হলো নাসিম? জোকার কেন ফেলে দিলে?'

নাসিম একটু বিব্রত হলো— 'আমার ভাই খেলতে ইচ্ছে করছে না।'

ইরফান হাতের তাস টেবিলে ছড়িয়ে দিলো—'আমারও ভালো লাগছে না।'

শওকত বললো, 'বাদ দাও তাহলে। চলো শুয়ে পড়ি।'

কনফারেন্স রুমের টেবিলটা একপাশে সরিয়ে ওরা পাঁচজন কার্পেটের ওপর শুয়ে পড়লো।

কামাল বললো, 'লাইট অফ করে দেবো?'

'থাক না, যদি কারো অসুবিধে না হয়!'

ইরফান বললো, 'আমি আলো জ্বেলে ঘুমাই।'

ঘড়িতে এগারোটা বাজলো। তখনও কেউ ঘুমোয়নি। শওকত আর বিপ্লবের আঙুলের ফাঁকে সিগারেট জ্বলছে। একটা চাপা অস্বস্তি সবাইকে ঘিরে রেখেছে। সাড়ে এগারোটায় শহরের প্রত্যেকটা মানুষের মতো ওরাও চমকে উঠলো। বিস্মিত হলো। তারপর শুধু শুনে গেলো অবিরাম এক ভীষণ যুদ্ধের শব্দ।

বাইরে তাকিয়ে দেখলো শহরের কোথাও এতটুকু আলো নেই। থমথম করছে প্রেতায়িত অন্ধকার। শহরে এত অন্ধকার আগে কোনদিন ওরা দেখেনি।

ইরফান উঠে ঘরের আলো নিভিয়ে দিলো। কেউ কিছু বললো না। অন্ধকার ঘরে ওরা পাঁচজন চুপচাপ বসে রইলো। একটার পর একটা আতঙ্কের মুহূর্ত কাটতে লাগলো। মুহূর্তগুলো বড় হয়ে ঘন্টা হলো। ঘন্টার পর ঘন্টা ওরা জেগে বসে রইলো। তবু ওদের বিশ্বাস ছিলো ভোর হলে সবাই বাড়ি ফিরে যেতে পারবে। ভোরের কাগজে হেডলাইনে দেখবে কি এমন বিপর্যয় ঘটলো। অথচ সেই ভোরই ছিলো ওদের জীবনের সবচেয়ে ভয়াবহ ভোর। কয়েকজনের জীবনের শেষ সূর্যোদয়।

পুরোনো ঢাকার দিকে ওরা মাঝরাতে শ্লোগানের শব্দ শুনেছিলো— 'সংগ্রাম সংগ্রাম, চলবে চলবে। জয় বাংলা।' রক্তের প্রতি কণায় শ্লোগানের সেই শব্দ

অসম্ভব উত্তেজনা ছড়িয়ে দিয়েছিলো। মেশিনগানগুলো সেই শ্লোগানের শব্দে আরো হিংস্র, আরো উন্মত্ত, আরো প্রচন্ড হলো। শেষ অবধি সেই নারকীয় শব্দের নিচে সমস্ত শ্লোগান চাপা পড়ে গেলো।

ভোরের দিকে দূরের মেশিনগানের শব্দ কমে এলো। খুব কাছে থেকে একটা রাইফেল কিছুক্ষণ পর পর গর্জে উঠছে। ওদের মনে হলো স্টেডিয়ামের ওদিক থেকে শব্দটা আসছে। তখনো সূর্য ওঠেনি। আকাশে শুধু রঙ ধরেছে। বাইরে ঘোলাটে অন্ধকার। তখনই ওরা শুনলো ট্যাঙ্কের শব্দ। একটানা অবিরাম কর্কশ ধাতব শব্দ ক্রমশ ওদের কাছে এলো। বন্ধ জানালাটা সামান্য ফাঁক করে ওরা চেয়ে দেখলো, জিন্না এভিন্যু থেকে একটা ট্যাঙ্ক ঘড় ঘড় শব্দ করে অতিকায় দৈত্যের মতো এগিয়ে আসছে। তার ঠিক পেছনেই একটা জিপ।

ট্যাঙ্কটা মোড় ঘুরে ডিআইটির দিকে চলে গেলো। জিপটাও সঙ্গে যাচ্ছিলো। হঠাৎ মোড়ের মাথায় এসেই থেমে গেলো। চারজন সৈন্য লাফ দিয়ে নামলো। প্রত্যেকের হাতে হালকা মেশিনগান। চোখে আবিষ্কারের হিংস্র উল্লাস। ক্লাবে ওরা বাংলাদেশের পতাকা দেখেছে। বুটের শব্দগুলো তালে তালে এগিয়ে আসতে লাগলো। দরজা বন্ধ। ভেতরে শওকতদের ভয় আর উত্তেজনা চরমে পৌঁছেছে। চারজোড়া বুটের শব্দে ওরা অবধারিত মৃত্যুর পদধ্বনি শুনলো। ভারী শব্দগুলো ওদের বুকের ভেতর কাঁপন ধরালো। দরজার কাছে এসে বুটের শব্দ থেমে গেলো। একটা কর্কশ কণ্ঠস্বর ওদের হাড়ের ভেতর বিঁধে গেলো— 'দরওয়াজা খোলো!'

ওরা কেঁপে উঠলো সেই বিজাতীয় কণ্ঠস্বরে। আবার শুনলো, তবু ওরা কেউ দরজার কাছে যেতে পারলো না। তারপর শুনলো নির্দেশের কণ্ঠ— 'দাগো।'

চারটা মেশিনগান একসঙ্গে গর্জে উঠলো। হলঘরে ওরা প্রলয়ের শব্দ শুনলো। বন্ধ দরজা ছিন্নভিন্ন হয়ে উড়ে গেলো। তারপর নিজেদের ওরা আবিষ্কার করলো চারটা উদ্যত মেশিনগানের সামনে। চারটা কালো চকচকে নল ওদের পাঁচজনকে লক্ষ্য করে স্থির হয়ে আছে। একজন কর্কশ কণ্ঠে বললো, 'লাইনে দাঁড়াও।'

পাঁচটা দম দেয়া পুতুলের মতো ওরা লাইন করে দাঁড়ালো। হিংস্র নেকড়ের আক্রোশে অবাঙালি সৈন্যগুলোর চোখ ওদের দেখলো ভালো করে। পাশাপাশি লাইনের প্রথমে নাসিম। তার পাশে শওকত, বিপ্লব, ইরফান, কামাল। সৈন্যদের অবস্থান দেখে মনে হলো প্রথম গুলি করবে নাসিমকে। তারপর শওকত, বিপ্লব এবং অন্যদের। পর পর পাঁচজনকেই হত্যা করা হবে।

শওকতের মনে আছে সেই নারকীয় নির্দেশ— 'দাগো'। শোনার সঙ্গে সঙ্গে মেশিনগান থেকে একঝলক আগুনের মতো গুলি বেরিয়ে এসে নাসিমকে ঝাঁঝরা করে দিলো। পড়ে গেলো নাসিম। সঙ্গে সঙ্গে শওকত, বিপ্লব, ইরফান আর

কামাল। একটানা গুলির শব্দ। কিছু আর্তনাদ, ধোঁয়া আর অন্ধকার। তারপর শওকতের আর কিছুই মনে নেই।

বেশ কিছুক্ষণ হলো সূর্য উঠেছে। সময়ের কথা মনে হলো শওকতের। হাতঘড়িটার দিকে তাকাতে গিয়ে দেখলো ওটা হাতে নেই। সারা ঘর বিধ্বস্ত। আলমারি, শোকেস আর জানালার কাচ ছড়িয়ে রয়েছে সারা মেঝেতে। দেয়ালগুলো ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। চেয়ার, টেবিল সব কিছু ভেঙে এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে আছে চারদিকে। মনে হলো, যুদ্ধক্ষেত্রের এক ধ্বংস্তুপের ভেতর পড়ে আছে সে।

হঠাৎ চমকে উঠলো শওকত। ঢং ঢং ঢং—দেয়ালঘড়িতে দশটার ঘন্টা বাজলো। তাকিয়ে দেখলো দেয়াল ঘড়িটা আগের জায়গাতেই আছে। অক্ষত। তখন থেকেই চলছিলো। সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে শওকত অনুভব করলো ঘড়ির শব্দ।

আবার চমকে উঠলো শওকত। একটা অস্ফুট গোঙানির শব্দ! উঠে বসে চারপাশে তাকালো। কামালকে দেখলো। ছিন্ন-ছিন্ন শরীর। নাসিমের পুরো শরীরটা ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। ইরফানের বুকে গুলি লেগেছে। কপালের কাছেও গভীর ক্ষত। রক্তে ডুবে আছে বিপ্লব। কোথায় শব্দ হলো? হয়তো মনের ভুল—ভাবলো শওকত।

ওকে সবচেয়ে বেশি অবাক করেছে নিজের বেঁচে থাকাটা। বুঝতে পারলো, গায়ে গুলি লাগার আগেই সে পড়ে গিয়েছিলো। শুধু কাঁধের পাশটায় খানিকটা চামড়া ছিঁড়ে গুলি বেরিয়ে গেছে। মনে হলো, মৃত্যু নয়— বেঁচে থাকাটাই সবচেয়ে বড়ো বিস্ময়!

আবার সেই শব্দ শুনলো শওকত। খুব কাছে। অস্পষ্ট গোঙানির শব্দ। ভালো করে চেয়ে দেখলো। তবে কি বিপ্লব? ওকে ধরে দেখলো। চমকে উঠলো। শরীরে এখনো জীবনের উত্তাপ। বিপ্লব তাহলে মরেনি! দু'হাতে ধরে ওকে বসিয়ে দিলো শওকত, দেখলো দু'জায়গায় গুলি লেগেছে। পায়ে আর কাঁধের নিচে। অস্পষ্ট একটা গোঙানির মতো শব্দ বেরুচ্ছে গলা দিয়ে।

ফিসফিস করে শওকত বললো— 'বিপ্লব তুই বেঁচে আছিস?'

ধীরে ধীরে অতি কষ্টে চোখ মেলে তাকালো বিপ্লব। আবার চোখ দুটো বুজে গেলো। এখনো অল্প অল্প রক্ত বেরোচ্ছে। পকেট থেকে রুমাল বের করে পায়ে বেঁধে দিলো। অস্ফুট কণ্ঠে বিপ্লব বললো, 'বাড়ি যাবো।'

শওকত বাইরে তাকিয়ে দেখলো। শহরে কোন মানুষ নেই। আকাশে একটা পাখি নেই। গাছের পাতায় কোন কাঁপন নেই। কোথাও এতটুকু প্রাণের সাড়া নেই। স্টেডিয়ামের কাছে কিছুক্ষণ পর পর একটা মেশিনগানের শব্দ হচ্ছে। আবার থেমে যাচ্ছে।

শওকতের মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠলো। বিড় বিড় করে বললো, 'কোথায় বাড়ি!'

ও মনে করতে পারলো না এ শহরের কোথাও ওর বাড়ি আছে। ওর পরিচিত শহরের সঙ্গে এই মুহূর্তের শহরটার কোন মিল নেই। চারদিকে থমথম করছে ভৌতিক নিরবতা। সম্পূর্ণ অচেনা পরিবেশ।

বিপ্লব আবার বললো, 'বাড়ি যাবো।' গোঙানোর মতো শব্দ হলো।

শওকত ফিসফিস করে বললো, 'বাইরে এখনো মেশিনগানের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ওটা না থামা পর্যন্ত বেরোনো যাবে না।'

বিপ্লব কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর বললো 'জল, একটু জল দাও আমাকে।'

শওকত বললো, 'এক্ষুনি আনছি।' ছুটে গেলো পাশের ঘরে। সেখানে পানির সোরাই ছিলো। দেখলো সোরাইটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে। সবটুকু পানি গড়িয়ে গেছে। ফিরে এলো খালি হাতে। বললো 'বাড়ি গিয়ে খেও বিপ্লব। আমরা একটু পরেই বেরুবো।'

বিপ্লবের চোখ দুটো আবার বন্ধ হয়ে গেলো। জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো শওকত। এক টুকরো রাস্তা দেখা যাচ্ছে। অন্য দিন ঢাকার সবচেয়ে ব্যস্ত রাস্তা এটা। মানুষ আর গাড়ির ভিড়ে সব সময় প্রাণোচ্ছল হয়ে থাকতো এই রাস্তা। অথচ আজ মনে হচ্ছে এটা ঢাকা শহরই নয়। ছবিতে দেখা যুদ্ধে বিধ্বস্ত অচেনা কোন শহর।

সৈন্যরা স্টেনগান আর হালকা মেশিনগান নিয়ে রাস্তায় টহল দিচ্ছে। হঠাৎ শওকত দেখলো দুটো সৈন্য ওদের ক্লাবটার দিকে এগিয়ে আসছে।

আবার নিজেকে ভীষণ এক ভয়ের জগতে আবিষ্কার করলো শওকত। নিশ্চিত মৃত্যুর মতো দুটো সৈন্য এগিয়ে আসছিলো। এবারের পদক্ষেপ অনেক বেশি ভয়াবহ। আগে ওরা পাঁচজন ছিলো। এবার ও সম্পূর্ণ একা। বিপ্লবের অবস্থা বেঁচে থাকার মতো নয়। তবু কিছুটা আশা হলো। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে মানুষ অনেক অসম্ভব কল্পনার ছবি আঁকে। বিপ্লবকে বললো, 'একেবারে মরার মতো শুয়ে থাকো। ওরা আবার আসছে।' বিপ্লবকে ধরে শুইয়ে দিলো শওকত। তারপর সে নিজেও একটা মৃতদেহ হয়ে গেলো। বুটের শব্দ বুকের ভেতর আঘাতের পর আঘাত করে এগিয়ে এলো।

সিঁড়ি থেকে হলঘর পেরিয়ে ওদের দরজার কাছে এসে ঘাতক শব্দ থমকে দাঁড়ালো। আবার সেই বিজাতীয় কণ্ঠস্বর। হাড় শিরশির করে উঠলো— 'কেউ যদি বেঁচে থাকো উঠে দাঁড়াও। নয়তো গুলি করবো।'

শওকত আবার সম্ভবনার আলো দেখলো। ওদের অসহায়তার কথা যদি খুলে বলে তাহলে বেঁচেও যেতে পারে। উঠে বসলো। বিপ্লবকেও ধরে বসালো।

বললো, 'আমরা দুজন বেঁচে আছি। ওর জখমটা খুব বেশি।'

সৈন্য দুটোর হাতে দুটো স্টেনগান। একজন আগের মতো রুক্ষ কণ্ঠে বললো, 'উঠে দাঁড়াও।'

ঠিক আগের মতো মৃত্যুর কণ্ঠস্বর। শওকত উঠে দাঁড়ালো। সামনের দৃশ্যগুলো ঝাপসা হয়ে এলো। একজন স্টেনগান উঁচিয়ে গুলি করার জন্যে প্রস্তুত হলো। মৃত্যুকে এবার মনে হলো অনেক বেশি অমোঘ।

ঘড়ির শব্দ শুনলো শওকত। ঢং, ঢং, ঢং—ঘন্টাগুলো অবিরাম বেজে চলেছে। শব্দগুলো থরে থরে জমতে লাগলো তার চারপাশে। তখন ভয় নয়, অদ্ভুত এক শূন্যতা ওকে ঘিরে ধরলো। ঢং, ঢং, ঢং, ঢং,—মন্থর গতিতে একের পর এক ঘন্টা বাজছে। পলকহীন শূন্যদৃষ্টিতে স্টেনগানের নলটার দিকে তাকিয়ে রইলো সে! একজন সৈন্যের আঙুল ট্রিগারের ওপর শক্ত হয়ে বসে যাচ্ছে। শওকত নির্বিকার। ঠিক তখনই পাশের সৈন্যটা স্টেনগানের নলটা হাত দিয়ে একপাশে সরিয়ে নিলো। উর্দু নয় পশতুতে বললো, 'এদের ক্যাপ্টেনের কাছে নিয়ে চলো।'

শওকতের চোখে তখনও শূন্যতা। সৈন্যটা ওকে পরিষ্কার উর্দুতে বললো, 'ওকে নিয়ে আমাদের সঙ্গে এসো।'

আবার জীবন। এবারও তাহলে বেঁচে গেলো শওকত! জীবন আর মৃত্যুর এক অদ্ভুত খেলা অনুভব করলো সে। বাঁচার ইচ্ছেটা আবার তীব্র হয়ে উঠলো। বিপ্লবকে তুলে দাঁড় করালো। ওর এক হাত নিজের কাঁধে তুলে নিলো। বাঁ হাতে সেই হাত চেপে ধরে ডান হাতে বিপ্লবের কোমর জড়িয়ে ধরলো। বললো, 'হাঁটতে হবে বিপ্লব।'

বিপ্লব মাথা নাড়লো। সৈন্য দুটোর নির্দেশ মতো ওদের আগে আগে এগিয়ে চললো শওকত আর বিপ্লব। নিজের দেহটাই তার কাছে অসম্ভব ভারী মনে হচ্ছিলো। বিপ্লবকে নিয়ে বার বার সে হোঁচট খেলো। একবার হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো। অমনি পেছনে একজন বুটের লাথি মারলো। কর্কশ কণ্ঠস্বর— 'জলদি চলো।'

উঠে দাঁড়ালো শওকত। পল্টনের মাঠের ভেতর দিয়ে ওদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। স্টেডিয়ামের গেটের কাছে সৈন্যরা ছাউনি করেছে।

সৈন্য দুটো শওকত আর বিপ্লবকে ছাউনির ভেতর ক্যাপ্টেনের কাছে নিয়ে গেলো। ক্যাপ্টেন ওদের দেখলো ভালো করে। বললো, 'তোমরা বাঙালি?'

শওকত মাথা নেড়ে সায় জানালো। ক্যাপ্টেন আবার প্রশ্ন করলো, 'ওখানে কেন ছিলে?'

সব কথা খুলে বললো শওকত। ক্যাপ্টেন বললো, 'বাঙালিরা অনেক বেশি স্বপ্ন দেখে। সে জন্যে আজ তোমাদের এ অবস্থা! স্বাধীনতা চেয়েছিলে তোমরা, তাই না? জানো, স্বাধীনতা কাকে বলে?'

রাগে ক্ষোভে ফেটে পড়লো ক্যাপ্টেন। কখনো উর্দুতে কখনো ইংরেজিতে অনর্গল বলে গেলো তার ক্ষোভের কথা। শওকত চুপ করে রইলো। অদ্ভুত একটা বিষণ্নতা ওকে ঘিরে রেখেছিলো। ক্যাপ্টেনের কিছু কথা কানে গেলো, কিছু গেলো না। ক্যাপ্টেন সবশেষে বললো, 'জানো, তোমাদের আমি এ মুহূর্তে গুলি করে মারতে পারি।'

শওকত বললো, 'কেন জানবো না?'

ক্যাপ্টেন বললো, 'তবু তোমাদের আমি মারবো না। মৃত্যুর সাক্ষী হয়ে তোমরা বেঁচে থাকবে। যাও, তোমরা বাড়ি যাও।'

অদ্ভুত হাসলো শওকত— 'আপনি যেতে বলছেন! রাস্তায় বেরুলে আমাদের কুকুরের মতো গুলি করে মারা হবে। এ কথা আপনি ভালোভাবেই জানেন। তার চেয়ে এখানেই মারুন। বাইরে যাবার কী দরকার!'

ক্যাপ্টেন কিছুক্ষণ অপলক চেয়ে রইলো শওকতের দিকে। এই ছেলের সঙ্গে রাজনীতির কোন সম্পর্ক আছে বলে পাঠান ক্যাপ্টেনের মনে হলো না। বললো, 'তোমরা যাও। আমি বলে দিচ্ছি।'

ক্যাপ্টেন অয়ারলেসে কথা বললো, 'ডিআইটি আর স্টেডিয়ামের রাস্তায় দুটো লোক যাচ্ছে, একজন আহত। আরেকজন তাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। ওদের মারার দরকার নেই।'

শওকত আর বিপ্লব বেরুলো মৃত্যুর ছাউনি থেকে। আরামবাগের ওদিকে আবাসিক এলাকা। এদিকে সব অফিস আর বাণিজ্যিক ভবন। আশ্রয়ের জন্যে ওদের আরামবাগ অবধি যেতে হবে। হাঁটতে শুরু করলো ওরা।

স্টেডিয়ামের শেষ মাথা পর্যন্ত যেতে যেতে হাঁপিয়ে গেলো শওকত। বিপ্লব একেবারেই বিপর্যস্ত। ক্লান্ত কণ্ঠে বললো, 'শওকত, জল না খেলে আমি এক পাও এগুতে পারবো না। আমাকে বরং রেখে চলে যাও।'

অসহায়ের মতো চারিদিকে তাকালো শওকত। অল্প দূরে একটা নতুন বাড়ি উঠছে। পাশে একটা চৌবাচ্চার মতো। ইট ভেজানোর জন্যে পানি রাখা হয়েছে সেখানে। শওকত ছুটে গেলো সেখানে। আঁজলা ভরে সেই নোংরা পানি এনে বিপ্লবের মুখে তুলে দিলো। তারপর দুজন এগিয়ে গেলো মতিঝিলের পথ ধরে।

সৈন্যদের দুটো দল ডিআইটি আর স্টেডিয়ামের ওপর থেকে পাহারা দিচ্ছিলো। থেকে থেকে ইচ্ছেমতো গুলি ছুঁড়ছিলো। ক্যাপ্টেন বলে দেয়াতে শওকত আর বিপ্লব নির্বিঘ্নে ওদের পাশ কাটিয়ে চলে গেলো। বিপদ হলো পথের শেষ মাথায় এসে। স্টেট ব্যাঙ্কের উঁচু দালানের ওপর আরো একটা দল রয়েছে। ওরাও ইচ্ছে মতো গুলি ছুঁড়ছে। স্টেটব্যাঙ্কের সামনে থেকে সোজা রাস্তা চলে গেছে পুরানা পল্টনের দিকে। আশি ফুট চওড়া রাস্তা। খাঁ খাঁ করছে। সৈন্যদের নিশানা সোজা রাস্তা বরাবর।

এ রাস্তা পেরোনো রীতিমত অসম্ভব বলে মনে হলো শওকতের। এবারে সে একেবারেই ভেঙে পড়লো। তবু শেষ চেষ্টাটুকু করতে হবে। বিপ্লবকে বললো, 'দৌড়োতে পারবে? এই যে রাস্তা দেখছো সামনে, এটা দৌড়ে পার হতে হবে। যতো জোরে পারো ছুটবে। রাস্তা পেরোলে কিছুটা নিশ্চিন্ত হতে পারবো।'

বিপ্লব সামনে চেয়ে দেখলো। ক্লান্ত গলায় বললো, 'পারবো।'

শক্ত হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়ালো বিপ্লব। তীব্র ব্যথায় সারা শরীর কেঁপে উঠলো। সমস্ত ইচ্ছাশক্তি একত্রিত করে দুজন একসঙ্গে ছুটলো। চোখ বুজে, দিকবিদিক জ্ঞান হারিয়ে। এর চেয়ে জোরে দৌড়ানোর কথা কোনদিন ওরা কখনো কল্পনাও করেনি।

রাস্তা পার হয়েই ওরা হুমড়ি খেয়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে মেশিনগানের গুলি বৃষ্টির ধারার মতো নেমে এলো চওড়া কালো রাস্তার বুকে।

দম বন্ধ হয়ে আসছিলো ওদের। বিপ্লবকে তুলে ধরে সামনের সরু গলির পথে আরো এগিয়ে গেলো শওকত। অবশেষে ওরা আরামবাগের কাছে পৌঁছলো। সামনে যে বাড়িটা ছিলো তার নিচু পাঁচিল টপকে বাগানে ঢুকলো। হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো বাগানের ঘাসের বুকে। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওরা জ্ঞান হারালো।

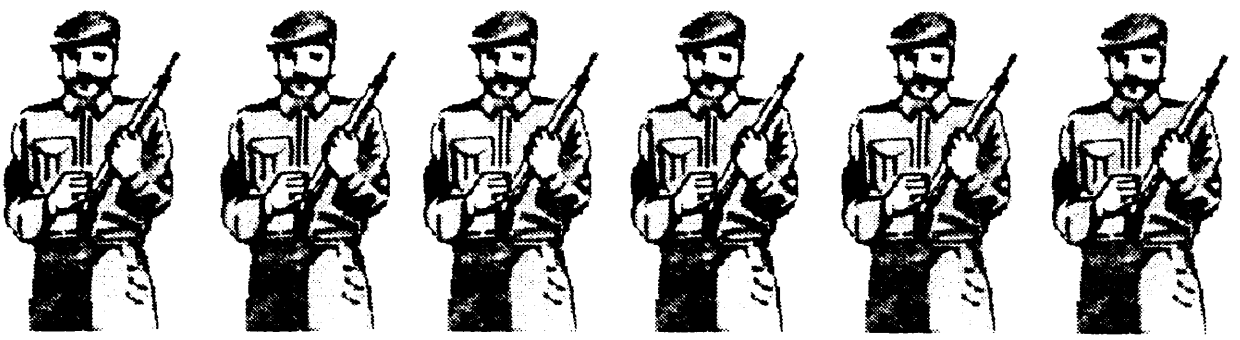

বাইরের পৃথিবীতে এখন শান্ত সুন্দর সকাল। ঝকঝকে নীল আকাশে সূর্য উজ্জ্বল আলো ছড়াচ্ছে। প্রতিদিনের মতো একটি অনুপম সকাল। রোদের শান্ত নরম আলোতে ছিন্নভিন্ন ঢাকা শহরটা শুধু থমথম করছে। মেশিনগানের দু'একটা বিক্ষিপ্ত গর্জন ছাড়া দ্বিতীয় কোন শব্দ নেই। বাইরের পৃথিবীর কোন কোলাহল এখানে এসে পৌঁছোচ্ছে না। আকাশে একটা পাখি নেই। রাস্তার কুকুরগুলোও সব যেন কোন যাদুকরের মন্ত্রবলে অদৃশ্য হয়ে গেছে। সবাই ঘরের ভেতর বসে আছে। চোখে মুখে উদ্বেগের ছাপ, শহরে কী ঘটছে কেউ জানে না। শুধু এইটুকু জানে— কাল রাত ছিলো প্রলয়ের রাত, যার জের এখনো চলছে।

মিনুর বাবা কিছুক্ষণের জন্যে ওপরের ঘরে গিয়েছিলেন। বুঝতে পারছেন না কী করবেন। শওকত না ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও যাবেন ভাবছিলেন। সেটাও এখন তাঁর কাছে অসম্ভব মনে হচ্ছে। রাস্তায়

বিকট চেহারার পাঞ্জাবি সৈন্যরা টহল দিচ্ছে।

হঠাৎ একটা গুলি এসে তেতালার ঘরে লাগলো। ঝনঝন করে জানালার কাঁচ ভাঙলো। নিচে বসে মিনুরা সবাই সেই শব্দ শুনলো। বাবা দরজা খুলে দোতালার ঘরে গেলেন।

শহরে কারফিউ কিনা বোঝা যাচ্ছে না। ট্রানজিস্টারটা দেখলেন, ঠিক আছে। ঢাকা রেডিয়ো ধরলেন। কোনো সাড়াশব্দ নেই। ট্রানজিস্টারটা হাতে করে তিনি আবার নিচের ঘরে নেমে এলেন।

মা তখন থেকেই অস্বাভাবিক রকম শান্ত। মিনু অনেক চেষ্টা করেও কিছু খাওয়াতে পারেনি। বাবা বললেন, 'মিনু, একটু চা করো। ওপরে যেও না।'

গুলির শব্দ মিনুও শুনেছে। কথা না বলে বেরিয়ে গেলো। মা অসম্ভব শান্ত গলায় বললেন, 'শওকত কি আসবে না?'

বাবা বিব্রত হলেন— 'এ অবস্থায় ও যেখানে আছে সেখানেই থাকা উচিত। বাড়ি ফেরার চেষ্টা না করলেই ভালো করবে।'

মা বললেন, 'তুমি জানো ও কোথায় আছে?'

বাবা একটু চুপ করে কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, 'হয়তো কোন বন্ধুর বাসায়। যেখানেই থাকুক আমার মন বলছে ও নিরাপদ। তুমি দেখো শওকত ঠিকই ফিরে আসবে।'

মা বিড়বিড় করে কী যেন বললেন।

কিছুক্ষণ পর মিনু ব্যস্ত পায়ে চায়ের ট্রে এনে টেবিলে রাখলো। ভীষণ উত্তেজিত মনে হলো ওকে। বললো, 'আর্মির কয়েকজন লোক রাস্তার মোড় থেকে আমাদের বাড়ির দিকে কী যেন দেখাচ্ছে।'

বাবা চমকে উঠলেন— 'তুমি কোত্থেকে দেখলে?'

মিনু বললো 'দোতালার জানালা দিয়ে দেখেছি।'

মা কাঁপা গলায় চেঁচিয়ে বললেন, 'দোতালায় কেন গিয়েছিলি?'

মিনু মাথা নিচু করে রইলো। একটু থতিয়ে বললো, 'এমনি দেখতে।'

মা তেমনি রাগের গলায় বললেন, 'কী এমন দেখার জিনিস ছিলো ওখানে? যদি গুলি করতো? বারণ করেছিলো, কানে যায়নি?'

বাবা বললেন, 'আহ্, তুমি থামবে! মিনু কী বলছিলে বলো।'

মিনু থেমে থেমে বললো, 'বেশ কয়েকজন আর্মির লোক, দু'একটা অফিসারও হবে। আমাদের বাড়ির দিকে বার বার আঙুল উঁচিয়ে কী যেন দেখাচ্ছিলো।'

বাবা একটু ভেবে বললেন, 'আমাদের বাড়িটায় প্রচুর গোলাগুলি লেগেছে। তাই হয়তো দেখাচ্ছিলো। ঠিক আছে। ওপরে গিয়ে কাজ নেই! ওরা এখনও এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়ছে।'

বাবা আবার ট্রানজিস্টার অন করলেন। ঢাকা স্টেশন ধরতে চাইলেন। কোথাও ধরা গেলো না। আকাশবাণীর খবর শুনলেন। এখানকার কোন খবর নেই। চিন্তিত গলায় বললেন, 'আটটা বেজে গেছে। এখনো স্টেশন বন্ধ।'

মিনু বললো, 'সৈন্যরা হয়তো স্টেশনের কোন ক্ষতি করেছে।'

বাবা কোন কথা বললেন না। অসম্ভব উদ্বিগ্ন মনে হলো তাঁকে। মা আগের মতো শান্ত স্থির। অথচ তাঁর বুকের ভেতর উত্তাল ঝড়।

একটু পরে সবাই একসঙ্গে চমকে উঠলো। কে যেন খুব জোরে দরজা ধাক্কাচ্ছে। মা বললেন, 'শুকু! নিশ্চয়ই শুকু এসেছে।'

বাবা কান পেতে শব্দটা শুনলেন। অস্বাভাবিক রকম জোরে হচ্ছে শব্দটা। একটু ভেবে বললেন, 'তোমরা বসো। আমি দেখছি।'

বাবা চলে গেলেন। গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে মিনুরা বসে রইলো। একটু পরেই শুনলো দরজা খোলার শব্দ। আর সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো ভারী বুটের শব্দ, মা চমকে উঠলেন। 'শুকুর কিছু হয়নি তো!' বলেই উঠে দাঁড়ালেন। মিনু মার সঙ্গে ওপরে এলো।

কানের পর্দায় কর্কশ কণ্ঠস্বর আছড়ে পড়লো। কে যেন চিৎকার করে বললো, 'কাঁহা হ্যায় সব বদমাস লোগ। ওদের বের কর জলদি। কোথায় সেই শয়তানের দল?'

ওরা বাবার শান্ত গলা শুনলো— 'আপনি কাদের কথা বলছেন? আমার ঘরে বাইরের কেউ নেই।'

মা শক্ত করে মিনুর হাত ধরে আছেন। ঠক ঠক করে কাঁপছেন। দরজার ফাঁক দিয়ে দেখলেন, পাশের ঘরে বেশ কয়েকজন অবাঙালি সৈন্য। একজন মেজরও রয়েছে। বাবার কথা শুনে মেজরটা চিৎকার করে বললো, 'তাহলে তোমরাই কাল সারারাত এ বাড়ি থেকে গুলি ছুঁড়েছিলে? কোথায় তোমার লোকজন? সব কটাকে কুকুরের মতো গুলি করে মারবো।'

মিনুর বাবা আগের মতো শান্ত গলায় বললেন, 'বাড়িতে শুধু আমি, আমার স্ত্রী আর আমার মেয়ে রয়েছে। আমরা কেউ বন্দুক ছুঁড়তে জানি না।'

মেজর আবার চিৎকার করে উঠলো, 'খামোশ। আমি এক্ষুণি বাড়ি সার্চ করবো।'

দুজন সৈন্যকে মেজর বললো, 'তোমরা এখানে দাঁড়াও।'

অন্য তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে মেজর প্রথমে মিনুদের ঘরে ঢুকলো। পেছনে বাবাও এলেন। মা আর মিনুকে দেখে মেজর থমকে দাঁড়াল—'এরা কে? তোমার স্ত্রী আর মেয়ে?'

বাবা মাথা নাড়লেন। মেজর বললো, 'তোমরা সবাই এ ঘরে দাঁড়িয়ে থাকো।'

দু'জন সৈন্য মেশিনগান তাক করে দাঁড়িয়ে পড়লো। মেজর বেরিয়ে গেলো।

বাবাকে দেখলো মিনু। কেমন যেন উদাস মনে হচ্ছে। ঘরের দেয়ালে ঝোলানো ওদের গ্রুপ ফটোটার দিকে আনমনে তাকিয়ে আছেন। মার চোখে মুখে নিদারুণ আতঙ্ক। শক্ত করে মিনুর হাত চেপে ধরেছেন। সৈন্য দুটো ওর দিকে বিচ্ছিরি দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে বার বার। মিনুর সারা শরীর ঘৃণায় শিউরে উঠলো।

একটু পরে মেজর নেমে এলো। সঙ্গে যে সৈন্যটা গিয়েছিলো তার হাতে দুটো খাকি শার্ট আর একটা রক্তমাখা রাইফেল। ওগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে কর্কশ গলায় মেজর বললো, 'নিজের বাড়িটাকে চমৎকার যুদ্ধক্ষেত্র বানিয়েছিলে। কাল রাতে শয়তানরা তোমার বাড়িতে আস্তানা গেড়েছিলো।'

বাবা শান্ত গলায় বললেন, 'ওরা পুলিসের লোক ছিলো।'

মেজর মুখটা বিকৃত করে বললো, 'পুলিসের লোক! সব কটা এক একটা শয়তান। কেন ওদের ঢুকতে দিয়েছিলে?'

বাবা বললেন, 'পুলিসের কাজে বাধা দেয়া বেআইনি। সে জন্যেই ওদের বাধা দিইনি।'

মেজর আবার চেঁচিয়ে উঠলো— 'কিসের পুলিস! ওরা সব বিশ্বাসঘাতক! বেইমান, গাদ্দার।'

বাবা আরো শান্ত গলায় বললেন, 'আমি কী করে বুঝবো কে বিশ্বাসঘাতক!'

মেজর ভুরু কুঁচকে বললো, 'তুমি কি আওয়ামী লীগের লোক!'

'না, তবে আমি ওদের স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে সমর্থন করি।'

'একজন পাকিস্তানি হয়ে তুমি জয় বাঙলাকে সমর্থন করো?'

'আমি প্রথমে একজন বাঙালি। পরে পাকিস্তানি।'

মেজর গলা চড়িয়ে বললেন, 'আসল শয়তান হচ্ছো তুমি। তোমাকে এর শাস্তি পেতে হবে।'

বাবা কোন কথা বললেন না। মেজর হাতের স্টেনগান উঁচিয়ে বললো, 'ঘরের ওই কোণে গিয়ে দাঁড়াও।'

বাবা ঘরের কোণে সরে গেলেন। মেজরের আঙুল ট্রিগারের ওপর। তখনও বাবাকে আশ্চর্যরকম নির্লিপ্ত মনে হচ্ছিলো। ট্রিগারে চাপ দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে মা ছুটে গিয়ে বাবাকে জড়িয়ে চিৎকার করে উঠলেন—'না।'

পর পর চারটা গুলির শব্দ হলো। ঘরের ভেতর মুহূর্তের মধ্যে যেন প্রলয় কান্ড ঘটে গেলো। সারা বাড়ি থরথর করে কেঁপে উঠলো। বাবা মা দুজনেই মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়েছেন। মিনুর বিস্ফোরিত চোখের সামনে ওর বাবা আর মার শরীর একটু কেঁপে উঠে স্থির হয়ে গেলো। রক্তের অনর্গল ধারা নেমে এলো মেঝের উপর দিয়ে। সমস্ত ঘর দুলে উঠলো মিনুর চোখের সামনে। চিৎকার করে

বাবা মার স্থির শরীরের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো। উচ্ছ্বসিত কান্নায় সে গুঁড়িয়ে গেলো।

মেজর কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে দেখলো। পাশের সৈন্য দুটোকে বললো, 'মেয়েটাকে জিপে তুলে নাও।'

'না'— চিৎকার করে উঠলো মিনু। সৈন্য দুটো দু'পাশ থেকে ওকে টেনে তুললো। সারা শরীর রক্তে লাল, মুখে রক্তের ছাপ, পাগলের মতো চিৎকার করলো মিনু— 'না, না, না।'

দু'পাশ থেকে সাঁড়াশির মতো চেপে ধরে ওরা নিয়ে গেলো মিনুকে। শুধু ওর তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ ঘরের দেয়ালে অনেকগুলো প্রতিধ্বনি তুললো—'না! না! না!'

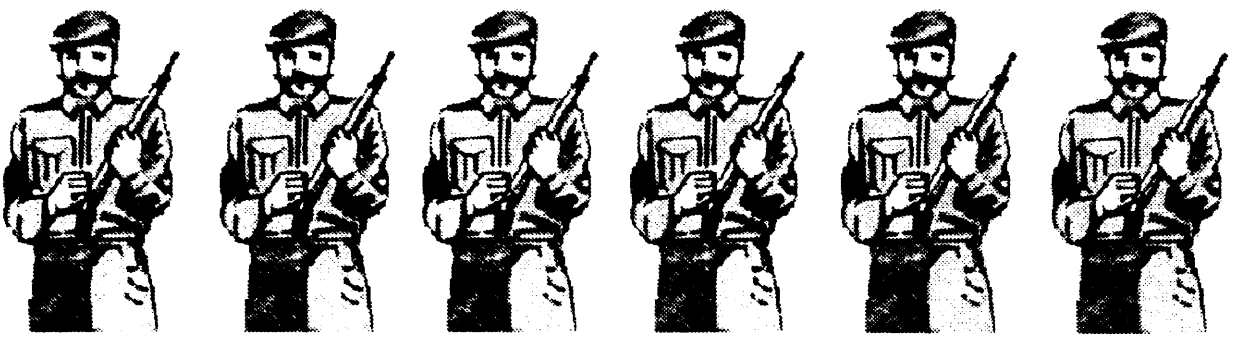

শহরের সকল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। কোথায় কী ঘটছে বোঝার বিন্দুমাত্র উপায় নেই। দশটার দিকে রেডিয়োতে এক ভৌতিক কণ্ঠস্বর শোনা গেলো। বাবু রেডিয়ো অন করে বসেছিলো। চিৎকার করে বাবাকে ডাকলো, 'বাবা, রেডিয়োতে কী বলছে শুনে যান।'

বাবা বারান্দায় বসেছিলেন। ছুটে এলেন ঘরে। একজন কর্কশভাষী অবাঙালি ভাঙা বাঙলায় মার্শাল ল রেগুলেশন পড়ছে। রেডিয়োতে তার কণ্ঠস্বর রীতিমতো ভয়াবহ মনে হচ্ছিলো। শহরে কারফিউ জারির কথা বললো। যাদের কাছে অস্ত্র আছে, বন্দুক রাইফেল সব সামরিক বাহিনীর কাছে জমা দিতে হবে। অয়ারলেস ট্রান্সমিটার, সাইক্লোস্টাইল মেশিন সবকিছু কারফিউ তুলে নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে জমা দিতে হবে। ঘোষকের অশরীরী কণ্ঠস্বর সবাইকে আতঙ্কিত করলো। প্রথমে বাংলায় বলা হলো। তারপর উর্দুতে।

বাবা কাঁপা গলায় চিৎকার করে উঠলেন, 'বন্ধ করো।'

ভাইয়া বললো, 'মনে হচ্ছে রীতিমতো যুদ্ধ শুরু হয়েছে।'

সবাই পাথরের মতো শব্দহীন হয়ে গেলো। তখন বাইরে কিছুক্ষণ পর পর মেশিনগান ছাড়া অন্য কোন শব্দ নেই। মেশিনগানের গর্জন থামার সঙ্গে সঙ্গে একটা থমথমে ভৌতিক পরিবেশ ছড়িয়ে পড়ছিলো সকলের চারপাশে। সকালের রোদ ভীষণ আতঙ্কে গাছগুলোকে জড়িয়ে রেখেছে।

ওরা কেউ সারারাত ঘুমোয়নি। ভাবী শুয়ে আছে। তার ব্যথা উঠেছে।

গতকালই তাকে হাসপাতাল নেয়ার কথা ছিলো। ছোট্ট হিমি বিমর্ষ হয়ে কার্পেটের এক কোণে বসে রয়েছে। ওর পাশে চুপচাপ শুয়ে আছে টম আর কেটি। কুকুর দুটো আজ অস্বাভাবিক রকম শান্ত।

গতরাতের জামান সাহেব এলেন। বাবাকে ডেকে বললেন, 'শহরের সবখানে মিলিটারীরা ঘাঁটি করেছে। ভারী ভারী অস্ত্র হাতে পজিশন নিয়ে বসে আছে।'

বাবা উদ্বিগ্নকণ্ঠে বললেন, 'শেখ সাহেবের কোন খবর জানেন? ওঁকে কি এ্যারেস্ট করেছে?'

জামান সাহেব বললেন, 'না, উনি আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে গেছেন। আমরা খুব শিগগিরই তাঁর নির্দেশ পাবো।'

'রাতে এতো গোলাগুলি কোথায় হলো জানেন?'

মাথা নাড়লেন জামান সাহেব— 'রাজারবাগ। সেখানকার পুলিস হেডকোয়ার্টার মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে। পুলিসের সাথে আর্মির তুমুল যুদ্ধ হয়েছিলো। অনেক পুলিস মারা গেছে।'

রাজারবাগের কথা শুনে বাবু চমকে উঠলো। মিনুদের কথা মনে হলো। জামান সাহেবকে বললো, 'আপনি কি রাজারবাগ গিয়েছিলেন?'

জামান সাহেব বললেন, 'আমি যাইনি। তবে খবর নিয়ে আমাদের লোক এসেছে। আমি একটু পরে বেরুবো।'

ভাইয়া বললো, 'কী করে বেরুবেন? কারফিউ জারি করেছে, শোনেননি?'

ম্লান হাসলেন জামান সাহেব— 'আমাকে যেতেই হবে। যত কারফিউ দিক, আমাদের নিজেদের যোগাযোগ ঠিকই রাখবো। আপনারা সাহস হারাবেন না।'

বাবাকে দূরে ডেকে নিয়ে জামান সাহেব ফিসফিস করে কী যেন বললেন। তারপর চলে গেলেন।

ভাইয়া বাবাকে বললো, 'বিলুর অবস্থা যে রীতিমতো সিরিয়াস হয়ে উঠেছে। কী করা যায় বলুন তো বাবা?'

বাবা মাথা নাড়লেন— 'কী করবে! বাইরে যাবার কোন উপায় নেই। টেলিফোনও তো ডেড!'

ভাইয়া চুপ করে বসে রইলো। হিমি এসে বললো, 'আব্বু, আম্মু তোমাকে ডাকছে।'

ভাইয়া চলে গেলো। সিঁড়ির ওপর হিমি বসে রইলো একা। ওর চার বছরের উচ্ছল জীবনটাও হঠাৎ যেন থমকে দাঁড়িয়েছে। সবকিছু ওর কাছে অদ্ভুত মনে হচ্ছে। ও জানে ওদের বাড়িতে নতুন মানুষ আসছে। কাল ও বাবুকে বলেছে, 'কাকু আমার একটা ভাই আসবে।'

বাবু হেসেছিলো— 'কোত্থেকে আসবে?'

হিমি জবাব দিয়েছে, 'হাসপাতাল থেকে। আম্মু বলেছে হাসপাতালে গিয়ে নিয়ে আসবে।'

বাবু বলেছে, 'ভাই কেন হিমি? তোমার যদি বোন হয়?'

হিমি মাথা নেড়ে বলেছে, 'না, ভাই হবে। আমি ভাইয়ের বোন হবো।'

বাবা শুনে হেসে ফেলেছিলেন। ভাবীকে ডেকে বলেছিলেন, 'তোমার মেয়ের কথা শোনো। ভীষণ পাকা হয়ে গেছে। আসছে বছর ওকে স্কুলে না পাঠালেই নয়।'

সেই হাসি-খুশি হিমি, যে সারা বাড়ি মাতিয়ে রাখতো, আজ শুধু বার বার অবাক হয়ে সবার মুখের দিকে তাকাচ্ছে। সবার অদ্ভুত কথাগুলো বোঝার চেষ্টা করছে।

জামান সাহেবের কাছে রাজারবাগের কথা শুনে বাবুর মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গিয়েছিলো। নিজের ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে চুপচাপ বসে রইলো। আগামীকাল মিনুর জন্মদিন। কাল রানার অফিসে ওকে বলেছিলো, 'আমার জন্মদিনে আসছো তো!' জন্মদিনে বাবুর কাছে লাল গোলাপ চেয়েছিলো মিনু।

অনার্সের প্রথম বছর থেকে মিনুর সঙ্গে বাবুর পরিচয়। দু'বছর হয়ে গেলো। ওরা দুজনেই কবিতা লেখে, গল্প লেখে। বন্ধু হতে দেরি হয়নি। এবারের মিছিলে সে পরিচয় আরও গভীর হয়েছে। থার্ড ইয়ারের বেবী আপা সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করবেন, এ নিয়ে ওদের সঙ্গে আলাপ করেছেন। সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি ইত্যাদি প্রসঙ্গে ছাত্রছাত্রীরা কি ভাবছে এ পত্রিকায় শুধু তাই থাকবে। ওরা সবাই মিলে নাম ঠিক করেছিলো সুকান্তের কবিতা থেকে। একুশে ফেব্রুয়ারি থেকে 'রানার' বেরুবে। বেবী আপা বললেন, 'তোমরা দুজন রানার-এর সহকারী সম্পাদক হিসেবে থাকবে।'

ওরা কেউ আপত্তি করেনি। ইচ্ছে মতো পত্রিকায় কাজ করার মতো উত্তেজনা আর কিছুতে নেই। ওরা দুজন শুধু রানার নিয়েই মেতে রইলো। কখনো অফিসে কখনো মিছিলে শুধু রানার নিয়ে আলোচনা। সে আলোচনায় বার বার রাজনীতি চলে আসে। সেদিন বাবু মিনুকে বলছিলো, 'তোমার কি মনে হয় শেখ মুজিব মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারবেন?'

বাবুর চেয়ে মিনু বেশি রাজনীতি সচেতন। বললো, 'অসম্ভব। ভুট্টোর সঙ্গে আপোস না করলে একা মুজিবকে কখনো মন্ত্রিসভা গঠন করতে দেয়া হবে না।'

'আমার তো মনে হয় না শেখ মুজিব কখনো আপোস করবেন।'

'আপোস হয়তো করবেন না। তবে সংগ্রাম সম্পর্কে তাঁর কোনও প্রত্যক্ষ বক্তব্য নেই।'

'কেন, সাতই মার্চের মিটিঙে তো তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। ঘরে ঘরে দুর্গ তৈরি করতে বলেছেন।'

'এটা আবেগের কথা। তাঁর উচিত এ মুহূর্তে স্বাধীনতার কর্মসূচী দেয়া।'

'শেষ পর্যন্ত নিশ্চয়ই দেবেন। এখনো দেখছেন পাকিস্তানকে না ভেঙে কিছু করা যায় কিনা।'

মিনু একটু উত্তেজিত হলো—'পাকিস্তান! অসম্ভব। পাকিস্তানের অস্তিত্বকে ভুলে যাও বাবু। ভাষা নয়, সংস্কৃতি নয়, শুধু ধর্মীয় বিশ্বাস দিয়ে দুটো জাতিকে কখনো এক রাখা যায় না। এটা একটা প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়।'

কথা বলতে বলতে মিনু রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে পড়লো। পাবলিক লাইব্রেরির রাধাচূড়ার পাতা গলিয়ে শেষ বিকেলের লাল রোদের ছায়া ওর মুখে কাঁপছিলো। বাবুর মনে হলো আগুন জ্বলছে সেখানে। মিনু থামলো। তারপর প্রত্যয়ের সঙ্গে ধীরে ধীরে বললো, 'বক্তব্য আমাদের একটাই। স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ।'

বাবু সেই প্রত্যয়ের ধ্বনি বুকের গভীরে অনুভব করে। তবু একদিন সে বলে ফেলেছিলো, 'মিছিলের পর শুধু মিছিল। বিক্ষোভ আর বিক্ষোভ। আর কত দেরি? আমি কিন্তু হতাশ হয়ে পড়ছি।'

মিনু আশাবাদী হলেও বাবু শেষ অবধি একরকম হতাশ হয়ে পড়েছিলো। অহরহ মৃত্যুর সংবাদ আসছে। সৈন্যরা মিছিলের ওপর নির্বিচারে গুলি করছে। জয়দেবপুরে, চট্টগ্রামে মানুষ অসহায়ের মতো মরছে। চব্বিশ তারিখে ও পরম ক্ষোভে ডায়রিতে লিখেছিলো— 'শেখ মুজিব এখনো কি পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখছেন? প্রতিদিনের এতগুলো অসহায় মৃত্যু কি তাঁকে একটুকু আলোড়িত করে না?'

গতরাতের সেই ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের কথা ভাবলো বাবু। মিনুর প্রিয় লাল গোলাপ, জমাট কুয়াশার নদী, অতিকায় নেকড়ের দল, অন্ধকারের অতলান্তিক সমুদ্র এবং ভয়ঙ্কর ঝড়ের দৃশ্যাবলী বার বার তাকে ক্ষত বিক্ষত করতে লাগলো। বাবু সেই অসম্পূর্ণ দুঃস্বপ্নের একটা অর্থ খোঁজার চেষ্টা করলো। যতবার ভাবলো ততবার রক্তাক্ত হলো।

জানালার বাইরে দুপুরের রোদে ইউক্যালিপ্টাস গাছগুলো বড়ো বেশি শান্ত। এতটুকু শব্দ নেই কোথাও। এতটুকু বাতাস নেই। গাছের পাতাগুলো পাথরের মতো জমে আছে। চারপাশে ভয়াবহ শূন্যতা থমথম করছে।

জানালা দিয়ে মাথা উঁচু করে হিমি ডাকলো, 'কাকু, আব্বু আর দিদা তোমাকে ডাকছে। শিগগির এসো।'

বাবু উঠে ড্রইংরুমে এলো। বাবা আর ভাইয়া রেডিয়ো শুনছেন। রেডিয়োতে গান হচ্ছে—'আমার সোনার বাংলা।'

বাবু চমকে উঠলো। ঢাকা রেডিয়ো কি তাহলে আমাদের দখলে এলো?

ভাইয়া বললো—'আকাশবাণী। শোন কী বলছে!'

বাবু শুনলো। একটি আবেগের কণ্ঠ— 'পূর্ব বাঙলায় গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছে।'

রোমাঞ্চিত হলো বাবু। রেডিয়োর সামনে বসে পড়লো। খবর শুনলো— 'পূর্ব বাংলার সর্বত্র গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছে। বিভিন্ন শহরে সৈন্যদের সাথে মুক্তিবাহিনীর যুদ্ধ চলছে ...'

স্টেশন বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত সবাই আকাশবাণী শুনলো। বার বার বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত বাজাচ্ছে ওরা— 'আমার সোনার বাংলা... ।'

রাতে ঢাকা রেডিয়োতে ইয়াহিয়া খানের বেতার ভাষণ শোনা গেলো। আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করা হলো। শেখ মুজিবকে বলা হলো দেশদ্রোহী। শুনতে শুনতে আকণ্ঠ ঘৃণায় শিউরে উঠলো সবাই। প্রচন্ড আক্রোশে ফেটে পড়লেন বাবা— 'জঘন্য! বন্ধ করো এ সব নোংরামি। আমার শুনতে ইচ্ছে করছে না।'

অনেক রাতে বাবু শুতে গেলো। সারা শহর অন্ধকার। চারদিক থমথম করছে। থেকে থেকে গুলির শব্দ। আকাশের কালো অন্ধকার কোথাও কোথাও আগুনের ছোঁয়া লেগে লাল হয়ে উঠেছে।

রাত আরো গভীর হলো। হঠাৎ শুনলো একটানা ঘরঘর শব্দ। সারা বাড়ি থরথর করে কেঁপে উঠলো। ছুটে এলেন জামান সাহেব। বললেন, 'শহরের পথে ট্যাঙ্ক নামিয়েছে ওরা। গুণে দেখেছি আঠারোটা ট্যাঙ্ক বেরিয়েছে ক্যান্টনমেন্ট থেকে।'

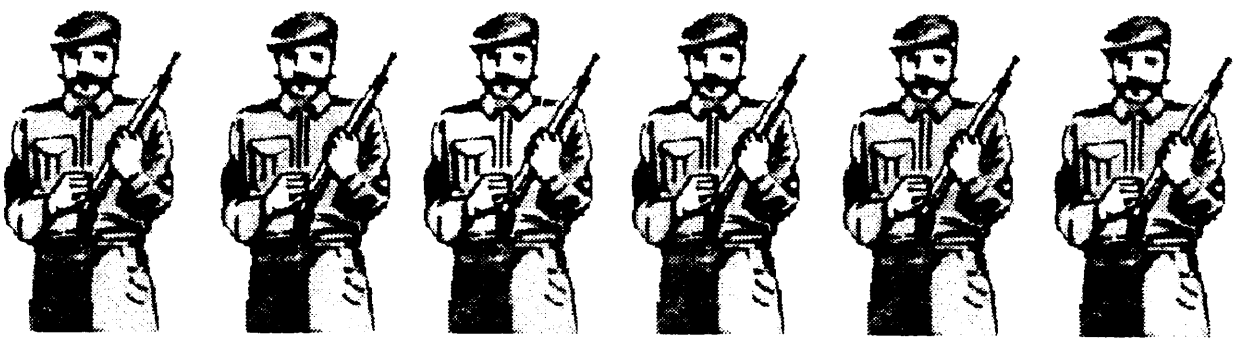

ক্যান্টনমেন্টে সারাদিন গভীর উত্তেজনার ভেতর কাটলো বাবলুদের। ওদের ব্যারাক ছেড়ে বাইরে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। অন্যান্য দিনের মতো আজ প্যারেডও হয়নি। ব্যারাকের চারপাশে পাঞ্জাবি সৈন্যরা টহল দিচ্ছে। থেকে থেকে অকথ্য ভাষায় বাঙালিদের গাল দিচ্ছে।

ব্যারাকের ভেতর বাবলুরা শুধু ফুঁসছিলো। ওরা প্রত্যেকে যেন এক একটা বারুদের স্তুপ, যেখানে সামান্য আগুনের ছোঁয়া লাগলে প্রচন্ড বিস্ফোরণ ঘটবে। কথা হয় চুপি চুপি। সেই কথার ভেতর চাপা আগুন ছটফট করে। নিঃশ্বাসে বারুদের গন্ধ। এক সময় অস্থির হয়ে শফি বললো, 'কিছুই বুঝতে পারছি না। এখনো কি সময় হয়নি?'

বাবলুও বিরক্তির চরমে পৌঁছে গেছে—'এভাবে সময় নষ্ট করার কোন মানেই হয় না।'

হাসান বললো, 'হাবিলদার মেজর সুলতান আহমেদ কোথায়? আজ সারাদিন ওঁকে দেখা যায়নি।'

রশিদ বললো, 'ওঁকে হয়তো এ্যারেস্ট করেছে।'

উদ্বেগ, অস্থিরতা আর উত্তেজনায় ভরা সময়গুলো ওদের কাছে অসম্ভব অসহনীয় হয়ে উঠলো। বুড়ো হাবিলদার মেজর এলেন অনেক রাতে। রাত তখন প্রায় বারোটা। ওরা সবাই অন্ধকার ঘরে জেগে ছিলো।

তাঁকে দেখে ঘিরে ধরলো সবাই। বুড়ো চুপি চুপি বললেন, 'খবর খুব খারাপ। আমাদের এখান থেকে পালাতে হবে। ঢাকা শহর পুরোটা আর্মি দখল করে ফেলেছে।'

হাসান বললো, 'কিন্তু পালাবো কেন?'

বুড়ো আরও নিচু গলায় বললেন, 'কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, যশোর আর রাজশাহী ক্যান্টনমেন্টের বাঙালি সৈন্যরা বিদ্রোহ করেছে। আমরা ওদের সঙ্গে যোগ দেবো।'

রশিদ বললো, 'কিন্তু বেরুবো কী করে? তাছাড়া এভাবে খালি হাতে যাওয়াটা কি ভালো হবে?'

'কুমিল্লা থেকে আমি খবর পেয়েছি যে কোন ভাবে বেরিয়ে যাওয়াটাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। অস্ত্রের জন্য অযথা অপেক্ষা করা ঠিক হবে না।' বুড়ো হাবিলদার মেজর একটু থামলেন। চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন। গলাটা আরও নামিয়ে বললেন, 'কীভাবে পালাবে তাই বলছি। আমাদের এখন প্যারেড হচ্ছে না। খাবার কিউতেও এই গন্ডগোলে কে আছে কে নেই কেউ অতটা লক্ষ্য করে না। আমরা প্রতিরাতেই কয়েকজন করে বেরিয়ে যাবো। একসঙ্গে বেশি বেরুনো যাবে না। পরে অবস্থা বুঝে অন্য ব্যবস্থা নেবো।'

তারপর তিনি ওদের বললেন কীভাবে পালাতে হবে। 'পাহারা সব জায়গাতেই আছে। কড়া পাহারা। তবু এর ভেতর দিয়েই পালাতে হবে। প্রথম দলে কে যাবে ঠিক করো। বাবলু আর শফি এখন থাকবে। তোমাদের অন্য কাজ দেবো।'

মৃদু গুঞ্জন শুরু হলো। বাবলু, শফি আর হাসান ঠিক করলো কে কে যাবে। দশজনকে নিয়ে প্রথম দল তৈরি হলো। বুড়ো বললেন, 'তোমাদের বেশির ভাগ পথ ক্রলিং করে যেতে হবে। এখান থেকে ক্রলিং করে যাবে সি কোম্পানির ব্যারাকে। তারপর রাস্তায় বেরুবে সাবধানে। রাস্তা পেরিয়েই আমবাগানে ঢুকে পড়বে। গাছের সাথে গা মিলিয়ে হাঁটবে। বাগানটা যদি নিরাপদে যেতে পারো বেড়া পেরিয়ে একেবারে টঙ্গির রাস্তা। সেখানে তেমন পাহারা নেই। তবু বড়

রাস্তা দিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। তোমরা যাবে রাস্তার নিচে ধানক্ষেতের ভেতর দিয়ে। দেরি করো না। এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ো।'

ওরা দশজন বেরিয়ে পড়লো। অন্ধকারে ব্যারাকের কামরা থেকে বুড়ো হাবিলদার মেজর আর অন্য ছেলেরা তাকিয়ে রইলো জানালা দিয়ে। অজানা আশঙ্কায় সবার বুক কাঁপছিলো। বুড়ো বিড়বিড় করে দোয়া পড়লেন।

বাবলু মনে মনে হিসেব করলো, তারের বেড়া পর্যন্ত পৌঁছতে ওদের এক ঘন্টার কিছু বেশি সময় লাগবে। এর ভেতর গুলির শব্দ না হলে বুঝতে হবে ওরা নিরাপদ। অবশ্য যদি ধরা পড়ে তাহলে গুলির শব্দ শোনা যাবে না। বুড়ো বললেন, 'তোমরা শুয়ে পড়ো। কোনো অবস্থাতেই কেউ বলতে পারবে না ওরা কোথায়।'

হাবিলদার মেজর চলে গেলেন। ওরা সবাই বিছানায় শুয়ে পড়লো। অথচ কেউ ঘুমোলো না। সবাই গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে সময় গুণতে লাগলো। শফি বাবলুকে ফিসফিস করে ডেকে বললো, 'কিছু কি বুঝতে পারলি, ওস্তাদ কেন আমাদের থাকতে বললেন?'

বাবলু একটু ভেবে বললো, 'হয়তো আমাদের ম্যাপিং-এর কাজ দেবেন। তোর আর আমার ম্যাপিং-এর রেজাল্ট সবচেয়ে এক্যুরেট হয়।'

কিছুক্ষণ পর শফি বললো 'ওরা কি সি, কোম্পানি পেরিয়ে গেছে?'

বাবলু বিড়বিড় করে বললো, 'মাত্র এক ঘন্টা। এক ঘন্টা পরই ওরা নিরাপদ।'

শফি বললো, 'পথে যদি কোন বিপদ হয়? তখন তো ওরা কিছুক্ষণের জন্যে থামতেও পারে!'

বাবলু বললো, 'বিপদ হবে না। ওরা সতর্ক থাকলে কিছুই হবে না।'

রশিদ বললো, 'আগামীকাল যে ব্যাচটা যাবে, তাতে আমিও যাবো। অসহ্য মনে হচ্ছে এখানে।'

হাসান আপন মনে বললো, 'কত দিনে যে আমাদের হাতে অস্ত্র আসবে! কত দিনে আমরা খোলা আকাশের নিচে ওদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারবো!'

বাবলু বললো, 'ওস্তাদের কথা শুনে তো মনে হয় খুব শিগগিরই সমস্ত বেঙ্গল রেজিমেন্ট একত্রিত হতে যাচ্ছে। পুলিশ আর ইপিআরও সঙ্গে থাকছে।'

হাসান বললো, 'আমরা কোথায় যাবো তিনি কিছু বলেছেন?'

'বলেছেন, আপাতত জয়দেবপুর। ওখান থেকে প্ল্যান করে অন্য কোথাও।' জবাব দিলো বাবলু।

শফি বললো, 'যাবার আগে দেখিস, আমি ঠিক ওদের এম্যুনেশন ডাম্পটা উড়িয়ে দিয়ে যাবো। শুধু কিছু ডিনামাইট দরকার।'

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে রইলো ওরা। এক সময় বাবলু বললো, 'রাস্তা

পেরিয়ে ওরা এতক্ষণে আমবাগানে ঢুকেছে।'

শফি বললো, 'আমবাগানে ওদের গোপন ডাম্পগুলো রয়েছে। নিশ্চয়ই সেখানে পাহারাও খুব কড়া।'

বাবলু একটু চমকে উঠলো। এ খবর শফি আর বাবলু ছাড়া এখানকার অন্য কোন ছেলে জানে না। হয়তো বুড়ো হাবিলদার মেজর নিজেও জানেন না। ওদের সতর্ক করে দেয়া উচিত ছিলো।

হঠাৎ সবাই ট্যাঙ্ক চলার শব্দ শুনলো। পাশে শহরে যাবার রাস্তা দিয়ে একটানা ঘরঘর শব্দ। সবাই উঠে বসলো। একে অপরের মুখের দিকে তাকালো। একটা অসম্ভব অস্বস্তিকর ধাতব শব্দ ওদের বুকের ভেতর ঢুকে যেতে লাগলো। বাইরে আলো জ্বলছে। শফি গিয়ে জানালার পাশে দাঁড়ালো। চাপা গলায় বাবলুকে ডাকলো— 'দেখে যা বাবলু। ট্যাঙ্ক এখান থেকে দেখা যাচ্ছে।'

বাবলু হুমড়ি খেয়ে পড়লো জানালার ওপর। তাকিয়ে দেখলো একটার পর একটা ট্যাঙ্ক ভীষণ শব্দে এগিয়ে চলেছে শহরের পথে। সামনের কালো নলগুলো ভয়াবহ মনে হচ্ছে। হাসান বললো, 'মনে হচ্ছে পুরো ঢাকা শহরটাই ওরা মাটিতে মিশিয়ে দেবে।'

রশিদ বললো, 'কিন্তু ট্যাঙ্ক কেন নামাবে? সাধারণ মানুষকে মারার জন্যে রাইফেলই তো যথেষ্ট।'

শফি উত্তেজিত হয়ে বললো, 'ঠিক বলেছিস। মনে হয় অন্য কিছু ঘটেছে। ঢাকার দিকে হয়তো গ্রামের মানুষরা এগিয়ে আসছে। ঢাকার পতন—'

শফির কথা ছাপিয়ে দুটো মেশিনগান তীব্র শব্দে গর্জন করে উঠলো। সবাই একসঙ্গে চমকে উঠলো। বেশি দূরে নয়। শব্দটা বড়ো রাস্তার কাছাকাছি কোথাও হবে। প্রায় এক মিনিট ধরে চললো সেই প্রলয়ের শব্দ। একটা প্রশ্ন সবার গলার কাছে কাটা মুরগির মত ছটফট করতে লাগলো। ওরা গভীর উৎকণ্ঠা আর আশঙ্কায় বার বার কেঁপে উঠলো। সবার মনে একটাই প্রশ্ন। ওদের দশজন সঙ্গীর মুখ চোখের সামনে ভাসতে লাগলো। কেউ কিছু বলতে পারলো না।

আরো পরে শহরের দিকে শোনা গেলো ট্যাঙ্কের গর্জন। ট্যাঙ্কগুলো একটার পর একটা সমানে গর্জে চলেছে। ফাঁকে ফাঁকে মেশিনগানের অবিশ্রান্ত গুলির শব্দ। মনে হলো পুরো শহরটাই যেন গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে। রাত গভীর হলো। শব্দের এতটুকু বিরাম নেই।

গভীর উদ্বেগের ভেতর রাত কাটলো। ওরা কেউ ঘুমোতে পারেনি। ভোর না হতেই জরুরি হুইসেলের ডাক শোনা গেলো। যে যেভাবে ছিলো ছুটে এলো প্যারেড গ্রাউন্ডে। সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালো।

সামনে সাদা কাপড়ে ঢাকা কতগুলো মৃতদেহ। পাঞ্জাবি ক্যাপ্টেন ক্রুর হেসে বললো, 'চেয়ে দেখো।'

কাপড় সরিয়ে দেয়া হলো। ওরা দেখলো। ওদের পরিচিত দশটা মুখ।

অসম্ভব যন্ত্রণার এক বিশাল ঢেউ ওদের বুকের ভেতরটাকে দুমড়ে মুচড়ে একাকার করে বয়ে গেলো।

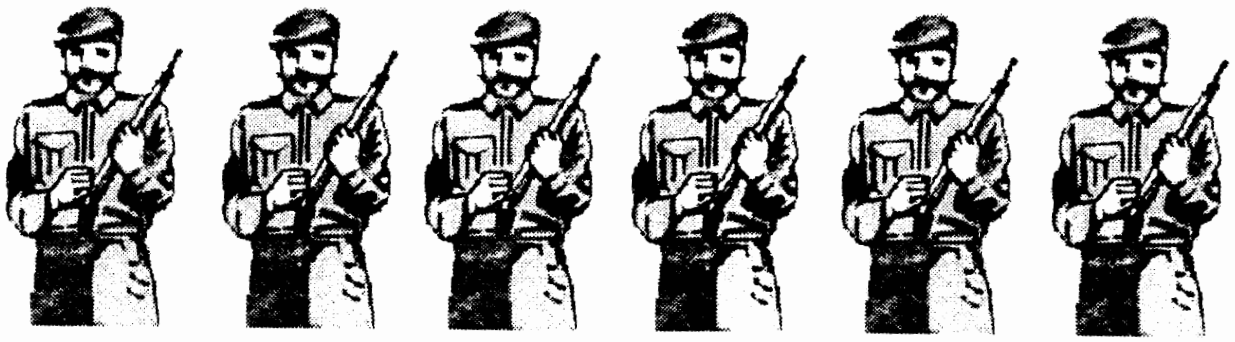

পরদিন সকাল দশটায় কারফিউ তুলে নেয়ার পর ভাইয়া আর ভাবী গাড়ি নিয়ে বেরুলো। রাতে ভাবী আরো অসুস্থ হয়ে পড়েছিলো। বাবা বললেন, 'হাসপাতালে সুবিধে না হলে ওকে কোন নার্সিং হোমে নিয়ে যেও।'

ভাইয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাবুও বেরিয়ে পড়লো। গেটটা পেরোতেই পর পর দুটো রাইফেলের গুলির শব্দ শুনলো। মনে হলো খুব কাছে কোথাও, সম্ভবত রেল ক্রসিংটার ওখানে। বাবা বললেন, 'তুমি আবার কোথায় যাচ্ছো?'

বাবু দরজা খুলে বেরুতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো। বাবার দিকে একবার তাকালো শূন্য দৃষ্টিতে। কিছু না বলে বেরিয়ে গেলো।

রাস্তায় প্রচুর লোক। সকলের চোখে মুখে আতঙ্কের ছাপ। দু'একটা গাড়ি ঝড়ের বেগে পাশ কাটিয়ে ছুটে যাচ্ছে। বাস, স্কুটার, রিকশা কিছুই চলছে না। এক মনে হাঁটতে লাগলো বাবু।

রেল গেট-এর কাছে এসে বাবু থমকে দাঁড়ালো। মহাখালীর মোড় থেকে তেজগাঁ স্টেশন পর্যন্ত সোজা লাইন চলে গেছে। যত দূর চোখ যায় দু'পাশে শুধু ছাইয়ের স্তুপ। তেজগাঁর কারখানাগুলোর বেশির ভাগ শ্রমিক থাকতো এই রেল লাইনের ধারে। কোনটা ছিলো টিনের ঘর, কোনটা বাঁশের বেড়ার। একটা ঘরেরও অস্তিত্ব নেই। কেউ বলতে পারবে না কোন দিন এখানে ঘন বসতি ছিলো।

অল্প দুরে কয়েকটা লোক জড়ো হয়ে কী যেন দেখছিলো। বাবু এগিয়ে গেলো। দুজন লোক পড়ে আছে মাটিতে, বুকে গুলির দাগ। একটু আগে এদেরই গুলি করা হয়েছে। ওদের গায়ে নীল ইউনিফর্ম। সম্ভবত কোন কারখানার শ্রমিক। বুকের রক্ত রেল লাইনের পাশ থেকে গড়িয়ে পাথরের নুড়ি লাল করে বয়ে গেছে। এখনো রক্ত বেরুচ্ছে। হয়তো এখনো বেঁচে আছে।

লাস ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলো সীমাহীন আতঙ্কে শুধু চেয়ে দেখলো। কেউ কিছু করতে পারলো না। একজন বললো, 'এখানে দাঁড়ানো ঠিক হবে না। সারাক্ষণ আর্মির লরি যাতায়াত করছে।'

অসহায় লোকগুলো এক এক করে চলে গেলো। দু'জন শ্রমিকের গুলিবিদ্ধ রক্তাক্ত দেহ তেমনি পড়ে রইলো।

হাঁটতে হাঁটতে বাবুর মনে হলো মাত্র একদিনের ব্যবধান। অথচ কি অসম্ভব পরিবর্তন। মানুষ কেন এত অসহায় হয়? কেন মানুষ এত নিষ্ঠুর হয়? কেন কয়েকটি মানুষের উন্মাদনার জন্য হাজার হাজার মানুষকে এভাবে অসহায় মরতে হবে? কেন সবাই মুখ বুজে সহ্য করবে? একটার পর একটা প্রশ্ন— অনেকগুলো প্রশ্ন বাবুকে ক্ষত-বিক্ষত করলো।

এয়ারপোর্টের মোড়ে ভারী মেশিনগান বসিয়ে পাঞ্জাবি সৈন্যরা পাহারা দিচ্ছে। দ্বিতীয়বার সেদিকে তাকাতে ইচ্ছে হলো না বাবুর। ওদের দু'চোখে পাশবিক হিংস্রতা। মনে হলো যে কোন মুহূর্তে এক ঝাঁক গুলি যে কারো গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

পথের দু'পাশে নেকড়ের অসংখ্য ধারালো থাবার হিংস্র ছাপ! আওলাদ হোসেন মার্কেটের মতো জমজমাট বাজারটা একটা ছাইয়ের স্তুপ হয়ে পড়ে আছে। গাছগুলো পুড়ে অঙ্গার হয়ে গেছে। তার কিছু দূরে বালির বস্তার আড়ালে বসে আছে নেকড়ের দল। ওদের সামনে পাকিস্তানের পতাকা উড়ছে। একদিন এই পতাকাকে শ্রদ্ধা করতো বাবু, বহু আগে, যখন স্কুলে পড়তো। তারপর শ্রদ্ধাটা কেটে গিয়েছিলো। কিন্তু ঘৃণাও করেনি। আজ সে বুকের ভেতর প্রচণ্ড ঘৃণা অনুভব করলো। ওই পতাকাটা যে বিজয় উল্লাসে উড়ছে এক বিশাল কবর প্রান্তরে, যে কোন সভ্য মানুষ ওটাকে ঘৃণা করবে। পাঞ্জাবি সৈন্যদের চোখের হিংস্র উল্লাসের ছায়া সেই পতাকায়। বাবু পা চালিয়ে সরে এলো।

ফার্মগেটের মোড়ে অসংখ্য ব্যারিকেড দেখতে পেলো বাবু। কোথাও ইটের স্তুপ দিয়ে, কোথাও গাড়ি উল্টে, কোথও আস্ত গাছ উপড়ে ব্যারিকেড দেয়া হয়েছিলো। পঁচিশের সন্ধ্যেবেলাও এই ব্যারিকেড বাবু দেখেনি। হাতের কাছে যে যা পেয়েছে তাই দিয়ে ব্যারিকেড দিয়েছিলো। মার্চের দু'তারিখে এখানে সৈন্যদের সঙ্গে জনতার একটা খণ্ডযুদ্ধ হয়েছিলো। অসহযোগ শুরু হয়েছে এক তারিখে। দু'তারিখে সাধারণ মানুষ কারফিউ ভেঙেছিলো। এখানে ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের সময়ও কয়েকবার সংঘর্ষ হয়েছে। একটা কালো শহীদ মিনার ছিলো কৃষ্ণচূড়া গাছগুলোর ভেতর। ওটাকেও ভেঙে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে।

কাওরান বাজারেও একই দৃশ্য। একটা ঘরের চিহ্ন কোথাও নেই। টিনের চালগুলো দুমড়ানো— কালো রাঙতার মতো। অঙ্গার হয়ে যাওয়া গাছগুলোর ডালে কয়েকটা শকুন বসে আছে। এ ছাড়া বাজারের সব কটি প্রাণী মৃত। উৎকট একটা গন্ধ চারপাশে ছড়িয়ে আছে। কতগুলো শকুন নিঃশব্দে উড়ছে।

আরেকটু এগিয়ে যেতেই এক অকল্পনীয় দৃশ্য দেখলো বাবু। অসংখ্য

মানুষের মিছিল চলেছে। রাস্তার দু'ধার দিয়ে, পিঁপড়ের মতো সারি বেঁধে, এতটুকু শব্দ না করে, সেই নিরব মিছিল এগিয়ে চলেছে। ফাঁকা রাস্তাটার সামনে যত দূর চোখ যায় শুধু মানুষ। ছেলে, বুড়ো, মেয়ে, শিশু। সব রকমের, সব বয়সের মানুষ। সবার চোখে মুখে নিদারুণ আতঙ্ক। সবাই শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ওদের সকলেই ঘর বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে। ওরা কবর থেকে পালিয়ে যাচ্ছে।

সেই আতঙ্কের মিছিলে বাবুও হাঁটলো। চেনা একজনকে প্রশ্ন করলো, 'বজুর বাপ, কোথায় যাচ্ছো?'

মাঝবয়সী লোকটা তাকালো বাবুর দিকে। শব্দ না করে কাঁদছিলো। বাবুর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেললো— 'অগরে আর কই পামু মিয়া ভাই! আমার চক্ষের সামনে গুলি কইরা মারলো। কই পামু আমার বজু, মাণিক আর লক্ষ্মীরে! জনমের মতো অগরে কাইড়া লইয়া গেছে জালিমেরা!'

লোকটা হু-হু করে উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়লো। পাশের লোকটা চাপা গলায় বললো, 'চুপ করো ভাই, চুপ করো। এই হগল কতা কইয়া কইলজায় আগুন জ্বালাইয়া দিও না।' সান্ত্বনা দিতে গিয়ে সেই লোকটাও কেঁদে ফেললো। বাবু দেখলো সবাই কাঁদছে। সকলের বুকে আগুন জ্বলছে।

সব কিছু হারিয়ে ওরা পথে নেমেছে। বাবু বললো, 'তোমরা কোথায় যাবে?'

লোকটা মাথা নাড়লো। চোখ মুছে বললো, 'জানি না।'

বাবু অবাক হলো— 'তাহলে?'

লোকটা জবাব দিলো না। তার পাশের লোকটা বললো, 'যেইহানে এমুন শয়তানের রাজত্বি নাই, হেইহানে যামু। শহরে শয়তানের রাজত্বি চলতাছে।'

বাবু বিড়বিড় করে বললো, 'কোথায় শয়তানের রাজত্ব নেই! যেখানে যাবে সেখানেই শয়তানরা তাড়া করে ফিরবে। পালিয়ে নয়, রুখে দাঁড়াতে হবে।'

হেঁটে হেঁটে বাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে এলো। ওর বন্ধুদের কথা ভাবছিলো। রাজ আর লাকি থাকে মহসীন হলে। ইকবাল হলে আশরাফ, সেলিম আর কাজল। আরো অনেক পরিচিত ছেলে রয়েছে। কাল রাতে এদিকে আগুন জ্বলছিলো।

পুরো বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধ। কোথাও কোন লোকজন নেই। রাস্তায় দেখলো ট্যাঙ্কের চাকার দাগ। কালো রাস্তার মসৃণ বুক কেটে লাল দগদগে ক্ষত তৈরি করেছে। মহসীন হলের দরজায় মস্ত বড়ো তালা ঝুলছে। সারা হলে কারো সাড়াশব্দ নেই। বাবু অবাক হলো। একদিনের ভেতর সবাই কোথায় গেলো? বাইরে দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিলো বাবু। পাশে একটা গাড়ি এসে থামতেই চমকে উঠলো। চেয়ে দেখলো হাউস টিউটর গিয়াস স্যার। বাবু এগিয়ে গেলো। বললো, 'হলের সব ছেলেরা কোথায় গেছে স্যার?'

গিয়াস স্যার বললেন, 'জানি না। পঁচিশ তারিখ রাতে ওরা ইকবাল হলে গিয়েছিলো আর্মি এ্যাটাকের খবর পেয়ে। তারপর কেউ আর ফিরে আসেনি।'

'আর্মি কি এ হলে আসেনি?' প্রশ্ন করলো বাবু।

'না।' গিয়াস স্যার বললেন, 'দুএকটা গুলি লেগেছে বটে। তবে সারারাত ওরা ইকবাল হল আর জগন্নাথ হল নিয়ে ব্যস্ত ছিলো।'

বাবু চুপ করে রইলো। গিয়াস স্যার বললেন, 'তুমি এখানে কী করছো?'

'রাজ আর লাকিকে খুঁজতে এসেছিলাম।' ধীরে ধীরে জবাব দিলো বাবু।

'ওরা যদি বেঁচে থাকে তবে নিশ্চয়ই দেখা পাবে। কিন্তু এখানে এভাবে ঘোরাঘুরি করা তোমার একেবারেই উচিত নয়! আর্মির লোকেরা ছাত্র পেলেই মারছে।' গিয়াস স্যারকে ভীষণ উদ্বিগ্ন মনে হলো।

বাবু ইকবাল হলের দিকে হাঁটলো। পথের ওপরই মৃতদেহ পড়ে আছে। একটা দুটো মৃতদেহ পেরিয়ে ইকবাল হলের চত্বরে ঢুকেই শিউরে উঠলো। সারা মাঠ জুড়ে লাসের মিছিল। এক জায়গায় কতগুলো লাস সার বেঁধে পড়ে আছে। পচে ফুলে উঠেছে। কারো গায়ে গুলির দাগ, কারো গায়ে বেয়নেটের।

দু'জন লোক মাঠের ভেতর ঘুরে ঘুরে পরিচিত মুখ খুঁজছে। প্রায় সব কটা লাসই ছাত্রদের। দু'একটা পুলিসের মৃতদেহও রয়েছে। ছাত্রদের অনেকেই বাবুর পরিচিত। বহুবার এদের দেখেছে। কখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের বারান্দায়, কখনো ক্যান্টিনে, কখনো বটতলার মিটিঙে, আবার কখনো কোন বিক্ষোভের মিছিলে।

আরো পরিচিত চেহারা দেখলো বাবু। আশরাফকে দেখলো। যাকে কমনরুমে গেলেই দেখা যেতো দাবার বোর্ড সামনে নিয়ে বসে আছে। শাহেদকে দেখলো বুকে গুলি লেগেছে। ছাত্রদের বহু অনুষ্ঠানে বাবু শাহেদের কবিতা শুনেছে। একুশে ফেব্রুয়ারিতে শহীদ মিনারে ওর সাথে আলাপ হয়েছিলো বাবুর। বেয়নেট দিয়ে যাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মেরেছে, তার নাম সালাম, বহুবার বটতলায় বক্তৃতা দিতে দেখেছে ওকে।

বুকের ভেতর বার বার বেয়নেটের আঘাত অনুভব করলো বাবু। মনে হলো, ও নিজেও এমনি একটা লাস হতে পারতো। এমনি পড়ে থাকতো রক্ত-কালো ঘাসের ওপর খোলা আকাশের নিচে। কবর দেয়ার জন্যে কেউ নেই। আকাশে শকুন উড়ছে। দূরে কয়েকটা কুকুর বসে আছে লোলুপ দৃষ্টিতে। শকুন আর কুকুররা এদের ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করবে। কেউ কোনদিন এদের কথা জানবে না। এদের মা বাবা ভাই বোন সবাই অপেক্ষা করছে কবে এরা ঘরে ফিরে যাবে।

বাবু আর ভাবতে পারলো না। ওর মনে হলো এক্ষুণি ও পড়ে যাবে। মাথাটা

ঘুরছে! পায়ের নিচে মাটি, সামনের গাছ আর দূরের আকাশ সব কিছু থেকে থেকে কেঁপে উঠছে।

কে যেন কাঁধের ওপর হাত রাখলো। তাকিয়ে দেখলো ওর বন্ধু মামুন। বাবু শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো ওর দিকে। মামুন বললো, 'এখানে কি করছো বাবু?'

বাবু ওর কথার জবাব দিতে পারলো না। মামুন আবার বললো, 'লাকির কোন খবর জানো?'

বাবু অসহায় ভাবে মাথা নাড়লো।

মামুন ওর হাত ধরলো। বললো, 'চলো ওপরে যাই।'

ইকবাল হলের সিঁড়ি বেয়ে ভেতরে ঢুকলো ওরা। ঘরগুলো দেখলো। গুলি লেগে দেয়ালগুলো ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। দেয়ালে দেয়ালে রক্তের ছাপ।

আগুনের ছাপ সারা ঘরে। পোড়া কাগজের স্তুপ। প্রত্যেকটা ঘরের চেহারা এক রকম।

দোতলার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে ওরা থমকে দাঁড়ালো। সিঁড়িতে লাস টেনে নামানোর দাগ। প্রত্যেকটা সিঁড়ি রক্তে আগাগোড়া লাল হয়ে আছে। ঠিক লাল নয়, কালচে লাল। সিঁড়ির পাশে দেয়ালেও রক্তের দাগ। আহত কেউ হয়তো টেনে নামানোর সময় ফাঁকা দেয়ালটা ধরতে চেয়েছিলো। দেয়ালে রক্তমাখা আঙুলের ছাপ। সব কিছু রক্তে একাকার।

বাবু আর মামুন সিঁড়ির নিচে পাথরের মূর্তি হয়ে গেলো। এক ঝলক দমকা বাতাস ফাঁকা বারান্দা দিয়ে হু হু করে বয়ে গেলো। ছাত্রাবাসের শূন্য ঘরে হু হু প্রতিধ্বনি। আধ পোড়া কাগজগুলো এলোমেলো উড়তে লাগলো।

বাবুর বুকের ভেতর প্রতিধ্বনি তুললো সেই ভয়াবহ শূন্যতা। আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলো মামুনের হাত ধরে।

মামুন চলে গেলো। সব কিছু ফাঁকা মনে হলো বাবুর। রাস্তা দিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো হাঁটলো। দুপুরের গনগনে সূর্য তখন ঠিক মাথার ওপর। বাবুর মনে হলো রাস্তার দু'ধারে বাড়ি ঘর কিছুই নেই। কোন মানুষ নেই। গাছপালা নেই। এক বিশাল মরুভূমির মাঝখান দিয়ে সে হেঁটে যাচ্ছে। সামনে ধূ ধূ করছে রোদে ঝলসানো এক শূন্য ক্যানভাস। কোথায় যাবে তার কোন ঠিকানা নেই।

তীব্র শব্দে একটা নীল টয়োটা গাড়ি তার পাশে ব্রেক কষে দাঁড়ালো। বাবু তাকিয়ে দেখলো ছোড়দা, ওর জেঠতুতো ভাই। ধমকের গলায় ছোড়দা ওকে বললো, 'এখানে দাঁড়িয়ে কী করছিস?'

বাবু মাথা নাড়লো— 'কিছু নয়।'

ভেতর থেকে ছোড়দা গাড়ির দরজা খুলে দিলো— 'উঠে আয়।'

বাবু কোন কথা না বলে ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলো। ছোড়দা বললো— 'বাড়ি থেকে কখন বেরিয়েছিস?'

রমনার মাঠের মাঝখানে কালী মন্দিরের ধ্বংসস্তুপ দেখছিলো বাবু। বললো, 'বেশ কিছুক্ষণ।'

'এ সময়ে এভাবে বাড়ি থেকে বেরুতে গেলি কেন?'

'ক্যাম্পাসে গিয়েছিলাম।'

ছোড়দা রেগে বললো, 'দয়া করে এখন বাড়ি থেকে বেরিও না। ছাত্রদের ওরা কিভাবে মারছে সে খবর নিশ্চয়ই তোমার অজানা নয়।'

বাড়ির দরজায় বাবুকে নামিয়ে দিয়ে ছোড়দা বাবার সঙ্গে দেখা করে চলে গেলো।

দুপুরের পর থেকে বাবু একা ওর ঘরে বসেছিলো। একটার পর একটা শূন্যতার দেয়াল ওর চারপাশে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছিলো। বাবুর মনে হলো কোনদিন এই শূন্যতার দেয়াল থেকে সে মুক্ত হতে পারবে না।

রাতে সারা বাড়ির বাতি নিবিয়ে সবাই রেডিয়ো শুনলো। ভাইয়া বহুক্ষণ চেষ্টা করে স্টেশনটা ধরেছিলো। ঘোষকের কণ্ঠ শুনে সবাই ভীষণ চমকে উঠলো— 'আপনারা স্বাধীন বাঙলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শুনেছেন।' বার বার ওরা শুনলো। যতবার শুনলো— রোমাঞ্চিত হলো। মেজর জিয়ার বেতার ভাষণ শুনলো। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মুক্তিফৌজ যুদ্ধ করছে।

বাবা উত্তেজিত গলায় বললেন, 'মনে হচ্ছে ঢাকা ছাড়া বাকি সব মুক্তিফৌজের দখলে।'

ভাইয়া আরো উত্তেজিত— 'শিগগিরই ওরা ঢাকা অবরোধ করবে। হঠাৎ করে আক্রমণ করেছিলো বলেই আর্মি ঢাকা দখল করতে পেরেছিলো। ঢাকার দিকে মার্চ করতে মুক্তিফৌজের আর বেশি দেরি নেই।'

স্বাধীন বাঙলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের পর আকাশবাণী। মুক্তিযুদ্ধের সংবাদ সেখানেও। অনবরত দেশাত্মবোধক গান বেজে চলেছে। বাংলাদেশের গান। সারা শরীর বার বার শির শির করে উঠলো।

ঢাকা রেডিওতে ধর্ম প্রচার করা হচ্ছে। ভাইয়া ওদের খবর শুনছিলো।

বাবা পাগলের মতো চেঁচিয়ে বললেন, 'বন্ধ করো ওদের নোংরামি!'

বিছানায় শুয়ে ঘুমোতে পারলো না বাবু। চোখের পাতা বন্ধ করলেই ভেসে ওঠে সারি সারি লাসের মিছিল। ঘাসের বুকে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য অসহায় মৃতদেহ। সবুজ ঘাস কালো হয়ে গেছে। দেয়ালে বারান্দায় সিঁড়িতে সবখানে শুধু চাপ চাপ রক্ত। দুঃখ, হতাশা, রাগ আর ঘৃণার মিশ্র অনুভূতি বাবুকে সারারাত ক্ষত-বিক্ষত করলো।

বাইরে মাঝে মাঝে গুলির শব্দ হচ্ছে। আগুন জ্বলছে কালো আকাশের গায়ে।

পঁচিশের রাত এখনো শেষ হয়নি। বাবু বুঝতে পারলো না আর কতদিন এভাবে রাত কাটবে।

শেষ রাতে কিছুক্ষণের জন্যে ঘুমিয়েছিলো বাবু। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলো— সেই ভয়াবহ স্বপ্ন। ঝড়ের রাত। অশান্ত ইউক্যালিপ্টাস গাছ। বিধ্বস্ত গোলাপ বাগান। তারপর নেকড়ের চোখে সবুজ হিংস্রতা। সাদা বরফের বুকে রক্তের দাগ।

বাবুর ঘুম ভেঙে গেলো। জেগে ওঠার পরও দুঃস্বপ্নের ছায়া দেখলো। ভীষণ ভয় পেলো বাবু। বাইরে দেখলো বাবা আর ভাইয়া অন্ধকারে বারান্দায় বসে আছেন।

সারা শহর নিকষ কালো অন্ধকারের চাদরে ঢাকা। আদিম পৃথিবীর অন্ধকার। আদিম হিংস্রতার রাজত্ব সেই অন্ধকারে। পাঞ্জাবি সৈন্যরা অন্ধকারে হানা দেয় শহরের প্রতিটি বাড়িতে। নির্বিচারে মানুষদের গুলি করে মারে। লুট করে নিয়ে যায় মানুষের আজীবনের সঞ্চয়। তারপর আগুন ধরিয়ে দেয়। কালো অন্ধকারের ক্যানভাসে শয়তানের জিভের মতো লকলক করে আগুনের লাল শিখা। আকাশে তার ছায়া পড়ে। সারারাত জ্বলে সেই আগুন। কোথাও রাইফেলের শব্দ শোনা যায়। মানুষের আর্তনাদ রাতের বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিটি শব্দ এক একটি মৃত্যুর স্বাক্ষর।

বাবা আর ভাইয়া ঘুমোতে পারেনি। সারাক্ষণ পায়চারি করছিলেন বাবা। ভাইয়া বসেছিলো বারান্দার সিঁড়ির ওপর। একসময় বললো, 'আমার মনে হয় শহর ছেড়ে আমাদের গ্রামে চলে যাওয়া উচিত।'

বাবা বেতের চেয়ারে বসলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন, 'ওরা গ্রামেও যেতে পারে।'

'গ্রামে ওরা ঢুকতে পারবে না, পথঘাট নেই। তার ওপর সব কিছু অচেনা।'

বাবা একটু বিরক্ত হলেন— 'ওরা প্যারাট্রুপার্স নামাতে পারে।'

বাবার কথা ভাইয়ার ভালো লাগলো না। খুব তাড়াতাড়ি হতাশ হয়ে পড়েছেন বাবা। ভাইয়া একটু পরে বললো, 'মুক্তিফৌজের কাছে নিশ্চয়ই এন্টি এয়ারক্র্যাফট গান রয়েছে।'

'তাতে কী হলো?'

'এয়ার এ্যাটাক বা প্যারট্রুপার্স নামানো অতো সহজ হবে না।'

বাবা ভাবলেন, ওদের মতো বয়স হলে আমিও ওভাবে ভাবতাম। শেষ মুহূর্তেও এ বয়সটা হতাশ হয় না। বললেন, 'মুক্তিফৌজের শক্তি কতটুকু? ইপিআর, বেঙ্গল রেজিমেন্ট আর কিছু পুলিশ। সব মিলিয়ে হাজার বিশেকও হবে না। তার ওপর অস্ত্র বলতে কিছুই নেই!'

'মুক্তিফৌজের সংখ্যা প্রতিদিন বাড়বে। ঘরে ঘরে মুক্তিযোদ্ধা তৈরি হবে।

সাড়ে সাত কোটি বাঙালির অস্তিত্ব রক্ষার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।' বলতে বলতে ভাইয়া উত্তেজিত হয়ে উঠলো— 'কেন সবাই যুদ্ধ করবে না বলুন? আজ আপনার কোন ছেলে যদি যুদ্ধে যেতে চায় আপনি কি পারবেন বাধা দিতে?'

বাবা একটু চমকে উঠলেন। তিনি এভাবে ভাবেননি। তাঁর ছেলেদেরও যুদ্ধে যাবার প্রয়োজন হতে পারে।

বিড়বিড় করে বললেন, 'আমার ছেলেরা যদি যুদ্ধে যেতে চায় তাহলে আমি খুশিই হবো। তোমরা আমার চোখের সামনে অসহায় পাখির মতো গুলি খেয়ে মরো, আমি তা চাই না।'

ভাইয়া কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর বললো, 'আমার মনে হয় বাবলুরা ক্যান্টনমেন্টে থেকে বেরিয়ে গেছে। ওরা নিশ্চয়ই মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছে।'

বাবা বললেন, 'অসম্ভব নয়। তবে একবার দেখা করে গেলে পারতো।'

'হয়তো ভেবেছে আপনি যেতে দেবেন না।'

'কেন এ রকম ভাববে?' বাবা বিষণ্ন গলায় বললেন, 'তোমাদের কোন কাজে আমি কোনদিন বাধা দিইনি।'

ভাইয়া চুপ করে রইলো। বাবা ওদের সবাইকে অবাধ স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছেন। আসলে মা মারা যাবার পর থেকেই বাবা কোন কিছুতে জড়াতে চান না। সরকারী চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর নিজেকে আরো বেশি গুটিয়ে নিয়েছেন।

বাবা বারান্দায় পায়চারী করছিলেন।

ভাইয়া বললো, 'বাবুকে আজ খুব বিষণ্ন মনে হলো। ও কি বেরিয়েছিলো কোথাও?'

বাবা বললেন, 'বেরিয়েছিলো। তোমরা যখন হাসপাতালে গেলে তারপরই বেরিয়ে গেলো। এসে বললো হলে গিয়েছিলো।'

ভাইয়া বললেন, 'ওর হলের বন্ধুরা কোথায়?'

'বললো ইকবাল হলে ওর পরিচিত অনেকের লাস দেখেছে। বন্ধুদের কথা কিছু বলেনি।'

ভাইয়া চুপ করে বসে রইলো। বাইরে মাঝে মাঝে গুলির শব্দ হচ্ছে। অন্ধকারটা ফ্যাকাশে হয়ে এসেছে। ভাবী হাসপাতালে কী অবস্থায় আছে কে জানে। বাবা ভাইয়াকে বললেন, 'শুতে যাও। রাত ভোর হয়ে এসেছে।'

ভাইয়া উঠে ওর ঘরে চলে গেলো। বাবা বারান্দায় একা পায়চারি করতে লাগলেন।

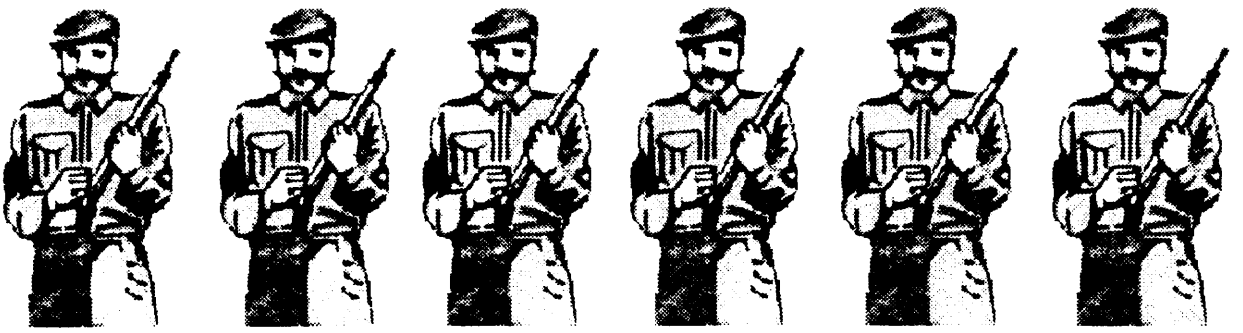

হাবিলদার মেজর সুলতান একেবারে মুষড়ে পড়েছেন। বার বার বললেন, 'আমার জন্যে দশটা ছেলেকে মরতে হলো। আমিই ওদের মৃত্যুর জন্যে দায়ী।'

বাবলু বললো, 'ক্যান্টনমেন্টে থাকলে একদিন আমাদের সবাইকে মরতে হবে। গর্তেচাপা ইঁদুরের মতো মরার চেয়ে ওভাবে মরাটা অনেক ভালো। আমরা সবাই এখান থেকে পালিয়ে যাবো।'

রশিদ বললো, আপনি যেভাবে বলেছেন ওটাই বেরুবার একমাত্র পথ। আমার মনে হয় ওরা ওদের নিজেদের বোকামির জন্যে ধরা পড়েছে।'

বাবলু বললো, 'আমারও তাই মনে হয়। নইলে ধরা পড়ার কোন কারণই তো দেখছি না।'

বুড়ো হাবিলদার মেজর সব শুনলেন। বললেন, 'তোমরা একেবারেই ছেলেমানুষ। তোমাদের কাছে এ ধরনের সতর্কতা আশা করা অন্যায়। আজ রাতে কেউ বেরিয়ো না। অপেক্ষা করো, কাল রাতে আবার চেষ্টা চালানো যাবে।'

রাতে ওরা সবাই হাবিলদার মেজরের অপেক্ষা করছিলো। যদি কোন বিশেষ সংবাদ থাকে, তিনি রাতে আসবেন বলেছিলেন। প্রতি মুহূর্তেই ওরা কোন বিশেষ সংবাদ শোনার অপেক্ষা করছে। অন্ধকার ব্যারাকে সবাই চুপচাপ বসে আছে। বাইরে পাঞ্জাবি সৈন্যরা টহল দিচ্ছে। এমুনেশন ড্যাম্পের দিকে পাহারাটা বেড়েছে মনে হলো। জিপ লরি ছুটোছুটি করছে সন্ধ্যের পর থেকে।

বাড়ির কথা ভাবছিলো বাবলু। বাবা নিশ্চয়ই ওর জন্যে খুব চিন্তা করছেন। হিমির কথা মনে হলো। হিমি কি এখনো আগের মতো হাসিখুশি আছে? থাকার কথা নয়। যে বিপর্যয় এ দেশের ওপর দিয়ে সর্বনাশা ঝড়ের চেয়েও প্রলয়ঙ্কর অবয়ব নিয়ে বয়ে গেলো, এরপর কেউ স্বাভাবিক থাকতে পারে না।

হঠাৎ চমকে উঠলো বাবলু। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বুড়ো হাবিলদার মেজর ইশারায় ওদের ডাকছেন। সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসলো বাবলু। রশিদ আর হাসানও উঠে জানালার কাছে এলো। বুড়ো চাপা গলায় বললেন, 'ভীষণ একটা ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছে। আজ রাতে এরা জয়দেবপুরে যে বেঙ্গল রেজিমেন্ট আছে ওদের আক্রমণ করবে। একশ আশিজনকে নিয়ে একটা কনভয় তৈরি হচ্ছে। মর্টার

ভারী মেশিনগান সবই থাকছে এদের সঙ্গে। আমাদের পুরো রেজিমেন্ট রয়েছে জয়দেবপুরে। সতর্ক না করে দিলে সবাই মারা পড়বে।'

কথাটা শুনে সবাই পাথরের মতো চুপ হয়ে বসে রইলো। ক্যান্টনমেন্ট থেকে কম করে হলেও বিশ মাইল দূরে জয়দেবপুর। তিন ঘন্টা লেগে যাবে ওখানে যেতে।

বাবলু বললো, 'ওরা কখন যাবে কিছু বুঝতে পেরেছেন?'

বুড়ো বললেন, 'বালুচি হাবিলদার আফতাব খানের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। ও বললো রাত দুটো নাগাদ ওরা আক্রমণ করবে। হঠাৎ করে আক্রমণ করতে চায় বলেই মাঝ রাতে যাচ্ছে।'

রশিদ ঘড়ি দেখলো, এগারোটা বাজতে দশ মিনিট বাকি আছে। বললো, 'আমি যাবো ওদের খবর দিতে। এক্ষুণি রওনা হলে দেড়টার ভেতর পৌঁছে যাবো।'

বুড়ো মেজর একটু ভেবে বললেন, 'যেতে পারবে জানি। তবু তোমাদের কজনকে আমি সঙ্গে রাখতে চেয়েছিলাম।'

শফি এক কোণে চুপ করে বসেছিলো। বললো, 'রশিদের চেয়ে আমি কম দৌড়োতে পারি না। আপনি যদি বলেন, ওর সঙ্গে আমিও যেতে পারি।'

রশিদ বললো, 'তুই যদি আসিস তাহলে খুবই ভালো হবে।'

বুড়ো বললেন, 'তোমরা দুজনই যেতে চাইছো?'

বাবলু বললো, 'আমিও যেতে পারি। আমি—।'

বুড়ো ওকে বাধা দিলেন— 'না, তুমি থাকো। ওরা দুজনেই যাক। তোমরা এক্ষুণি বেরিয়ে পড়ো। ওখানে ক্যাপ্টেন সামাদ আছেন। ওঁকে আমার সালাম জানিয়ে বলো, ওঁরা যেন আমাদের সাথে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করেন। পাঞ্জাবিদের ওঁরা যদি বাধা দেন তাহলে ওঁদের নিশ্চয়ই ওখান থেকে সরে যেতে হবে। যোগাযোগ না রাখলে আমরা একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বো। এখানে আমাদের সাধ্যমতো যা পারি করবো। কোন বিশেষ নির্দেশ থাকলে জেনে নিও। আর যদি সুবিধে বোঝো, তাহলে একজন ফিরে এসে খবরটা দিয়ে যেও। নইলে দুজনই ওদের সঙ্গে চলে যেও।'

রশিদ আর শফির পিঠে হাত রেখে বুড়ো হাবিলদার মেজর ধরা গলায় বললেন, 'বাবা মার সঙ্গে তোমাদের দেখা হলো না। আমি বাড়িতে খবর পাঠাবার চেষ্টা করবো। এসো তাহলে। খোদা হাফেজ।'

শফি আর রশিদ বেরিয়ে গেলো। অন্ধকার ঘরের জানালা দিয়ে বুড়ো তাকিয়ে রইলেন ওদের পথের দিকে। বার বার বিড়বিড় করে বললেন, 'আল্লাহ্ তোমাদের সহায় হোন।'

বুকে হেঁটে ক্রলিং করে ওরা দুজন সি কোম্পানি আর বি কোম্পানির ব্যারাক

পেরিয়ে গেলো। কোথাও এতটুকু শব্দ হলো না। ক্রলিং করে রাস্তাও পেরিয়ে গেলো। রাস্তার পর আমবাগান। বাগানে ঢুকতে গিয়ে ওরা চমকে উঠলো। দেখলো দূরের গাছগুলোর সাথে গা মিলিয়ে পাঞ্জাবি সৈন্যরা পাহারা দিচ্ছে। ভালো করে লক্ষ্য না করলে বোঝার কোন উপায় নেই। ওরা থমকে দাঁড়ালো। রশিদ ফিসফিস করে বললো, 'বনের ভেতর দিয়ে যাওয়া যাবে না। এখানে যে কিছু গোপন এম্যুনেশন ডাম্প আছে, ওস্তাদও জানেন না। ভিমরুলের চাকের মতো এখানে পাহারা দেয়া হয়। কাকপক্ষিও ঢুকতে পারে না।'

শফি মাথা নাড়লো। নিচু গলায় বললো, 'ওরা কাল এখানেই গুলি খেয়েছিলো।'

রশিদ বললো, 'রাস্তার পাশের নালা দিয়ে যাবো আমরা। একটু ঘুরতে হবে। সেটা বড়ো রাস্তায় গিয়ে পুষিয়ে নেয়া যাবে।'

রাস্তা থেকে ওরা নালায় নেমে পড়লো। প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হলো ওদের। কাদার ভেতর অতি সন্তর্পণে এতটুকু শব্দ না করে ওরা এগিয়ে চললো। একটানা পনেরো মিনিট হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটলো শিকারী বেড়ালের মতো। তারপর এক সময় ওরা নালাও পেরিয়ে গেলো। নালার মুখেই কাঁটাতারের বেড়া। বেড়া ডিঙিয়ে ওরা ছুটতে আরম্ভ করলো। ঠিক বড়ো রাস্তার ওপর দিয়ে যাওয়া যাবে না। বড়ো রাস্তায় জিপ চলার শব্দ হচ্ছে। রাস্তার নিচের ধানক্ষেত ধরেই ওরা দৌড়ালো।

আকাশে চাঁদ নেই। ওদের সুবিধেই হলো। তারার ফ্যাকাশে আলোতে অস্পষ্ট পথের রেখা দেখা যাচ্ছিলো। কোন কথা না বলে ওরা দুজন ছুটে চললো অবিরাম।

রাত যখন সোয়া একটার মতো— ওরা জয়দেবপুর পৌঁছলো। ছাউনিতে ঢুকতেই বাধা পেলো। অন্ধকারে ভারী কণ্ঠস্বর শুনলো— 'হল্ট।'

ওরা চমকে উঠলো। পাঞ্জাবি সৈন্য নয়তো? ওরা জানতো এখানে কিছু পাঞ্জাবি সৈন্য রয়েছে। এ মুহূর্তে পালানো সম্ভব নয়। হাত তুলে ওরা দাঁড়িয়ে বললো— 'ফ্রেন্ডস।'

অন্ধকার ফুঁড়ে একজন সৈন্য বেরিয়ে এলো। টর্চের আলো ফেলে বললো— 'আপনারা কোথায় যাবেন?'

ওরা আশ্বস্ত হলো। পাঞ্জাবি সৈন্য নয়, বাঙালি। রশিদ বললো, 'আমরা টেন্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট থেকে আসছি। হাবিলদার মেজর সুলতান আহমেদের একটা জরুরি সংবাদ আছে ক্যাপ্টেন সামাদের জন্যে।'

টহলদার সৈন্যটি বললো, 'আমার সঙ্গে আসুন।'

জয়দেবপুর রাজবাড়ির ভেতর সৈন্যদের ছাউনি। ক্যাপ্টেন সামাদের দপ্তর সেখানে। একটা টেবিলে পাঁচজন কমিশনড্ অফিসারকে নিয়ে ক্যাপ্টেন সামাদ

কী যেন পরামর্শ করছিলেন। রশিদ সব কথা খুলে বললো ক্যাপ্টেনকে।

রশিদের কথা শুনে চমকে উঠলেন ক্যাপ্টেন। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন দেড়টার মতো বাজে। সবাইকে ডেকে পাঠালেন কনফারেন্স রুমে।

রশিদ আর শফি বসলো। অফিসাররা সবাই এলেন। ক্যাপ্টেন বললেন, 'পাঞ্জাবি সৈন্যরা আমাদের আক্রমণ করার জন্য ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে রওনা হচ্ছে। আমরা ওদের পথে বাধা দেবো। এখান থেকে দু'মাইল এগিয়ে ব্রিজের কাছে যাবো। পথের দু'পাশে পজিশন নিয়ে ওদের জন্যে অপেক্ষা করবো। সবাই ঝটপট তৈরি হয়ে যান।'

শফি আর রশিদও এলো এদের সঙ্গে। দু'মাইল এগিয়ে এসে সবাই পজিশন নিয়ে বসে পড়লো। রশিদের সঙ্গে একটা হালকা মেশিনগান। চারদিকে থমথমে অন্ধকার। নিজের শরীরও দেখা যাচ্ছে না সেই অন্ধকারে। ওরা সবাই প্রতীক্ষার মুহূর্ত গুণে চললো। উত্তেজনায় সবার বুকের ভেতরটা ঢিবঢিব করছিলো। সময় গড়িয়ে চললো।

অবশেষে ওরা এলো। প্রথমে একটানা মৃদু শব্দ শোনা গেলো। দূর থেকে ভারী লরি আর জিপ আসার শব্দ। সকলের আঙুল ট্রিগারের ওপর স্থির হলো।

লরির পজিশন ওদের বলে দেয়া হয়েছে। বিশেষ জায়গাটায় আসা মাত্র সবাই গুলি ছুঁড়বে।

শব্দ আরো কাছে এলো। রাস্তার ওপর ঘরঘর শব্দ। প্রথম লরির হেড লাইটের নিচের ছোট লাইট দুটো জ্বালানো। অন্যগুলোতে কোন আলো নেই। বেশি জোরেও চলছে না। যতটুকু পারা যায় শব্দ কমানোর চেষ্টা করছে।

প্রথম লরিটা দেবদারু গাছের নিচে এলো। বাকিগুলো তার পেছনে। শেষটা ব্রিজের ওপর। দেবদারু গাছটা পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একসঙ্গে আটটা মেশিনগান গর্জে উঠল ভীষণ শব্দে। এক মুহূর্তের বিরতি না দিয়ে কট-কট-কট-কট করে গুলি বৃষ্টি করে চললো মেশিনগানগুলো। পুরো কনভয়টা যেন হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। দু'একটা পাল্টা গুলির চেষ্টা চললেও পরমুহূর্তে সেটা থেমে গেলো।

প্রায় পনেরো মিনিট পরে এদের মেশিনগান থামলো। সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতা পুরো পরিবেশকে জড়িয়ে ধরলো। একটু পরে ওরা রাস্তায় উঠে এলো। টর্চের আলো ফেললো। লরিগুলো ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। পাঞ্জাবি সৈন্যদের লাসগুলো টেনে নামানো হলো। মোট একশ আশিজন, একজনও বেঁচে নেই। অস্ত্রগুলো সব জড়ো করা হলো। বারোটা হালকা মেশিনগান, তিনটা ভারী মেশিনগান, তিন ইঞ্চি মর্টার, পঁচিশ রাউন্ড মর্টার শেল আর চাইনীজ রাইফেল একশ দশটা।

লাসগুলো ফেলে দিয়ে লরিগুলো পরিষ্কার করা হলো। একটা লরি শুধু

অকেজো হয়ে গেছে। ক্যাপ্টেন বললেন, 'আমরা প্রথমে ঘাঁটিতে যাবো। যতটুকু সম্ভব অস্ত্র আর রসদপত্র নিয়ে একদল মধুপুরের গড়ের দিকে যাবে, অপর দল যাবে নরসিংদীর দিকে। তার আগে কাঠের ব্রিজ উড়িয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করো।'

রশিদ আর শফিককে ক্যাপ্টেন বললেন, 'তোমাদের ফিরে কাজ নেই। আমাদের সঙ্গে থেকে যাও।'

শফির মুখে বিজয়ের হাসি। রশিদকে বললো, 'আমাদের মিশন সাকসেসফুল। ওরা যখন একশ আশিটা লাস দেখবে তখন নিশ্চয়ই আমাদের দশজনের শোক কিছুটা ভুলতে পারবে।'

একটা বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে কাঠের ব্রিজটা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। লরিগুলো উত্তরের রাস্তায় এগিয়ে চললো। রশিদ পেছনে তাকিয়ে দেখলো। মনে মনে বললো, 'বিদায় বন্ধুরা।'

বাবলুরা মেশিনগানের অস্পষ্ট শব্দ শুনেছিলো। বুঝতে পেরেছিলো পাঞ্জাবিরা পৌঁছে গেছে। ওরা উদ্বিগ্ন ছিলো রশিদ আর শফির জন্যে। ওরা যদি আগে পৌঁছোয় বেঙ্গল রেজিমেন্ট জিতবে, নইলে সবাই মারা পড়বে। হাসান বললো, 'ওরা হয়তো খবর পায়নি। পেলে নিশ্চয়ই সরে যেতো জয়দেবপুর থেকে।'

বাবলু বললো, 'গুলির শব্দটা ওদেরও হতে পারে।'

এক ঘন্টা পরে সব যখন আগের মতো নিশ্চুপ, তখন ওরা ট্যাঙ্ক বেরোতে দেখলো। একটা ট্যাঙ্ক আর তার পেছনে কয়েকটা লরি জয়দেবপুরের দিকে বেরিয়ে গেলো।

বুড়ো হাবিলদার মেজর এলেন কিছু পরে। চুপিচুপি বললেন, 'ওরা সম্ভবত মার খেয়েছে। এইমাত্র বিশ লরি সৈন্য আর ট্যাঙ্ক নিয়ে ওরা জয়দেবপুর গেলো। কামানও নিয়েছে সঙ্গে।'

ট্যাঙ্ক ব্রিজ পর্যন্ত গিয়ে আর এগুতে পারলো না। এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়লো বহুক্ষণ। বাবলুরা সেই শব্দ শুনলো। কেউ বুঝতে পারলো না ওরা জয়দেবপুরে কি ঘটছে। সবাই ভোর হওয়া পর্যন্ত জেগে রইলো। সবার মনে গভীর উৎকণ্ঠা।

পাঁচটার সময় প্যারেড গ্রাউন্ডে ডাক পড়লো। ওরা দেখলো কালকের মতো সারি সারি লাস। রক্তাক্ত শরীর। সবাই পাঞ্জাব রেজিমেন্টের। বাবলু গুনলো। গুনে আশ্চর্য হলো, একশ আশিটা লাস। একজনও বাঁচতে পারেনি। গত দিনের কথা মনে হলো বাবলুর। চোয়ালটা শক্ত হয়ে গেলো।

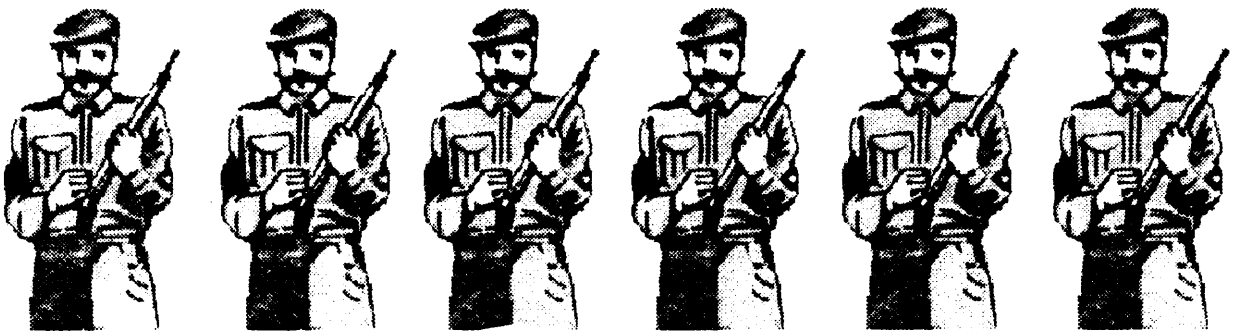

প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে বাবু শুধু মৃত্যুর পর মৃত্যু দেখে যাচ্ছিলো। ঘর থেকে পথে বেরুলেই মৃত্যুর মহড়া। যেখানে সেখানে মৃত্যুর দৃশ্য। ঘরে থাকলে মৃত্যুর শব্দ। অসংখ্য মৃত্যুর দৃশ্য আর শব্দ বাবুকে সারাক্ষণ আচ্ছন্ন করে রাখলো। বাবু কিছুই ভাবতে পারছিলো না। প্রতিদিনের এই অসংখ্য মৃত্যু আমাদের সময়কে কোন ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে নিচ্ছে? কত দিন চলবে ধ্বংস আর মৃত্যুর এই নারকীয় তাণ্ডব? কবে আসবে সেই মুক্তি— স্বাধীনতা যার নাম?

প্রশ্নের পর প্রশ্নের চাবুক ওকে রক্তাক্ত করলো। কোন জবাব খুঁজে পেলো না। ওর চিন্তা করার শক্তিও ধীরে ধীরে কমে যেতে লাগলো। বাবুর মনে হলো এভাবে চলতে থাকলে ও ঠিক মরে যাবে।

রোজ কারফিউ তুলে নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে পথে বেরিয়ে পড়ে বাবু। দু'একটা গাড়ি চোখে পড়ে, বেশির ভাগই বিদেশীদের। মানুষ— যারা পথ চলছে তারা সবাই শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ওদের সকলের চোখে মৃত্যুর ছায়া। বাড়িগুলোতে ধ্বংসের ছাপ। মর্টারের আর ট্যাঙ্কের গোলায় ক্ষত-বিক্ষত। কতগুলো ছাইয়ের স্তূপে পরিণত হয়েছে। পোড়ামাটির বুকে ঝলসানো গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে কঙ্কালের মতো।

প্রতিদিন একই দৃশ্য। হাঁটতে হাঁটতে বাবু কখনও চলে যায় টিকাটুলির দিকে। কখনও শাজাহানপুর, কখনও ধানমণ্ডির দিকে। বন্ধুদের খুঁজে বেড়ায়। সবখানে হতাশার তালা ঝুলছে। রাজারবাগ মিনুদের বাড়ি গিয়ে বাবু আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলো। সারা বাড়ি জুড়ে ধ্বংস আর মৃত্যুর ছাপ। ভেতরটা গুঁড়ো হয়ে গেছে। বন্ধুরা কেউ নেই। এভাবেই সে নিঃসঙ্গ হয়ে গেলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের দিনগুলো অথবা 'রানার'-এর সুন্দর সময়গুলো ফ্যাকাশে হয়ে হারিয়ে যেতে লাগলো। মনে হলো কখনও বহুযুগ আগে তার জীবনে এমন কোন সুন্দর সময়ের অস্তিত্ব ছিলো। যাকে আর কোনদিন ছোঁয়া যাবে না। ধরা ছোঁয়ার বহুদূরে চলে গেছে সেই সুন্দর দিনগুলো।

ভাবী হাসপাতাল থেকে ফিরেছে। ফুটফুটে একটা মেয়ে হয়েছে। অথচ বাড়িতে এতটুকু আনন্দ নেই। বাবা শুধু চেয়ে দেখেন। বাচ্চাটা গলা ফাটিয়ে কাঁদে। এতটুকু গুলির শব্দ হলেই চিৎকার করে কাঁদে। বাবু ভেবে পায় না ছোট্ট

বাচ্চাটা গলায় এত জোর কোথায় পেলো। বাবুর মনে হয় ও এক ভীষণ দুঃসময়ের জাতক, যে প্রতি মুহূর্তে সেই সময়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে চলেছে। বাবা ওর নাম রেখেছেন বহ্নি।

বাবু ভাবে বহ্নি যে দিন বড় হবে ও কি মনে রাখবে, কি এক দুঃসময়ে ও জন্মেছিলো? ওদের কাছে সব গল্পের মতো মনে হবে।

পঁচিশে মার্চের পর আরো সাত দিন কেটে গেছে। এখনো সময় এতটুকু বদলায় নি। বরং আরো ছড়িয়ে পড়েছে। শহর থেকে শহরতলিতে, সেখান থেকে মফস্বল শহরে। যেখানেই পাঞ্জাবি সৈন্যরা হানা দিয়েছে সেখানেই ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা। স্থানীয় অবাঙালিরা মহা উল্লাসে বাঙালিদের হত্যা করছে। ওদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে জামাতে ইসলামী আর মুসলিম লীগের লোকেরা। বাঙালি মাত্রই ওদের কাছে অধার্মিক, কাফের। এদের হত্যা করাটাকে ওরা সওয়াবের কাজ বলে মনে করছে।

ধর্মকে বাবু কোনদিন সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। মামুনকে বলেছে, 'যতদিন মানুষ এ ধরনের কুসংস্কারের দেয়াল ভেঙে বাইরে না আসতে পারবে, ততদিন ওরা এমনিভাবে অসহায়ের মতো মরতে থাকবে।'

মামুনদের পল্লবীর বাড়ি বিহারী মোহাজেররা লুট করে নিয়েছে। কোন রকমে ওরা প্রাণে বেঁচে উঠেছে কলাবাগানের স্টাফ কোয়ার্টারে, এক আত্মীয়ের ফ্ল্যাটে।

সেদিন মামুনের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটালো বাবু। মামুন রীতিমতো উদ্দীপ্ত। বিভিন্ন জায়গায় মুক্তি বাহিনীর সঙ্গে পাকিস্তানি সৈন্যের যুদ্ধ চলছে। যুদ্ধের খবর শোনালো মামুন। বললো, 'সুযোগ পেলেই আমি মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেবো। শুধু যোগাযোগের অপেক্ষা করছি।'

দুপুরের পর বাড়ি ফিরলো বাবু। এসে দেখে মেজদা ওর ঘরে বসে আছেন। বাবুকে দেখে বললেন, 'চলে এলাম বাবু। ক'দিন তোমাদের এখানে আত্মগোপন করে থাকতে হবে।'

বাবু একটু অবাক হলো! বড়দার মতো মেজদাও কমিউনিস্ট পার্টি করেন। বাবু বললো, 'বড়দা কোথায় মেজদা?'

মেজদা ওর দিকে তাকালেন— 'বড়দার খবর শোননি? ওঁদের পত্রিকা অফিস পুড়িয়ে দিয়েছে। বড়দা আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে গেছেন।'

বাবু আর কোন কথা বললো না। লেখার টেবিলে চুপচাপ বসে রইলো। মেজদা ওর বইয়ের আলমারি থেকে বই বাছছিলেন। বললেন, 'এ সব বই সরিয়ে ফেলো। ওরা বাড়ি বাড়ি সার্চ করছে। এ ধরনের বই পেলে বিপদ হবে।'

ভাবী ডাইনিং রুম থেকে ডাকলো— 'বাবু, খেয়ে এসেছো?'

বাবু বললো, 'না।'

'তাহলে মেজদাকে নিয়ে খেতে এসো।'

মেজদা বললেন, 'চল বাবু।'

ডাইনিংরুমে বাবা, ভাইয়া, হিমি আর ভাবী খেতে বসেছে। বাবা বাবুকে বললেন, 'কোথায় ঘুরিস বলতো? কোনদিন কোথায় মরে পড়ে থাকবি। কেউ জানতেও পারবে না।'

বাবু ভাবলো, আমিতো মরেই গেছি। এর নাম কি বেঁচে থাকা? বেঁচে থাকার মানে কি এই ভয়াবহ শূন্যতা। যেদিন ওরা মিনুদের বাড়িটাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে, যেদিন মিনুর মতো অসংখ্য মানুষ হারিয়ে গেছে, সেদিন থেকেই আমি মরে গেছি। মরে আছি বলেই আমি প্রতিশোধ নিতে পারিনি।

মেজদা বললেন, 'বাবু অত ভেঙে পড়বে চলবে কেন? আমাদের আরো কঠিন সময়ের জন্যে তৈরি হতে হবে।'

বাবা খেতে খেতে মেজদাকে বললেন, 'তাহলে তুই বলছিস, শেখ মুজিবকে ওরা সত্যিই এ্যারেস্ট করেছে?

মেজদা মাথা নেড়ে সায় জানালেন— 'প্রথম রাতেই এ্যারেস্ট করেছে।'

'তবে যাই বলিস, এভাবে ধরা দেয়াটা মুজিবের আদৌ উচিত হয়নি।' বাবা নিজের মত প্রকাশ করলেন— 'মুজিব ছাড়া আওয়ামী লীগ একেবারেই অচল।'

ভাইয়া বলল, 'কাল আমাকে জামান সাহেব বললেন, শেখ মুজিব ধরা না দিলে আর্মি গোটা ঢাকা শহর একেবারে ধ্বংস করে দেবে বলেছিলো।'

'ধ্বংসের আর বাকি রইলো কী?' বাবা উত্তেজিত হলেন— 'কি ছিলো শহরটা, কি হয়ে গেলো। ভাবতেই আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে। এতোদিন খবরের কাগজে পড়েছি ভিয়েৎনাম আর কম্বোডিয়ার কথা। এর চেয়ে ভয়াবহ কিছু যে আমাদের দেশে ঘটবে, কোনদিন কি ভাবতে পেরেছিলাম?'

ভাবী বললো, 'ওরা যে এতটা করবে শেখ মুজিব সেটা বুঝতে পারেননি।'

বাবা ক্ষুব্ধ গলায় বললেন, 'ইয়াহিয়াকে তিনি কি করে এতটা বিশ্বাস করতে পারলেন, আমি ভাবতেই পারছি না। তিন তারিখে অনায়াসে তিনি এ্যাসেম্বলির সেশন ডেকে শাসনতন্ত্র পাশ করতে পারতেন। সেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা তাঁর দলের ছিল। অনায়াসে স্বাধীনতা ঘোষণা করে প্রস্তুতি নিতে পারতেন।'

ভাবী বললো, 'আসলে শেখ মুজিব বড়ো বেশি ভালোমানুষ। এতো ভালোমানুষ দিয়ে পলিটিক্স হয় না।'

'ন্যাপ-এর খবর কী?' মেজদার কাছে জানতে চাইলেন বাবা।

মেজদা বললেন, 'নেতারা তেইশ তারিখেই আন্ডারগ্রাউন্ড চলে গেছেন। তবে মওলানা ভাসানীর কোন খবর পাওয়া যাচ্ছে না। কাজী জাফরদের এক ছেলে বললো তিনি নাকি টাঙ্গাইলেও নেই।'

বাবা বললেন, 'ন্যাপ কি মুক্তিযুদ্ধে আওয়ামী লীগে সঙ্গে সহযোগিতা করবে?'

'কেন করবে না?' মেজদা বললেন, 'ন্যাপ অসহযোগের সময় থেকেই আওয়ামী লীগকে সমর্থন করে আসছে। এ মুহূর্তে আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের কথা ভাবা ঠিকও হবে না। এই যুদ্ধকে, আমাদের উচিত হবে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে টেনে নেয়া। আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক বিপ্লব ছাড়া সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা বলা ভুল হবে।'

ভাইয়া বললো, 'মেজদা কী করবেন, কিছু ঠিক করেছেন?'

মেজদা বললেন, 'একবার কোলকাতা যাবো ভাবছি। বাইরের দেশগুলোর অবস্থা জানা দরকার। ভারতের মনোভাব জানাটা বেশি দরকার।'

খাবার পর সবাই ড্রইংরুমে গিয়ে বসলো। ভাবী রেডিও ঘোরাতে ঘোরাতে বললো, 'ঢাকার রেডিয়ো স্টেশনে অসম্ভব ডিসটার্ব হচ্ছে।'

ভাইয়া বললো, 'স্বাধীন বাঙলা বেতার থেকে বলেছে সাভারে মুক্তিবাহিনীর সাথে পাক সৈন্যের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছে। আমার মনে হয় সাভারে অয়ারলেস সেন্টারের কোন ক্ষতি হয়েছে।'

মেজদা বললেন, 'আমার কী মনে হয় জানো? বেঙ্গল রেজিমেন্ট ইপিআর— এরা যে যুদ্ধ করছে তা সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে। নেতাদের কোন নির্দেশ এরা পায়নি। পঁচিশে মার্চেও যদি ওরা খবর পেতো তাহলে এভাবে অন্তত ঢাকার পতন ঘটতো না।'

ভাইয়া ভুরু কুঁচকে বললো, 'পঁচিশ তারিখে কি করে সম্ভব হতো! অবশ্য সাত তারিখে যদি রমনার মিটিঙের পাঁচ লাখ লোক ক্যান্টনমেন্ট ঘেরাও করতো, তাহলে হয়তো একটা কিছু হতো। সেদিন বাবলুও তাই বলছিলো।'

মেজদা বললেন, 'কি করে হতো বলছি। আওয়ামী লীগ আর ন্যাপ-এর মুক্তি সংগ্রাম কমিটির স্বেচ্ছাসেবক কত হবে বলে মনে করো? শুধু ঢাকা আর তার আশেপাশে?'

ভাইয়া একটু ভেবে বললো, 'ষাট সত্তর হাজারের মতো হবে।'

মেজদা বললেন, 'পঞ্চাশ হাজারই ধরো। ক্যান্টনমেন্ট থেকে সে রাতে ট্যাঙ্ক নামবে এ কথা নেতারা জানতেন। যে জন্যে ব্যারিকেডও দিতে বলা হয়েছিলো। সেই সঙ্গে কি পাল্টা আক্রমণের ব্যবস্থা নেয়া যেতো না? সারাদিন পঞ্চাশ হাজার স্বেচ্ছাসেবককে একত্রিত করে এয়ারপোর্ট রোড থেকে শুরু করে শহরের প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় কোথাও দুই কোথাও পাঁচ হাজার করে ছড়িয়ে রাখা যেতো। জয়দেবপুরে যে বেঙ্গল রেজিমেন্ট এর এক কোম্পানি সৈন্য ছিলো, ওরাই ঢাকার যুদ্ধ পরিচালনা করতে পারতো। বেরুবার মুখেই ওরা বাধা পেতো। এমনিভাবে প্রতিপদে ওদের যদি বাধা ডিঙিয়ে এগুতে হতো, তাহলে ভাবো,

শেষ পর্যন্ত ওদের শক্তি কতখানি অবশিষ্ট থাকতো! জয়দেবপুরে মর্টার রকেট লাঞ্চার সবই ছিলো। ক্যান্টনমেন্ট উড়িয়ে দেয়ার জন্যে সে সব যথেষ্ট। দক্ষিণে থেকে ইপিআর উত্তর থেকে বেঙ্গল রেজিমেন্ট যৌথ আক্রমণ চালালে ওদের অবস্থা কি হত একবার ভাবো। কয়েকটা ট্যাঙ্ক উড়িয়ে দিলেই ওরা অচল হয়ে যেতো। যুদ্ধ চলার সময় রেডিয়োতে শুধু একটা ঘোষণা দিলেই হতো সবাই ঢাকার দিকে মার্চ করো। এরপরও কি ঢাকা পাঞ্জাবি সেনাদের দখলে থাকতে পারতো? প্রত্যেকটা ক্যান্টনমেন্টে বাঙালি সৈন্যরা উদগ্রীব হয়ে নির্দেশের অপেক্ষা করছিলো। শেষে ওদের নিরস্ত্র হয়ে পালিয়ে বাঁচতে হলো। এর জন্যে কি নেতারা দায়ী নন?'

কথা বলতে বলতে মেজদা উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বাবু এক কোণে বসে শুনছিলো। মেজদার কথা শুনে মনে হয় না আমাদের ক্ষমতা সীমিত। মেজদার সঙ্গে কথা বললে মনোবল অনেকখানি বেড়ে যায়। আবার যখন রাতে অন্ধকার নামে, বিছানায় শুয়ে যখন রাইফেলের গর্জন আর মৃত্যুর আর্তনাদে আহত হয়, তখন ও হতাশায় ভেঙে পড়ে। এখনও শহরে আগুন জ্বলে। রাতের অন্ধকারে শয়তানরা হিংস্র থাবা মেলে অসহায় শহরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। যন্ত্রণার চাবুক বাবুর সমস্ত চেতনাকে অবিরাম রক্তাক্ত করে।

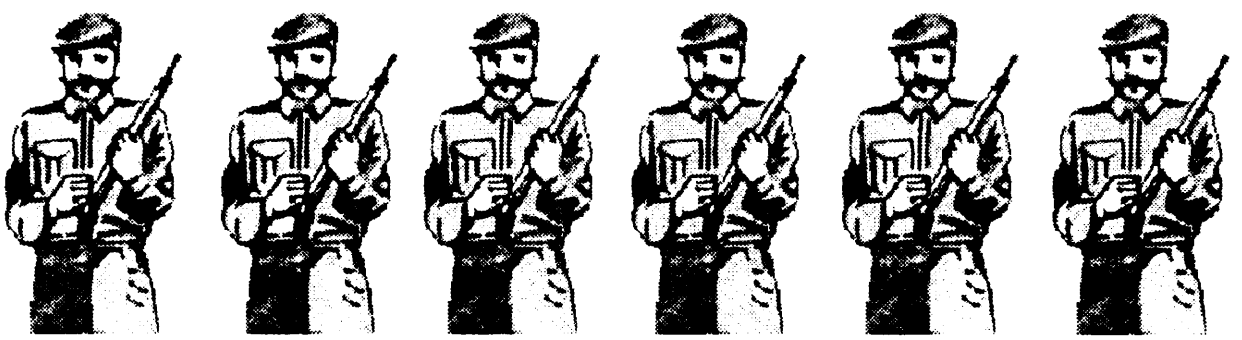

পাঁচ দিন পর হাসপাতাল থেকে বেরুলো শওকত আর বিপ্লব। আহত হয়ে ওরা যে বাড়িতে ঢুকেছিলো, তারাই সাতাশ তারিখে ওদের দুজনকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েছে। দু'একজন ডাক্তার নার্স ছাড়া হাসপাতাল একেবারে ফাঁকা। বিপ্লবের জখমটাই বেশি ছিলো। ডাক্তার ওকে আরো দু'দিন থাকতে বলেছিলো। তবু ওরা বেরিয়ে এসেছে। বাড়ির জন্যে ওরা দু'জনই উদ্বিগ্ন। প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে গুলির শব্দ শুনছে আর ছটফট করেছে কখন বেরুতে পারবে।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে দুজন দুজনের বাড়ির দিকে গেলো। বিপ্লব গেলো ফরাশগঞ্জ, শওকত এলো ওদের রাজারবাগে। বাড়িতে ওদের দুজনের জন্যেই প্রচণ্ড বিস্ময় অপেক্ষা করছিলো। ওরা দুজনেই বাড়ির চেহারা দেখে হতভম্ব হয়ে পড়েছিলো। পাড়ার একজন শওকতকে পুরো ঘটনাটা বললো। ওর মা বাবাকে ওরাই কবর দিয়েছেন। মিনুর কোন খবর এখনো পাওয়া যায়নি।

পাগলের মতো বাড়ির ভেতর ঢুকলো শওকত। মস্ত বড়ো বাড়িটায় বিশাল এক কবরের নিস্তব্ধতা। এ বাড়িতে কোনদিন কোন প্রাণের অস্তিত্ব ছিলো— তার কোন চিহ্ন নেই। সারা দেয়াল বুলেটে বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। আসবাবপত্র কিছুই অক্ষত নেই। ঘরময় ভাঙা জিনিসপত্র। জানালার কাচ গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে সবখানে ছড়িয়ে রয়েছে। দেয়ালে ঝোলানো ওদের ছবিটার গায়েও বুলেটের দাগ, এক পাশে কাত হয়ে ঝুলে আছে। ঘরের পর ঘর পেরিয়ে গেলো শওকত। প্রত্যেকটা ঘরেরই আলাদা একটা চেহারা ছিলো। এখন সবগুলো এক রকম দেখতে। প্রত্যেকটা ঘরই সমান বিধ্বস্ত।

সবশেষে হলঘরে ঢুকলো শওকত। সামনে দেখলো রক্তের দাগ। ঘরের দেয়ালে দেয়ালে রক্তের দাগ। ঘরের মেঝেতে রক্তের দাগ। শুকিয়ে কালচে হয়ে গেছে। তবু চেনা যায়, শওকতকে কেউ চিনিয়ে দিলো না। তবু সে চিনে নিলো। ওর বাবার রক্ত। ওর মায়ের রক্ত। হলঘরের মেঝেতে দেয়ালে মিশে একাকার হয়ে গেছে। বুকের ভেতরটা অসহনীয় এক যন্ত্রণায় দুমড়ে মুচড়ে একাকার হয়ে গেলো। কী যেন বললো সে, নিজেই বুঝলো না। সময় গড়িয়ে চললো। মুহূর্তগুলো ঘন্টায় পরিণত হলো। ঘন্টাগুলো বড় হলো। অপলক দৃষ্টিতে সেই জমানো রক্তের দিকে তাকিয়ে রইলো শওকত।

হঠাৎ একসঙ্গে অনেকগুলো ঘন্টার শব্দ শুনে চমকে উঠলো শওকত। হল ঘরের বড় দেয়াল ঘড়িটায় ঘন্টাগুলি বাজলো। ঘড়িটা চলছে। আগে লক্ষ্য করেনি। সারা ঘরে ঘড়িটাই শুধু অক্ষত রয়েছে। শব্দহীন হলঘরে ঘন্টার শব্দ এক ভৌতিক প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে দিয়েছে।

শওকত ভীষণ ভয় পেলো। মনে হলো ওর আর কেউ নেই। ভয়াবহ শূন্যতা ওকে আচ্ছন্ন করলো। অসম্ভব নিঃসঙ্গ মনে হলো নিজেকে। বুকের ভেতর চেপে বসে গেলো সেই শূন্যতা। পুরো পৃথিবীটা ওর কাছে ফাঁকা মনে হলো। ওর কেউ সেই। আর থাকতে পারলো না শওকত। রক্তের দাগে মুখ গুঁজে অসহ্য কান্নায় ভেঙে গুঁড়িয়ে গেলো।

কতক্ষণ কেঁদেছিলো শওকতের মনে নেই। শুনলো কে যেন নাম ধরে ডাকছে। চেয়ে দেখলো সামনে দাঁড়িয়ে আছে বিপ্লব। বিপ্লবেরও চোখ দুটো ভেজা। শওকত উঠে বসলো। বিপ্লব ওর পাশে বসলো। পিঠে হাত রাখলো।
— 'আমি সব শুনেছি শওকত। কারো অবস্থাই আমাদের চেয়ে ভালো নয়।'

শওকত বিপ্লবের মুখের দিকে তাকালো। অদ্ভুত এক হাসি ফুটে উঠলো বিপ্লবের ঠোঁটের ফাঁকে। বললো, 'আমাদের বাড়িটা পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে।'

শওকত আর্তস্বরে বললো, 'তোমার বাবা মা?'

বিপ্লব মাথা নাড়লো— 'কেউ বেঁচে নেই। বাবা মা দুজনেই পুজোর ঘরে ছিলেন।'

শওকত আর কোন কথা বলতে পারলো না। দুজন চুপচাপ বসে রইলো।

কে কাকে সান্ত্বনা দেবে? সময় গড়িয়ে চললো। বহুক্ষণ পর বিপ্লব বললো, 'কি করবে কিছু ঠিক করেছো?'

শূন্য দৃষ্টিতে বিপ্লবের দিকে তাকালো শওকত— 'কী করবো!'

'এখানে থাকা তো সম্ভব নয় শওকত।'

'কোথায় যাবো?'

'যেখানে নিরাপদ।' অদ্ভুত এক প্রত্যয়ের সঙ্গে নিরাপদ শব্দটা উচ্চারণ করলো বিপ্লব।

'কোথায় নিরাপদ?'

'এ মুহূর্তে যুদ্ধক্ষেত্রে।'

শওকত চোখ তুলে তাকালো।

'নিরাপদ পৃথিবীর কোন জায়গাই নয়।' শান্ত গলায় বিপ্লব বললো, 'মানুষের নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনতে হবে। এর জন্যই যুদ্ধ করতে হবে।'

শওকত অসহায় গলায় বললো, 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না বিপ্লব। কী করবো কিছুই ভাবতে পারছি না।'

'তুমি আমার সঙ্গে থাকবে।' বিপ্লব গভীর স্বরে কথাগুলো উচ্চারণ করলো।

শওকত কোন কথা বললো না। বিপ্লবের হাতে হাত রাখলো। কিছুক্ষণ পর বললো, 'ঢাকা থেকে কীভাবে বেরুবে?'

বিপ্লব বললো, 'কোনো রকমে বুড়িগঙ্গা পার হতে পারলে কিছুটা নিরাপদ। জিঞ্জিরা দিয়ে ধলেশ্বরী পার হয়ে বেরিয়ে চলে যাবো।'

শওকত চুপ করে রইলো। বিপ্লব বললো, 'কী ভাবছো শুকু?'

'মিনু যদি ফিরে আসে?'

বিপ্লব ম্লান হাসলো। 'বেঁচে আছে এটা এখনো ভাবছো কী করে! মিনু মরে গেছে। ওর মতো যাদের ধরে নিয়ে গেছে কেউ বেঁচে নেই।'

বিপ্লবের কথাগুলো শওকত বিশ্বাস করতে চাইলো না। বিড়বিড় করে বললো, 'মিনু বেঁচে আছে। ওকে বাঁচতে হবে।'

বিপ্লব বললো, 'কিছু বলছো শুকু?'

শওকত মাথা নাড়ালো— 'কিছু নয়।' একটু পরে বললো, 'কখন যাবে?'

বিপ্লব বললো, 'আমাদের এক্ষুণি বেরিয়ে পড়তে হবে। দেরি করলে কারফিউ শুরু হয়ে যাবে।'

শওকত ইতস্তত করলো— 'এভাবেই বেরুবো?'

বিপ্লব হাসলো— 'এভাবেই বেরুতে হবে শওকত। সবই তো রইলো। দু'একটা দরকারি জিনিস ছোট একটা ব্যাগে গুছিয়ে নাও। অনেকটা পথ যেতে হবে। বোঝা বাড়িয়ে কী লাভ!

শওকত উঠে দাঁড়ালো। ঘরে গিয়ে এয়ার ব্যাগটা খুঁজে বের করলো। কী নেবে! এ ঘরের যে কোন জিনিসের ভগ্নাবশেষ ওর প্রিয়, প্রত্যেকটা জিনিসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অসংখ্য স্মৃতি। বহুদিনের স্মৃতি। বিপ্লব তাড়া দিলো— 'কী হলো শওকত! কী নেবে নাও।'

বুক ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। কিছুই নেবে না শওকত। সকল স্মৃতি খণ্ডিত হয়ে পড়ে থাক এভাবে। আলনার ওপর থেকে কটা প্যান্ট শার্ট ব্যাগে ঢোকালো। আলমারি খুললো। ড্রয়ারে কিছু টাকা ছিলো, সেগুলো পকেটে নিলো। এক কোণে চোখে পড়লো ছবির এ্যালবাম। নামিয়ে আনলো। ওদের সকলের একসঙ্গে তোলা ছবিটা খুলে ব্যাগে রাখলো। চেইন টেনে ব্যাগ বন্ধ করে বললো, 'চলো।'

বিপ্লব বললো, 'আর কিছু নেবে?'

শওকত মাথা নাড়লো। বিপ্লব বললো, 'চলো।'

হলঘরে এলো ওরা। ঘর থেকে বেরোতে গিয়ে পেছন ফিরে তাকালো। চেয়ে দেখলো, যেখানে ওর মা বাবার রক্ত শুকিয়ে কালচে হয়ে আছে। বুকের ভেতর কান্নার উত্তাল ঢেউ। বিপ্লব আবার বললো, 'চলো শওকত।'

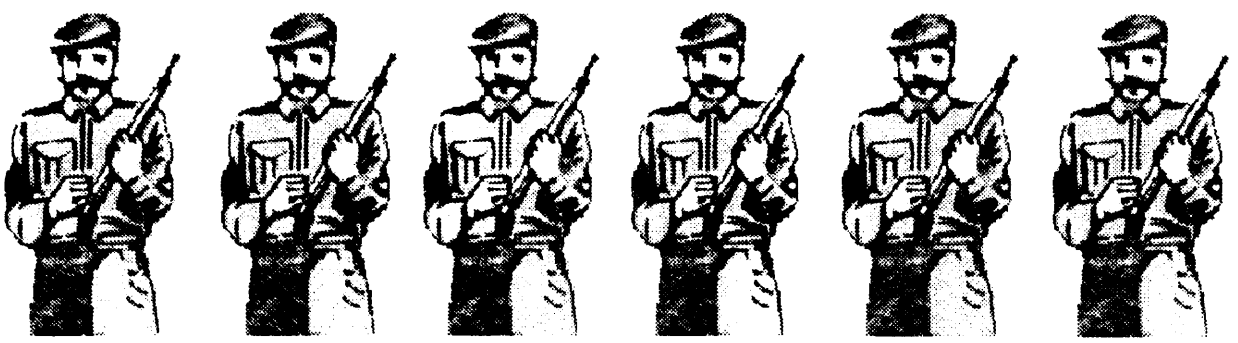

সদর দরজায় একটা তালা ঝুলিয়ে ওরা পথে নামলো। ঘড়িতে তখন দেড়টা বাজে। চারটা থেকে আবার কারফিউ। যারা পথে বেরিয়ে ছিলো ব্যস্ত ভয়ার্ত পায়ে ঘরে ফিরে যাচ্ছে। বেশির ভাগই ওদের মতো ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। সবাই একসঙ্গে হাঁটছে। দূর থেকে মিছিল মনে হয়। কেউ কারো সঙ্গে কথা বলছে না। মায়ের কোলে ছোট্ট ছেলেটাও কান্না ভুলে গেছে। সবার চোখে মুখে সীমাহীন আতঙ্কের ছায়া।

সেগুন বাগানের মোড়ে বাবুর সঙ্গে দেখা হলো শওকতের। প্রথম দেখলো বাবু, ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলো— 'তুমি বেঁচে আছো শওকত ভাই?'

শওকত ম্লান হাসলো— 'তোমরা কেমন আছো?'

বাবু বললো, 'এখনো বেঁচে আছি। তবে বাবলুর কথা জানি না। বেঁচে আছে কিনা তাও জানি না।'

শওকত বললো 'ও তো ক্যান্টনমেন্টে ছিলো?'

বাবু মাথা নাড়লো— 'ছিলো। এখন কোথায় জানি না। চোদ্দ তারিখে ওর সাথে শেষ দেখা হয়েছিলো।'

শওকত কোন কথা বললো না। বাবু ওদের সঙ্গে হাঁটলো। বললো, 'আমি তোমাদের বাড়ি গিয়েছিলাম।' শওকত কোন কথা বললো না। বাবু আবার বললো, 'কোথায় যাচ্ছো শওকত ভাই?'

শওকত বললো, 'জানি না।'

বাবু চমকে উঠলো। যতবার যতজনকে প্রশ্ন করেছে সবার কাছে একটাই উত্তর পেয়েছে— জানি না। কেউ জানে না ওরা কোথায় যাচ্ছে। কারণ সকলের মনে সংশয় গন্তব্যে ওরা পৌঁছতে পারবে কিনা। পাটকলের শ্রমিক বজুর বাপ থেকে শুরু করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যারয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের শেষ বছরের ছাত্র শওকত— কেউ জানে না ওরা কোথায় যাচ্ছে। অনেকক্ষণ ওরা চুপচাপ হাঁটলো। তারপর এক সময় শওকত বললো, 'তুমি আমাদের সঙ্গে কেন আসছো বাবু? ঘরে ফিরে যাও। কারফিউ শুরু হয়ে যাবে।'

ওরা দাঁড়ালো। বাবু কী যেন বলতে চাইলো। বার বার কথা কথাটা গলার কাছে আটকে গেলো। শওকত বললো, 'কিছু বলবে বাবু?'

বাবু মাথা নাড়লো। শওকত চেয়ে দেখলো বাবুকে। দুজনেই কিছু যেন বলতে চাইলো। বিপ্লব বললো, 'কোন কথা থাকলে বলে নাও শওকত। দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

শওকত আস্তে আস্তে বললো, 'ওরা মিনুকে ধরে নিয়ে গেছে। যদি কোনদিন ওকে খুঁজে পাও তোমাদের কাছে রেখো। ও আমার বড়ো আদরের বোন। কথা দাও বাবু, তুমি ওকে দেখবে?'

বলতে বলতে শওকতের গলা বুজে এলো। বাবুর দু'চোখ ঝাপসা হয়ে উঠলো। শওকতের হাত নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে বললো, 'আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে পারো শওকত ভাই। মিনুকে আমি খুঁজে বের করবোই।'

শওকত বললো, 'আমাকে তুমি বাঁচালে বাবু। ওর কথা ভেবে বার বার থমকে যাচ্ছিলাম। চলি ভাই। যদি বেঁচে থাকি, দেখা হবে!'

বাবু ম্লান হাসলো— 'দেখা হবে, যদি বেঁচে থাকি।'

শওকত আর বিপ্লব চলে গেলো। বাবু দাঁড়িয়ে রইলো বহুক্ষণ। ওরা মিছিলের সাথে এক হয়ে হাঁটছে। মিছিল চলছে শান্তির সন্ধানে। দূরে কৃষ্ণচূড়া গাছের আড়ালে রাস্তা মোড় নিয়েছে। বিধ্বস্ত কৃষ্ণচূড়ার সারি ওদের ঢেকে দিলো।

বাবু আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর বাড়ির পথে পা বাড়ালো।

বুড়িগঙ্গার তীরে এসে থমকে দাঁড়ালো শওকত আর বিপ্লব। সামনে এক অভাবনীয় দৃশ্য! নদীতে লঞ্চ নৌকো কিছুই নেই। তবু মানুষ পার হচ্ছে। দলে

দলে ওরা সাঁতার কেটে নদী পাড়ি দিচ্ছে। বিপুল বিস্ময়ে ওরা শুধু চেয়ে দেখলো। একের পর এক বিস্ময়ের মুহূর্তগুলো গড়িয়ে গেলো। সবাই সাঁতার কাটছে। যাদের অত দূরে সাঁতার কাটার শক্তি নেই, ওরা অসহায় ভঙ্গিতে নদীর তীরে বসে পড়ছে। ওদের হু হু কান্না নদী হয়ে যাচ্ছে।

শওকত আর বিপ্লবের সে ভয় নেই। বিপ্লব বললো, 'নেমে পড়ো। দাঁড়িয়ে থেকে কি লাভ!'

বিপ্লবের দিকে তাকালো শওকত। বিপ্লবের হাতের ব্যাণ্ডেজ এখনো খোলা হয়নি। বললো, 'পারবে বিপ্লব?'

বিপ্লব ম্লান হাসলো— 'পারতে হবে।'

ব্যাগটাকে পিঠে বেঁধে ওরা দুজন নেমে পড়লো নদীতে। পুরো পঁচিশ মিনিট সাঁতার কাটার পর ওরা তীরের মাটি স্পর্শ করলো। মাঝ নদীতে স্রোতের বেশ টান। দুজনেই ক্লান্ত। ভেজা কাপড় বদলে ওরা বিশ্রাম নেয়ার জন্যে তীরের কাশ বনের ধারে বসে পড়লো।

হঠাৎ মাঝ নদীতে চিৎকার শুনে ওরা চমকে উঠলো। তাকিয়ে দেখলো একটা মেয়ের পিঠে বাঁধা এক বছরের একটা বাচ্চা। হাতের কাছে আট-ন বছরের একটা ছেলে। ছেলেটা মার সঙ্গে সাঁতার কেটে আসছিলো। মাঝ নদীর স্রোতের টান সামলাতে পারে নি। হাবুডুবু খাচ্ছে ছেলেটা। মেয়েটা ধরতে গেলো ছেলেটাকে। স্রোতের টানে দুজনই পুবদিকে সরে যাচ্ছে। ছেলেটা দু'হাতে জাপটে ধরলো মেয়েটাকে। এবার ওরা তিনজনই ডোবার পথে। বার দুই ডুবে আবার ওরা আলাদাভাবে ভেসে উঠলো। স্রোতের টানে ছেলেটা আরো দূরে সরে যাচ্ছে। একবার ডুবছে, একবার ভাসছে। একটা আর্ত চিৎকার শোনা গেলো ছেলেটার গলায়— 'মাগো।'

চিৎকার করে উঠলো মেয়েটা— 'আমার বাজান রে!' ডুবতে ডুবতে মেয়েটা ছেলেটার কাছে যেতে চেষ্টা করলো। আরো কয়েকজন ওদের দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। স্রোতের তোড়ে কেউ কাছাকাছি হতে পারছে না। শেষবারের মতো একটা আর্ত চিৎকার শোনা গেলো। — 'মা!'

নদীর তীরে ঢেউয়ের সঙ্গে আছড়ে পড়লো সেই চিৎকার। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটার আর্তনাদ— 'না।'

তারপর ওরা তিনজনই স্রোতের আবর্তে তলিয়ে গেলো।

পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে বসেছিলো বিপ্লব আর শওকত। মাথার ওপর প্লেনের শব্দ শুনে ওদের চমক ভাঙলো। চেয়ে দেখলো, দুটো স্যাবর জেট চক্রাকারে উড়ছে। আরো নিচে দিয়ে উড়ছে দুটো হেলিকপ্টার।

বিপ্লব বললো, 'শওকত উঠে এসো। মনে হচ্ছে এয়ার রেইড হতে পারে।'

প্লেনের শব্দ এক নিদারুণ আতঙ্ক ছড়িয়ে দিলো নদীর দুই তীরে। আতঙ্কগ্রস্ত

লোকগুলো ছুটোছুটি করতে লাগলো। জায়গাটা একেবারে ফাঁকা। সবাই বাজারের দিকে ছুটলো। সেখানে আরেক দৃশ্য। কম করে হলেও হাজার পাঁচেক লোক জড়ো হয়েছে বাজারে। প্রায় সবাই শহর থেকে এসে এখানে আশ্রয় নিয়েছে। বিপ্লব বললো, 'রাতটা এখানেই কাটাতে হবে। কাল ভোরে উঠে আবার হাঁটবো। আজ বড়ো ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।'

শওকতেরও হাঁটার ইচ্ছে ছিলো না। শরীর তার এমনিতেই দুর্বল। সাঁতার কাটার পর সারা শরীর ক্লান্তিতে ভেঙে পড়তে চাইছে। একটা টিনের চালার নিচে বসে পড়লো। বিপ্লব ঘুরে ঘুরে কোত্থেকে মুড়ি আর গুড় নিয়ে এলো। বললো, 'অন্য কোন খাবার নেই। এগুলো অনেক কষ্টে যোগাড় করেছি।'

দুজনেরই অসম্ভব ক্ষিদে পেয়েছিলো। শুকনো সেই মুড়িগুলো গোগ্রাসে গিলে খেলো ওরা। টিউবঅয়েলে গিয়ে পেট ভরে পানি খেলো। তারপর আবার আগের জায়গায় গিয়ে বসলো।

হেলিকপ্টার দুটো তখন থেকেই খুব নিচু হয়ে ঘুরছিলো। বাজারে সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। বিপ্লব বললো, 'হয়তো ওরা মুক্তিবাহিনীর ঘাঁটি খুঁজছে।

শওকত বললো, 'বম্বিং করতে পারে।'

'স্যাবর জেটগুলোকে তো দেখছি না।' বিপ্লব বললো, 'হেলিকপ্টার দিয়ে কিভাবে বম্বিং করবে?'

শওকত চুপ করে বসে রইলো। সন্ধ্যে নাগাদ একটানা উড়লো হেলিকপ্টার দুটো। তারপর শহরের দিকে চলে গেলো। তখনও শহর থেকে দলে দলে সবাই নদী পার হচ্ছে। যারা বাড়তি কাপড় আনতে পারেনি ভেজা কাপড়েই গুটিসুটি মেরে বসে পড়েছে।

প্লেনগুলো যে অকারণে ওড়েনি কিছুক্ষণ পরই সেটা বোঝা গেলো। সন্ধ্যের আলোটুকু তখনো পশ্চিমের আকাশে কিছুটা লেগেছিলো। দূরে নদী দেখা যাচ্ছে। আগের মতো না হলেও এখনো কেউ কেউ সাঁতার কেটে নদী পার হচ্ছে। যারা বাজারে বসেছিলো ওদের কিছুটা নিশ্চিন্ত মনে হচ্ছিলো। সকলের ধারণা সৈন্যরা নদী পার হবে না।

বিদ্যুৎ চমকানোর মতো এক ঝলক আলোর সঙ্গে সঙ্গে ওদের সকল স্বস্তির ধারণা মিথ্যে হয়ে গেলো! প্রচণ্ড শব্দে কামান গর্জে উঠলো। সারা মাটি থরথর করে কেঁপে উঠলো। গোলাটা কোথায় পড়লো কেউ বুঝতে পারলো না। তারপরই শুরু হলো গর্জনের পর গর্জন। বিদ্যুতের মতো আলো আকাশ ঝলসে দিলো। প্রতিটি গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি ঘর সব থরথর করে কাঁপতে লাগলো।

দিশেহারা হয়ে সবাই ছুটোছুটি শুরু করে দিলো। ছোট ছেলেমেয়েদের কান্না, নদীর তীরে মরণ আর্তনাদ মুহূর্তের ভেতর জিঞ্জিরার শান্ত পরিবেশ ভয়াবহ শব্দে ভরিয়ে দিলো।

অল্প দূরে ভীষণ শব্দে একটা মর্টারের গোলা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লব আর শওকত মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছিলো। বাজারের একপাশে দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো। অসংখ্য মানুষের আর্তনাদে বাতাস ভারি হলো।

ওরা দুজন ছুটলো নদীর তীর ঘেঁষে। মেশিনগান থেকে অবিরাম গুলিবৃষ্টি হচ্ছে। একটানা ধাতব শব্দ কানে তালা লাগিয়ে দেয়।

বোঝা গেলো বাজারটাই আক্রমণের লক্ষ্য। বাজারটাকে পেছনে ফেলে ওরা দুজন সোজা দক্ষিণে ছুটলো। এখানে সেখানে গোলা ফাটছে। আগুন জ্বলছে। আশেপাশে লোকগুলো গুলি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে যাচ্ছে। কেউ কামানের গোলায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। সব কিছু মিলিয়ে এক ভয়াবহ যুদ্ধক্ষেত্র। ব্যতিক্রম শুধু এখানে কোন বাধা নেই, কোন প্রতিরোধ নেই। একপক্ষ আধুনিক মারণাস্ত্রে সজ্জিত সুনিপুণ হত্যাকারী সৈন্য, অপর পক্ষ অসহায় কিছু মানুষ। যাদের ভেতর নারী আর শিশুর সংখ্যাই বেশি।

শওকত আর বিপ্লব প্রাণপণে ছুটছিলো। কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। বেশ কিছু দূর এগিয়ে গিয়েছিলো ওরা। হঠাৎ ওরা বাধা পেলো। সামনে থেকে গ্রামের লোকগুলো ছুটে আসছে ওদের দিকে। ওরা বললো, গ্রামে মিলিটারি ঢুকে পড়েছে। ঘরের ভেতর আগুন লাগিয়ে বেরিয়ে আসা লোকগুলোকে মেশিনগান দিয়ে গুলি করে মারছে।

শওকত আর বিপ্লব কান পেতে শুনলো সামনে আর্তনাদ, মেশিনগানের শব্দ। দাউদাউ করে গ্রামগুলো জ্বলছে।

পালাবার কোন পথ নেই। পেছনে মৃত্যু তাড়া করছে। সামনে এগিয়ে আসছে মৃত্যু। ওরা পাশের ধানক্ষেতে নামে পড়লো।

বিশাল ধানক্ষেত। এদিকে এখনো কামানোর গোলা পড়েনি। হাত দুয়েক উঁচু ধানগাছগুলো দু'পাশে সরিয়ে ওরা পুবদিকে যেতে লাগলো। এঁটেল কাদামাটিতে বার বার পা আটকে যাচ্ছিলো। বিপ্লব কয়েকবার হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো। শওকত ওকে টেনে তুললো। শেষে এক সময় বিপ্লব বললো, 'আমি আর পারছি না। শওকত, তুমি এগিয়ে যাও।'

এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ালো শওকত— 'তুমি কি ক্ষেপেছো বিপ্লব? এখানে থাকা মানে নির্ঘাৎ মরণ— বুঝতে পারছো না? আর একটু এগিয়ে চল ভাই।'

ধানক্ষেতের কাদামাটির ওপর বসে পড়লো বিপ্লব। ভারী বুলেটগুলো বাতাস কেটে তীব্র শিস দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। দু'একটা গোলা ছিটকে এসে পেছনের ধানক্ষেতেও পড়ছিলো। প্রচণ্ড শব্দে কানের পর্দা ফেটে যেতে চাইছে! অসংখ্য মানুষের আর্তনাদ চারপাশের বাতাসে জমাট বেঁধে আছে। শওকত মরিয়া হয়ে বললো, 'তোমাকে আমি এভাবে রেখে যেতে পারি না বিপ্লব। আমার হাত ধরো। নদীর ধারে কোন লোকালয় নেই। এই সামান্য পথটুকু পেরুতেই হবে।'

বিপ্লব করুণ হাসলো। ওদের কাছেই গোলা পড়লো। বিপ্লবকে জড়িয়ে কাদার ভেতর উপুড় হয়ে পড়লো শওকত। বিপ্লব বললো, 'আমার জন্যে এটাই নিরাপদ।'

বারুদের গন্ধ ভাসছে বাতাসে। রক্তের গন্ধ পাচ্ছে শওকত। বিপ্লব আবার বললো, 'পৃথিবীর কোথাও কি তুমি এ মুহূর্তে এতটুকু নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে পাবে শওকত?'

শওকত চমকে উঠলো। যেন কথাগুলো বিপ্লবের নয়, বহু দূর থেকে ভেসে আসছে— 'পৃথিবীর কোথাও কি এতটুকু নিরাপদ আশ্রয় আছে?' শওকত কেঁপে উঠলো।

অস্পষ্ট স্বরে বিপ্লব বললো, 'ভিয়েৎনাম, লাওস, কম্বোডিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা, প্যালেস্টাইন, বাংলাদেশ।'

বিপ্লবের মাথাটা কোলে তুলে নিলো শওকত। অস্পষ্ট শব্দগুলো শওকতের বুকের ভেতর গেঁথে গেলো— 'তবু ভালো এই বাংলাদেশ। এদেশের মাটি, এদেশের আকাশ, এদেশের জল।'

শেষের দিকে বিপ্লবের কথাগুলো আরো জড়িয়ে গেলো। শওকত ডাকলো— 'বিপ্লব?'

আকাশে আলোর হাউই জ্বললো। ফসফরাস বোমার তীব্র আলোর ছটায় আলোময় হয়ে উঠলো সবকিছু। শওকত দেখলো, রক্তে ভেসে যাচ্ছে বিপ্লবের সারা শরীর। ওর গায়েও রক্তের দাগ। চোখ দুটো পরম শান্তিতে বুজে আছে। মুহূর্তের জন্যে পাথর হয়ে গেলো শওকত। বিপ্লবের বুকে গুলি লেগেছে।

প্রচণ্ড শব্দে বোমা ফাটলো। এবার আরো কাছে। বুকের ভেতর ভীষণ যন্ত্রণা অনুভব করলো শওকত। চোখ দুটো জ্বালা করতে লাগলো। শূন্যতা আর সেই সঙ্গে ব্যর্থতার জ্বালা ওকে ক্ষত-বিক্ষত করতে লাগলো।

বিপ্লবের মাথাটা তখনো ওর কোলে। নিশ্চল বসে রইলো। শওকতের তখন অন্য কোন বোধ নেই। মর্টার আর মেশিনগানের তীক্ষ্ণ শব্দ ওর কাছে ক্রমশঃ অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। হাউই-এর তীব্র আলোয় সব কিছু ঝাপসা দেখছে। দু'পাশে ছপ ছপ পায়ের শব্দ। দিশেহারা মানুষ ধানক্ষেতে নেমে পড়েছে।

একটু পরেই মানুষের ভিড় শওকতকে ঢেকে দিলো। কে যেন তার কাঁধে হাত রাখলো। তাকিয়ে দেখলো। অন্ধকারে ভালো দেখতে পেলো না। মনে হলো ওরই মতো একজন। অচেনা গলায় বললো, 'এখানে এভাবে বসে কেন ভাই। ওরা যে এদিকে আসছে।'

শওকত কোন কথা বললো না। অপরিচিত কণ্ঠস্বর আবার বললো, 'তুমি এভাবে কেন মরবে? সবাইকে বাঁচতে হবে। এসো ভাই। উঠে এসো।'

অচেনা কণ্ঠস্বর ওকে সম্মোহিত করলো। উঠে দাঁড়ালো শওকত। বললো, 'আপনি কে?'

অচেনা কণ্ঠ উচ্চারণ করল, 'বিপ্লব।'

অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলো শওকত— 'কী বললে?'

'বিপ্লব।' আবার সেই কণ্ঠস্বর— 'চমকালে কেন?'

শওকত এলোমেলো ভাবে বললো— 'আমার বন্ধু বিপ্লব। এইমাত্র বিপ্লব যে মরে গেলো।'

'না।' চমকে উঠলো শওকত।

'বিপ্লব মরেনি। তোমার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। এসো আমার সঙ্গে।'

শওকত আচ্ছন্নের মতো বিপ্লব নামের অচেনা লোকটির হাত ধরে এগিয়ে চললো।

সে বললো— 'বিপ্লবের মৃত্যু নেই!'

শওকত এবার আর চমকালো না! ও কিছুই ভাবতে পারছিলো না। অচেনা বিপ্লবের হাত ধরে শুধু হেঁটে চললো।

বিশাল ধানক্ষেত পেরিয়ে গ্রামের মেঠোপথ। মেশিনগানের শব্দ আর শোনা যাচ্ছে না। কয়েকটা কুঁড়েঘরে প্রদীপের আলো দেখা যাচ্ছে। ঝিঁঝি পোকা ডেকে চলেছে একটানা। কোথাও তক্ষক ডাকছে। আকাশে তারার আলো। শওকত বললো, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

বিপ্লব হাসলো। আবৃত্তির সুরে বললো, 'কৃষক মজুর! আজকে তোমার পাশাপাশি/অভিন্ন দল আমরা। বন্ধু আগে চল— সবাই আমরা নিজবাসভূমে পরবাসী।'

শওকত বিস্মিত হলো। অচেনা বিপ্লবের সমস্ত আচরণই ওর কাছে অদ্ভুত মনে হচ্ছিলো। সারা পথ সে গুনগুন করে কবিতা আবৃত্তি করছিলো। শওকত প্রশ্ন করলো 'আপনি কি কবি?'

'না।' বিপ্লব হাসলো— 'কবিতা ভালোবাসি।'

শওকতের হাত তখনো বিপ্লবের হাতের মুঠোয়। ওরা দুজন এগিয়ে চললো মেঠো পথ ধরে। মেশিনগানের অবিরাম শব্দ, নদীতে অসহায় মায়ের মুখ, কতগুলো আর্তনাদ, দাউ দাউ আগুন, বিপ্লবের রক্তমাখা শরীর, প্রতিটি দৃশ্য কখনো বিচ্ছিন্নভাবে কখনো অবিচ্ছিন্ন হয়ে ওর চোখের সামনে ঘুরতে লাগলো। তারপর দৃশ্যগুলো আরো গাঢ় হয়ে চেতনার গভীরে প্রবেশ করলো। রক্তের ভেতর তোলপাড় তুললো। মুঠোর ভেতর বিপ্লবের হাত চেপে ধরলো। পরম নির্ভরতা খুঁজে পেলো সেই হাতে।

বিপ্লবের মুখে অস্পষ্ট হাসি। আপন মনে আবৃত্তি করে করে চলেছে— 'শরীরে সঙ্গীন ফোটে/রক্তের ফোয়ারা ছোটে/আকাশের নিচে ওঠে

প্রতিধ্বনি/'এদেশ আমার।' শয়তানের দম্ভ ভাঙে;/দিকে দিকে শাসানো তর্জনী/দুর্জয় প্রাকার।'

আকাশের কোণে এক টুকরো ভাঙা চাঁদ ঝুলছে। পথের দু'পাশে বন্ধ ডোবা, গাছের পাতা, খড়ের ছাউনি, চকচক করছে সেই আবছা ঠাণ্ডা রুপোলি আলোয়। বিপ্লবের হাতে হাত রেখে শওকত এগিয়ে চললো এক অচেনা গন্তব্যে।

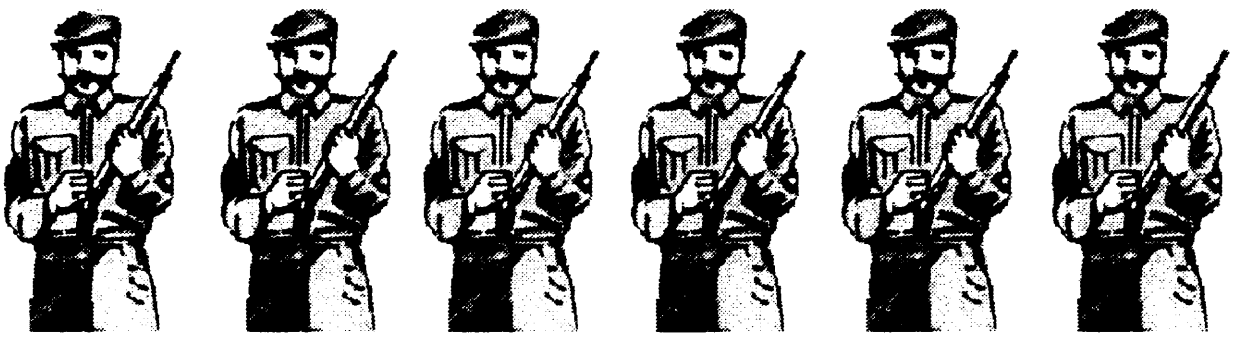

ক্যান্টনমেন্টে বাবলুদের দিনগুলো এক অস্থির উত্তেজনার ভেতর কাটছিলো। এখন আর শহরে অবিরাম রাইফেল অথবা মেশিনগানের গর্জন শোনা যায় না। তবে আর্মি এয়ারপোর্ট থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে প্লেন উড়ে যায়। সবগুলো স্যাবর জেট আর বম্বার। বুঝতে এতটুকু অসুবিধে হয় না— কোন স্নিগ্ধ গ্রাম অথবা শান্ত শহর এ মুহূর্তে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হচ্ছে। প্রতিদিন একই নিয়মে ধ্বংসের কাজগুলো সম্পন্ন হয়।

লরি ড্রাইভার কেরামত আলী, হাবিলদার মেজর সুলতান আহমেদকে খবর দিয়েছে রশিদ আর শফি মধুপুরের গড়ে আছে। সেদিন জয়দেবপুর থেকে যাবার পথে ওরা একটা পুল উড়িয়ে দিয়েছে। ময়মনসিংহের পথে দুই লরি পাঞ্জাবি সৈন্য শেষ করেছে। তার পর ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে মধুপুরের গড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। ওরা খবর পাঠিয়েছে— ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের এরা যেভাবে পারে যেন পালাবার বন্দোবস্ত করে।

প্রথম দলের ব্যর্থতার পর একটা মাত্র দল গতরাতে আগের মতো বেরিয়ে গেছে। কোন গুলির শব্দ বাবলুরা শুনতে পায়নি। তবে ড্রাইভার কেরামতের খবরটা ভয় পাইয়ে দিয়েছে। সাভার থেকে ফিরছিলো। দশটা ছেলেকে দেখেছে চোখে কালো কাপড় বেঁধে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

'ওরা আমাদের ছেলে?' বুড়ো হাবিলদার মেজর ভালো করে যাচাই করে নিয়েছেন— 'তুমি কি করে বুঝলে কেরামত, ওরা যে আমাদের ছেলে?'

কেরামত জবাব দিয়েছে— 'ওদের চুল কাটার ধরন দেখে বুঝেছি আমাদের ছেলে। কয়েকটা মুখ এখানে আগেও দেখেছি বলে মনে হলো।'

হাবিলদার মেজর আর কোন কথা বলেননি। সকাল থেকে তাঁকে বড়ো বেশি বিষণ্ন মনে হচ্ছিলো। দুপুরে ক্যাপ্টেন করিম তাঁকে ডেকেছিলেন। প্যারেড

গ্রাউন্ডে পায়চারি করছিলেন ক্যাপ্টেন। কাছে ডেকে খুব আস্তে করে বললেন, 'আমাদের নতুন ছেলেরা কিছু কিছু পালাচ্ছে, সে সম্পর্কে কিছু জানেন?' শুনে বুড়ো হাবিলদার মেজর প্রথমটায় চমকে উঠেছিলেন। ব্যাপারটা ক্যাপ্টেন জানলেন কী করে? ভালো করে তাকিয়ে দেখলেন ক্যাপ্টেনকে। মুখটা কেমন যেন ম্লান আর ফ্যাকাশে। একবার মনে হচ্ছে কোন ফাঁদ নয়তো? মুহূর্তের ভেতর নিজেকে সামলে নিলেন হাবিলদার মেজর। উদাস স্বরে বললেন, 'আমি ভেবেছিলাম আপনি বোধ হয় ঘটনাটা জানেন।'

ক্যাপ্টেনের গলার স্বর বড় বেশি করুণ শোনালো। কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে কি যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, 'রাতে খাবার সময় আমার সাথে একবার দেখা করার চেষ্টা করবেন। সম্ভব হলে নতুন ছেলেদের ভেতর থেকে দু'একজনকে সঙ্গে আনবেন।'

বুড়ো ভালো করে জরিপ করলেন ক্যাপ্টেনকে— 'খুব গোপন কিছু কি?'

ক্যাপ্টেন একটু থতিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, মানে— খুব গুরুতর কিছু নয়। তবু একটু সাবধানেই আসবেন।'

আর কোনো কথা বলেননি ক্যাপ্টেন। হাত দুটো পকেটে গুঁজে কী যেন ভাবতে ভাবতে চলে গেলেন। কটা পাঞ্জাবি সৈন্য হল্লা করতে করতে ক্যাপ্টেনের পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেলো। ওরা কেউ ক্যাপ্টেনকে সেল্যুট দিলো না। বরং পেছনে এসে ক্যাপ্টেনকে দেখিয়ে কি যেন ইঙ্গিত করলো। ক্যাপ্টেন আগের মতো মাথা নিচু করে চলে গেলেন। দূর থেকে হাবিলদার মেজর সবই দেখতে পেলেন।

আজকাল কোনো বাঙালি অফিসারকেই সম্মান দেখানো হয় না। ওঁদের শুনিয়ে শুনিয়েই সাধারণ সৈন্যগুলো আজে বাজে মন্তব্য করে। সামরিক বাহিনীর অফিসারদের জন্য এটা যে কতখানি মর্মান্তিক ঘটনা, যাঁরা জানেন শুধু তাঁরাই বুঝতে পারবেন। নতুন অর্ডার এসেছে, কমিশন আর নন-কমিশন র‍্যাঙ্কে যত বাঙালি অফিসার আছেন, তাঁরা যেন তৈরি থাকেন। চব্বিশ ঘন্টার নোটিসে তাঁদের ওয়েস্ট পাকিস্তান পাঠানো হবে। কয়েকজনকে এর ভেতরই পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। ক্যান্টনমেন্টের কোয়ার্টারে সুলতান আহমেদের স্ত্রী আর ছেলে মেয়েরা রয়েছে। ওদের কি করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। কোম্পানি কমান্ডার ক্যাপ্টেন আফতাব গুলকে গিয়ে বলেছিলেন, 'একদিনের ছুটি পেলে ওদের গ্রামের বাড়িতে রেখে আসতে পারি।'

তরুণ পাঞ্জাবি অফিসার আফতাব গুল মুখের ওপর জবাব ছুঁড়ে মেরেছে— 'একঘন্টার ছুটিও নয়।'

বুড়ো সেই থেকে ভীষণ উদ্বিগ্ন। ক্যাপ্টেন করিম ওদের চর হয়ে কাজ করছে না তো? সেদিন পর্যন্ত সে ক্যাপ্টেন দম্ভ করে বলতেন, 'পাকিস্তান এক থাকবেই।

পাকিস্তানকে ভাঙার চেষ্টা আমরা কিছুতেই সহ্য করবো না' — তাঁর এ ধরনের পরিবর্তন একটু অস্বাভাবিক বৈকি! তবু হাবিলদার মেজর ভাবতে চেষ্টা করলেন, তখনকার সময় আর এখনকার সময়ের ভেতর অনেক ব্যবধান। সময় এবং পরিস্থিতি মানুষের পরিবর্তন ঘটায়, বিশ্বাস পাল্টে দেয়। ক্যাপ্টেন এখন যে অবস্থায় আছেন, পাকিস্তানের স্বপ্ন সেখানে সম্পূর্ণ অবাস্তব। পুরো ব্যাপারটা বাবলু হাবিলদার মেজরের কাছে শুনলো। শুনে ও নিজেও কিছুটা অবাক হয়েছিলো। বুড়ো বললেন, 'দেখা যাক কী হয়। রাতে তৈরি থেকো। তোমাকেই নিয়ে যাবো।'

অসম্ভব অস্থিরতার ভেতর দিয়ে সময়গুলো কাটছিলো। বার বার বাবলুর মনে হচ্ছিলো, একটা কিছু করা দরকার। হাবিলদার মেজরকে ও সুইসাইডাল স্কোয়াড করার কথাও বলছিলো। তিনি ভীষণ আপত্তি করেছেন। বলেছেন, 'এ সময়ে মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করতে হবে। ঝোঁকের মাথায় কিছু করতে যেও না।'

উত্তেজনা বাইরে প্রকাশ না করলেও বুকের ভেতর ঝড় তুলছিলো। শুধু অস্থিরতা। একটা দেশ। দেশের মানুষ। মানুষের অধিকার। অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ। প্রতিটি শাণিত সত্য তার অসহায়তাকে রক্তাক্ত করছিলো। বার বার ঘুরে ফিরে একটা প্রতিজ্ঞায় বাবলু স্থির হলো— 'এদেশের স্বাধীনতার জন্যে সবাইকে যুদ্ধ করতে হবে।'

রাতে ও হাবিলদার মেজরের সাথে ক্যাপ্টেনের কোয়ার্টারে গেলো। ক্যাপ্টেন ওদের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছিলেন। কীভাবে কথাটা শুরু করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর ক্যাপ্টেন বললেন, 'আমাদের কয়েকজন অফিসার বেরিয়ে গেছেন।'

হাবিলদার মেজর প্রশ্ন করলেন, 'আমাদের অফিসার মানে?'

ক্যাপ্টেন স্থির দৃষ্টিতে বুড়োর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সেকেন্ড ইস্ট বেঙ্গলের কয়েকজন অফিসার ছিলেন। পঁচিশ তারিখ রাতেই ওঁরা সবাই বেরিয়ে গেছেন।'

হাবিলদার মেজর মাথা নাড়লেন, — 'আমি জানি।'

ক্যাপ্টেন বললেন, 'আমি একজন লেফট্যানেন্ট-এর ম্যাসেজ পেয়েছি। ওয়েস্ট পাকিস্তানে আমাদের কোন অবস্থাতেই যাওয়া যাবে না। এখানেই থাকতে হবে। যদি এর ভেতর নোটিস এসে যায়, তাহলে পালাবার চেষ্টা করতে হবে।'

হাবিলদার মেজর বললেন, 'এখানে থাকা আর বেরুবার চেষ্টা দুটোই সমান বিপদজনক। আমাদের ছেলেরা দুবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে।'

ক্যাপ্টেন ভুরু কুঁচকে বললেন, 'আমি জানি, তবে ওদের ওভাবে প্ল্যান করে যাবার চেষ্টা করা ঠিক হয়নি। তাছাড়া রাতে পালাতে গিয়ে বেশি বোকামি হয়েছে।'

হাবিলদার মেজর বিস্মিত হলেন— 'অন্য কোন পথ ছিলো না স্যার!'

ক্যাপ্টেন মাথা নাড়লেন— 'ভুল করছেন। এখান থেকে বেরুতে হবে দিনে। ওদের নাকের ডগা দিয়ে। আর ওভাবে দল বেঁধে নয়। যে যখন সুযোগ পাবে তখনই বেরিয়ে পড়বে।'

বুড়োর বিস্ময় আরো বেড়ে গেলো— 'আপনি কি এ সম্পর্কে কিছু ভেবেছেন।'

'ভেবেছি।' ক্যাপ্টেন ধীরে ধীরে বললেন, 'আপনাদের লক্ষ্য করা উচিত ছিলো রাতে ক্যান্টনমেন্টের পাহারাটা অনেক বেশি হয়। দিনে শুধু চেকপোস্ট রয়েছে কয়েকটা। রাতের মতো দিনে অসংখ্য গার্ড পজিশন নিয়ে বসে থাকে না। দিনে ওদের অতখানি সতর্কতার দরকার নেই।'

মেজর বললেন, 'কিন্তু চেকপোস্ট তো রয়েছে, বেরুবে কীভাবে?'

ক্যাপ্টেন মাথা নাড়লেন— 'তাই বলছি। মন দিয়ে শুনুন। কয়েক দিন ধরে আমি লক্ষ্য করেছি ক্যান্টনমেন্টে কারা নিয়মিত যাতায়াত করে। বাঙালি সিভিলিয়ান যারা ছিলো, তারা কেউ এখন নেই। অবাঙালিরা আছে। ওদের পরিচিতরা যাওয়া-আসা করে নিয়মিত। আর আসে ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের লোকজন। ওদের চেকিং হয় ঢোকার সময়। বেরুবার সময় অতটা লক্ষ্য করা হয় না। আমার মনে হয় ছেলেরা যদি ওদের ভেতর কোন রকমে ঢুকে যেতে পারে তাহলে বেরুতে অসুবিধে হবে না।'

বুড়ো হাবিলদার মেজরকে যথেষ্ট চিন্তিত মনে হলো— 'ওদের ভেতর সবাই কি বিশ্বাসযোগ্য হবে?'

ক্যাপ্টেন বললেন, 'হয়তো হবে না। তবু বিশ্বাস করতে হবে। একজনের সঙ্গে আমি আলাপ করেছি। নির্ভরযোগ্য মনে হলো। বললো, সাধ্যমতো যা কিছু করার করবে।'

বুড়ো বললেন, 'খুবই রিস্কের ব্যাপার!'

বাবলু এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিলো। ভেবে দেখলো ক্যাপ্টেনের প্রস্তাব মন্দ নয়। বললো, 'এটুকু ঝুঁকি না নিলে কোন দিনই আমরা এখান থেকে বেরুতে পারবো না।'

ক্যাপ্টেন ওর পিঠে হাত রাখলেন— 'ঠিক বলেছো। এ ঝুঁকিটুকু নিতে হবে। সকাল দশটায় কাশ্মীর পয়েন্টে থেকো, ইলেকট্রিক সাপ্লায়ের লোকেরা ওই পথ দিয়েই যাবে।'

সুলতান আহমেদ মাথা নেড়ে সায় জানালেন। ক্যাপ্টেন বললেন, 'আপনারা তাহলে আসুন। ওই কথাই রইলো। কাল দশটা।'

ক্যাপ্টেনের কোয়ার্টার থেকে ওরা বেরিয়ে এলো। একটু উত্তেজিত মনে হলো বাবলুকে। বললো, 'আমি যাচ্ছি তাহলে!'

মাথা নেড়ে সায় জানালেন হাবিলদার মেজর— 'তুমিই যাও। প্রথমে একটা

বিভ্রাট বাঁধলে অন্য সবাই নার্ভাস হয়ে পড়বে। আমি মনে করি তুমি ঠিকমতো যেতে পারবে।'

বাবলু বললো, 'অন্য সবার সাথে কিভাবে যোগাযোগ করবো?'

হাবিলদার মেজর একটু ভেবে বললেন, 'তুমি নরসিংদী চলে যেও। ড্রাইভার কেরামত মিথ্যে খবর দেবে না। সেখানে তুমি ক্যাপ্টেন সামাদের দেখা পাবে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন বুড়ো হাবিলদার মেজর। কি যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, 'একটা খবর পাঠাবার চেষ্টা করো।'

এরপর তাঁর সঙ্গে বাবলুর আর কোন কথা হয়নি। হাসানকে শুধু শোবার আগে বললো, 'আমি কাল যাচ্ছি। যত তাড়াতাড়ি পারো বেরিয়ে এসো।'

সকালে বাবলু লুঙ্গি আর গেঞ্জি পরে, কাঁধে তোয়ালে ফেলে কাশ্মীর পয়েন্ট চলে গেলো। ব্যারাকের পাহারাদার সৈন্যরা মনে করলো পুকুরে যাচ্ছে। অনেকেই যায়। কেউ কিছু বললে বাবলু তাই জবাব দিতো। কিছুটা উত্তেজনা অবশ্যই অনুভব করছিলো। তবে মুখে তার প্রকাশ নেই।

সাপ্লাইয়ের লোকদের সঙ্গে দেখা হলো বাবলুর। সব মিলিয়ে পনেরো জন। কারো হাতে ব্যাগ, কারো কাঁধে মই। ওদের সঙ্গে পথ চলতে চলতে বাবলু এক সময়ে ভেতরে ঢুকে গেলো, কেউ খুব একটা লক্ষ্য করলো না। একজন বুড়ো শুধু পেছন থেকে সামনে এগিয়ে এলেন। বললেন, 'ক্যাপ্টেন করিম বুঝি তোমাকে পাঠিয়েছেন?'

বাবলু মাথা নাড়লো। দেখলো একজন সাধারণ মিস্ত্রি। বেশ বয়েস হয়েছে। গায়ের চাদরটা খুলে বললেন, 'এটা গায়ে জড়িয়ে নাও। আর আমার তারের কয়েলটাও নাও।'

তারের বোঝা কাঁধে ফেলে বাবলু একমনে হাঁটতে লাগলো। শেষ চেকপোস্ট পর্যন্ত প্রায় এক মাইল পথ। অফিসারদের কোয়ার্টারের কাছে ক্যাপ্টেন করিম দাঁড়িয়েছিলেন। বাবলুকে দেখে মুহূর্তের জন্য তার ঠোঁটের ফাঁকে হাসি ফুটে উঠলো। ইশারায় ওকে মাথাটা একটু নিচু করে যেতে বললেন। বড়ো বেশি ম্লান আর বিষণ্ন দেখাচ্ছিলো ক্যাপ্টেনকে।

বাবলু তাঁর আসল দ্বন্দ্বটা বুঝতে পারলো। তবু ভালো ক্যাপ্টেন তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছেন।

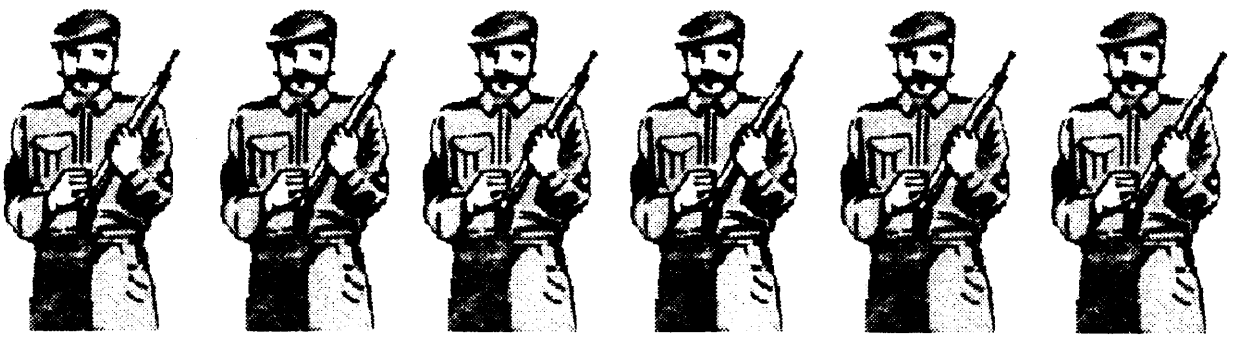

বাবলু যখন এলো বাবু তখন বাড়িতে ছিলো না। বাবা, ভাইয়া, ভাবী আর হিমি বারান্দায় বসেছিলো। হিমিই প্রথম দেখতে পেলো। চেঁচিয়ে উঠলো— 'দিদা, দেখ কে এসেছে।'

সবাই চমকে উঠলো। লুঙ্গি আর গেঞ্জি পরা বাবলু। খালি পা। হিমির দিকে তাকিয়ে বাবলু হাসলো। ভাইয়া বললো, 'কোত্থেকে এলি?'

বাবলু জবাব দিলো, 'ক্যান্টনমেন্ট থেকে।'

'বেরুলি কীভাবে?' ভাইয়ার গলায় অসম্ভব ব্যস্ততা।'

বাবলু একটু হাসলো— 'পালিয়ে এসেছি।'

'পালিয়ে এসেছিস, কীভাবে?'

বাবা বাধা দিলেন— 'এখানে এভাবে চেঁচিয়ে পাড়া মাত কোরো না। ঘরে যাও।'

হিমি বাবলুর হাত ধরলো। ওকে কোলে তুলে চুমু খেলো বাবলু। হিমির ভয় হচ্ছিলো ছোটকা এক্ষুণি হয়তো চলে যাবে। ভাইয়ার সঙ্গে ওরা ঘরে ঢুকলো। সব কথা খুলে বললো বাবলু। শুনে সবাই চুপ করে রইলো। শুধু হিমি বললো, 'তুমি আর কোথাও যেতে পারবে না। আমার কাছে থাকবে।'

বাবলু হিমিকে আদর করে বললো, 'কেন হিমি?'

হিমি বললো, 'আমার সাথে কেউ খেলে না। কাকু সারাদিন শুধু বাইরে থাকে। কারো সাথে কথা বলে না।'

বাবা কিছুক্ষণ পর ভাইয়াকে বললেন, 'এখানে থাকা ওর জন্যে আদৌ নিরাপদ নয়।'

ভাইয়া বললো, 'নিউ ইস্কাটনে আমার বন্ধু জাহাঙ্গীরদের বাড়ি গিয়ে থাকতে পারে।' ওর এই বন্ধুর বাবা একসময় মুসলিম লীগের মন্ত্রী ছিলো।

বাবলু চমকে উঠলো। এই ভয়টাই করছিলো সে। বাবা হয়তো তাকে যেতে দেবেন না। ভাইয়া ওকে প্রশ্ন করলো— 'বাবলু কি বলিস?'

বাবলু কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর শান্ত স্থির গলায় বললো, 'আমি এখানে কোথাও থাকতে পারবো না। যুদ্ধে যেতে হবে আমাকে।'

বাবা কোন কথা বললেন না। ভাইয়া একটু অবাক হলো— 'সে কী! তোর

যে এখনো ট্রেনিং শেষ হয়নি?'

আগের মতো শান্ত গলায় বাবলু বললো, 'আর্টিলারী ট্রেনিং আমাদের হয়ে গেছে। ভারী মেশিনগানও চালাতে জানি আমি। শুধু চালানো নয়, মেকানিজমও জানি। আমার মনে হয় এখনকার মতো এটাই যথেষ্ট।'

ভাইয়া বাবার দিকে তাকালো। বাবা কী যেন ভাবছিলেন। সবাই চুপ করে বসে রইলো। বাবা কিছুক্ষণ পর ধীরে ধীরে বললেন, 'আমার ছেলে স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ করবে এটা আমার জন্যে গর্বের কথা।'

এই বলে বাবা থামলেন। তারপর স্বাভাবিক গলায় বাবলুকে বললেন, 'তুই যাবি কীভাবে? ঢাকা থেকে বেরোতে গেলেই ধরা পড়ে যাবি। পালানোর সংবাদ তোর ছবি সুদ্ধো নিশ্চয়ই প্রত্যেকটা চেকপোস্টে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে। তোর চেহারা দেখে বোঝা যায় তুই আর্মিতে ছিলি। আর তাছাড়া কোন ঠিকানা না নিয়ে কোথায় যাবি? যুদ্ধ হচ্ছে বিক্ষিপ্তভাবে, আমার তো মনে হয় চট্টগ্রামও এরা দখল করে নিয়েছে।'

বাবলু উৎসাহের সঙ্গে বললো, 'ওদের সব খবরই আমার জানা আছে। আমি নরসিংদী যাব প্রথমে। ক্যাপ্টেন সামাদ আছেন ওখানে। ঢাকা থেকে বেরোনো এমন কোন কঠিন কাজ হবে না। বাঘের গুহা থেকে বেরিয়ে এসেছি। চেকপোস্ট দেখেই যাবো। আমার ওপর বিশ্বাস রাখতে পারো।'

বাবা বললেন, 'তোমাদের কাউকে নিয়ে ভয় করি না। ভয় শুধু বাবুকে নিয়ে। ছেলেটা দিন দিন যেন বদলে যাচ্ছে।'

ভাবী বললো, সেদিন বলছিলো ওর বন্ধুরা নাকি কেউ বেঁচে নেই।'

বাবলু বললো, 'ওসব ঠিক হয়ে যাবে। আমি ওর সঙ্গে কথা বলবো।'

বাবু এলো বিকেলে। ওর চোখে মুখে চাপা উত্তেজনা। বাবলুকে দেখে জড়িয়ে ধরলো— 'কখন এলি বাবলু? কীভাবে এলি?'

বাবলু হাসলো— 'দুপুরের অল্প আগে এসেছি। পালিয়ে এসেছি বুঝতেই পারছো।'

'কীভাবে পালালি তাই বল না?'

ভাইয়া আর ভাবী একটু অবাক হলো। সেদিনের পর থেকে বাবুকে এই প্রথম হাসতে দেখা গেলো। ওরা ভাবলো, বাবলুকে পেয়েই হয়তো ওর ভালো লাগছে। বাবলুকে নিয়ে বাবু ওর ঘরে গেলো। বললো, 'তোদের যুদ্ধের খবর বল বাবলু। আদৌ কিছু হচ্ছে কি?'

বাবলু বললো, 'জোর যুদ্ধ চলছে সবখানে। উত্তরবঙ্গের বিরাট একটা অঞ্চল আমাদের দখলে।'

'কিন্তু এভাবে কদিন চলবে বলতো?' বাবুকে একটু অধৈর্য মনে হলো।

বাবলু বললো, 'গেরিলা যুদ্ধে অনেক সময় দরকার। ভিয়েতনামে ক বছর

ধরে যুদ্ধ চলছে, হিসেব রাখো? ওসব পরে বলছি। তুমি কী করছো? তোমাদের লেখক সংগ্রাম শিবিরের খবর কি? কিছু করছো কি?'

বাবু বললো, 'সংগ্রাম শিবিরের পক্ষ থেকে আমাদের লেখক শিল্পী সবাই পৃথিবীর সকল দেশের বুদ্ধিজীবীদের কাছে আবেদন জানাবেন, আমাদের দেশে যে গণহত্যা হচ্ছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে আর স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্যে তাদের নিজ নিজ সরকারকে চাপ দিতে। এটা কোন খবরই নয়। আসল খবর শোন। আজ সেজদির সঙ্গে দেখা হয়েছিলো।'

বাবলু চমকে উঠলো। সেজদি গোপন কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী। সব সময় তাকে আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকতে হয়। বললো, 'কোথায় দেখা হলো? সেজদি বাইরে ঘোরাফেরা করছে কীভাবে?'

বাবু বললো, 'সেটাই তো বলছি। পুরানা পল্টন মোড়ে বোরখাপরা সেজদিকে দেখে আমিও অবাক হয়েছিলাম। সেজদি বললো, এখন আর আই বির টিকটিকিরা ঘুরে বেড়াচ্ছে না। সবাই নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। চলাফেরা এখনই নিরাপদ, যদিও সৈন্যদের মেশিনগান রাস্তার প্রতি মোড়ে নল উঁচিয়ে পাহারা দিচ্ছে। ওদের গোপন কর্মসূচীর কথা অবশ্য আমাকে কিছু বলেনি। তবে এটুকু বললো, নোয়াখালীতে ওরা ট্রেনিং ক্যাম্প খুলেছে। আওয়ামী লীগ এর ট্রেনিং ক্যাম্পে নাকি ওদের জায়গা হবে না। নিজেদের ফ্রন্টে ওরা নিজেরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। সেজদি আরো বললো, শহরের ভেতর গেরিলা তৎপরতা চালানো দরকার। পাঞ্জাবি সৈন্যরা শহরগুলোকে খুব নিরাপদ ভাবছে। ওদের জানানো দরকার মুক্তিবাহিনী সবখানেই আছে। আরো অনেক কথা বললো সেজদি। আসল কথা হলো আমি ওদের জন্যে কাজ করবো।'

বাবলু অবাক হলো— 'তুমি ওদের পার্টির জন্যে কাজ করবে? ওদের পার্টি তোমাকে নেবে কেন?'

বাবু একটু বিরক্ত হলো, 'পার্টির জন্যে কিনা জানি না। আমি কাজ করবো দেশের জন্যে।'

'কাজটা কী? যুদ্ধ করবে?' নির্দিষ্টভাবে জানতে চাইলো বাবলু।

বাবুকে একটু উত্তেজিত মনে হলো— 'যুদ্ধে নিশ্চয়ই যাবো, তবে আমাকে এখন অন্য কাজ করতে হবে। কাজটাকে গুপ্তচরের কাজ বলতে পারিস। ক্যান্টনমেন্ট থেকে কিছু খবর সংগ্রহ করতে হবে।'

উত্তেজনায় বাবু রীতিমতো কাঁপছিলো। বাবলু আরো অবাক হলো— 'সে কী? তুমি গুপ্তচরের কাজ করবে কী?'

বাবু রেগে গেলো— 'অতটা অকর্মা ভাবছিস কেন? সেজদির সঙ্গে সব কথাই হয়েছে। আমিও প্রথমে একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম। স্পাইদের যা গল্প শুনেছি সব টাফ ব্যাপার। বললাম, আমি কি পারবো? সেজদির সঙ্গে দাড়িওয়ালা

মাওলানা টাইপের এক ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি বললেন, কেন পারবে না। তোমার বুদ্ধি আছে, বিচক্ষণতা আছে, আর সব চেয়ে বড়ো কথা হলো তোমার চেহারা। তোমাকে এত ইনোসেন্ট মনে হয়, এত ভালো উর্দু জানো, কেউ কল্পনাই করতে পারবে না তুমি এ ধরনের কাজ করতে পারো। আর কাজটাও ভয়ানক কিছু নয়।'

বাবলু বললো, 'কাজটা কী তাই বলো না।'

বাবলু বললো, 'ক্যান্টনমেন্টের কয়েকটা জায়গার নকশা আমাকে এঁকে দিতে হবে। কোথায় জেনারেলদের বাড়ি, কোথায় এম্যুনেশন ডাম্প, কোথায় সৈন্যদের ব্যারাক, কোথায় হ্যাঙ্গার সব কিছু। আর কিছু লোকেশনের খবর। সেটা অফিসারদের কথা থেকে জানতে হবে।'

বাবলু বললো, 'এটাকে এত সাধারণ কাজ ভাবছো কেন? ক্যান্টনমেন্টে তুমি যাবে কীভাবে? তাছাড়া শুধু গেলেই তো চলবে না, ওখানে দিনের পর দিন থাকতে হবে।'

'ওসব ব্যবস্থাও করা হয়েছে।' বাবু বললো, 'সেজদি অবশ্য কাজটা গুছিয়ে দিয়ে কেটে পড়েছেন। বলেছেন কোন পরিচিত আর্মি অফিসার খুঁজে ওর বাড়িতে থাকতে। আমি মামুনের সাথে আলাপ করেছি। ওকে সব বলেছি। ওর বাবার এক বন্ধু আছেন মেজর মুস্তফা। ইউ পির লোক। মামুনের বাবাকে কিছুদিন আগে বলেছিলেন শহরে নিরাপদ মনে না করলে ক্যান্টনমেন্টে ওর কোয়ার্টারে গিয়ে থাকতে। ফ্যামিলি এবটাবাদ পাঠিয়ে দিয়েছেন, পুরো কোয়ার্টার খালি পড়ে আছে। মামুন আগে বলেছিলো ওর বাবার ইচ্ছে ও মেজর মুস্তফার কাছে থাকুক। ভয়ানক আদর্শবাদী বলেই ও যেতে রাজি হয়নি। আমি সেজদির ব্যাপারটা খুলে বলতে ও খুব উৎসাহিত হলো। বললো, সব ব্যবস্থা করে দেবে। পরে সেজদিও বললো, এর চেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারে না।'

একনাগাড়ে অনেকক্ষণ কথা বললো বাবু। বাবলু সব শুনলো। বাবুর জন্য ভয় হলো, তবু মাথা নেড়ে সায় জানালো— 'ব্যবস্থাটা মন্দ নয়। কিন্তু তুমি বাঙালি, এটা ভুলে যেও না। প্রত্যেকটা বাঙালিকেই ওরা সন্দেহের চোখে দেখে।'

বাবু হাসলো— 'আমি বাঙালি বটে। তবে পরিচয় দেবো রিফ্যুজি। যাদের ওরা বলে মোহাজের। যাদের জন্যে ওদের দরদের অন্ত নেই। এটা তো জানিস, রিফ্যুজিরা সবসময় ওদের সঙ্গে সহযোগিতা করছে। তাছাড়া আমি উর্দু বলতে আর লিখতে ওদের চেয়ে কম জানি না।'

বাবলুর দ্বিধা তবু যায় না— 'যদি ধরা পড়ো— ।'

বাবু বাধা দিলো— 'কক্ষণো ধরা পড়বো না। আমি মোহাজের। ভারতীয়দের অত্যাচারে দেশ ছেড়ে পালিয়ে এসেছি। ভারতীয়দের ওপর আমার প্রচণ্ড ঘৃণা। আদি বাড়ি ছিলো বিহারে। বঙ্গাল মুলুকে থেকে বঙ্গাল জবানটা

ভালোই রপ্ত করেছি। বঙ্গালদের দুচোখে দেখতে পারি না। শহরটা নিরাপদ নয় বলেই কদিন ক্যান্টনমেন্টে থাকবো। এর পরও কি বলিস ধরা পড়বো?'

বাবলু ম্লান হাসলো— 'কি নোংরা পরিচয়!'

ভুরু দুটো কুচকে গেলো বাবুর— 'বাবলু তোর জানা দরকার, দেশের জন্যে স্পাইদের অনেক জঘন্য কাজ করতে হয়। এটা একটা ত্যাগ স্বীকার, এটা ভুলে যেও না। আমিও জানি কী পরিচয়ে ওদের ওখানে থাকছি।'

বাবলু বললো, 'তুমি রাগছো কেন? আমি সবই জানি। তোমাকে আমি এ ব্যাপারে কিছু সাহায্য করতে পারি।'

বাবু এবার অবাক হলো— 'কী রকম?'

বাবলু বললো, 'ওখানে বেঙ্গল রেজিমেন্টের একজন বাঙালি ক্যাপ্টেন আছেন! নাম হলো ক্যাপ্টেন করিম। তাঁকে অবশ্য আন-আর্মড করে রাখা হয়েছে। যে কোনো সময় ওয়েস্ট পাকিস্তানেও পাঠিয়ে দিতে পারে। তাঁর সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ করতে পারো। কারণ বাঙালিদের ওখানে যথেষ্ট সন্দেহের চোখে দেখা হয়।'

বাবু বললো, 'তিনি কি মুক্তিযুদ্ধ সমর্থন করেন?'

বাবলু বললো, 'নিশ্চয়ই করেন।'

'তাহলে তিনি বেরিয়ে আসেননি কেন? আমি তো জানি বেশ কয়েকজন অফিসার বেরিয়ে আসতে পেরেছেন।'

'গোড়ার দিকে তিনি বেরিয়ে আসার বিপক্ষে ছিলেন। এখন অবশ্য নিজের ভুল বুঝতে পেরেছেন। তিনি তোমার কোন অসুবিধার কারণ হবেন না।'

বাবু বললো, 'তুই যাচ্ছিস কবে?'

'কালই যাবো। তুমি কবে যাচ্ছো?'

'আমিও কাল বিকেলে যাচ্ছি।'

বাবলুর সঙ্গে বাবুর অনেক কথা হলো। সেজদির কথা বললো বাবলুকে। ওর কথাগুলো বাবুকে আলোড়িত করেছে। যে বাবু নিজেকে সব কিছু থেকে দূরে সরিয়ে নিতে চেয়েছিলো, সে বাবু জীবনের এত কাছাকাছি এসে যাবে, এভাবে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে এটা বাবু নিজেও কোনোদিন ভাবেনি। যে কাজ সে করতে যাচ্ছে মনে হলো ওর জীবনের সবচেয়ে গৌরবের কাজ। প্রতিপদে ওকে বিপদের চরম সীমায় বিচরণ করতে হবে।

বাড়িতে বাবু কাউকে কিছু বললো না। রাতে শুধু খাবার টেবিলে বললো, 'আমি কদিন মামুনদের বাড়িতে থাকবো।'

বাবা ওর পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিলেন। বললেন, 'বেশ তো। যাচ্ছো কবে?'

খেতে খেতে বাবু বললো, 'কাল বিকেলে।'

মেজদা রাতে ফেরেননি। কোলকাতা যাওয়ার ব্যবস্থা করছেন। হিমি বাবলুর

সাথে ওর ছোট বোনটিকে নিয়ে গল্প করছিলো। বাবার মনে হলো, অনেকদিন পর সবাই একসঙ্গে বসে খাচ্ছি। কাল এরা চলে যাবে। কতদিন পর সবাই একত্রিত হবো কে জানে! হয়তো কোনদিনও নয়। তাঁর ছেলে মুক্তিযুদ্ধে যাচ্ছে। একই সঙ্গে গর্ববোধ করলেন এবং এক ধরনের শূন্যতাও। ওদের মা মারা যাওয়ার সময় বাবলু ছিল এক বছরের। এই ছেলেটিকে তিনি কোনদিন মায়ের অভাব বুঝতে দেননি।

খাবার পর বাবা, ভাইয়া আর ভাবী আকাশবাণীর খবর শুনতে বসলো। বাবলু বাবুর সঙ্গে ওর ঘরে বসে কথা বলছিলো। কথা ফুরোতে চায় না। বাবুও ভাবছিলো হয়তো কোনদিনই আর দেখা হবে না। এ সময়টুকু যতটা পারি ধরে রাখি।

রাতে বিছানায় শুয়ে বাবু অনেক রাত অবধি অনেক কথা বললো। নিজের দেশ, দেশের মানুষ আর মানুষের স্বাধীনতার কথা। স্বপ্নের কথাও মনে হলো। বাবু আজও খুঁজে পেলো না সেই দুঃস্বপ্নের অর্থ কী। তারপর একসময় ও ঘুমিয়ে পড়লো। বহুদিন পর বাবু শান্তিতে ঘুমোলো।

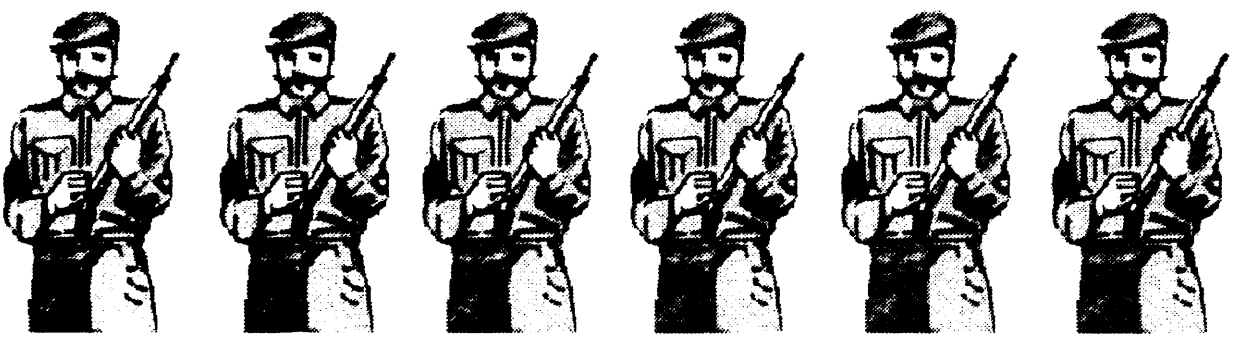

শহরের সাধারণ মানুষের জন্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এলাকা ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট। শহরে এতো উত্তেজনা, এতো আতঙ্ক, অথচ এখানে তার এতোটুকু ছায়া পড়েনি। অফিসারদের কাজের চাপ বেড়েছে। উত্তেজনা হয়তো সেখানেও আছে। তবে তার চেহারা আলাদা। সেখানে প্রতি মুহূর্তে পরিকল্পনা আর প্রস্তুতি চলছে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী মানুষদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য। তবে বাইরে থেকে কেউ সেটা অনুভব করতে পারবে না।

মেজর মুস্তফার বাড়িতে চমৎকার অভ্যর্থনা পেলো বাবু আর মামুন। লনে বসে একজন কমবয়সী ক্যাপ্টেনের সঙ্গে চা খাচ্ছিলেন মেজর মুস্তফা। ওদের দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, 'এসো, এসো। এত দেরি হলো কেন?'

ইউ পির লোক বলেই চমৎকার উর্দু বলেন মেজর। মামুন উর্দুতেই জবাব দিলো— 'স্কুটার এদিকে আসতে চাইছিলো না। এয়ারপোর্ট থেকে হেঁটে আসতে হয়েছে।'

গলা ফাটিয়ে হাসলেন মেজর মুস্তফা—'তাই বলো, এ বুঝি তোমার সেই বন্ধু

বাবু? তোমার বাবার সঙ্গে আমার ফোনে কথা হয়েছে।'

বাবু হেসে সালাম করলো। মেজর বললেন—'ও কি দাঁড়িয়ে কেন, বোসো।' তারপর চেঁচিয়ে ডাকলেন, 'রইস, আরো দু'কাপ চা দিয়ে যাও। চা খাবে তো? নাকি কফি?'

মামুন বললো—'চা খাবো।'

মোটাসোটা হাসিখুশি সরল মানুষ মেজর মুস্তফা। দেখে মনেই হয় না আর্মি অফিসার। প্রচুর কথা বলেন। এদের চুপচাপ বসে থাকতে দেখে বললেন, 'তারপর খবর টবর বলো। কথ বলো! চুপ থাকা গোমড়া মানুষ আমি পছন্দ করি না।'

মামুন বললো—'খবর তো আপনাদের কাছে চাচা।'

মেজর আবার হাসলেন—'তা বটে। এখন আমরাই খবরের কাগজের হেড লাইন! তোমার বাবাকে বলেছিলাম করাচী চলে যেতে, যে কদিন গণ্ডগোল চলছে সে কদিন করাচী থাকতে। তোমার বাবা বললেন করাচীতেও গণ্ডগোল লাগবে। আমি তো শুনে হেসেই বাঁচি না। সারা পাকিস্তানে গণ্ডগোল লাগলেও করাচীর রেস্টুরেন্টে একটা খদ্দের কমবে না। সিনেমায় টিকেটও আগের মতো বিক্রি হবে। বেগম সাহেবদের শপিং-এ এতটুকু অসুবিধে হবে না। ব্যাস, আর কি চাই!'

হা হা করে হাসলেন মেজর। বাবুকে বললেন, 'তুমি বাপু বড়ো গম্ভীর ছেলে। কিছু মনে করো না। আমি একটু বেশি বকি। এ নিয়ে গিন্নি আমাকে কম জ্বালায় না।'

বাবু হেসে বললো, 'আমি শুনতে ভালোবাসি।'

'তাই নাকি!' মেজরের হাসি আর থামতে চায় না। 'আজকালকার দুনিয়ায় কেউ শুনতে চায় নাকি? সবাই তো চায় বলতে। বলতে বলতেই জীবন কেটে যায়।'

মামুন বললো, 'ব্যতিক্রম সব সময় থাকে।'

হাসতে হাসতে মেজর বললেন, 'তা ঠিক বলেছো। আমিও তাই বলতে চাইছি, বাবু ব্যতিক্রমদের দলে পড়ছে।'

বাবু মৃদু হাসলো। মামুন বললো, 'আপনি চমৎকার বলতে পারেন চাচা।'

'তাই নাকি। যাক এদ্দিনে তাহলে কথা বলার মতো মানুষ পেলাম। গিন্নি চলে যাবার পর থেকে বড়ো হাঁপিয়ে পড়েছিলাম।'

রইস এসে চা দিয়ে গেলো। একেবারে সীমান্তের লোক। সাড়ে ছ'ফুট লম্বা। দৈত্যের মতো চেহারা। মেজর বললেন, 'রইস, এঁরা আমাদের মেহমান। তোমাদের যখন যা দরকার মামুন, রইসকে বলবে।'

ক্যাপ্টেন এতক্ষণ চুপচাপ বসে খবরের কাগজ পড়ছিলো। ঘড়ি দেখে

বললো, স্যার, কনফারেন্সের সময় হয়ে গেছে।'

মেজর মুখ ভার করলেন—'শুধু কনফারেন্স আর কনফারেন্স। যাই বলো ক্যাপ্টেন, আমি হাঁপিয়ে পড়েছি। এক্ষুণি যেতে হবে?'

ক্যাপ্টন বললো, 'জিপ দাঁড়িয়ে আছে।'

মেজর উঠে দাঁড়ালেন। মামুনদের বললেন, 'দেখলে তো! রাতে আলাপ করবো।'

বাবু আর মামুন মাথা নাড়লো। মেজর আর ক্যাপ্টেন জিপ নিয়ে চলে গেলো।

মামুন বললো, 'চমৎকার লোক।'

বাবু বললো, 'ভালোই হলো।'

জায়গাটা বেশ নিরিবিলি। বড়ো রাস্তা থেকে একটু ভেতরে। পশ্চিম দিকটা একেবারে খোলা। বহুদূর অবধি মাঠ। মাঠের শেষে ধানক্ষেতে শুরু হয়েছে। ধানক্ষেত শেষ হয়েছে মিরপুরের কাছে। দূরে মিরপুরের ঘরগুলো দেখাচ্ছিলো কালো ছায়ার মতো।

সূর্য ডুবছে। এক টুকরো বিষণ্ন লাল ছায়া গায়ে মেখে পশ্চিমের দিগন্তে নেমে যাচ্ছে। মাটি ছোয়ার আগেই লালটুকু ফ্যাকাশে হয়ে হারিয়ে গেলো। পুব আকাশে মেঘ জমেছে। মেঘের গায়ে বিষণ্ন লালটুকু লেগে রইলো আরো কিছুক্ষণ। সুন্দর একটা শান্ত পরিবেশ এখানে। বাবুর মনে হলো সকল সুন্দরের ভেতরই অসুন্দর বাস করে।

রাত নটার দিকে মেজর ফিরলেন। সঙ্গে সেই ক্যাপ্টেনও। বিষণ্ন সময়টাকে মেজর আবার মাতিয়ে তুললেন—'ওকি তোমরা এখনো খাওনি? ভারী অন্যায়! আমার তো আরো দেরি হতে পারতো। কক্ষনো আমার জন্যে অপেক্ষা করো না। আমি তো বাইরেও খেয়ে নিতে পারি।'

খাবার টেবিলে বসে মেজরের কথা আর ফুরোতে চায় না। ক্যাপ্টেনকে বললেন, 'বুঝলে ক্যাপ্টেন, আমাদের জোয়ানদের কাণ্ড কারখানা দেখে আমি হেসে বাঁচি না। প্লেন থেকে যখন ওরা নামে এখন সকলের সে কি বীরমূর্তি। যেন একাই একশ। কাফেরদের খতম করার জন্যে সারাক্ষণ হাত নিশপিশ করছে। যেই বেচারাদের বুটের তলাটা কাদা পানি লেগে একটু ভিজলো, তখনই সব চুপসে এতোটুকু। আর বৃষ্টিতে একবার ভিজলে তো কথাই নেই। জিভে ন্যাকড়ার মতো নেতিয়ে যায়।'

ক্যাপ্টেন হাসলো—'সেদিন কি কেলেঙ্কারি হলো শোনেন নি? ব্যারাকে জায়গা নেই বলে নুতন ফ্রন্টইয়ার ফোর্সকে বলা হলো পশ্চিমের খোলা মাঠটায় তাবু গেড়ে থাকতে। রাতে জোরে বৃষ্টি নামলো। সবাই ভিজে ভয়ে জড়োসড়ো। বিদ্যুৎ চমকালো। প্রচণ্ড শব্দে সামনের তালগাছে একটা বাজ পড়লো। অমনি

কয়েকজন উঠে ফায়ারিং শুরু করে দিলো। সে এক বিচ্ছিরি কাণ্ড। শেষে সবাই সুড় সুড় করে ব্যারাকে এসে ঢুকলো। বললো, 'ওরা ক্যাম্পে থাকবে না।'

মেজর হেসে গড়িয়ে পড়লেন—'আহা ওদের কী দোষ বলো। বেচারারা কোনদিন কী এমন পানি দেখেছে?'

মামুন বললো, 'কেন, জওয়ানদের এ ধরনের আবহাওয়ার উপযোগী করে কি ট্রেনিং দেয়া হয় না?'

'কী করে হবে বলো?' মেজর বললেন, 'ওয়েস্টে এই ওয়েদার কোথায় পাবে? যারা অনেক দিন ধরে এখানে আছে, তারা কিছুটা অভ্যস্ত হয় বটে। তবে এখন যারা আসছে সবাই আনকোরা নতুন। অনেকে জীবনে নদীই দেখেনি।'

ক্যাপ্টেন বললো, 'নদীকে ওরা সবচেয়ে বেশি ভয় করে।'

মেজর হাসলেন। হঠাৎ যেন একটা কথা মনে পড়লো—'আচ্ছা ক্যাপ্টেন, ইমতিয়াজ কবে আসছে জানো কিছু?'

ক্যাপ্টেন বললেন, 'মেজর ইমতিয়াজ বেগ তো? সম্ভবত কালই আসছেন। বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন আসার জন্যে।'

'আহা, তা তো হবেই।' সমবেদনার ভঙ্গীতে মেজর মুস্তফা বললেন, 'বেচারার ওপর কি কম ধকল গেছে! আমি চেষ্টা করছি তাড়াতাড়ি যাতে ওয়েস্ট পাকিস্তান যেতে পারে।' মামুনদের বললেন, 'আমার এক বন্ধু আসছেন চিটাগাং থেকে। কদিন থাকবেন এখানে। অনেক দিনের পুরনো বন্ধু।'

বাবু বলল, 'কদ্দিন চিটাগাং আছেন?'

হিসেব করে মেজর বললেন, 'বছর চারেক হবে। আগে হায়দ্রাবাদে ছিলেন।'

খাবার পর ক্যাপ্টেন বিদায় নিয়ে চলে গেলো। ড্রইংরুমে বসে পাইপ টানতে টানতে মেজর তার ছোট বেলার গল্প করছিলেন। টেলিভিশনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ছবি হচ্ছে। বাবু টেলিভিশন দেখছিলো। মামুন মেজরের সাথে গল্প করছিলো। বাবু ভাবলো, কাল থেকে কাজে নেমে পড়তে হবে। সেজদির সঙ্গে দেখা করতে হবে। তার আগে বাবলুর সেই ক্যাপ্টেন করিমকেও খুঁজে বের করতে হবে।

এগারোটা যখন বাজলো মেজর বললেন, 'তোমরা তাহলে শুয়ে পড়ো। আমিও একটু গড়িয়ে নিই। হয়তো মাঝরাতেই আবার ডাক পড়বে। কী যে কনফারেন্স হচ্ছে—জ্বালিয়ে খেলো।'

বাবু খুব সাবধানে জানতে চাইলো, 'কনফারেন্সটা কিসের?'

'আর বলো না!' মেজর বিরক্ত হয়ে বললেন, 'জেনারেল হামিদ আসছেন। রিপোর্ট তৈরি করতে হবে। আমাদের হয়েছে বিপদ। যা ঘটেছে জেনারেলকে তা জানানো যাবে না। যা ঘটা উচিত ছিলো তাই বলতে হবে। প্রেস রিলিজও তাই যাবে। ভারী জটিল ব্যাপার। তুমি ওসব বুঝবে না।'

বাবু মৃদু হেসে বললো, 'জটিল ব্যাপার বুঝে কাজ নেই।'

মেজর হাসলেন—'এসো তাহলে। গুড নাইট।'

'রাতে ভালো ঘুম হয়েছিলো তো?' সকালে খাবার টেবিলে মেজর মুস্তফা বাবুকে জিজ্ঞেস করলেন।

'চমৎকার ঘুমিয়েছি।' বাবু শান্ত গলায় জবাব দিলো।

'রাতে কি চাচা ফায়ারিং-এর শব্দ শুনেছিলেন?' মামুনকে একটু উত্তেজিত মনে হলো—'তিনটে, সাড়ে তিনটে নাগাদ মেশিনগানের কয়েক রাউন্ড ফায়ারিং-এর শব্দ শুনেছি।'

রুটিতে পুরু মাখন লাগিয়ে মুখে দিয়ে মেজর বললেন, 'ওটা কিছু নয়। ও রকম প্রত্যেক রাতেই শুনতে পাবে।'

বাবু অবাক হলো—'প্রত্যেক রাতে?'

মেজর খেতে খেতে বললেন, 'রাতের দিকে ওরা প্রায়ই ক্যান্টনমেন্টের দিকে হামলা চালায়। আমাদের জওয়ানদের তৈরি থাকতে হয়। হামলা না হলেও কয়েক রাউন্ড গুলি খরচ করে জানাতে হয় আমরা জেগে আছি।'

মেজর হাসলেন। বাবু বলতে যাচ্ছিলো, ওদের সম্পর্কে তাঁর কী ধারণা। চেপে গেলো। সেজদি বলে দিয়েছেন, কখনো অহেতুক উৎসাহ দেখিও না। সব সময় শুধু শুনে যাবো। প্রত্যেকটা কথা মনে রাখবে। কারণ অনেক কথা তোমার কাছে অপ্রাসঙ্গিক মনে হলেও আমাদের কাছে অসম্ভব মূল্যবান হতে পারে।

খেয়ে উঠে মেজর বললেন, 'যাচ্ছি। তোমরা ঘরে বসে চেকার খেলতে পারো। নইলে বাইরেও ঘুরে আসতে পারো। এখানে ভয়ের কিছু নেই। কারণ এটা ঢাকা শহর নয়।' মেজর হাসলেন। রইসকে ডেকে বললেন, 'মেহমানদের দুপুরে খাইয়ে দিও। আমার জন্যে অপেক্ষা করো না।'

জিপ নিয়ে বেরিয়ে গেলেন মেজর। মামুন জিজ্ঞেস করলো, 'ঘরে থাকবে না বেরুবে?'

বাবু বললো, 'বেরুতে হবে। তুমি নিশ্চয়ই সঙ্গে আসছো?'

ওরা দুজন বেরিয়ে এলো। অফিসারদের কোয়ার্টার পেরিয়ে সদর রাস্তা। জীবনযাত্রা স্বাভাবিক গতিতে চলছে। বাজারে কেনাকাটা হচ্ছে। গাড়ি চলেছে। হোটেলে উর্দু গান বাজছে। কোথাও এতোটুকু ছন্দ পতন নেই। মেজর বলছিলেন, এটা ঢাকা শহর নয়। আসলেই তাই। শহরের এখনকার জীবনের সঙ্গে এর কোন মিল নেই। শহরের এই জীবন মার্চ মাসের পঁচিশ তারিখের রাত থেকে হারিয়ে গেছে।

জেনারেলদের কোয়ার্টারের গা ঘেঁষে একটা ত্রিভুজাকৃতি পার্ক। বাবু আর মামুন এসে পার্কটায় বসলো। ক্যান্টনমেন্টে বাবু আগেও কয়েকবার এসেছে

বাবলুর সঙ্গে দেখা করার জন্যে। কোথায় কি আছে সে সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা তার রয়েছে।

মামুন বললো, 'তোমার কাজ কিভাবে শুরু করবে?'

বাবু হাসলো—'কাজ কাল থেকেই শুরু হয়ে গেছে। মাপিং-এর আগে ক্যাপ্টেন করিমের সঙ্গে আলাপ করবো।'

পার্কে বসে মামুনের সাথে কথা বলতে বলতে জেনারেলদের কোয়ার্টারগুলো ভালো করে লক্ষ্য করলো। পার্কের গায়ের সাথে লাগানো জেনারেল টিক্কা খানের বাড়ির পাঁচিল। নিরাপত্তার জন্যে গভর্ণর টিক্কা খান এখন ক্যান্টনমেন্টে থাকছেন। নইলে তার গভর্নর হাউসে থাকার কথা। তার পাশের বাড়িটা হচ্ছে জেনারেল ফরমান আলীর।

পার্কে পায়চারি করলো ওরা। কোন অফিসারের চাকর কুকুর নিয়ে পার্কে ঘুরছে। দুজন কম বয়েসী ছেলে এক কোণে বাদাম খেতে খেতে গল্প করছে। বাবু আর মামুন সারাক্ষণ উর্দুতে কথা বলছিলো।

জেনারেলদের বাড়িতে কড়া পাহারা দেয়া হচ্ছে। প্রতি দশ হাত পর পর হালকা মেশিনগান হাতে পাহারাদার সৈন্য। প্রধান প্রবেশ পথের দু'পাশে দুটো কামান। ফটকের দু'ধারে ভারী মেশিনগানের পাহারা।

ঝোপঝাড়ে ভরা পার্কটার একটা খসড়া নকশার কথা ভাবলো বাবু। সদর রাস্তা থেকে দূরত্ব, বড়ো বড়ো ঝোপগুলোর প্রসঙ্গ উল্লেখ থাকা দরকার।

দু'ঘন্টার মতো সময় ওরা পার্কে কাটালো। তারপর ক্যাপ্টেন করিমের খোঁজে বেরুলো। কেউ সন্দেহ করছে বলে মনে হলো না। কয়েকজন টহলদার সৈন্য অবশ্য লক্ষ্য করেছে। ওরা সারাক্ষণ উর্দু ছবি নিয়ে উর্দুতে কথা বলছিলো, অফিসারদের বখে যাওয়া ছেলেদের মতো। তবু বেশিক্ষণ জেনারেলদের বাড়ির কাছে থাকা উচিত নয়।

বাবুল ক্যাপ্টেন করিমের ঠিকানা দিয়েছিলো। খুঁজে বের করতে অসুবিধে হলো না। বাড়িতেই ছিলেন ক্যাপ্টেন। বারান্দায় মাথা নিচু করে পায়চারী করছিলেন। বয়স খুব বেশি হবে না। বড়ো জোর আটাশ কি ঊনত্রিশ। চমৎকার লম্বা চওড়া শরীর। খুব অসহায় মনে হচ্ছিলো তাকে।

বাবু গিয়ে পরিচয় দিলো। ক্যাপ্টেন একটু চমকে উঠলেন। ভেতরে নিয়ে বসালেন। বললেন, 'বাবলু ঠিকমতো যেতে পেরেছিলো?'

বাবু মাথা নেড়ে সায় জানালো—'কালই ও নরসিংদী চলে গেছে।'

ক্যাপ্টেন বললেন, 'তোমরা কী জন্যে এসেছো এখানে?'

বাবু একটু ইতস্তত করলো। তারপর পুরো ব্যাপারটাই খুলে বললো।

ক্যাপ্টেন ওর সব কথা শুনে চমকে উঠলেন—'খুবই বিপজ্জনক কাজ।'

বাবু মৃদু হাসলো—'তবু এ কাজ আমাকে করতে হবে।'

ক্যাপ্টেন কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। তারপর বললেন, 'তোমরা উঠেছো কোথায়?'

'মেজর মুস্তফার বাড়িতে।'

'ভালো লোক।' ক্যাপ্টেন মাথা নেড়ে সায় জানালেন—'কোন অসুবিধে নিশ্চয়ই হচ্ছে না?'

'না। খুবই ভালো লোক তিনি।'

'মেজর মুস্তফার বাড়িতে আছো এক হিসেবে ভালোই হলো। তিনি এয়ারপোর্টের চার্জে আছেন। ওঁর বাড়িতে বিভিন্ন ধরনের অফিসার যাতায়াত করেন। সবার কথাই ভালোমতো খেয়াল করে শুনবে। অনেক বেশি খবর পাবে।' এইটুকু বলে ক্যাপ্টেন থামলেন। একটু ভেবে বললেন, 'আমার কাছে ক্যান্টনমেন্টের একটা ম্যাপ আছে। বছর খানেক আগের আঁকা। ট্রেনিং-এর ছেলেদের ম্যাপ রিডিং-এর জন্যে রেখেছিলাম। ওটা তোমার কাজে লাগতে পারে। তবে ইমার্জেন্সি ডাম্পগুলোর লোকেশন ওতে নেই। ওগুলো শুধু তোমাকে বসিয়ে নিতে হবে। ম্যাপ সম্পর্কে আইডিয়া আছে তো?'

বাবু মাথা নাড়লো—'ইমার্জেন্সী ডাম্প কোনগুলো?'

ক্যাপ্টেন বললো, 'আগে যেখানে কোন ডাম্প ছিলো না। এখন জরুরি অবস্থার জন্যে করতে হয়েছে। যেমন ধরো অফিসার্স কোয়ার্টার থেকে সোজা দক্ষিণে যদি যাও, তাহলে হাতের বাম দিকে দেখবে কয়েকটা তাঁবু। জায়গাটা ফাঁকা কিন্তু ওপরে জাল টাঙানো রয়েছে। যেখানে এরকম দেখবে সেখানেই বুঝবে অস্ত্র মজুদ রয়েছে। এ রকম অনেক দেখতে পাবে।'

মাথা নেড়ে সায় জানালো বাবু—'বুঝেছি। ও সব জায়গার রিডিং নেয়া একটু কঠিন ব্যাপার হবে।'

ক্যাপ্টেন বললেন, 'বড়ো অসুবিধে হচ্ছে তোমাকে শুধু স্টেপিং থেকে ক্যালকুলেট করতে হবে। অন্য কিছু ব্যবহার করতে পারবে না। বাজারের লোকেশন আমার ম্যাপে রয়েছে। বাজারকে কেন্দ্র ধরে চারিদিকের রিডিংগুলো স্টেপিং মেপ নিতে হবে। এতো চুলচেরা এক্যুইরিটি হয়তো থাকবে না। তবু মোটামুটি লোকেশনটা মাপে বসাতে পারবে।'

ক্যাপ্টেন উঠে গিয়ে ম্যাপটা আনলেন। ওদের সামনে মেলে ধরলেন। কয়েকটা বিশেষ জায়গা দেখিয়ে বললেন, 'এখানে ইমার্জেন্সী ডাম্প রয়েছে। রিজার্ভ ডাম্পগুলো হচ্ছে ব্যারাকের পাশের এই আম বাগানে। ওর ডিটেলস পাওয়া অসম্ভব। প্রত্যেকটা গাছের সঙ্গে গা লাগিয়ে একজন করে সৈন্য পাহারা দিচ্ছে। দূর থেকে কিছু বোঝা যাবে না। কিন্তু বাগানে যেই মাত্র ঢুকেছো সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে যাবে। ধরা মানে কি, দেখামাত্র গুলি করার অর্ডার রয়েছে ওদের ওপর। আমার মনে হয় তোমাদের যে মিশন তাতে রিজার্ভ ডাম্প অতখানি

গুরুত্বপূর্ণ হবে না। তবে কয়েকটা উইক এন্ট্রি পয়েন্ট জেনে রাখো। মিরপুরের উত্তর পূব দিকে আর টঙ্গির দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ওদের পাহারাটা একটু কম। কারণ ওদিকে কোন রাস্তাঘাট নেই। সবচেয়ে বেশি সতর্কতা যেখানে সেগুলো মার্ক করে দিচ্ছি।'

মানুষ বললো, 'ম্যাপটা কি সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারি?'

'না'। মাথা নাড়লেন ক্যাপ্টেন—'তোমাদের সঙ্গে এ মুহূর্তে ম্যাপ থাকাটা খুবই বিপজ্জনক। এটা আমার কাছেই থাকবে। তোমরা রোজকার মতো ঘুরবে। রিডিং নেবে। ঘুরতে ঘুরতে আমার বাড়ি চলে আসবে। তারপর ম্যাপে তোমাদের রিডিংগুলো বসিয়ে দেবে। আমার এখানে আসার সময় সাবধানে আসবে।'

ওরা সায় জানালো। ম্যাপটা দেখলো ভালো করে। তারপর ফিরে গেলো মেজর মুস্তফার বাড়িতে। বার বার লক্ষ্য করছিলো, কেউ তাদের দেখতে পেলো কিনা।

একজন মেজরের সঙ্গে কথা বলছিলেন মুস্তফা। বাবু আর মামুনকে দেখে বললেন, 'কোথায় কোথায় ঘুরলে? অনেক্ষণ বেড়িয়েছো মনে হচ্ছে?'

বাবু একটু বিব্রত হয়ে বললো, 'এই তো পার্কেই ছিলাম। আপনি কখন এসেছেন?'

মুস্তফা ঘড়ি দেখে বললেন, 'তা ঘন্টাখানেক তো হয়েছে। এসো, পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি হচ্ছেন মেজর ইমতিয়াজ বেগ। কাল যার কথা তোমাদের বলেছিলাম।'

তারপর মেজর বেগের দিকে তাকালেন—'এদের কথা তো তোমাকে এইমাত্র বললাম।'

বেগ একটু হাসলেন। রোগাটে শরীর। মেজর মুস্তফার তুলনায় যথেষ্ট গম্ভীর। বয়সটাও একটু বেশি মনে হলো। বললেন, 'ক্যান্টনমেন্টে কেমন লাগছে আপনাদের।'

কথার মাঝখানে মেজর মুস্তফা হা হা করে উঠলেন, 'ওকি বেগ? ওদের আবার আপনি বলছো কেন? ওরা তোমার ছেলের বয়সী।'

বেগ গম্ভীর হেসে বললেন, 'আর ছেলে! আজকালকার ছেলেরা বাপের নাম ভুলিয়ে দেয়।'

'উহুঁ।' মাথা নাড়লেন মেজর মুস্তফা—'আমি ভালো করে বাজিয়ে দেখেছি বেগ। এরা সে রকম ছেলেই নয়।'

বাবু একটু হেসে বললো, 'আমাদের আপনি তুমিই বলবেন বেগ চাচা।'

মাথা নেড়ে কি যেন বিড়বিড় করে বললেন মেজর ইমতিয়াজ বেগ। মেজর মুস্তফা বললেন, 'সিএনসি কালই আসছে। তুমি কাল দিনটা থেকে যাও বেগ।'

চোখ তুলে তাকালেন মেজর বেগ—'কাল কখন আসছে?'

মুস্তফা বললেন, 'আমি আশা করছি বিকেল সাড়ে চারটা কি পাঁচটা নাগাদ।'

মেজর বেগ কি যেন ভাবলেন। তারপর যেন আপন মনেই বললেন, 'সিএনসি-র কাছে আমার তো কোন প্রয়োজন নেই মুস্তফা। আমি কোন রকমে ওয়েস্ট পাকিস্তান যেতে পারলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচি।'

মেজর মুস্তফা হাসলেন—'তুমি বড়ো বেশি হতাশ হয়ে পড়েছো বেগ।'

বেগ বললেন, 'কোন সুস্থ মানুষের পক্ষে এসব দৃশ্য দেখার পর স্বাভাবিক থাকা সম্ভব নয়। ভাবতে পারো তুমি—?'

বাধা দিয়ে মুস্তফা বললেন, 'আপাতত ওসব ভেবে কাজ নেই। যত কম ভাবা যায় ততই মঙ্গল। তুমি ভাবছো বলে কষ্ট পাচ্ছো বেগ। আমাকে দেখো, সব ভুলে যাচ্ছি। সে জন্যে এখনো আমি হাসতে পারছি।' বলতে বলতে মেজর মুস্তফা গম্ভীর হয়ে গেলেন। বাবু দেখে অবাক হলো। এই প্রথম তাঁকে গম্ভীর হতে দেখলো।

মেজর বেগ চুপচাপ বসে রইলেন। রইস এসে বললো, 'টেবিলে খাবার দিয়েছি।'

সবাই খাবার টেবিলে গেলো। বেগ খাবার টেবিলেও চুপচাপ বসেছিলেন। মুস্তফা আবার উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। কথা জমাতে চাইলেন। অথচ বেগ এড়িয়ে গেলেন।

শেষ বিকেলে বাবু আর মামুন লনে বসেছিলো। মেজর বেগও রয়েছেন ওদের সঙ্গে। মামুন বললো, 'বেগ চাচা কি আগে কখনো ঢাকা আসেননি?'

'না।' মাথা নাড়লেন বেগ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। তারপর মামুনকে বললেন, 'আচ্ছা, তুমি কি বলতে পারবে ঢাকায় ক্ষতির পরিমাণ কত হবে?'

ওরা দুজনেই অবাক হলো।

মামুন বললো, 'চোখে না দেখলে বলে বোঝানো সম্ভব নয় বেগ চাচা।'

'কত লোক মারা গেছে বলে মনে হয় তোমার?' খুব ধীরে ধীরে জানতে চাইলেন বেগ।

তারপরও মামুন স্বাভাবিক গলায় বললো, 'ঢাকাতে চোদ্দ পনেরো হাজার হতে পারে।'

মাথা নেড়ে সায় জানালেন বেগ—'আমি ভেবেছিলাম বেশি।' কী যেন ভাবলেন। আবার বললেন, 'তোমরা কি কেউ কাল আমার সঙ্গে শহরে যাবে?'

মামুন অবাক হলো—'কেন বেগ চাচা?'

বেগ বললেন, 'আমি শহরে ঘুরে দেখতে চাই কোথায় কি ক্ষতি হয়েছে।'

মামুন বললো, 'নিশ্চয়ই যাবো।'

আকাশে সন্ধ্যার রঙটুকু মুছে গিয়ে ঘোলাটে অন্ধকার নেমে এলো। বাবুর মনে হলো পৃথিবীর সকল বিষণ্নতা যেন সন্ধ্যার পৃথিবীতে জমাট বেঁধে পড়ে আছে।

মেজর বেগ-এর চেহারায় দুঃখ আর ক্লান্তির ছাপ, বিষণ্ন সন্ধ্যার রঙে মিশে একাকার হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে বললেন, 'জানো, পরশু চট্টগ্রামের রাস্তায় গাড়ি চালাতে গিয়ে আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। একবার ভাবো, যে রাস্তায় কোনদিন ফার্স্ট গিয়ারের বেশি স্পীড দিতে পারিনি, সে রাস্তায় আমি থার্ড গিয়ারে গাড়ি চালিয়ে এসেছি। শহরে একটা মানুষ নেই। কয়েকটা পচা লাস দেখলাম এখানে সেখানে পড়ে আছে। আর সেই কুৎসিত পাখিগুলো শহরের সারা আকাশ জুড়ে উড়ছে। অসংখ্য শকুন। আশি মাইল স্পিডে আমি সেই ডেড সিটিতে গাড়ি চালিয়ে পালিয়ে এসেছিলাম। মনে হচ্ছিলো লাসগুলো যেন আমাকে তাড়া করছে।'

মেজরের সারা মুখে অব্যক্ত যন্ত্রণার ঢেউ বয়ে গেলো—'সেই থেকে ওরা আমার চোখের সামনে ভেসে বেড়াচ্ছে। গলে যাওয়া, শকুন আর কুকুরে ছিঁড়ে খাওয়া সেই ডেড বডিগুলো তখন থেকে আমাকে হন্ট করছে।'

কথা বলতে বলতে উদাস হয়ে গেলেন মেজর। বহুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। বাবু আর মামুনের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। গভীর বিস্ময়ের সাথে ওরা দেখছিলো মেজর বেগকে। বিব্রত হয়ে মেজর ম্লান হাসলেন—'এটা বাংলাদেশ হোক, কি ইণ্ডিয়াই নিয়ে যাক, আমি এখানে আর থাকছি না। বাড়ি গিয়ে লম্বা ছুটি চেয়ে বসে থাকবো। চাকরির ওপর ঘেন্না ধরে গেছে।'

মেজর মুস্তফা এলেন কিছুক্ষণ পর। বিকেলে তিনি বেরিয়েছিলেন। ওরা তখনও অন্ধকার লনে চুপচাপ বসেছিলো। ওদের দেখে হইচই করে উঠলেন মুস্তফা—'তোমরা তিন-তিনজন মানুষ আমার কোয়ার্টারটাকে কবর বানিয়ে রেখেছো কেন? ঘরে আলো নেই। জলজ্যান্ত মানুষগুলো সব মুর্দা হয়ে বসে আছে। যাই বলো, তোমরা বাপু আদৌ সুবিধের লোক নও।'

মামুন হেসে বললো, 'মসনবীর একটা গল্পে পড়েছিলাম, মরার আগে যে মরতে পারে সে পরমজ্ঞান লাভ করেছে।'

চোখ দুটো গোল গোল করে মুস্তফা বললেন, 'কী বললে—মরার আগে মরা? এ আবার কেমন কথা হলো? থাকগে ওসব আধ্যাত্মিক ব্যাপার। একটা জাগতিক গল্প শোন। গল্প নয় ঘটনা। এই বিকেলেই ঘটলো। তোমাদের একজন নেতা আছেন না, মৌলভী কি যেন নাম?'

ঘৃণায় বাবুর মুখটা বিকৃত হলো। অন্ধকারে কেউ লক্ষ্য করলো না। বললো, 'মৌলভী ফরিদ আহমেদের কথা বলছেন?'

মাথা নাড়লেন মুস্তফা—ঠিক বলেছো। মৌলভীই বটে, তার কথা শোন। বিকেলে অফিসে বসে আছি। তিনি এলেন। খুব তেল টেল দিলেন। তারপর বললেন, প্লেনে ওয়েস্ট পাকিস্তান যাবার এগারোটা টিকিট চাই। শুনে চমকে উঠলাম। গত একমাসে এতো টিকিট কাউকে কোন দিন দেয়া হয়নি।

দেয়াটা এ মুহূর্তে সম্ভবও নয়। বললাম, এতগুলো টিকিট দিয়ে কি হবে? বিনয়ে গলে গিয়ে তিনি বললেন, গরমের শুরুতে সপরিবারে মারী যাবার অভ্যেস তার বহু বছরের। তাই আর কি। আমি হা করে তাকিয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। লোকটা বলে কি! পাগল নাকি? বললাম, মৌলভী সাহেব, এদেশের একজন বিখ্যাত নেতা আপনি। দেশের এই দুর্দিনে আপনি মারী যাচ্ছেন হওয়া খেতে! লোকটা জবাব দিলো, আমি এক্ষুণি যাচ্ছি না। আপাতত ফ্যামেলী পাঠিয়ে দিচ্ছি। ওর মুখের ওপর আমি সোজা বলে দিলাম, দুঃখিত, কোন অবস্থাতেই দুটোর বেশি টিকিট দেয়া সম্ভব নয়। আর গরমে মারী গিয়ে সময় কাটানোর জন্যে আমি একটা টিকিটও খরচ করতে রাজী নই। কিছুতেই ছাড়বে না সে লোক। বললো, টিকিট না দিলে আমি এখান থেকে আর নড়ছি না। বললাম, আমার এয়ার কণ্ডিশণ্ড দফতর যদি আপনার পছন্দ হয় কিছুক্ষণ বসতে পারেন। তবে টিকিট পাচ্ছেন না।'

মেজর বেগ বললেন, 'এদের ঘাঁটাতে যাও কেন? আমি তো চিটাগাং ছিলাম। চার বছর ধরে ওকে দেখছি। সাপের চেয়েও ভয়ানক লোক এরা। নিজেদের জাতের সঙ্গে যারা বেইমানি করতে পারে, তাদের কখনো বিশ্বাস করবে না।'

মুস্তফা বললেন, 'তা না হয় মানলাম। এও জানি ফরমান আলী নয়তো টিক্কা খানকে ধরে সে টিকিট-এর ব্যবস্থা ঠিকই করে নেবে। তবু ভাবো, দেশের এমন দুর্দিনে তিনি হাওয়া খাবার লোভটুকু সামলাতে পারছেন না। কেমন নেতা তিনি!'

বেগ হাসলেন—'নেতা যে তিনি নন, তাঁর আচরণ থেকেই আশা করি সেটা বুঝে নিয়েছো। দেশের দুর্দিন বলতে তুমি যা বোঝাতে চাইছো, ওদের কাছে তা পরম সুদিন। এই সুদিনের অপেক্ষায় ছিলো তারা বহুদিন ধরে। এখন সে সময় এসেছে।'

বিস্মিত মেজর একটা শব্দই উচ্চারণ করলেন—'স্ট্রেঞ্জ!'

ঠিক সেই সময় বাবুর মনে হলো বাঙালিদের ভেতর যেমন ফরিদ আহমেদ আছে, তেমনি অবাঙালিদের ভেতরও মেজর বেগ আর মেজর মুস্তফারা রয়েছে। এ ধরনের ব্যতিক্রম সব সময়ই থাকে।

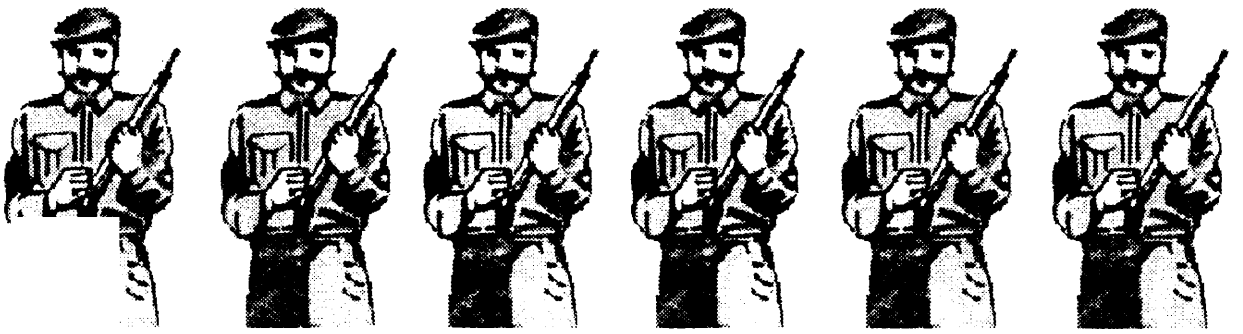

সকালে মেজর বেগকে নিয়ে মামুন শহরে বেরুলো। সেগুন বাগানের মোড়ে এসে বাবু জিপ থেকে নেমে গেলো।

সেজদি পুরানা পল্টনের একা বাড়িতে ঠিকানা দিয়েছিলো। নম্বর মিলিয়ে একটা গলির ভেতর আবিষ্কার করলো বাড়িটাকে। পুরনো আমলের রঙওঠা একতলা বাড়িটা। ভেতরে কেউ আছে কি না বাইরে থেকে বোঝার বিন্দুমাত্র উপায় নেই।

সেজদির কথা মতো বাবু দরজায় কলিং বেল প্রথমে দুবার তারপর তিনবার টিপলো। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো। কাঠের দরজার শাটার্স খুলে একজন তাকে দেখলো। ভেতরে খবর দিতে গেলো। একটু পরে সেজদি এসে দরজা খুললো। বাবুকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে আবার দরজা বন্ধ করে দিলো।

প্রায় অন্ধকার ছোট্ট একটা ঘরে ওকে নিয়ে সেজদি বসলো। বললো, 'খবর বল।'

বাবু পকেট থেকে নকশাটা বের করে দিলো। কাল সারারাত জেগে তৈরি করেছে সেটা। কাঠামোটা ক্যাপ্টেন বেগ-এর ম্যাপ থেকে নকল করেছে। দক্ষিণে কিছু নতুন এম্যুনেশন ডাম্প চিহ্নিত করা আছে ওতে। বাবু বললো, 'উত্তর আর উত্তর-পশ্চিমের ডাম্পগুলো পরে দিচ্ছি।'

সেজদি উত্তেজিত গলায় বললো, 'স্কেল ঠিক আছে তো?'

বাবু হাসলো—'ওদের নিজেদের ম্যাপ থেকে ট্রেস করেছি। ভুল হওয়া উচিত নয়।'

নকশাটা দেখতে দেখতে সেজদির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বললো, 'খুব প্রম্পট কাজ করেছিস। অন্য কোন খবর আছে?'

বাবু বললো, 'সিএনসি হামিদ খান আজ বিকেলে সাড়ে চারটা থেকে পাঁচটার মধ্যে এসে যাবে। গোপন সফর এটা। কাগজে কয়েক দিন পরে জানানো হবে।'

সেজদির ভুরু দুটো কুঁচকে গেলো—'কি জন্যে আসছে সে সম্পর্কে কিছু জানিস?'

বাবু বললো, 'সরেজমিন তদন্ত করার জন্যেই আসছে। তবে অপারেশনটা

এরা যে ভাবে চালিয়েছিলো, সিএনসি সেটা পছন্দ করবে না এটা বোঝা গেলো। তাই নতুন করে কাগজ-পত্র তৈরি করা হচ্ছে। জেনারেলকে ওরা দেখাতে চাইছে, ঢাকা শহর শান্ত আর স্বাভাবিক রয়েছে। গণ্ডগোল কিছু হচ্ছে, তবে সে সব বর্ডারে। ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী আর তার দালালরা সেখানে গণ্ডগোল বাঁধিয়ে রেখেছে।'

সেজদি গম্ভীর হয়ে গেলো —'তোর এ খবর কতখানি নির্ভরযোগ্য?'

বাবু বললো, 'কাল রাতে বহুক্ষণ মেজর মুস্তফা আর মেজর বেগ এ নিয়ে আলাপ করছিলেন। আমি আর মামুন পাশের ঘরে শুয়েছিলাম।'

ছোড়দি মাথা নেড়ে জানালো—'এ ধরনের সোর্স অবশ্য রিলায়বল। কত দিন ওরা জেনারেলের ঢাকা থাকা গোপন রাখবে?'

বাবু হিসেব করে বললো—'অন্তত চার দিন। প্রোগ্রাম থেকে তাই বুঝেছি। বুধবারের আগে কাউকে জানাবে না।'

কী যেন ভাবলো সেজদি। তারপর বললো—'তুই মঙ্গলবার এগারোটার সময় একবার আয়। আমি এক্ষুণি বেরুচ্ছি।'

সেজদির সঙ্গে বেরিয়ে এলো বাবু। বাড়িতে লোকজন আরো অনেকেই ছিলো। বাবু ওদের কাউকে দেখতে পেলো না। শুধু চলাফেরা থেকে বুঝলো এ বাড়ির সবাই অত্যন্ত সন্তর্পণে চলাফেরা করে।

পল্টনের মোড় পর্যন্ত ওরা একসঙ্গে এলো। তারপর সেজদি গেলো পুরনো ঢাকার দিকে। বাবু দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। সেজদিকে দেখলো। পরনে আধময়লা একটা মিলের শাড়ি। কাঁধে ঝোলানো একটা কাপড়ের ব্যাগ। তেল না দেয়া চুলগুলো এলোমেলো বাতাসে উড়ছে। দ্রুতপায়ে হেঁটে চলে যাচ্ছে সেজদি।

বাবু আগে প্রায়ই ভাবতো—সেজদি অমন হয়ে গেলো কেন? স্কুল কলেজে খেলার মাঠে, নাটকের মঞ্চে যে সেজদির নাম সবার মুখে মুখে ফিরতো, তার সঙ্গে এই মাত্র চলে যাওয়া সেজদির কোন মিল নেই। হঠাৎ করেই, সেজদি ওদের কাছে কেমন একটা কুয়াশার মতো হয়ে উঠেছিলো।

পার্টি নিষিদ্ধ বলে বড়দা ন্যাপ-এর হয়ে কাজ করেন। আগে বড়দা বহুবার জেল খেটেছিলেন। বড়দার মতো না হলেও ভাষা আন্দোলনের সময় থেকে মেজদাও কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে জড়িত। তারপর লেখা আর ছবি বানানোতে ব্যস্ত রইলেন। ইদানিং আবার রাজনীতিতে উৎসাহিত হয়েছেন। ওদের কারো সঙ্গে সেজদির মিল নেই। বড়দার কাছে একদিন শুনেছিলো, সেজদিরা নাকি চরমপন্থী, বড়দা ওদের লাইন ঠিক মনে করেন না।

ক্যান্টনমেন্ট ফেরার পথে দুটো চেকপোস্টে বাবুকে আটকালো। জিজ্ঞেস করলো, কোথায় যাবে। মেজর মুস্তফার নাম শুনে ছেড়ে দিলো। ঘরে না গিয়ে বাবু সোজা ক্যাপ্টেন করিমের কোয়ার্টারে চলে এলো।

ড্রইংরুমে বসে কি যেন ভাবছিলেন ক্যাপ্টেন। হাতে সিগারেট ধরা। এ্যাশট্রেতে আধাপোড়া সিগারেটের স্তুপ। রেডিয়োতে অত্যন্ত মৃদুশব্দে আকাশবাণীর দেশাত্মবোধক গান বাজছে। বাবুকে দেখে একটু হাসলেন—'এসো। খবর ভালো তো?'

বাবু ভেতরে গিয়ে বসলো। বললো—'সিএনসি আসছে খবরটা এরা গোপন রাখছে কেন?'

আধপোড়া সিগারেটটা এ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে ক্যাপ্টেন বললেন, 'সাডেন ভিজিটে আসছেন। এরা এখনো তৈরি হয়ে ওঠেনি। জেনারেলের নিরাপত্তার জন্যেই এটা করা। তাছাড়া খবরটা গোপন থাকলে জেনারেল অনেক ফ্রি চলাফেরা করতে পারবেন।'

বাবু একটু অবাক হলো—'ক্যান্টনমেন্টেও তাঁর নিরাপত্তার অভাব! এখানে সবই তো ওদের লোক?'

ক্যাপ্টেন মৃদু হাসলেন—'কে বললে সব ওদের লোক। বেলুচ রেজিমেন্ট রীতিমতো অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। ওরা এ ধরনের অপারেশন চালাতে চাইছে না। কোথাও কোথাও পাঞ্জাবিদের সঙ্গে ওদের ছোটখাটো সংঘর্ষও হয়ে গেছে।'

বাবু চমকে উঠলো—'বেলুচরা বিদ্রোহ করেছে?'

ক্যাপ্টেন বললেন, ঠিক বিদ্রোহ এখনো ঘোষণা করেনি। পাকিস্তানের প্রতি ওদের আনুগত্য আছে। তাদের বক্তব্য, নিজের দেশের অসহায় মেয়ে পুরুষ শিশুদের মারা চলবে না। তারা বলছে সৈন্য হচ্ছে বিদেশী শত্রুকে মোকাবেলা করার জন্যে। নিজের দেশের মানুষ মারার জন্যে নয়।'

বাবু বললো, 'আদেশ অমান্য করলে কোর্ট মার্শাল হবে না?'

ক্যাপ্টেন বললেন, 'অসন্তোষ সকলের ভেতরে। সবার তো কোর্ট মার্শাল সম্ভব নয়। পরে হয়তো কারো কারো হবে।'

বাবু চুপ করে রইলো। ক্যাপ্টেন কিছুক্ষণ পর নিচু গলায় বললেন, 'তোমার ইনফরমেশনের জন্যে একটা কথা বলছি। সিএনসিকে ওরা দেখাতে চায় সব কিছু শান্ত আর স্বাভাবিক আছে। বুধবার পর্যন্ত ওরা শান্তি রক্ষার আপ্রাণ চেষ্টা করবে। এর ভেতর ক্যান্টনমেন্টের আশে পাশে যে কোন এ্যাকশনই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হবে। সিএনসি তাহলে বুঝবে অবস্থাটা যত স্বাভাবিক দেখানো হচ্ছে আসলে তা নয়।

বাবু মাথা নেড়ে সায় জানালো—'সেজদিকে বলবো।'

ক্যাপ্টেন-এর কোয়ার্টার থেকে বাবু মেজর মুস্তফার বাড়িতে এলো। দেখলো মেজর বেগ শহর থেকে ফিরেছেন। তাকে আরো বেশি বিষণ্ন মনে হলো। চুপচাপ সোফায় বসে আছেন। হাতের চুরুটটা কখন নিভে গেছে খেয়াল নেই। বাবুর দিকে তাকালেন নিবর দৃষ্টিতে। বাবু বললো, 'ঢাকা কেমন দেখলেন?'

ম্লান হাসলেন মেজর—'না দেখলেই ভালো হতো। আমি এমন দৃশ্য দেখবো কল্পনাও করিনি।' একটু থেমে আপন মনে বললেন, 'আমি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধও দেখেছিলাম।'

বাবু কিছুক্ষণ কোন কথা বলতে পারলো না। মামুন বললো, 'টেবিলে তোমার খাবার দেয়া আছে। খেয়ে নাও। আমরা মুস্তফা চাচার সঙ্গে খেয়ে নিয়েছি।'

বাবু প্রশ্ন করল, 'মুস্তফা চাচা কোথায়?'

'ডিউটিতে গেছেন।' মৃদু গলায় জবাব দিলেন মেজর বেগ—'আজ সিএনসি আসবেন। সেজন্যে তিনি খুব ব্যস্ত।'

বাবু লক্ষ্য করলো শুধু মেজর মুস্তফা নয়। সবাই ব্যস্ত। রাস্তায় ব্যস্ত গাড়ির আনাগোনা। অফিসারদের ব্যস্ততা। টিক্কা খানের নির্দেশ সিএনসিকে সব স্বাভাবিক দেখাতে হবে। সিএনসি যেন বুঝতে পারেন, ইণ্ডিয়ান রেডিয়ো মিথ্যে ছাড়া সত্য কিছুই বলে না।

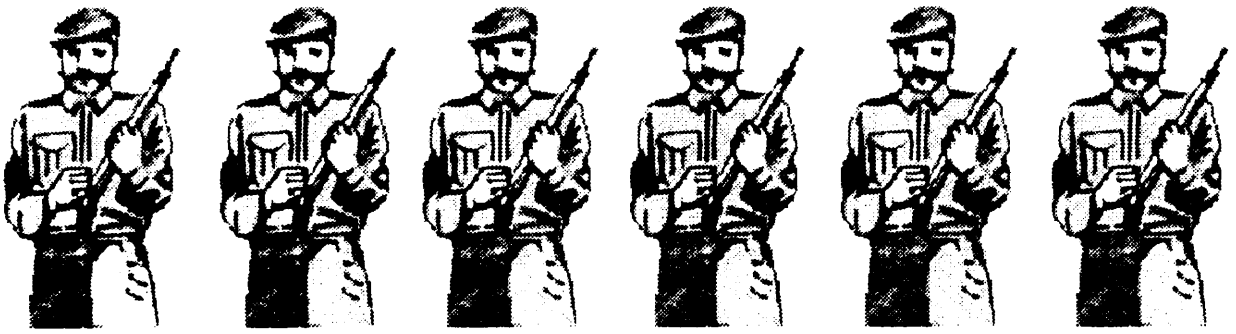

অথচ শহরে কিছুই স্বাভাবিক ছিলো না। সারা ঢাকা এক আতঙ্কের শহর। মুক্তিবাহিনী শহরে হ্যান্ডবিল ছড়িয়েছে, 'ক্যান্টনমেন্ট, এয়ারপোর্ট, রেডিয়ো সেন্টার, গভর্নর হাউস এবং অন্যান্য সামরিক ছাউনি থেকে সবাই যথাসাধ্য নিরাপদ দূরত্বে থাকুন। মুক্তিযোদ্ধা আপনার আশে পাশেই আছে।' প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ট্রেন চলাচল একেবারে বন্ধ। খবর এলো লঞ্চও বন্ধ হয়ে গেছে। চলতি লঞ্চের ওপর পাঞ্জাবিরা গুলি ছুঁড়েছে। কেউ লঞ্চ স্টীমারকে নিরাপদ মনে করছে না।

সবচেয়ে অনিরাপদ হচ্ছে কোচ সার্ভিসের বাসগুলো। বাস থেকে যাত্রীদের নামিয়ে ধরে জোর করে রক্ত নিয়ে যাচ্ছে। শরীরের সমস্ত রক্ত শুষে নিয়ে জ্ঞানহীন দেহটাকে নদীতে ভাসিয়ে দিচ্ছে। রক্ত ওদের ভীষণ দরকার। কমবাইণ্ড মিলিটারী হসপিটালে এতোটুকু জায়গা নেই। শহরের হাসাতালগুলো আহত পাঞ্জাবি সৈন্যে ভরে আছে। সাধারণ হাসপাতালেও কোন জায়গা নেই। আহতদের এখন পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে। হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কে এক ফোঁটা রক্ত নেই। আহত সৈন্যদের দিতে দিতে বহু আগেই সব শেষ

হয়ে গেছে। রক্তের জন্যে ওরা ব্লাড হাউন্ডের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে ইমার্জেন্সি মেডিকেল স্টেশন। যাকে হাতের কাছে পাচ্ছে তারই রক্ত নিচ্ছে। রক্ত নেয়ার কোন সীমা নেই। ইচ্ছে মতো নিচ্ছে। সারা শহরে রক্তলোলুপ আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

সিএনসি হামিদ খানের এ সব জানার কথা নয়। তাঁর কানে যাতে এ সব না যায়, ঢাকার সামরিক কর্তৃপক্ষের সে জন্যে চেষ্টার অন্ত নেই। জেনারেল টিক্কা খানের ব্যর্থতা আগেই ধরা পড়ে গেছে। জেনারেলদের কনফারেন্সে টিক্কা খান কথা দিয়েছিলেন, বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে অবস্থা আয়ত্তে নিয়ে আসবেন। বাহাত্তর ঘন্টায় কিছুই হলো না। তারপরে বললেন সাত দিন। তারও পরে বললেন একুশ দিন। অবস্থা শুধু দিনের পর দিন খারাপের দিকে যেতে লাগলো। টিক্কা খানের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত—খুব শিগগিরই হবে। কারণ এর চেয়েও ভয়াবহ অপারেশন চালাতে তিনি প্রস্তুত আছেন। যে ভাবেই হোক অবস্থা আয়ত্তে আনতেই হবে।

প্রেসিডেন্টের শেষ নির্দেশ টিক্কা খানের পরিষ্কার মনে আছে। পাঁচিশে মার্চ ঢাকা থেকে যাবার আগে প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন—'আই ওয়ান্ট নো ম্যান অন দিস ল্যান্ড। আই ওয়ান্ট অনলি দা ল্যাণ্ড।' যে কোন মূল্যেই হোক বাংলাদেশের মাটিটুকু হাতছাড়া করা যাবে না। টিক্কা খান সবে মাত্র 'সি' অপারেশন চালিয়েছেন। এর চেয়ে ভয়াবহ 'বি' অপারেশনের জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছেন। 'বি' অপারেশন যদি ব্যর্থ হয়, 'এ' অপারেশন চালাবেন। প্রেসিডেন্টের তাই নির্দেশ।

বাইরের দেশগুলোকে অবশ্য বলা হচ্ছে—একটু বেশিই হয়ে গেছে। এ ছাড়া উপায় ছিলো না। হিন্দুস্থানের গুপ্তচরে দেশটা ছেয়ে গেছে। অবস্থা এখন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। সকাল থেকে রাত অবধি সারাক্ষণ তারস্বরে চেঁচিয়ে ঢাকা রেডিয়ো টিক্কা খানের বাণী প্রচার করছে।

অবস্থা যে কতখানি খারাপ, সবচেয়ে ভালো জানেন টিক্কা খান নিজে। কনফারেন্স রুমের এয়ার কণ্ডিশনড্ হলে বসে ঠাণ্ডা মাথায় তিনি নতুন অপারেশনের কথা ভাবছেন। সঙ্গে রয়েছেন জেনারেল ওমর আর জেনারেল মিটঠা খান। সিএনসিকে বাঝানো হচ্ছে, যে কোন মূল্যে ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী আর এদেশী দুষ্কৃতকারীদের হাত থেকে দেশটাকে রক্ষা করতে হবে। দেরি না করে বি অপারেশন চালানো দরকার, এ কথা প্রত্যেক জেনারেলই ভাবছেন।

অফিসারদের ছুটোছুটির অন্ত নেই। মেজর মুস্তফা খাবার সময়টুকুও পাচ্ছেন না। ইমার্জেন্সির জন্যে মেজর বেগ-এর বদলির হুকুম বাতিল হয়ে গেছে। তাঁকে বলা হয়েছে চট্টগ্রাম ফিরে যেতে। একবারে ভেঙে পড়ছেন মেজর বেগ। যুদ্ধের ওপর তাঁর ভীষণ ঘৃণা। মামুনকে বলছিলেন, 'অফিসারদের ডেডবডিগুলো পাকিস্তান নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আমাকে লাস হয়েই সেখানে যেতে হবে। জীবিত অবস্থায় ফিরে যাবার কোন সম্ভাবনাই নেই।' কখনো তিনি বেঙ্গল রেজিমেন্টের

ওপরও ক্ষেপে যান—'কেন ওরা এমন করলো বলতে পারো। মেজর জিয়াকে তো আমি দেখেছি। যে সব অফিসারদের জুতোর ফিতে বাঁধার জন্যেও আলাদা এ্যাটেন্ডেন্টস ছিল সারাক্ষণ, খাবার টেবিলে দশ বারোটা আইটেমের কম থাকলে যাঁরা বিরক্ত হতেন, সে সব অফিসার বনে জঙ্গলে কাদাপানিতে ঘুরছেন পলাতকের মতো। কতদিন খেতে পাচ্ছেন না কে জানে। আমি একজন সৈন্যকে দেখেছি, জামা কাপড় ছিঁড়ে ফালা ফালা হয়ে গেছে। মুখে দাড়ি গজিয়েছে। খেতে পায়নি অনেক দিন। তোমাকে বলে বোঝাতে পারবো না, দেখে আমার কি খারাপ লেগেছিলো।' আবার যখন একেবারে অসহিষ্ণু হয়ে পড়েন তখন রীতিমতো ক্ষেপে যান—'আমাদের জেনারেলরা যা করছেন, যা ভাবছেন, সভ্যতার ইতিহাসে এর নজির নেই। আমি জানি এ সব বলা ঠিক নয়! তবু তোমার কি মনে হয় এর শাস্তি থেকে এরা বাঁচাতে পারবেন? এ দুনিয়ায় না পেলে আল্লার দরবারে ওদের বিচার হবে। একদিন সেখানে জবাবদিহি করতে হবে, কেন অকারণে এতোগুলো মানুষকে মারা হয়েছিলো।'

মেজর বেগ-এর বিষণ্নতা মামুনকে প্রভবিত করে। ওর মনে হয় লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণের মূল্যে স্বাধীনতা আসছে। শুধু কি স্বাধীনতার জন্যে সাড়ে সাত কোটি মানুষ লড়াই করছে? শুধু স্বাধীনতা নয়। পুরো সমাজব্যবস্থাটাই পাল্টাতে হবে। স্বাধীনতার পর আবার আগের অন্ধকারে ফিরে যেতে চাই না। যে শোষণের কারণে মানুষ হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছে, সেই শোষণমুক্ত সমাজ প্রয়োজন আমাদের। যদিও এর জন্যে অনেক বেশি মূল্য দিতে হচ্ছে। তবু মামুন আশাবাদী—এ দেশের সাধারণ মানুষ অস্ত্রের ব্যবহার শিখেছে।

বাবু সেজদির সঙ্গে দেখা করার জন্যে গিয়েছিলো পুরানা পল্টনের সেই বাড়িটায়। দরজায় আগের মতো শব্দ করলো। সেজদি ওকে আগের মতো ভেতরে নিয়ে বসালো। ক্যাপ্টেনের কথাগুলো সেজদিকে খুলে বললো বাবু।

সব শুনে সেজদি মৃদু হাসলো—'ভদ্রলোককে যথেষ্ট বিচক্ষণ মনে হচ্ছে। তিনি ওখানে পড়ে রয়েছেন কেন?'

বাবু বললো, 'বেরোতে পারছেন না বলে।'

সেজদি কি যেন ভাবলো। তারপর বললো, 'আমরাও তাই ভেবেছি। আজ রাতেই আমাদের ছেলেরা ক্যান্টনমেন্টে অপারেশনে যাবে। ক্যাপ্টেনকে বলিস, তিনি যদি আসতে চান সন্ধ্যে সাড়ে ছয়টায় বাজারের কাছে বাস স্ট্যান্ডে যেন পায়চারি করেন। হাতে সিগারেট থাকবে। কখনো সেটা টানবেন না। তাহলেই আমাদের ছেলে তাঁকে চিনে নেবে। যা বলার বলে দেবে।'

আবু অবাক হয়ে বললো, 'সেজদি সেটা একেবারেই অসম্ভব। ওদের ওপর কড়া নজর রাখা হয়েছে।'

মাথা নাড়লো সেজদি—'জানি। ক্যান্টনমেন্টে তুই আমাদের একটা চ্যানেল

বটে। তবে এ রকম আরো চ্যানেল আছে। সে ব্যবস্থা আমিই করবো। তুই ওঁকে খবরটা পৌঁছে দিস।'সেজদির কথা বাবুর বিশ্বাস হচ্ছিলো না। তবু ক্যাপ্টেনকে এসে বললো। কথাটা শুনে ক্যাপ্টেন বহুক্ষণ ভাবলেন। শেষে বললেন, 'বিপদের যথেষ্ট ঝুঁকি আছে। তবু আমাকে এ ঝুঁকি নিতেই হবে।'

সারা রাত বাবু ঘুমোতে পারেনি। শুয়ে শুয়ে একটার পর একটা বিস্ফোরণের শব্দ শুনলো। তারপর মেশিনগানের একটানা গুলিবৃষ্টি। মুহূর্তের বিরতি না দিয়ে চার পাঁচটা মেশিনগান একনাগাড়ে গুলি বর্ষণ করলো। তারই ফাঁকে ফাঁকে কয়েকটা বিস্ফোরণের শব্দ। একটা বেশ দূরে। সঙ্গে সঙ্গে সারা ক্যান্টনমেন্ট অন্ধকার হয়ে গেলো। বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেছে।

মেজর বেগ আর মেজর মুস্তফা বারান্দায় বসেছিলেন। অন্ধকারে এক হাত দূরের জিনিসও দেখা যাচ্ছে না। শেষে এক সময় বিস্ফোরণের শব্দ থামলো। কিছক্ষণ কট কট করে মেশিনগানগুলোও থেমে গেলো। সারা ক্যান্টনমেন্টের ভৌতিক অন্ধকারের ভেতর শুধু কয়েকটা গাড়ি অনবরত ছুটোছুটি করতে লাগলো।

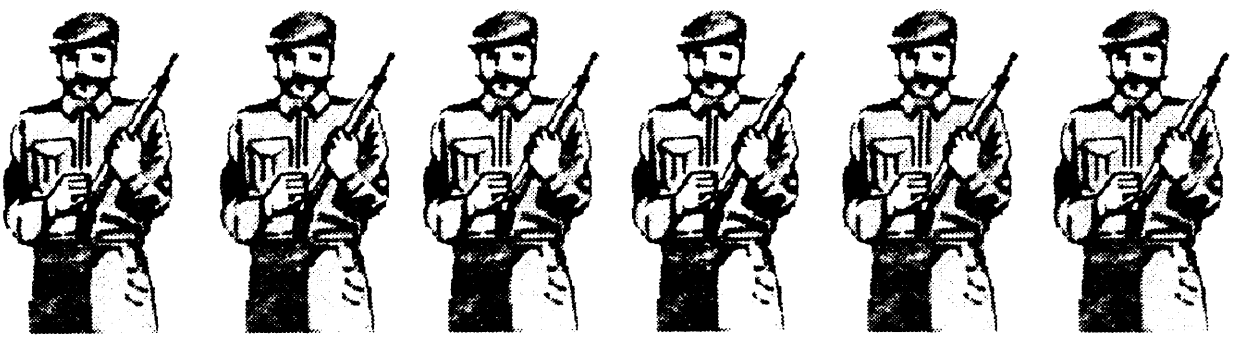

সকালে অনেক দেরিতে বাবুর ঘুম ভাঙলো। ঘড়িতে তাকিয়ে দেখলো দশটা। মুখ হাত ধুয়ে খাবার টেবিলে গেলো। ড্রইংরুমে মেজর মুস্তফা, মামুন, আর মেজর বেগ বসেছিলেন। মেজর মুস্তফার পরনে ইউনিফর্ম। বোধ হয় বাইরে যাবেন।

রইস বললো, 'স্যার সকালে কয়েকবার আপনার খোঁজ করেছিলেন।'

বাবু ভুরু কুঁচকে তাকালো—'চাচা কি বাইরে বেরোচ্ছেন?'

রইস মাথা নাড়লো—বেরিয়েছিলেন। খুব সকালে কে একজন টেলিফোন করলো, সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন। ঘন্টাখানেক হলো ফিরেছেন।'

বাবুর কথা শুনে মেজর মুস্তাফা খাবার ঘরে এলেন। বাবুকে বললেন, 'খাবার পর আমার বেডরুমে একবার এসো।'

বাবু একটু অবাক হলো। মেজর মুস্তফার মুখটা বেশ গম্ভীর মনে হচ্ছে। কথাটা বলে মেজর আর দাঁড়ালেন না। বাবুও হাতটা মুছে তার সঙ্গে ঘরে ঢুকলো।

শুধু গম্ভীর নয়, অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর মনে হলো মেজরকে। বাবু দরজা বন্ধ

করে ঘুরে দাঁড়ালো। বুকের ভেতর অজানা একটা ভয় ঢিবঢিব করতে লাগলো।

মেজর ওকে দেখলেন কিছুক্ষণ। মেজরের এ দৃষ্টির সঙ্গে বাবুর কিছুমাত্র পরিচয় নেই। অনেকগুলো প্রশ্নের ভেতর যে প্রশ্নটা ওর মনে সবচেয়ে বড় হয়ে আঘাত করলো—মেজর কি কিছু টের পেয়েছেন?

ইশারায় ওকে বসতে বললেন মেজর। আবার ওর দিকে তাকালেন। চোখে চোখ রেখে বললেন, 'ক্যাপ্টেন করিমকে তুমি চেনো কীভাবে?'

বাবু ভীষণ রকম চমকে উঠলো—'কোন ক্যাপ্টেন করিম?' নিজেকে সামলানো জন্য ও সময় নিচ্ছিলো।

মেজর আগের মতো পূর্ণদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যদি পরিচিত হয়, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট একজনই বাঙালি ক্যাপ্টেন করিম আছেন। তিনি তোমার পরিচিত।'

'না।' নিজেকে সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিয়েছে বাবু—'ক্যাপ্টেন করিম বলে কাউকে আমি চিনি না।'

যেন একটা ধাক্কা খেলেন মেজর মুস্তফা—'সত্যিই কি চেনো না? প্লীজ, আমাকে মিথ্যে বলো না।'

বাবু আবার বললো, 'আমি তাকে চিনি না।'

'কিন্তু আমাদের লোক তোমাকে কাপ্টেন করিমের কোয়ার্টারে যেতে দেখেছে।' মেজরের গলার স্বর কঠিন মনে হলো।

'কক্ষণো নয়।' বাবু প্রতিবাদ করলো—'আমি কোন ক্যাপ্টেন করিমের কোয়ার্টার চিনি না।'

মেজর সমান উত্তাপে বলে চললেন, 'মঙ্গলবার তুমি ট্রায়াঙ্গাল পার্কে চার ঘন্টা সময় কাটিয়েছো। সে সময় আমাদের লোক তোমাকে সন্দেহজনকভাবে জেনারেলদের পাঁচিলের কাছে ঘুরতে দেখেছে। এতো সময় ওখানে কাটানোর কারণটা কি?'

নিজেকে বড়ো অসহায় মনে হলো বাবুর। গলাটা বার বার শুকিয়ে যাচ্ছে। বুকের ভেতর একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি ক্রামগত পাক খেতে লাগলো। বললো, 'পার্কে তো আমি প্রত্যেক দিন বেড়াতে যাই।'

মেজর আরো কঠিন স্বরে বললেন, 'তোমার গতিবিধি সেদিন অত্যন্ত সন্দেহজনক ছিলো।'

নিজেকে আর সামলাতে পারছিলো না বাবু। অসহায়ের মতো বললো, 'পার্কে আমি শুধু বেড়াতেই যাই। কিন্ত আপনি আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলছেন কেন?"

মেজর চোখে চোখ রেখে বললেন, 'কাল রাতে জেনারেলদের কোয়ার্টারের কাছে বোমা ফেটেছে। কয়েকজন নাইট গার্ড মারা গেছে। আমরা অনুমান করছি

ক্যাপ্টেন করিম এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন।'

বাবু বললো, 'আমাকে জড়াতে চাইছেন কেন?'

মেজর বললেন, 'আজ সকালে ইনভেস্টিগেশন কমিটির জরুরি বৈঠক ছিলো। আমাকে ডেকেছিলো ওরা। তোমার সম্পর্কে যে রিপোর্ট সিক্যুরিটি গার্ড দিয়েছে, তা থেকে ওদের ধারণা জন্মেছে তুমিও এর সাথে জড়িত আছো। ওদের রিপোর্টে তোমার গতিবিধি অত্যন্ত সন্দেহজনক বলা হয়েছে।'

'আপনার কি ধারণা আমি এ ধরনের ঘৃণ্য কাজের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারি?'

'অন্যভাবে ভাবতে পারলে আমি খুশি হতাম। কিন্তু সন্দেহটা আমারও। ওদের রিপোর্টে ভুল তথ্য থাকতে পারে না।'

'আমাকে আপনার অবিশ্বাস কেন?'

'বিশ্বাস করার স্বপক্ষে আমার কোন যুক্তি নেই।'

'আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, যে বা যারা এ কাজ করুক, তারা নিশ্চয়ই ভারতীয় চর।' কথাটা বলতে গিয়ে বাবলুর গলা এতোটুকু কাঁপলো না। শান্ত স্থির গলায় বাবু বলে গেলো— 'এটা আশা করি আপনার জানা আছে, পাকিস্তানকে এ মুহূর্তে তারাই বেশি করে চাইছে, যারা ভারতের অত্যাচারে দেশ ছেড়ে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে। আমি মোহাজেরদের কথা বলছি। প্রত্যক্ষভাবে আপনাদের সাহায্যের জন্যে কোন কাজ না করলেও আমি ওদেরই একজন, এ কথা ভুলে যাবেন না। পাকিস্তানের স্বার্থের জন্যে মোহাজেররা নিঃস্বার্থভাবে কাজ করছে।'

এ কথাগুলো বলার সময় অপরিসীম একটা ঘৃণা বাবুকে আচ্ছন্ন করে রাখলো। সে ঘৃণা তার সারা চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিলো। প্রত্যেকটি কথা, যার চেয়ে ঘৃণ্য কথা সে এ মুহূর্তে আর কিছু ভাবতে পারছিলো না, তাই তাকে বলতে হলো।

বাবুর এই ঘৃণা মেজরকে অন্যভাবে প্রভাবিত করলো। মেজর শান্ত গলায় বললেন, 'আমি জানি ভারতীয়দের তুমি ঘৃণা করো। এতোটা ঘৃণা হয়তো আমিও করি না। একটু বেশি ইমোশনাল বলেই তুমি ওদের এতো ঘৃণা করো। এখন মনে হচ্ছে, ক্যাপ্টেন করিমকে কোন রকমের সহযোগিতা তুমি করতে পারো না। ওরা তোমাকে সন্দেহ করেছিলো। আমি শুধু ওদের সন্দেহের কথাটাই তোমাকে বলেছিলাম। তোমার কথা ওদের বলবো। হয়তো তোমাকে তদন্ত কমিশনের মিটিং-এ ডাকতে পারে।'

হাঁপ ছাড়তে গিয়েও বাবু পারলো না। বললো, 'ওদের মিটিং কখন?'

মুস্তফা বললেন, 'তোমাকে বলবো কখন যেতে হবে। আমি এক্ষুণি বেরোচ্ছি।'

মেজর মুস্তফা চলে গেলেন। মনের ভেতর উদ্বেগ থাকলেও বাবু এক অদ্ভুত

ধরনের তৃপ্তি পেয়েছে মেজরের কথা থেকে। ওর কাজ তাহলে ও ঠিক মতোই করতে পেরেছে। সেজদি বলেছিলেন, 'যদি কখনো ধরা পড়িস মনে করিস তোর নিজের দোষেই ধরা পড়েছিস। কাদের সঙ্গে যোগোযোগ রাখিস ঘুণাক্ষরেও বলতে পারবি না।'

ওদের অপারেশন তাহলে পুরোপুরি সফল হয়েছে। কমিশনের মিটিং-এ বাবু কি বলবে মনে মনে ভেবে রাখলো। নাটকটা আরো জমাতে হবে। মামুন সব শুনে কিছুটা ভয় পেয়ে গেছে। বললো, 'আমরা তাহলে আজই চলে যাই।'

বাবু মাথা নাড়লো—'এ মুহূর্তে যাওয়া ঠিক হবে না। ওরা সন্দেহ করবে। মেজর মুস্তফা কী বলে আগে দেখো।'

বিকেলে মেজর মুস্তফা বললেন, 'তোমাদের কাল চলে যেতে হবে। কমিশন সিদ্ধান্ত নিয়েছে কোন সিভিলিয়ান এখানে থাকতে পারবে না।'

ওরা একটু চমকালো। তবু বাবুর মনে হলো, এটাই ভালো। বললো, 'কখন যাবো?'

মেজর ম্লান গলায় বললেন, 'যদি এক্ষুণি যেতে চাও আমি আপত্তি করবো না।'

মামুন বললো, 'যেতেই যখন হবে দেরি করে লাভ কী?'

মেজর হাসলেন। এ হাসির সঙ্গে তাঁর আগের হাসির বিন্দুমাত্র মিল নেই। বাবুর পিঠে হাত রেখে মুস্তফা বললেন, 'তোমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার জন্যে আমি খুবই দুঃখিত। কমিশন আমাকে অভিযুক্ত করেছিলো বলেই ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম। এভাবে চলে যেতে হলো বলে কিছু মনে করো না।' মামুনকে বললেন, 'বাবাকে বুঝিয়ে বোলো।'

বাবু ম্লান হাসলো। মেজর মুস্তফা বললেন 'চলো, এয়ারপোর্ট অব্দি পৌঁছে দিই। একটু পরে আবার মিটিং আছে।'

বাবু আর মামুন সেদিন সন্ধ্যার দিকে বাড়ি ফিরে গেলো। মামুন বললো, 'তোমাকে যদি ঢাকা থেকে চলে যেতে হয় আমাকে জানিও। তোমার জন্যে আমি গর্বিত।'

সন্ধ্যার শেষ আলোতে বাবু বাড়ি ফিরলো। তখনও ওদের বাড়িতে আলো জ্বলেনি। বাবা বারান্দায় মার্বেল পিলারের গায়ে ঠেস দিয়ে বসেছিলেন। হিমি বসে আছে সিঁড়ির ওপর। সন্ধ্যার বিষণ্নতা ওদের দুজনের মুখে ছায়া ফেলেছে। অজানা আশঙ্কায় বুকটা কেঁপে উঠলো বাবুর। কিছুক্ষণ কোন কথা বলতে পারলো না। বাবার কাছে এসে দাঁড়ালো নিঃশব্দে।

বাবু হিমির দিকে তাকিয়ে হাসতে চেষ্টা করলো। হিমি হাসলো না। বললো, 'আব্বু চলে গেছে।'

'কোথায় গেছে?' জানতে চাইলো বাবু।

হিমি মাথা নাড়লো—'জানি না।'

'ভাইয়া কোথায় গেছে বাবা?'

বাবা শান্ত গলায় বললেন, 'ও তো বলে গেলো মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেবে।'

বাবু কিছুই বুঝতে পারলো না। বললো, 'সব খুলে বলুন বাবা। ভাইয়া হঠাৎ কেন চলে গেলো? ওর তো যাবার কথা ছিলো না।'

বাবা আরো শান্ত গলায় বললেন, 'বিপদ যখন আসে হঠাৎ করেই আসে। আমাদের বাড়ি যে পাঞ্জাবি সৈন্যরা লুট করেছে সে খবর তো তুমি জানো না। তুমি যেদিন গেলে সেদিন সন্ধ্যের দিকে তিনটে পাঞ্জাবি সেন্য এসেছিলো। একটা বাইরে গেটের কাছে দাঁড়িয়েছিলো। বাকি দুটো স্টেনগান উঁচিয়ে সোজা ওর ঘরে ঢুকে গেলো। আমরা ওর ঘরে বসেছিলাম। সৈন্য দুটো ঘরে ঢুকেই বললো, 'সবাই দেয়ালের কাছে লাইন করে দাঁড়াও। আমি বললাম, 'তোমরা কে? কেন এসেছো? একজন জবাব দিলো, আপনাদের সঙ্গে আওয়ামী লীগের যোগাযোগ ছিলো। এখনো আছে! ওদের লোকজন এ বাড়িতে আসতো। আপনারা তেইশে মার্চ পাড়ায় আওয়ামী লীগ-এর পতাকা বিলিয়েছেন। আমরা এ বাড়ি সার্চ করবো। আমি বললাম, তোমরা ভুল করেছো। কেউ তোমাদের ভুল খবর দিয়েছে। আমি কোনদিন আওয়ামী লীগ করিনি। আমি ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোতে কাজ করতাম। আরেকজন সৈন্য নির্লজ্জের মতো হাসলো। বললো, আপনাকে আমরা চিনি। আমাদের অভিযোগ আপনার ছেলের বিরুদ্ধে। সঙ্গের সৈন্যটা এর ভেতরই সার্চ শুরু করে দিয়েছে। আমি বললাম, তোমাদের সার্চ ওয়ারেন্ট আছে? ওরা জবাব দিলো, দরকার নেই। সব কিছু ওরা তছনছ করে ফেললো। একজন তোর ভাইয়ার ঠিক বুকের ওপর স্টেনগান ধরেছিলো। ওয়ার্ডরোব খুলে টাকা বের করলো লোকটা। কদিন আগে বিলু ব্যাঙ্ক থেকে সমস্ত টাকা তুলে ঘরে রেখেছিলো। সৈন্যটা বললো, এগুলো আওয়ামী লীগের টাকা। সিজ করলাম। বলে বিলুর বড়ো ব্যাগটায় টাকাগুলো ঢুকিয়ে নিলো। ওয়ার্ডরোবের ড্রয়ারে বাংলাদেশের ফ্ল্যাগ ছিলো একটা প্যাকেটে। সবশেষে সৈন্যটা সেই প্যাকেটটা বের করলো। বললো এটা কী? যে সৈন্য স্টেনগান উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছিলো সেও তাকালো। ঠিক তখনই তোর ভাইয়া এক ঝটকায় দরজা খুলে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিলো। দুটো সৈন্যই চমকে উঠে সামনের দরজা দিয়ে ছুটে গেলো। আমিও গেলাম ওদের সঙ্গে। ওরা আর ওকে খুঁজে পেলো না। যাবার সময় টাকার ব্যাগটা নিয়ে চলে গেলো। বললো, আমাদের হাত থেকে পালিয়ে কখনো বাঁচতে পারবে না। আমরা আবার আসবো। তোর ভাইয়া সারারাত আর ফেরেনি। ফজরের সময় চুপি চুপি এসে হাতব্যাগটা গুছিয়ে নিয়ে চলে গেছে। বললো, চুয়াডাঙ্গার দিকে যাচ্ছে। ওর পার্টনার দুজনও নাকি সঙ্গে যাবে।'

বাবু অবাক হয়ে শুনছিলো সব। এদিকে এতো ওলট-পালট হয়ে গেছে কিছুই সে জানে না। বললো, 'মার্শাল ল হেড কোয়ার্টারে কমপ্লেন করেন নি?'

বাবা ম্লান হাসলো—'করেছিলাম। একজন ক্যাপ্টেন এসেছিলো তদন্ত করতে। সব দেখে শুনে বললো, এগুলো বেঙ্গল রেজিমেন্টের বিদ্রোহী সৈন্যদের কাজ। ওরাই সবখানে লুটপাট করে বেড়াচ্ছে। বলার কিছুই ছিলো না। তাই চুপ করে রইলাম।' এই বলে বাবা থামলেন।

হিমি বললো, 'দিদা, আব্বু আর আসবে না?'

বাবা বললেন, 'কেন আসবে না? নিশ্চয়ই আসবে।'

বাবু হিমির দিকে তাকালো। বললো, 'হিমি তখন কি করছিলো?

বাবা বললেন, 'কাঁদছিলো। বার বার বলছিলো, আব্বুকে তোমরা মেরো না।' একটু থেমে বাবা বললেন, 'ফ্ল্যাগগুলো যদি ওরা দেখতে পেতো তাহলে নির্ঘাত ওকে গুলি করতো। ওরা একটা অজুহাত খুঁজছিলো মারার জন্যে।'

বাবু বিড়বিড় করে বললো, 'ফ্ল্যাগগুলো ও ভাবে না রাখলেও চলতো।'

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন বাবা। তরপর মৃদু গলায় বললেন, 'এক রাতের মধ্যেই ও অসম্ভব বদলে গিয়েছে। যাবার আগে আমাকে সালাম করে বললো, বাবা দোয়া করবেন। বিলু কাঁদছিলো। হিমি ঘুমিয়েছিলো। ওর ভেতর এতটুকু দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখতে পেলাম না। হিমির কপালে চুমু খেলো। বিলুকে বললো, 'দেশ স্বাধীন করে ফিরবো।'

হিমি বাবুর হাত ধরে বললো, 'কাকু, তুমি কি বাবাকে খুঁজে আনবে?'

বাবু ওকে কোলে টেনে নিয়ে বললো, 'নিশ্চয়ই আনবো মামণি। কালই তোমার আব্বুকে খুঁজতে যাবো।'

বাবা বললেন, 'তুই এতদিন কি করছিলি? বিলু বললো, সেদিন তোরা যে টি ভি প্রোগ্রাম করলি তার জন্যে একজনকে এ্যারেস্ট করেছে। একটা খবরও তো পাঠালে পারতি।'

বাবু তখন বাবাকে সব কথা বললো। সেজদির সঙ্গে দেখা হওয়া থেকে মেজর মুস্তফার পৌঁছে দেয়া পর্যন্ত। বাবা পাথরের মতো বসে রইলেন। অনেকক্ষণ পর বললেন, 'এখন কি করবি, কিছু ঠিক করেছিস?'

বাবা বললো, 'এখানে থাকা আমার জন্যে নিরাপদ নয়।'

বাবা চোখ তুলে তাকালেন—'কোথায় যাবি?

বাবু একটু ইতস্তত করলো। তারপর স্বাভাবিক গলায় জবাব দিলো—'ফ্রন্টে যাবো।'

'মানে!'—বাবা অস্ফুট আর্তনা করে উঠলেন।

বাবু শান্ত গলায় বললো, 'যুদ্ধ যাবো বাবা। এখানে থাকলে অসহায়ের মতো মরতে হবে। আপনি সেটা আটকাতে পারবেন না। তার চেয়ে যুদ্ধে গিয়ে মরাটা

অনেক ভালো। যদিও যুদ্ধে গেলেই মরতে হবে তার কোন মানে নেই। হয়তো ফিরেও আসতে পারি। সবচেয়ে বড়ো কথা, আমাকে কিছু করতে হবে। আমি ঠিক করে ফেলেছি বাবা এটুকু যদি না করি নিজের বিবেকের কাছে কি জবাব দেবো?'

বাবা বললেন, 'যখন ঠিকই করে ফেলেছো, তখন বাধা দেয়ার কোন কথা ওঠে না। জানি দিলেও তুমি শুনবে না। আমি ভাবছি আমার তিনটি ছেলেকেই হারাতে হচ্ছে।'

বাবু শান্ত গলায় বাবাকে বোঝালো—'বাবা, দেশের কথা একবার ভাবুন। এদশের মানুষদের কথাও ভাবুন। স্বাধীনতা আমাদের চাই। প্রয়োজন হলে আমাদের পুরো জেনারেশনটা শেষ হয়ে যাবে। হিমিরা রইলো। ওদের দিয়ে নতুন জেনারেশন শুরু হবে। আমাদের বংশধরদের জন্যে আমারা একটা সুন্দর দেশ রেখে যাবো। ওরা সুন্দর হয়ে বাঁচবে। এটাই কি ভালো নয় বাবা?'

বাবা বিড়বিড় করে বললেন, 'আমি খারাপ বলিনি। বলছিলাম, আমার ছেলেরা, তোমাদের মৃত্যুর সময় আমি পাশে থাকবো না। আমার এ বুড়ো বয়সটা কতখানি অভিশপ্ত দেখো। এ বয়সে অক্ষম আমাকে শুনতে হবে আমার তরুণ ছেলেদের মৃত্যুসংবাদ।'

বাবু নরম গলায় বললো, 'এটাই আপনার গর্ব বাবা। এর চেয়ে বড় গর্ব আর কি হতে পারে!'

আকাশে সন্ধ্যার আলো হারিয়ে গেলো। রাত নামলো। অন্ধকারে ঢেকে গেলো বাংলাদেশের একটি শহর। যে শহরের নাম ঢাকা। সেই শহরের একটা ছোট্ট বাড়ি। যাকে ঘিরে এক সময় অসংখ্যা গোলাপ ফুটতো চারপাশের বাগানে। সে বাগান বিধ্বস্ত হয়েছে, পঁচিশে মার্চের রাতে। সারা শহরটাই বিধ্বস্ত। মানুষগুলোও বিধ্বস্ত।

বাবার সঙ্গে অনেক রাত অবধি বাবু বসে রইলো। বিধ্বস্ত বাগানে এখনো একটা দুটো ফুল ফোটে। বাতাসের গন্ধ ছাড়ায়। একসময় পাপড়িগুলো উড়ে যায়। সরল ইউক্যালিপ্টাসের ভেজা পাতার ফাঁকে সুগন্ধ ঘনায়। নরম বাতাসে সেই গন্ধ চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ে। তবু গাছগুলো বিষণ্ন। গোলাপেরা বিষণ্ন। অন্ধকারে অসহায় বিষণ্নতা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বিদ্ধস্ত শহরের প্রায় বিধ্বস্ত বাড়িটা।

জানালার কাচ গলিয়ে ভোরের আলো এসে মেঝের ওপর পড়লো। এক টুকরো নরম রোদ দেয়ালে কমলা রঙের ছায়া ফেললো। বাবু শুয়ে শুয়ে দেখলো। মায়ের ছবিটা এখনো জানালার কাছে পড়ে আছে। দিন দিন ছবিটা কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে।

বাবা মৃদু পায়ে ঘরে ঢুকলেন। মায়ের ধুলোজমা ছবিটার চেয়েও বেশি বিবর্ণ মনে হলো বাবাকে। সারারাত জেগেছিলেন বাবা। চোখের পাতার নিচে রাতজাগার ছায়া। বাবুকে বললেন, 'শুয়ে রয়েছো কেন? উঠে পড়ো।'

বাবু উঠে বসলো। মায়ের ছবির ওপর বাবার চোখ পড়লো। বাবু বললো, 'মার ছবিটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বাবা।'

বাবা ম্লান হাসলেন। বাবু উঠে পড়লো। বাথরুমের বড়ো আয়নায় নিজেকে দেখলো। আয়নায় ধুলো জমেছে। বাবুর মনে হলো সব কিছু বর্ণহীন হয়ে যাচ্ছে। টিসু কাগজ দিয়ে আয়নাটা ঘষে ঘষে পরিষ্কার করলো। ভারী বেলজিয়াম কাচের আয়নাটা আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বাবু ভাবলো, মার ছবিটা কি কখনো এমন উজ্জ্বল হবে, অথবা বাবার বিষণ্ন মুখ!

খাবার টেবিলে গিয়ে দেখলো বাবা ওর জন্যে অপেক্ষা করছেন। চকোলেট মেশানো হরলিকস-এর গ্লাস থেকে ধোঁয়া উড়ছে। একটু আগে বাবা বানিয়েছেন।

বাবু বললো, 'আপনি বসে আছেন কেন বাবা?'

বাবা কোন কথা বললেন না। পাউরুটিতে মাখন লাগিয়ে প্লেটটা ওর দিকে এগিয়ে বললেন, 'পরিজ খাবে?'

পরিজ খেতে বাবুর ভালো লাগে না। তবু বললো, 'অল্প দিন।'

বাটিতে রাখা সেদ্ধ কোয়েকারোটস খানিকটা তুলে নিয়ে বাবা ওতে দুধ মেশালেন। চিনি মেশালেন। সুপের চামচটা ধুয়ে টেবিলে রাখলেন।

অদ্ভুত এক ধরনের অস্বস্তিতে ভুগছিলো বাবু। বাবাকে মানা করতে পারলো না—কেন এসব করছেন। তাঁর এ আন্তরিকতা সহজভাবে গ্রহণ করতে পারছিলো না। তাঁর মতো একজন সংসার উদাসীন মানুষের পক্ষে এ ধরনের আচরণ খুবই অস্বাভাবিক মনে হচ্ছিলো। তিনি কি ওকে এভাবে শেষ বিদায় জানাচ্ছেন? অসম্ভব চাপা স্বভাবের বাবাকে কোন দিন এতো কাছে পায়নি বাবু।

বাবা শান্ত গলায় জানতে চাইলেন, 'তুমি কোন্‌দিকে যাবে ঠিক করেছো?'

বাবু বললো, 'কুমিল্লার দিকে। সেজদিদের পার্টির ভালো সংগঠন রয়েছে ওখানে।'

দূরে কোথাও মেশিনগানের শব্দ শোনা গেলো। এক নাগাড়ে বেশ কিছুক্ষণ সেই শব্দ বাবুকে অনড় করে রাখলো। বাবা আরো শান্ত গলায় বললেন, 'ঠিকামতো যেতে পারবে?'

বাবু বললো, 'পার্টির একজন আমার সঙ্গে থাকবে। তাছাড়া ছোড়দাও কিছুটা পথ এগিয়ে দেবে।'

বাবা আর কোন কথা বললেন না। বাবু বললো, 'হিমিরা কোথায় বাবা?'

ইশারায় বাবা ভাইয়ার ঘরটা দেখিয়ে দিলেন। বাবু ডাকলো, 'হিমি শুনে যাও।'

হিমি এলো। বাসি গোলাপের মতো বিষণ্ন মনে হলো হিমিকে। কাছে এসে বললো, 'কেন ডেকেছো কাকু?'

হিমির চলাফেরা কথার ভঙ্গি সব কিছুতে বয়স্ক মানুষের গাম্ভীর্য। এ কদিনের

ঘটনা ওর চার বছর বয়সের সীমানা অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছে। বাবুর মনে হলো, হিমি কি আবার কোনদিন আগের মতো হতে পারবে? বললো, 'বহ্নি কি করছে হিমি?'

'ঘুমিয়েছে।' হিমি ছোট্ট জবাব দিলো।

বাবু ওকে পাশে বসালো। বললো, 'একটু চকোলেট খাও।'

হিমি চুপ করে রইলো। বাবু কাপে চকোলেট ঢেলে এগিয়ে দিলো। হিমি শান্ত গলায় আস্তে আস্তে বললো, তুমি কখন যাবে কাকু?'

'একটু পরেই যাবো মামণি।'

হিমি আরো শান্ত গলায় বললো, 'তুমি কি আব্বুকে নিয়ে আসবে?'

'নিশ্চয়ই আনবো হিমি। খুব শিগগিরই তোমার আব্বুকে আর বাবলু কাকাকে নিয়ে আসবো। তখন আমাদের আর কোন ভয় থাকবে না।'

'তখন আমাদের বাড়িতে আর মিলিটারী আসবে না?'

'না মামণি। তখন আর কোন মিলিটারী আসবে না। তুমি ভয় পেয়ো না।'

'আমি আর ভয় পাবো না।' মাথা নেড়ে বললো হিমি।

বাবা বললেন, 'তোমার কি টাকার দরকার হবে?'

বাবু বললো, 'শ' খানেকের মতো আছে।'

খাবার টেবিলে আর কোন কথা হলো না। উঠে ব্যাগটা গুছিয়ে নিলো। তেমন কোন ব্যাগ নয়। বাজার করার সাধারণ একটা চটের থলে। সেদিন সেজদি বলে দিয়েছিলেন, 'তুমি বাইরে কোথাও যাচ্ছো এটা যেন কেউ বুঝতে না পারে।' কিছুটা পথ অবশ্য ছোড়দা পৌঁছে দেবে। কিন্তু বাকি রাস্তাটুকু পার্টির সেই লোকটির সঙ্গে ওকে একাই যেতে হবে।

বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন বাবা। থলেটা হাতে করে বাবু এসে তাঁর সামনে দাঁড়ালো। বললো, 'যাচ্ছি বাবা।'

বাবা বললেন, 'এসো।' ওর হাতের ভেতর পঞ্চাশ টাকার কয়েকটা নোট গুঁজে দিলেন,—'এগুলো রাখো। দরকার হতে পারে।'

অনেক কথা গলার কাছে কাটা মুরগির মতো ছটফট করছিলো। কিছুই বলতে পারলো না। চোখ দুটো কেমন যেন জ্বালা করছে। চারপাশটা ঝাপসা হয়ে আসছে। ভাবীকে বললো, 'চলি ভাবী।'

হিমির কপালে চুমু খেলো বাবু। বললো, 'যাই মামণি।'

বাবা অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন ওর দিকে। তাঁর পা ছুঁয়ে সালাম করলো বাবু। পিঠের ওপর হাতে রাখলেন বাবা। বিড়বিড় করে বললেন, 'ভালো থেকো।'

লোহার গেটটা খুলে বাবু বাইরে এলো। হিমি হাতটা সামান্য নেড়ে বিদায় জানালো। বাবুও হাত তুললো। মনে মনে বললো, 'বিদায় বাবা, যদি বেঁচে থাকি আবার দেখা হবে। যদি বেঁচে থাকো আবার দেখা হবে।'

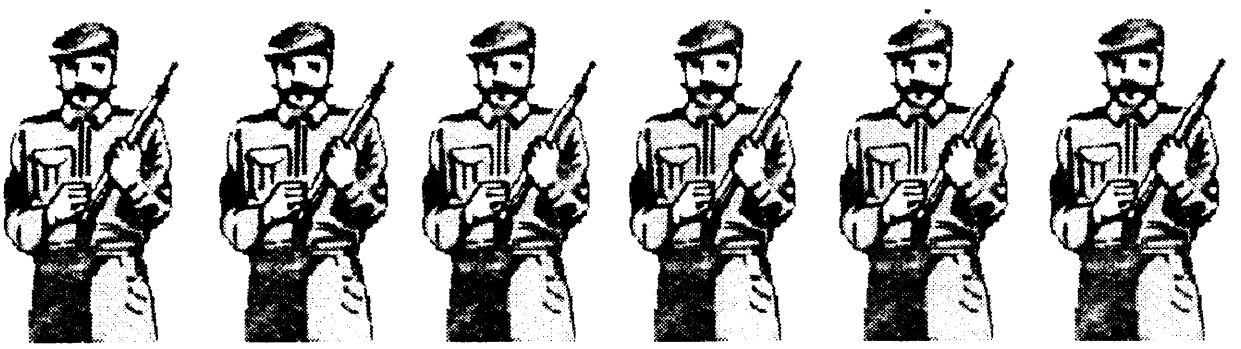

বাবু বাইরে এসে দেখলো, সারা রাস্তা খাঁ খাঁ করছে। আতঙ্কগ্রস্ত দু'একটা মানুষ ভয়ে ভয়ে কোথাও যাচ্ছে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে পাঞ্জাবি সৈন্যরা টহল দিচ্ছে। হাতে স্টেন কারবাইন। ইচ্ছে মতো যাকে তাকে যেখানে সেখানে গুলি ছুঁড়ছে। এসবের ভেতর দিয়েই যেতে হবে। যারা রাস্তায় এখনো জীবিত অবস্থায় চলাফেরা করছে সকলেই জানে, তারা যে কোন সময়ে রাস্তার দু'পাশে ইতস্তত ছড়ানো কুকুর আর মানুষের শবদেহের একটা হয়ে যেতে পারে। তবু রাস্তায় বেরোতে হয়। কেউ একেবারেই শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। কেউ খাবারের সন্ধানে যাচ্ছে, যদি কোথাও কিছু খাবার পেয়ে যায় সেই আশায়।

সারা শহর ভীষণ রকম শব্দহীন। মাঝে মাঝে কয়েকটা গুলির শব্দ ছাড়া মনেই হয় না এ শহরের কোন প্রাণ আছে। ছায়াছবিতে দেখা যেন কোন যুদ্ধ বিধ্বস্ত মৃতের শহর। তার চেয়েও বেশি ভয়াবহ। কারণ এ শহরের জীবন্ত মানুষগুলোও মৃত।

হেঁটে হেঁটে জ্যাঠাইমাদের বাড়ি আসতে বাবুর পুরো এক ঘন্টা সময় লাগলো। ছোড়দা ওর জন্যে অপেক্ষা করছিলো। বললো, 'তোর গাইড অনেকক্ষণ বসে আছে।'

পকেট থেকে একটা চিঠি বের করলো ছোড়দা। বাবু বললো, 'মেজদা কোথায়?'

ছোড়দা বললো, 'কাল রাতে চলে গেছেন। তোর জন্যে একটা চিঠি দিয়েছেন।'

চিঠি খুললো বাবু। মেজদা লিখছেন—

'আমি আপাতত কোলকাতা যাবো। বাইরের দেশগুলোতে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হচ্ছে জানা দরকার। নেতারা প্রায় সবাই এখন কোলকাতার পথে। বড়দা কোথাও যাবেন না। তিনি বলেছেন, আমাদের যে ভাবেই হোক দেশের ভেতরে থাকতে হবে। আমাদের যুদ্ধ আমাদেরই করতে হবে। কখনো ভেবো না, অন্য কেউ আমাদের হয়ে যুদ্ধ করে দেবে। তুমি মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিতে যাচ্ছো জেনে আনন্দিত হলাম। শুনেছি আওয়ামী লীগের ট্রেনিং ক্যাম্পে অন্য কোন দলের ছেলেদের ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে না। যদি নিজেরা ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা

করতে পারো ভালো। নইলে বাইরে ঘুণাক্ষরেও কখনো জানতে দিয়ো না কোন বিশেষ দলের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক আছে। সবচেয়ে বড়ো কথা এটা এক ভয়াবহ বিভ্রান্তির সময়। প্রতিমুহূর্তে বিভ্রান্ত হতে পারো। মতাদর্শে অটল থাকলেই বিভ্রান্তি কাটিয়ে উঠতে পারবে। মনে রেখো বিপ্লবকে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে নিতে হবে।'

পড়া শেষ হলে বাবু চিঠিটা ছিঁড়ে ফেললো। ছোড়দাকে বললো, 'বড়দার খবর কী? ওঁদের পার্টির অনেকে তো চলে গেছেন।'

ছোড়দা মাথা নেড়ে সায় জানালো। বললেন, 'জানি। বড়দাকে ঢাকাতেই থাকতে হবে। পার্টির নির্দেশ।'

বাবু ভেতরে গিয়ে জ্যাঠাইমার সঙ্গে দেখা করলো। বললো, 'যাচ্ছি জ্যাঠাইমা। বাবা একা রইলেন।'

জ্যাঠাইমা বললেন, 'তোর বাবাকে আমার এখানে এনে রাখবো। ওর শরীর একেবারেই ভেঙে গেছে।'

ছোড়দা গাড়ি বের করে ওকে ডাকলো। বাবু আর ওর সঙ্গী গাড়িতে উঠে বসলো। ছোড়দা বললো, 'সব ঠিক আছে তো?'

বাবু মাথা নাড়লো। বললো, 'যাবার পথে লেক সার্কাস হয়ে যাবেন।'

মামুনকে লেক সার্কাস-এর স্টাফ কোয়ার্টার থেকে ডেকে বাবু বললো, 'ফ্রন্টে যাচ্ছি। যদি পারো তুমিও চলে এসো।'

মামুন বললো, 'কয়েক দিনের ভেতরেই যাচ্ছি।'

বাবু বললো, 'কুমিল্লা অথবা নোয়াখলির দিকে থাকবো। পারলে যোগাযোগ কোরো।'

মামুন ওকে বিদায় জানালো।

দু'পাশে ধ্বংসের স্তূপ, পেছনে বিধ্বস্ত ঢাকাকে রেখে বাবুদের গাড়ি কুমিল্লার পথে এগিয়ে গেলো।

রাস্তার দু'পাশে কৃষ্ণচূড়ার গাছগুলো অজস্র ফুলে ছেয়ে আছে। ফুল নয়, মনে হয় গনগনে ফার্নেসে আগুন জ্বলছে। কালো পিচঢালা পথে কৃষ্ণচূড়ার পাপড়ি জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো ছড়িয়ে রয়েছে। ছোট ছোট বাতাসের ঘূর্ণিতে পাপড়িগুলো এলোমেলো উড়ে যায়। ঝাঁ ঝাঁ করে দুপুরের রোদ।

ছোড়দা বললো, 'কৃষ্ণচূড়ার রঙটা কি দগদগে দেখেছিস! ফুলগুলো মনে হয় লক্ষ মানুষের রক্তে ভিজে এত লাল হয়ে ফুটেছে।'

বাবু মনে মনে বললো, 'এখন সে ফুল বিপ্লবের আগুন ছড়াচ্ছে। বিপ্লবের রঙ লাল হয় ছোড়দা।'

বাবার কথা মনে হলো বাবুর। তিনি এখন এক ধূসর জগতে বাস করছেন। সকল রঙ সেখানে ফ্যাকাশে। বড়ো বেশি একা হয়ে গেলেন বাবা। মায়ের

ধুলোজমা ছবিটার মতো একা। সেই ধূসর জগৎ বাবু পেছনে ফেলে এসেছে।

পুব দিকের সড়কটার সবখানে কৃষ্ণচূড়ার আগুন জ্বলছে। সে আগুন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। বলছে পথ একটাই সামনে। এগিয়ে চলো। অনেকটা পথ যেতে হবে। দু'ঘন্টা একটানা যাওয়ার পর পথে বাধা পেলো ওরা। এলিয়টগঞ্জের বড় পুলটা মুক্তিবাহিনী উড়িয়ে দিয়েছে। পাঞ্জাবি সৈন্যরা পাশের পুরোনো পুলটা মেরামত করছে। বললো, 'এ পথে আর্মির গাড়ি ছাড়া অন্য কোন গাড়ি যেতে পারবে না।'

বাবুর সঙ্গী বললো, 'আমরা তাহলে এখানেই নেমে যাই। বাকি পথ হেঁটে যেতে হবে।'

বড়ো রাস্তা থেকে ওরা ধানক্ষেতে নেমে পড়লো। দুজনের হাতে দুটো চটের থলে। পরনে লুঙ্গি। গায়ে জামা। সাধারণ গ্রামের লোকের মতো দেখাচ্ছিলো ওদের। বাবুর থলের চেয়ে ওর সঙ্গীর থলেটা বেশ বড়ো। কিছুটা ভারীও। ওর জানতে ইচ্ছে হলো থলের ভেতর কি আছে। পরমুহূর্তে নিজেকে সংযত করলো সেজদির কথা ভেবে। সেজদি বলে দিয়েছিলেন, 'ওর কোন আচরণে অহেতুক উৎসাহ দেখিও না।' এমনকি ওর নামটাও সেজদি বলেননি। অথচ বয়সে বাবুর চেয়ে বেশি হলে তিন চার বছরের বড়ো হবে। নিতান্ত গ্রাম্য চেহারা। গ্রামের লোকদের মতো মাথাটা তেলে জবজব করছে। লুঙ্গিটাও অনেকখানি উপরে তুলে পরা।

বাবু বললো, 'পথে কি কোথাও আমরা বিশ্রাম নেবো?'

অত্যন্ত নির্লিপ্ত গলায় সঙ্গী জবাব দিলো, কি দরকার মিছেমিছি সময় নষ্ট করে।'

বাবুর মনে হলো, 'একনাগাড়ে পঁচিশ তিরিশ মাইল হাঁটা ওর সঙ্গীর জন্য এমন কোন উল্লেখযোগ্য ব্যাপার নয়। নিজেকে প্রস্তুত করে নিলো।

সূর্যটা এখন পশ্চিমের আকাশে। এদিকের গ্রামগুলোতে কোন প্রাণের সাড়া নেই। পাঞ্জাবি সৈন্যরা যেদিকেই গিয়েছে পথের দু'পাশে গাছ পাল ঘর-বসতি সব কিছু জ্বালিয়ে দিয়েছে। বাবু দেখলো ধানক্ষেতেও ওরা আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। বাবু ওর সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করলো 'ধানক্ষেত ওরা পোড়ালো কি ভাবে?'

সঙ্গী জবাব দিলো, 'ওরা প্রথম এক ধরনের পাউডার ছড়িয়ে দেয়। তারপর আগুন লাগায়। চোখের পলকে সব দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে।'

কী ভয়াবহ নিষ্ঠুরতা! সবখানে বাবু এই নিষ্ঠুরতার ছাপ দেখতে গেলো। বাবুর সঙ্গী প্রথমবারের মতো স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে কথা বললো, 'ওরা গ্রামে আগুন ছড়িয়েছে। এ আগুন ওদেরই পুড়িয়ে মারবে। নিজেদের ধ্বংস ওরা নিজেরাই ডেকেছে।'

'গ্রামের মানুষগুলো কোথায়?' জনশূন্য গ্রামগুলোর দিকে তাকিয়ে বাবু প্রশ্ন করলো।

'তৈরি হচ্ছে।' কঠিন প্রত্যয়ের সঙ্গে ওর সঙ্গী উচ্চারণ করলো। 'এবারই দেখবে যুদ্ধ কাকে বলে।'

ঘন্টা দুয়েক একটানা হাঁটার পর বাবু লক্ষ্য করলো, পাঞ্জাবি সৈন্যরা এদিকে আর আসেনি। তবে গ্রামে কোন সাড়া শব্দও নেই। ধানক্ষেতের আলপথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাবু প্রশ্ন করলো 'এ সব গ্রামে কি কোনো মানুষ নেই?'

'আছে।' সঙ্গী ছোট্ট জবাব দিলো।

সুর্য যখন আরো পশ্চিমে নেমে এলো— আকাশ রঙের মেলা বসলো, তখন ওরা বহুদূরে রাইফেলে শব্দ শুনলো।

বাবু অবাক হয়ে সঙ্গীর দিকে তাকালো। দেখলো, তার ভুরু দুটো কুঁচকে গেছে। বাবু কিছু বলার আগে ওর সঙ্গী বললো, 'মনে হচ্ছে আমাদের আজ রাতে আবিদপুরে থাকতে হবে।'

বাবু বললো, 'শব্দটা লক্ষ্য করেছেন? পাঞ্জাবি সৈন্যদের নিশ্চয়ই নয়। সম্ভবত গ্রামের কেউ করেছে।'

সঙ্গী অদ্ভুত হাসলো। বললো, 'তুমি কি পাঞ্জাবি সৈন্যদেরই একমাত্র শত্রু ভেবেছো? ওদের চরিত্রের কেউ তো আমাদের ভেতর থাকতে পারে।'

বাবু কথাটা ঠিক বুঝতে পারলো না— 'আমাদের ভেতর ওদের চরিত্র? আপনি কাদের কথা বলছেন।?'

সঙ্গী শান্ত অথচ কঠিন গলায় জবাব দিলো, 'আমাদের যুদ্ধ শুধু পাকিস্তানি সৈন্যদের বিরুদ্ধে নয়। বাঙালিদের ভেতরও ওদের মতো শোষক আছে, ওদের দালালরা আছে। এ কথা কখনো ভুলে যেও না।'

কথার ভঙ্গিতে মনে হলো না বাবুর এ ধরনের প্রশ্ন তার ভালো লেগেছে। বাবু চুপ করে রইলো। ওর মনে পড়লো মৌলভী ফরিদ আহমেদের কথা। আকাশে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। অন্ধকারের কালো ছায়া গাছের পাতার ফাঁকে, পথের পাশে ছড়ানো বুনো ঝোপের নিচে, ছোট ছোট ডোবার পাশে কচুরি পানার মতো থরে থরে জমতে লাগলো। তারপর ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়লো।

আরো পরে ফ্যাকাশে কালো আকাশে এক টুকরো চাঁদ দেখা গেলো। বাবুরা তখন আবিদপুর পৌঁছে গিয়েছে।

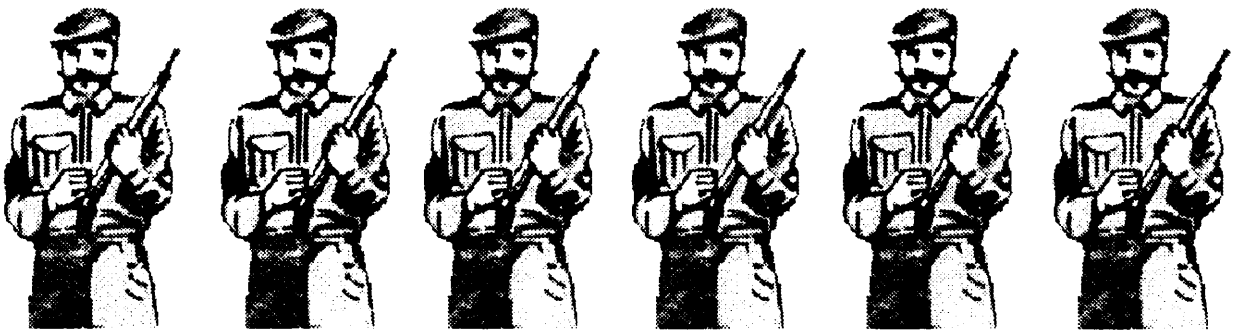

যে বাড়িতে ওরা উঠলো সেটা সাধারণ এক কৃষকের বাড়ি। একটা ঘরের চালে টিন রয়েছে, বাকি দুটো খড়ের। ওরা সবাই খড়ের একটা ঘরে বসেছিলো। অত্যন্ত নিরাভরণ বাঁশের বেড়ার ঘর। ভাঙা বেড়ার ফাঁক দিয়ে অনেকখানি আকাশ দেখা যাচ্ছে। কিছুটা চাঁদের আলোও সেই ফাঁকে ঘরে ঢুকেছে। ঘরের এককোণে একটা কেরোসিনের বাতি জ্বলছিলো।

বাবু আর ওর সঙ্গী ছাড়াও ঘরে আরো দশ আট জন লোক বসেছিলো। বেশির ভাগ যুবক, দু'একজন মধ্যবয়সীও আছে। গ্রামের সাধারণ কৃষকের সরলতা সকলের মুখে। সরল হলেও চেহারাগুলো যথেষ্ট বুদ্ধিদীপ্ত মনে হলো বাবুর। ওর সঙ্গী বললো, 'এরা সবাই আমাদের বিশিষ্ট কর্মী। বিভিন্ন গ্রাম থেকে এসেছেন।'

সবাই নিজেরা নিচু গলায় আলোচনা করছিলো। মনে হলো কারো জন্যে যেন অপেক্ষা করছে। বেশ কিছুক্ষণ পর আরো একজন এসে ঘরে ঢুকলেন। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে। লুঙ্গি আর শার্ট পরা। তাঁকে ঢুকতে দেখে সবাই কথা বন্ধ করলো। বোঝা গেলো এরই জন্যে সবাই অপেক্ষা করছিলো।

তিনি বাবুর সঙ্গীকে ইশারায় কাছে ডাকলেন। নিচু গলায় কি যেন বললেন।

সঙ্গী জবাবে কিছু বললো, যা কেউ শুনতে পেলো না। তারপর তিনি বাবুকে ডাকলেন। বাবু উঠে গেলো।

কাছে যেতে বাবুকে সেজদির কথা বললেন, 'তোমার কথা ঢাকা থেকে আমাদের জানিয়েছে। তুমি আমাদের জন্যে কী ধরনের কাজ করতে পারবে কিছু ভেবেছো? অবশ্য কিছু কাজ এর ভেতরই করেছো। আমি ভবিষ্যতের কথা জানতে চাইছি।'

বাবু বললো, 'আমি যুদ্ধ করার জন্যে এসেছি।'

তিনি মৃদু হাসলেন। বাবুর পিঠে হাত রেখে বললেন, 'আমাদের নীতি বা কাজের ধারা সম্পর্কে তোমার কোন প্রশ্ন আছে?

বাবু মাথা নাড়লো— 'না।'

তিনি আবার বললেন, 'পুরোপুরি আস্থা আছে?'

বাবু শান্ত গলায় প্রত্যয়ের সঙ্গে বললো, 'নিশ্চয়ই আছে।'

তারপর তিনি বললেন, 'দুটো গ্রাম পরে বর্ডারের ওপারে ঢাকার ছেলেদের একটা ট্রেনিং ক্যাম্প আছে। অবশ্য ওরা আমাদের দলের নয়। আমাদের কেন, কোন দলেরই নয়। তুমি ওদের সঙ্গেই থাকবে। পরে যখন দরকার হবে ডেকে নেবো। তুমি ওদের রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন করবে।' এই বলে তিনি থামলেন। বাবু গভীর আগ্রহ নিয়ে তাঁর কথা শুনছিলো। তিনি আবার মৃদু হাসলেন। বললেন, 'আজ রাতে বিশ্রাম নাও। অনেক পথ হেঁটেছো।'

বাবুর সঙ্গী বললো, 'তুমি কি এক্ষুণি ঘুমোবে?'

বাবু মাথা নেড়ে জানালো—'না।'

তিনি তখন বললেন, 'তুমি আমাদের কাছে বসতে পারো।'

একজনকে তিনি বললেন, 'মনু মিয়া, আপনাদের এলাকার খবর কিছু বলেন।'

একজন মাঝ বয়সী চাষী মন্তু মিয়া বললেন, 'একটা দুইটা মুসলিম লীগ আর জামাতের জোতদার খতম না করলে ওইবো না। মিলিটারির জুলুমে হিন্দুরা ঘর বাড়ি থুইয়া চইলা যাইতাছে। গেদু মোল্লা আর আরজত মহাজনের পোলারা সমানে লুট করতাছে। হ্যারা ধমকও দিছে, কয় মেলেটারিরে খবর দিবো।'

মন্তু মিয়ার বয়সী আরেকজন চাষী বললেন, 'খতমের লাইগা বইয়া রইছেন ক্যান মন্তু মিয়া। আর কিছু না থাক ঘরে তো দাওডা আছে। কল্লাডা নামাইয়া ফালাইলে কি হয়। গেদু মোল্লা আরজত আলীর কুখ্যাতি দশ গ্যারামের মাইনষে জানে। কম ওইত্যাচার করছে নিহি আমাগো উপরে!'

অন্য একজন বললেন, 'আমাগো পোলাগোরে কওন লাগে নাই। গ্যারামে যত জোতদার মহাজন আছিল ব্যাবাকটিরে খতম কইরা ফালাইছে। আমাগো এলাকার কোন দালাল বদমাইশ জামাত, মুসলিম লীগ পাইবেন না।'

তিনি চুপ করে সব শুনছিলেন। তাঁর মুখে মৃদু হাসি। বাবুর মনে হলো, তাঁর এ হাসিটুকু অদ্ভুত সুন্দর। তিনি বললেন, 'আক্কাস আলী বা নিতাই খুড়া যা বললেন তাই করতে হবে মন্তু মিয়া। এদিকের গ্রামে এখনো মিলিটারী আসেনি। তবে আসতে পারে। কারা আনবে জানেন? আনবে ওই জোতদার আর মহাজনের জাতেরা। গেদু মোল্লারা ঠিকই বলেছে। ওরা মিলিটারীকে পুষবে। এখন থেকেই আমাদের গ্রামগুলোকে মুক্ত এলাকা করে তাকে রক্ষা করার জন্যে তৈরি থাকতে হবে।'

একজন তরুণ বললো, 'আমরা সব সময় তৈরি আছি।'

বাবু অবাক বিস্ময়ে প্রত্যেকের কথা শুনছিলো। ওর মনে হলো এ যেন তার পরিচিত পৃথিবীর কোন সংলাপ নয়। কিছুটা বইয়ে পড়া কিছুটা কল্পনায় গড়া একটা ধূসর কুয়াশার জগৎ ধীরে ধীরে স্বচ্ছ হয়ে যাচ্ছে তার চোখের সামনে। চোখের সামনে যাদের দেখতে পাচ্ছে তারা বাস্তব জগতেরই মানুষ। বেশির ভাগ

কৃষক, কিছু শ্রমিক, সবাই তার নিজের দেশের। নিজেকে নব আবিষ্কৃত এই জগতে দেখতে পেয়ে বাবুর সাহস বহুগুণ বেড়ে গেলো। নিজের ওর বিরক্তি জন্মালো। কী ভীষণ হতাশায় সে ভুগতো। ভাবতো বঞ্চিত মানুষের মুক্তি বুঝি কোনদিন আসবে না। অথচ আজ মনে হচ্ছে মুক্তি তার হাতের মুঠোয়। শুধু এগিয়ে যেতে হবে সামনে।

সবাই যখন ফিরে গেলো তখন তিনি বাবুকে ডাকলেন। অনেক কথা বললেন। তাঁর কথা শুনতে শুনতে বাবুর মনে হলো, সে তার উনিশ বছর বয়সের সীমানা ছাড়িয়ে বহুদূর অবধি চলে এসেছে। আর ফিরে যাওয়া নয়। উনিশ বছরের অতীত মরে গেছে। মৃতের কাছে বাবু কোনদিন ফিরে যাবে না! তার সামনে ভোরের সূর্যের মতো টকটকে লাল নিশ্চিত ভবিষ্যৎ। যে ভবিষ্যৎ তাকে স্বাগত জানাচ্ছে।

ভোর বেলা সূর্য ওঠার কিছু আগে ছুটতে ছুটতে এসে একজন খবর জানালো— 'পাক সৈন্যরা গ্রামে ঢুকেছে। নদী প্রায় পার হয়ে গেছে।'

বাবু তার সঙ্গী আর তিনজন মেঝেতে মাদুর পেতে এক ঘরে শুয়েছিলো। কাল রাতে আসা নেতা শুয়েছিলেন পাশের ঘরে। কথা শুনে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। বাবুদের ঘরে আরো কয়েকজন এসে ঢুকলো। বাবু এই প্রথম দেখলো পাকিস্তানি সৈন্যের নামে কারো মুখে এতোটুকু আতঙ্কের ছায়া নেই। যেন একটা দুর্জয় অস্থিরতা। সবাই কোন নির্দেশের অপেক্ষা করছিলো।

তিনি বললেন, 'তোমরা সবাই এসেছো?'

একজন উঠোনে নেমে গেলো। বেড়ার ফাঁক দিয়ে বাবু দেখলো উঠানে অনেক মানুষের ভিড়। সবাই গ্রামের মানুষ। প্রায় সবারই খালি গা। পরনে লুঙ্গি। কোমরে গামছা বাঁধা। বারো তের বছরের ছেলে থেকে ষাট বছরের বুড়ো— সবাইকে সেই ভিড়ের ভেতর দেখতে পেলো বাবু। সিদ্ধান্ত নিতে তাঁর কয়েক মিনিট সময় লাগলো। একটা ম্যাপ খুলে তিনি গভীর মনোযোগ দিয়ে কী যেন দেখলেন। বাবু দেখলো সেই এলাকার ম্যাপ। নদীর তীরে একটা গ্রাম। তারপরই আবিদপুর। তিনি বললেন, 'যত সামনে ডিফেন্স দিতে পারো ততো ভালো। তিনটা মেশিনগান আর পাঁচটা রাইফেল তোমাদের। আমরা পেছনে তৈরি হচ্ছি।'

অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বাবুর সঙ্গী তৈরি হয়ে গেলো। একজন ভেতরের ঘর থেকে মেশিনগান আর রাইফেল বের করে আনলো। বাবু ওর সঙ্গীকে বললো, 'আমি আপনার সঙ্গে থাকবো।'

সঙ্গী তাঁর দিকে তাকালো। তিনি মৃদু হেসে বললেন, 'সাবধানে থেকো।'

হাতে রাইফেল আর মেশিনগান কাঁধে ফেলে ওরা ধানক্ষেতের ভেতর দিয়ে ছুটলো। পুবর আকাশটা ফর্সা হয়ে এসেছে। এখনো গাছের তলায় ঝোপের কাছে অন্ধকার। আকাশে শুকতারা তখনো জ্বলছিলো। ওরা বহুদূর একনাগাড়ে

ছুটতে ছুটতে বারুইদীঘির পাড়ে এসে থামলো। সামনে কয়েকটা গাছ, কিছু ঝোপঝাড়। তারপর বিরাট চর। ফাঁকা জায়গা। নদী অনেক দূরে। দুটো গানবোট তীরে থেমে আছে।

দীঘির পাড়ে ওরা পজিশন নিয়ে বসলো। আকাশটা আরো ফর্সা হলো। বাবু দেখলো দশ বারোজন সৈন্য গানবোট থেকে নেমেছে। একটু ছড়িয়ে ওরা গ্রামের দিকে এলো। বাবুর সঙ্গীরা ট্রিগারে আঙ্গুল চেপে অপেক্ষা করতে লাগলো।

রেঞ্জের ভেতর আসতেই বাবুর সঙ্গী বললো, 'ফায়ার।'

সঙ্গে সঙ্গে রাইফেল আর ভারি মেশিনগান একসঙ্গে গর্জে উঠলো। কয়েক মুহূর্তে পাঞ্জাবি সৈন্যদের হতভম্ব মনে হলো। তিনজন পড়েও গেলো। সঙ্গে সঙ্গে ওরা মাটিতে শুয়ে পড়লো। কোন পাল্টা আক্রমণের চেষ্টা না করে পাঞ্জাবি সৈন্যরা বুকে হেঁটে ক্রল করে গানবোটের দিকে সরে গেলো। বাবুদের মেশিনগান থামলো।

পাঁচটা মৃতদেহ নদীর চরে রেখে সৈন্যরা গানবোটে উঠে পড়লো। বাবুর সঙ্গীদের চোখে জয়ের উল্লাস একজন বললো, 'দ্যাখছো হাফেজ! হারামজাদারা ক্যামন ডরাইয়া গ্যাছে।'

আরেকজন বললো, 'দুইডা গানবোট কইরা দশ বারোটা আইবো ক্যান? মনে হয় ফির‍্যা এ্যাটাক করবার পারে।'

বাবুর সঙ্গী বললো, 'এ্যাটাক তো করবেই। তৈরি থাক।'

আক্রমণের জন্যে ওরা প্রস্তুত থাকলেও সৈন্যরা কিভাবে আক্রমণ করবে ওরা বুঝতে পারলো না। প্রচণ্ড শব্দে কিছু দূরে একটা মর্টারের শেল পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সবাই কিছুটা চমকে উঠলো। পর পর আরো কয়েকটা পড়লো। কোনটা পেছনে। কোনটা সামনে। বাবুর সঙ্গী বললো, 'সবাই আরো পাড়ের দিকে সরে এসো। আমাদের রিট্রিট করতে হবে।'

কয়েকটা শেল দিঘির পানিতে পড়লো। সারা দীঘিতে প্রচণ্ড কোলাহল। গাছ থেকে পাখিরা ঝাঁক বেঁধে ডাকতে ডাকতে উড়ে গেলো। আকাশটা আরো ফর্সা হয়েছে। বাবুর সঙ্গী বললো, 'ওরা আমাদের দেখতে পেয়েছে। ওদের কাছে আমি বায়নোকুলার দেখছি। বাবু তোমার জামাটা খুলে ফেলো।' এই বলে সে নিজের জামাটাও খুলে ফেললো।

বাবু অবাক হয়ে জামাটা খুললো। আরো কয়েকজন যাদের গায়ে জামা ছিলো খুলে ফেললো। বাবুর সঙ্গী তখন দীঘিতে নেমে আঁজলা ভরে কচুরীপানা তুলে আনলো। বাবু অবাক হয়ে তাকে দেখছিলো। সঙ্গী একজনকে বললো, 'এগুলোকে মানুষ বানাও।'

হেসে কয়েকজন জামার ভেতর কচুরিপানা ভরে ফুলিয়ে দিলো। মাথার কাছে কচুরিপানার কালো শেকড়গুলো বের করে দিলো।

তখনো ইতস্তত মর্টারের শেল পড়ছিলো। বাবু দেখলো, এ রকম এক ভয়াবহ যুদ্ধক্ষেত্রে যেখানে যে কেউ প্রতি মুহূর্তে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে, সেখানে মৃত্যুকে এ ধরনের উপহাস বুকের সাহস অনেক বাড়িয়ে দেয়।

বাবু হাসছিলো। আধখানা মানুষদের কয়েকখানা দীঘির পারে মাথা উঁচিয়ে আর কয়েকটা গাছের আড়ালে রেখে ওরা পেছনে ছুটলো। দীঘির উঁচু পাড়ের জন্য নদী থেকে দেখার কোন সম্ভাবনা নেই।

যখন গ্রামে ফিরলো পুবের আকাশ তখন আগুনের মতো লাল। তিনি কয়েকজনকে নিয়ে ঘরে বসেছিলেন। বাবুর সঙ্গী বললো, 'দু তিন ঘন্টার আগে ওরা গ্রামে ঢুকবে না। দীঘির ধারে মানুষগুলো যে সত্যিকারের মানুষ নয়। এটা বুঝতে ওদের বেশ কিছুটা সময় লাগবে।'

তিনি বললেন, 'গ্রামের সবাইকে তৈরি হতে বলছি। রাইফেল আমাদের খুবই কম। তবু আমাদের মানুষ আছ। অনেক মানুষ আছে। অনেক মানুষ। মানুষেরাই ওদের অস্ত্রের জবাব দেবে।'

কাল রাতের মন্তু মিয়া, আক্কাস আলী, আর নিতাই খুড়োও এসে পড়লেন।

তিনি বললেন 'খবর কি নিতাই খুড়ো?'

মন্তু মিয়া একগাল হেসে বললেন, 'ব্যাবাকতে তৈরি হইয়া বইসা রইছে।'

তখনো রকেটের গোলার শব্দ শোনা যাচ্ছিলো। তিনি বললেন, 'যতক্ষণ মর্টারের গোলার শব্দ শোনা যাচ্ছে ততোক্ষণ আমরা চুপ থাকবো। যখন ওরা থামবে তার কিছুক্ষণ পর আমাদের আক্রমণ শুরু হবে।'

আক্রমণের ধরনটা কী দু'ঘন্টা পরে বাবু টের পেলো। আবিদপুরের সীমানায় ওরা দাঁড়িয়েছিলো। কিছুক্ষণ হলো রকেট ছোঁড়া ওরা বন্ধ করেছে। বাবুর সঙ্গী কোমরের রিভালবারটা বের করে পর পর তিনবার গুলি ছুঁড়লো।

তারপরই শুরু হলো সম্মিলিত আক্রমণ। চারপাশ থেকে এবং বহুদূর থেকে পর পর অনেকগুলো রাইফেল গর্জে উঠলো, সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে শ্লোগান। একটা দুটো নয়, একশ দুশ নয়; গ্রামের পর গ্রাম জুড়ে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ শ্লোগানের শব্দে বাবু বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলো। শ্লোগানের ফাঁকে ফাঁকে গর্জে উঠছে রাইফেলগুলো।

একজন গাছের ওপর থেকে সৈন্যদের গতিবিধি লক্ষ্য করছিলো। সৈন্যরা প্রথমে হতচকিত হয়ে এলোপাথাড়ি গুলি ছুড়তে শুরু করলো। অনেকে পজিশন নিয়ে শুয়ে গেলো।

শ্লোগানের শব্দে এতটুকু বিরাম নেই। সমুদ্রের গর্জনের মতো সেই শব্দ ভীষণ অবয়বে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছিলো। বাবুর মনে হলো, গাছের ভেতের থেকে, মাটির ভেতর থেকে, আকাশের ভেতর থেকে, সমুদ্রের গর্জন ভেসে আসছে। কয়েকটা রাইফেলের শব্দকে সেই গর্জনের ঢেউয়ে কয়েকশ মনে হলো।

পাঞ্জাবি সৈন্যরা লক্ষ্যহীন কিছু গুলি ছুঁড়লো। ওদের মেশিনগানের কটকট শব্দ সেই বিশাল গর্জনের নিচে তলিয়ে গেলো। বহুক্ষণ ওরা চেষ্টা করলো সেই অলৌকিক শব্দের উৎস বন্ধ করা যায় কি না। ওরা ব্যর্থ হলো। ঘন গাছপালা আর গ্রাম দিয়ে ঘেরা ফাঁকা চরের ওপর সৈন্যগুলোকে খুবই অসহায় মনে হলো। রাইফেলে শুধু ফাঁকা আওয়াজ হচ্ছিলো না। কয়েকটা সৈন্য গুলি খেয়ে পড়েও গেলো।

দুপুর নাগাদ গ্রামে ঢোকার ব্যর্থ চেষ্টা করে সৈন্যগুলো ফিরে গেলো। গানবোট নিয়ে যাবার সময় নদীর তীরে এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়ছিলো। শেষে এক সময় ওদের গুলির শব্দ মিলিয়ে গেলো। সমুদ্রের গর্জনও শান্ত হলো।

সন্ধ্যেবেলা সবাই উঠোনে বসেছিলো। ওরা সবাই হাসছিলো। ওদের গায়ে মাটির তাজা গন্ধ। হাসিতে গাছের সবুজ সজীবতা। তিনি একপাশে বসেছিলেন। বাবুকে বললেন, 'পাকসৈন্যরা আর এদিকে আসতে সাহস করবে না!' একটু থেমে আবার বললেন, 'এভাবে প্রত্যেক গ্রামে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।'

বাবু বললো, 'আমি কি কাল যাচ্ছি?'

তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই! ওখানে তোমার পরিচিত অনেককে পাবে। ওরা সবাই ঢাকার ছেলে।'

বাবুর সঙ্গী বললো, 'ওদের ক্যাম্পটা বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসারদের পরিচিত। বেশ কিছু সাহসী ছেলে আছে ওখানে।'

অনেক রাত অবধি ওরা জেগেছিলো। মেজদার চিঠির কথা মনে পড়লো বাবুর— 'বিপ্লবকে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে নিতে হবে।'

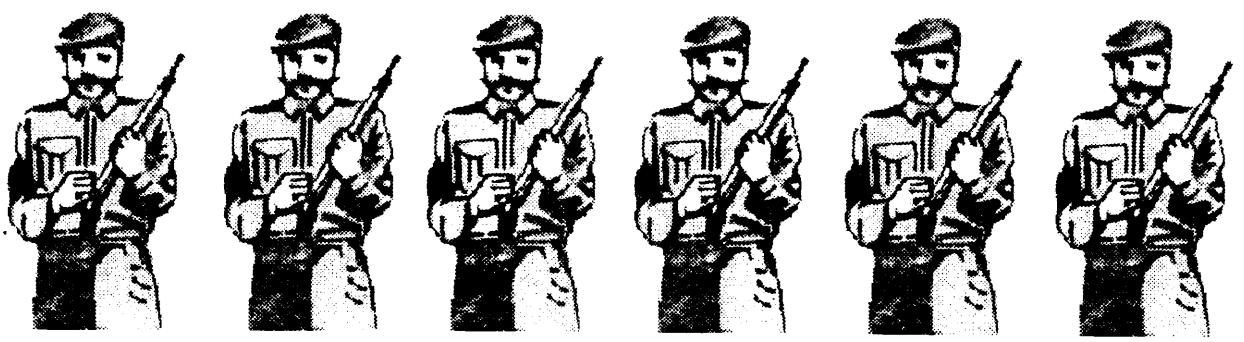

অবশেষে বাবু মুক্তিবাহিনীর সেই শিবিরে এসে পৌঁছলো। চারপাশে আম আর সুপুরি গাছের সারি। একটা ছায়াময় শান্ত পরিবেশ। মাঝখানে একটা বড়ো টিনের ঘর। তার ডানপাশে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। কতগুলো তাঁবু রয়েছে সেখানে। সামনের খোলা জায়গায় একটা লম্বা বাঁশের গায়ে বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে। গাছের পাতার মতো সবুজ, ধানের শীষের মতো সোনালি আর সূর্যের মতো লাল পতাকা।

দূরে কোথাও একটা নাম-না জানা পাখি শিষ দিচ্ছিলো মিষ্টি সুরে। আমের

গাছে এখনো মুকুলের ছোঁয়া লেগে আছে। একটা লেবু গাছে অজস্র সাদা ফুল ফুটে রয়েছে। বুক ভরে গন্ধ নিলো বাবু, গভীর প্রশান্তিতে মনটা ভরে গেলো।

সঙ্গী বললো, 'এটাই সেই শিবির।'

বিশ একুশ বছরের একজন তরুণ স্টেনগান হাতে পাহারা দিচ্ছিলো। তার পরনে জলপাই সবুজ জিনসের প্যান্ট। গায়ে সাদা গেঞ্জি। বড়ো তাঁবুর ভেতর কয়েকজন বসে আছেন। কারো পরনে লুঙ্গি শার্ট, কারো পায়জামা।

সঙ্গী আবার বললো, 'এ ক্যাম্পে বেশির ভাগই ছাত্র। কয়েকজন বেঙ্গল রেজিমেন্ট আর ইপিআরও রয়েছেন। আমাদের ক্যাপ্টেন সেকেন্ড বেঙ্গলে ছিলেন।'

বাবুকে দেখে হাসিমুখে তাঁবু থেকে একজন বেরিয়ে এলো। বাবুর চেয়ে বয়সে কিছু কম হবে। বললো, 'আসুন, আপনার অপেক্ষা করছিলাম। আমার নাম রফিক হাসান।'

বাবু হাত মেলালো। নিজের নাম বললো। হাসান মাথা নেড়ে সায় জানালো— 'আপনার নাম শুনেছি। কোথাও দেখেছি বলে মনে হচ্ছে।'

হাসানের হাতে ব্যান্ডেজ। বাবু ওদিকে তাকাতেই হাসান বললো, 'এ সব কিছু নয়। কথা বের করার জন্যে পাক ফৌজেরা কিঞ্চিৎ আপ্যায়ন করেছিলো।'

ওরা দুজন টিনের ঘরটায় গেলো। ঘরের ভেতর কয়েকজন গল্প করছিলো। একজন বাবুকে দেখেই লাফিয়ে উঠলো। বাবু চমকে উঠলো। চিৎকার করে বললো, 'শওকত ভাই, তুমি!'

হাসান অবাক চোখে তাকালো। বললো, 'চেনেন নাকি?'

'চিনি না মানে!' শওকত ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলো বাবুকে— 'তুমিও তাহলে এসে গেছো!'

বাবু কয়েক মুহূর্ত কোন কথা বলতে পারলো না। হাসান বললো, 'যোগাযোগটা ভালোই হলো তাহলে। শওকত ভাই সত্যিই ভাগ্যবান।'

শওকত বললো, 'ভাগ্যবানের বেশি কোন বিশেষণ থাকলে তাই বলো। বাবু জানো, মিনু আমাদের সঙ্গে আছে!'

বাবু অসম্ভব চমকে উঠলো— 'মিনু!'

'হ্যাঁ হ্যাঁ মিনু। আমার আগেই ও চলে এসেছিলো। উদ্ধারকর্তা হচ্ছে হাসান। তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে শুনে মিনু বললো, নিয়ে এলাম না কেন।'

বাবু বললো, 'মিনু এখন কোথায়?'

হাসান বললো, 'এখানেই আছে, ডেকে দিচ্ছি।'

অনেকগুলো বেলুনের ভিড়ে একটা রঙিন বেলুনের মতো বাতাসে ভাসছিলো বাবু। মনে হলো একটা স্বপ্নকে সে ছুঁয়ে ফেলতে যাচ্ছে, যাকে মনে হতো বহু দূর সমুদ্রের বাতিঘরের মতো। মিনু এলো। সেই মিনু, যে স্বপ্নের মতো অথবা

কুয়াশার সমুদ্রের সেই বাতিঘর।

মিনু হাসলো— 'জানতাম তুমি আসবে।'

জবাবে বাবু শুধু হাসলো। মিনু বললো, 'বাবা কোথায়? তোমার ছোট ভাই যে আর্মিতে ছিলো, সে কোথায়?'

বাবু বললো, 'বাবা বাড়িতেই রয়েছেন। ছোট ভাই সম্ভবত কুমিল্লার কোন ফ্রন্টে আছে।'

হাসান প্রশ্ন করলো, 'আপনার ছোট ভাই কোন রেজিমেন্টে ছিলো?'

'টেনথ ইস্ট বেঙ্গলে।' বাবু জবাব দিলো।

হাসান অবাক হয়ে বললো, 'আমিও যে ওখানে ছিলাম ট্রেনিংয়ে। আপনার ছোট ভাইর নাম বলুন তো?'

'বাবলু।'

'বাবলু?' বিস্ময়ে হাসান হতবাক হয়ে গেলো। 'আপনিই বাবলুর ভাই?'

এবার বাবুর বিস্ময়ের পালা— 'বাবলুকে চেনেন নাকি?'

'বারে! বাবলুকে কেন চিনবো না? আমরা যে একসঙ্গেই ছিলাম। ও তো এখন নোয়াখালির ফ্রন্টে। কাল রাতেও ওর সঙ্গে কথা বলেছি। নোয়াখালিতে আমাদের শক্ত ঘাঁটি রয়েছে।'

মিনু হেসে বললো, 'সবাই দেখি মুক্তিযোদ্ধা!'

শওকত আবেগের সঙ্গে বললো, 'আমার সবচেয়ে আনন্দের দিন এটা।'

বাবু বললো, 'সে আনন্দ আমারও।'

হাসান বললো, 'চলুন সেলিব্রেট করি। আমাদের খাবার তৈরি। আজ আমরা আমবাগানে খাবো।'

সবাই বাইরে জড়ো হয়েছে। কেউ খাচ্ছে। কেউ খাবার নিচ্ছে। দুজন দুটো বড়ো পাত্র থেকে খাবার তুলে দিচ্ছে। ওরা প্লেট হাতে এগিয়ে গেলো। ডাল ভাত একসঙ্গে খিঁচুড়ির মতো রান্না। বাবু, মিনু আর হাসান গিয়ে একটা গাছের নিচে বসলো। খুবই সাধারণ খাবার। বাবুর অদ্ভুত লাগলো খেতে। হাসান বললো, 'গ্রামের লোকেরাই আমাদের খাওয়াচ্ছে। কেউ চাল দেয়! কেউ ক্ষেতের তরকারি দেয়। কখনো জেলেরা মাছ দিয়ে যায়। এদের সহযোগিতা না পেলে মরে ভূত হয়ে যেতাম।'

মিনু বললো, 'জানো বাবু, এদের আমি যত দেখছি তত মুগ্ধ হচ্ছি।'

হাসান বললো, 'সাধারণ মানুষের বিশ্বাস আর ভালোবাসার চেয়ে বড়ো শক্তি আর কিছুই হতে পারে না। ভালোবাসা এক আশ্চর্য শক্তি।'

বাবু মৃদু হেসে বললো, 'কবিতা লেখো নাকি!'

হাসান লাল হলো— 'না, কবিতা ভালোবাসি। সেদিন টেলিভিশনে আপনাকে কবিতা পড়তে দেখছিলাম।'

মিনু বললো, 'আমাকে বাদ দিচ্ছেন কেন হাসান। ওর সঙ্গে আমিও পড়েছিলাম।'

হাসান হাসলো— 'দুজনের কবিতাই আমার ভালো লেগেছিলো।'

শওকত শব্দ করে হাসলো— 'হাসান কখনও কাউকে চটাবে না।'

বাবু বললো, 'টিভিতে আমাদের শেষ অনুষ্ঠানটার কথা মনে আছে মিনু? সেই সিরিজে বলেছিলো ইকবাল। তোমার সঙ্গে কি ওর পরিচয় ছিলো?'

মিনু অবাক হয়ে বললো, 'কেন ইকবালের কি হয়েছে?'

বাবু বললো, 'ইকবালকে ধরে নিয়ে গেছে। অকথ্য অত্যচার করেছে। বাঁচবে বলে মনে হয় না।'

মিনু চুপ করে রইলো। হাসান বললো, 'আমাদের বেঁচে থাকাটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় বিস্ময়।'

বিকেলে ওরা পুকুরের ধারে এসে বসলো। চারপাশে কলাগাছ দিয়ে ঘেরা পেছনে সুপুরি গাছের ঘন সারি। অল্প দূরে মস্ত বড়ো একট বাঁশঝাড়। দু'একটা পাখি ডাকছিলো ঝোপের ভিতর। শান্ত বাতাস পুকুরের এক কোণে ঝিরিঝিরি ঢেউ তুলেছে। পুকুরের আরেক দিকে আয়নার মতো স্থির। অদ্ভুত শান্ত একটা সৌন্দর্য ছড়িয়ে ছিলো ওদের চারপাশে। মিনু গুনগুন করে গাইলো, আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি। মাটির সাথে পুকুরের ঢেউয়ের সাথে আর ঘন গাছের দেয়ালে মিশে গেলো সেই গান।

আমগাছের আড়ালে দূরে ধানক্ষেত দেখা যাচ্ছিলো। সবুজ গাছের ফ্রেমে সন্ধ্যার লাল সুর্য ধানের সোনালি শিষের সাথে মিশে অপরূপ হয়ে ছড়িয়ে আছে। ফসল তোলার সময় এগিয়ে আসছে। বাংলাদেশের চিরকালের রূপ। অতি পরিচিত দৃশ্য। শত দুর্যোগের ভেতরও যে রূপ অম্লান।

সন্ধ্যা গভীর হলো। রাতের কালো ছায়া থরে থরে জমতে লাগলো। প্রথমে বাঁশের ঝোপে। তারপর আমের বনে, পুকুরের পাড়ের নিচে।

সে ছায়া আরো বড়ো হলো। ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়লো। অন্ধকারে ওদের অবয়ব অস্পষ্ট হয়ে গেলো। আলাদাভাবে কাউকে চেনা গেলো না। একজন এসে বললো, 'কী ব্যাপার। তোমরা সব দেখি এখানে বসে আছো? আমি ঘরে খুঁজলাম।'

শওকত বললো, 'এসো বিপ্লব। বাবু এসেছে।'

বিপ্লব বললো, 'শুনেছি।'

হাসান বললো, 'কেমন এ্যাকশন হলো বিপ্লবদা? সবাই কি ফিরেছে?'

বিপ্লব বসলো। বললো, 'সবাই ফিরেছে। আমাদের আরো গ্রেনেড দরকার। বেশ কয়েকটা গ্রেনেড আজ ফাটেনি।'

হাসান বললো, 'আজ রাতে মেজর জিয়া আসতে পারেন। একজন এসে

খবর দিয়ে গেছে।'

মেজর জিয়ার কথা শুনে বাবু রোমাঞ্চিত হলো। সাতাশে মার্চের কথা মনে হলো—যেদিন স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে প্রথম ওঁর ভাষণ শোনা গিয়েছিলো। বাবু বললো, 'হাসান কি স্বাধীন বাংলা বেতারে মেজর জিয়ার ঘোষণা শুনেছিলে?'

হাসান বললো, 'সাতাশ তারিখেই আমরা খবর পেয়েছিলাম। মেজর জিয়ার গলা শুনেছিলাম সেদিন রাতে।' একটু থেমে হাসান বললো, 'চট্টগ্রামের বেতার কেন্দ্র থেকে তিনি যদি সেই ভাষণ না দিতেন, আমরা অনেকেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতাম। অন্তত বাঙালি সৈন্য যারা ছিলাম তারা তো বটেই। তার ভাষণ শুনেই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম কি করতে হবে। আমাদের সঙ্গে অন্য কারো যোগাযোগ ছিলো না।'

শওকত বললো, 'বিপ্লব, ওই কবিতাটা পড়েছিলে—একটি কবিতার জন্যে?'

বিপ্লব বললো—'একটি কবিতা লেখা হবে।
তার জন্যে আগুনের শিখার মতন আকাশ
রাগে রী-রী করে, সমুদ্রে ডানা ঝাড়ে
দুরন্ত ঝড়, মেঘের ধূম্র জটা
খুলে খুলে পড়ে বজ্রে হাঁকডাকে
অরণ্যে সাড়া, শিকড়ে শিকড়ে
পতনের ভয় মাথা খুঁড়ে মরে
বিদ্যুৎ ফিরে তাকায়
সে আলোয় সারা তল্লাট জুড়ে
রক্তের লাল দর্পণে মুখ দেখে
ভস্মলোচন।
একটি কবিতা লেখা হয় তার জন্যে।'

অন্ধকারে একজন এসে হাসানকে নিচু গলায় কী যেন বললো। হাসান সঙ্গে সঙ্গে উঠে গেলো।

মিনু বললো, 'বিপ্লবদা এতো কবিতা যে কী করে মনে রাখো ভেবে অবাক হই।'

বিপ্লব হাসলো—'এ সব কি কখনো ভোলা যায়! মনে হয় না সব আমাদের জন্যে লেখা? নাজিম হিকমতের সেই কবিতাটা শুনেছো—

কেঁদে কেঁদে চোখে আর কান্না নেই।
আমাদের খানিক বিষণ্ন, খানিক রুক্ষ করে রেখে
চোখের জল শুকিয়েছে।
তাই আমরা ভুলেই গিয়েছি

কেমন করে ক্ষমা করতে হয়।
রক্তের নদী উজিয়ে
আমাদের নিশানা
দাঁত আর নখ দিয়ে
ছিনিয়ে নিতে হবে জয়—
কিছুই আমরা ক্ষমা করবো না।'

সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনলো সেই কবিতা। মিনু এক সময় বললো, 'পৃথিবীর সকল মুক্তিকামী নিপীড়িত মানুষের জন্যে এ কবিতা।' হাসান ফিরে এলো। বললো, 'কিছুক্ষণের ভেতর মেজর জিয়া আসছেন। গ্রেনেড তাঁর সঙ্গে আসছে। বিপ্লবদাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।'

আকাশে চাঁদ উঠলো। অন্ধকারটা ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। কিছুক্ষণ পর আমগাছের নিচে একটা জিপ থেকে মেজর জিয়া নামলেন। চাঁদের আলো আমগাছের তলায় আলোছায়ার আল্পনা এঁকেছে। সেই আল্পনার ওপর পা রাখলেন মেজর জিয়া। হাসান বাবুর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলো—'এর কথাই আপনাকে বলেছিলাম।'

মেজর বাবুর সঙ্গে হাত মেলালেন। বললেন, 'তুমি আমাদের জন্যে যা করেছো আমি সব খবরই পেয়েছি। কংগ্র্যাচুলেশন মাই বয়।' বিপ্লবকে বললেন, 'তোমার অপারেশন চমৎকার হয়েছে। আমি স্পটে গিয়েছিলাম।' মিনুকে বললেন, 'শিবিরের জীবন কেমন লাগছে?'

মিনু শুধু বললো, 'চমৎকার।'

শওকতের পিঠ চাপড়ে বললেন, 'তুমি কদিন বিশ্রাম নেবে। ওষুধ খাবে ঠিকমতো।'

শওকত হাসলো। মেজর বললেন, 'আমি যাচ্ছি। তোমাদের জন্যে আমার শুভেচ্ছা রইলো। এক সপ্তাহ পরে আবার আসবো।'

মেজর জিয়া জিপে উঠলেন। হাত নাড়লেন। ওরা সবাই হাত নাড়লো।

জিপটা চলে গেলো আমবাগানের ভেতর দিয়ে। ওরা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর আবার পুকুরের ধারে গিয়ে বসলো।

চাঁদের আলোয় দূরে কুয়াশার ফিকে চাদর ঝুলছে। শেষ বসন্ত এখন। রাতে কিছুটা শীতের আমেজ এখনো আছে। বাবু ভাবলো, পৃথিবীটা কেন এই বসন্তের রাতের মতো সুন্দর হয় না। চৈত্রের আকাশে ঘুরে বেড়ানো লোভী শকুনরা কেন বসন্তের পৃথিবীতে ছায়া ফেলে?

দূরে কোথাও কোকিল ডাকছিলো। মিনু বললো, 'এখন তো বসন্তকাল, তাই না বাবু?'

বাবু মাথা নাড়লো—'এখনও বসন্ত।'

বিপ্লব বললো, 'বুর্জোয়া শিল্পীরা বিলাসী জীবনের উপমা খোঁজে বসন্তের সাথে। অথচ দেখো এ বসন্তের রূপ কত আলাদা! কোকিলের শিস যেন কোন মুক্তিযোদ্ধার ব্যালাড। কৃষ্ণচূড়ায় রক্তের ছায়া কাঁপে। পলাশের গাছ আগুন ছড়ায়। চৈত্রের বাতাসে বারুদের গন্ধ ভাসে। তেরোশ সাতাত্তরের এই বসন্ত দেখো, কত স্বতন্ত্র! কত উজ্জ্বল। আগামী বছরের জন্যে রেখে যাচ্ছে সংগ্রামের ডাক।'

স্বতন্ত্র সেই চৈত্র শেষের রাত আরো গভীর হলো। ওরা সে রাতে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছিলো বসন্তের এক উজ্জ্বল গ্রামে। যেখানে কৃষ্ণচূড়ায় রক্তের ছায়া, পলাশে আগুনের স্পর্শ, বাতাসে বারুদের গন্ধ।

শেষ রাতে ওরা ক্যাম্পে ফিরে গেলো। বহুরাত অবধি জেগেছিলো বাবু। ঘুমিয়েছিলো শেষ রাতে।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিলো বাবু। সেই স্বপ্নটাই দেখলো, একদিন যে স্বপ্ন ওকে আতঙ্কের রাজ্যে ছুঁড়ে দিয়েছিলো। এবার একই স্বপ্ন দেখলো—তবে অন্য ভাবে।

বিশাল আকাশে ঝুলছে রুপোলি চাঁদ। একটা কালো মেঘ আগের মতো ঢেকে দিলো শান্ত চাঁদটাকে। নরম রুপোলি চাঁদটা হারিয়ে গিয়ে সব কিছু আগের মতো অন্ধকার হয়ে গেলো। তারপর ঝড় উঠলো। গোলাপ বাগানে ইউক্যালিপটাসের সারিতে, সারি সারি সুপুরি গাছে, পুকুরের শান্ত পানিতে ঝড়ো বাতাসে উদ্দাম হয়ে বয়ে গেলো।

তারপর বিধ্বস্ত পৃথিবীতে পাতা ঝরা গাছগুলো দাঁড়িয়ে রইলো সারি সারি সাজানো ধারালো বর্শার মতো। আরো বাতাস এলো। মেঘগুলোকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললো।

সবশেষে সূর্য উঠলো। জ্বলন্ত ইস্পাতের গোলকের মতো টকটকে লাল সূর্য। অসম্ভব লাল সুর্য। সে লাল গলে পড়লো সবুজ গাছের ভিড়ে, ফসলের সোনালি মাঠে।

বাবু এতদিনে স্বপ্নের অর্থ খুঁজে পেলো।

নুলিয়াছড়ির সোনার পাহাড়

অলংকরণ : হাশেম খান

নেলী খালার জলপাই-সবুজ চিঠি

সূর্যটা এখন ঠিক মাথার ওপরে। আমাদের রূপলাল লেনের পুরোনো বাড়িটার বিশাল ছাদের কোথাও একরত্তি ছায়া নেই। গোটা ছাদ জুড়ে ঝাঁ-ঝাঁ রোদ। পাশের বাড়ির চৌধুরীদের কামরাঙ্গা গাছের ডালে কয়েকটা পাতিকাক মাঝে মাঝে অলস গলায় ডাকছে। খুব একটা বাতাসও নেই। গোটা আকাশটা জুন মাসের গনগনে রোদে ঝলসে যাচ্ছে।

বাবু আর আমি চিলেকোঠায় বসেছিলাম। আট দিন আগে বাবু আমেরিকা থেকে এসেছে। ওখানে মিসৌরীর এক স্কুলে পড়ে। ওর বাবা, অর্থাৎ আমার মেজকাকা ওয়াশিংটনে আমাদের এ্যাম্বেসিতে কাজ করেন। বলতে গেলে আমি এক রকম জোর করেই বাবাকে দিয়ে মেজকাকাকে চিঠি লিখিয়ে বাবুকে এনেছি। নইলে গরমের লম্বা ছুটিটা একা আমার কী করে যে কাটতো ভেবে পাই না।

আমি ক্লাস নাইনে পড়ি। ক'দিন আগে আমাদের হাফ ইয়ারলি পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। আগের মতো আমি ফার্স্ট হয়েছি। স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে আমার মিশতে ইচ্ছে করে না। ক্লাসে ফাস্ট হই বলে সবাই আমাকে হিংসে করে। আড়ালে বলে, আমার নাকি দেমাগে মাটিতে পা পড়ে না। আমি তো কাউকে ফার্স্ট হতে বারণ করি নি। রকিবুল ফি বছর ওদের বাড়িতে স্যারদের নেমন্তন্ন করে খাওয়ায়। ওর বাবা মস্ত বড়ো ব্যবসায়ী। প্রায়ই বিদেশে ঘোরেন। আর রকিবুল স্যারদের কলম, রুমাল এসব প্রেজেন্ট করে। ওর বাবা নাকি সিঙ্গাপুর না হংকং থেকে ওসব আনেন। তবু রকিবুল সেকেন্ডের ওপরে উঠতে পারে নি। সারা ক্লাসে ও আমার নামে বাজে কথা বলে বেড়ায়। ক্লাসের ছেলেরাও ওর নামে অজ্ঞান। তাই বাবু ছাড়া আমার আর কোনো বন্ধু নেই।

দু'বছর আগে বাবু আমেরিকা গিয়েছিলো। তখন ও দেখতে ছিলো অসম্ভব ফর্সা আর রোগা। এখন ও আগের চেয়ে অনেক লম্বা— শরীরটাও ভালো হয়ে গেছে। ফর্সা রঙটা এখন আর ফ্যাকাশে মনে হয় না। নীল জিনসের ট্রাউজার আর সেইন্ট-এর ছাপঅলা গেঞ্জি পরা বাবুকে আমেরিকান ছবির কাউবয়দের

মতো মনে হয়। তবে এখনো আমার সঙ্গে পাঞ্জায় হেরে যায়।

গত আট দিন আমরা সারা দিন সারা রাত শুধু কথা বলেছি। আমাদের যতো কথা ছিলো, এ ক'দিনে সব বলা হয়ে গেছে। বাবু এখন চিলেকোঠার খাটে বসে 'এ্যাডভেঞ্চার অব হাকলবেরী ফিন' পড়ছে। আর আমি বাবার পুরোনো ইজি চেয়ারে শুয়ে ভাবছিলাম হাক ফিনের জীবনটা কী মজা করেই না কেটেছে! ওর মতো যদি বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতে পারতাম, তাহলে বেশ হতো। একটা ছোট্ট নৌকা নিয়ে সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে বঙ্গোপসাগরে চলে যেতাম। আর এমন একটা নির্জন দ্বীপ আবিষ্কার করে ফেলতাম, যেখানে মড়ার খুলি আঁকা গাছের নিচে আগেকার দিনের হার্মাদদের লুকিয়ে রাখা দারুণ সব গুপ্তধন রয়েছে। কিন্তু একা কী করে যাই! হাক ফিন একা এ্যাডভেঞ্চার করে নি। ওর সঙ্গে নিগ্রো চাকরটা ছিলো। আমার সঙ্গে বাবু থাকলে বেশ হতো। বাবুকে এ কথা বললে ও এক্ষুনি হেসে খুন হবে, আর রাতে খাবার টেবিলে বাবা-মাকে বলে দেবে। তবে হাক ফিনের বইটা যে বাবুর ভালো লাগছে, সেটা আমি ঠিক টের পেয়েছি। মাঝে মাঝে ও মুখ টিপে হাসছে আর আকাশের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবছে।

গত মাসে ভাইয়ার একখানা চিঠি পেয়েছিলাম। কোত্থেকে লিখেছে বুঝতে পারি নি। চিঠিতে ভাইয়া কখনো নিজের ঠিকানা লেখে না। এর আগে ভাইয়ার আরো দুটো চিঠি পেয়েছিলাম আমি। একটা চিঠির খামের উপর পোস্ট অফিসের সিল পড়তে পেরেছিলাম আমি। বাংলাদেশে রাঙ্গাপানি নামে যে কোনো জায়গা আছে আমি জানতাম না। সার্ভের প্রকাণ্ড ম্যাপ খুঁজে বের করেছি। চট্টগ্রামের পাহাড়ের ভেতর একটা থানার নাম হচ্ছে রাঙ্গাপানি। চা বাগান আছে সেখানে। ভাইয়া চা বাগানে কী করছে বুঝি না। বাবাকে আমি জিজ্ঞেস করতে পারি নি। ভাইয়া তিন বারই চিঠিতে বারণ করেছে, বাবাকে যেন চিঠির কথা না বলি। প্রথম চিঠিটা শুধু মাকে দেখিয়েছিলাম। ভাইয়াকে আমার দারুণ রহস্যময় মনে হয়।

ভাইয়ার শেষ চিঠিটা আমি বাবুকে দেখিয়েছি। বাবুকে চিঠি দেখাতে তো আর বারণ করে নি ভাইয়া। শুধু বলেছে গোপন রাখতে। আমি জানি বাবু গোপন রাখবে। কারণ আমার মতো বাবুরও কোনো বন্ধু নেই। ওর সব কথা আমাকেই শুনতে হয়। বাবু চিঠি পড়ে গম্ভীর হয়ে বলেছিলো, 'অপুদা বিপ্লবীদের দলে ঢুকেছে।' আমার কাছে ভাইয়া তখন আরো রহস্যময় হয়ে গেলো। আমি ভেবেছিলাম ভাইয়া বুঝি রবিনহুডের মতো একটা কিছু করছে। বাবুকে প্রশ্ন করেছিলাম, 'তুমি কী করে বুঝলে?' বাবু আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করেছে, 'অপুদা তোমাকে যে বইগুলো পড়ার কথা বলেছে, পড়েছো?' ভাইয়া আমাকে বলেছিলো, ওর আলমারির নিচের তাকে যে বইগুলো আছে গরমের ছুটিতে যেন

সেগুলো পড়ি। আমি শুধু 'যে গল্পের শেষ নেই', আর 'ইস্পাত' পড়েছি। আরেকটা শুরু করেছিলাম, কিছুই বুঝি নি। তাছাড়া চুপচাপ বসে পরীক্ষার পড়ার মতো প্রবন্ধের বই আমি বেশিক্ষণ পড়তে পারি না।

বাবু আমাকে বিপ্লবীদের অনেক কথা বলেছে। ও নাকি সিনেমায় দেখেছে বলিভিয়া, গুয়াটেমালা আর মেক্সিকোর বিপ্লবীরা কীভাবে কাজ করে। আমার একবার ইচ্ছে হয়েছিলো বাবুকে বলি— 'চলো, আমরাও বিপ্লবীদের দলে যোগ দিই।' বাবু যদি মাকে বলে দেয়, সেই ভয়ে বলি নি।

প্রায় তিন বছর হতে চললো, ভাইয়া বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। বাবা তখন এমন গম্ভীর থাকতেন যে, ভয়ে তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারতাম না। মা লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদতেন। একদিন মাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ভাইয়ার কথা। মা কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছিলেন, 'তোর বাবার সঙ্গে মতের মিল হয় নি বলে ও বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে।' একটু পরে মা বিড়বিড় করে বলেছিলেন, 'অপু এখন নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখেছে।' মাকে যখন আমি ভাইয়ার প্রথম চিঠিটা দেখালাম, তখন মার চোখে অদ্ভুত এক আনন্দ ছড়িয়ে পড়েছিলো, যা আমি কোনোদিন দেখি নি।

ভাইয়া আমার চেয়ে আট বছরের বড়ো। তার ছোট আমার এক বোন ছিলো। ও নাকি জন্মাবার পর মাত্র ছ'মাস বেঁচেছিলো। বাড়িতে এখন আমি একা। মাঝে মাঝে ডিজনীর এ্যাডভেঞ্চারও একঘেয়ে মনে হয়। নিজের পায়ে দাঁড়াবার আগে যে কিছু করা যাবে না, এটা আমি পরিষ্কার বুঝেছি। বাবা বিকেলে মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে চাইনিজ চেকার খেলেন। তাতে কি আর সময় কাটানো যায়!

দূরে আমাদের স্কুলের ঘড়িটায় বারোটার ঘন্টা বাজলো। এক দুই করে আমি নয় পর্যন্ত গুনে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। ঘন্টা-বুড়ো পিটারের ক্লান্ত চেহারাটা মনে পড়লো। গলি দিয়ে ফেরিঅলারা লেস ফিতা, ঢাকাই শাড়ি বলে সুর করে ডেকে যাচ্ছিলো। আমি জানি ঢাকাই শাড়িঅলা বুড়ো হাতেমালি এখন চৌধুরীভিলার গাড়ি বারান্দার নিচে বসে গামছা ঘুরিয়ে বাতাস খাচ্ছে। কামরাঙ্গা গাছের কাকগুলো ডেকে ডেকে ক্লান্ত হয়ে এখন বসে ঝিমুচ্ছে।

গত বছর এ সময়ে ছোট নানু আর নেলী খালা এসেছিলেন আমাদের বাড়িতে। আমাদের বাড়ির অনেক দিনের জমে থাকা গম্ভীর, গুমোট বাতাস নেলী খালা চোখের পলকে উড়িয়ে দিলেন। ছোট নানু ফরেন সার্ভিসে ছিলেন। রিটায়ার করে বহু দিন পর দেশে ফিরেছেন। নেলী খালার প্রায় পুরো জীবনটাই বিদেশে কেটেছে। মা বলেছেন, নেলী খালার বয়স নাকি এখন সাতাশ। ছোট নানু কয়েক দিন থেকে কক্সবাজারে তাঁর নিজের বাড়িতে চলে গিয়েছেন। নেলী খালা গরমের ছুটির একটানা দু'মাস আমাদের সঙ্গে ছিলেন।

বাবুকে নেলী খালার সব কথা বলে ফেলেছি। মার সঙ্গে রোজ এক বার করে নেলী খালার ঝগড়া হতো। নেলী খালা ছেলেদের মতো চুল কেটেছেন বলে মার রাগ, মার পছন্দ করা পাত্রকে নেলী খালা বিয়ে করবেন না বলে রাগ, নেলী খালা চাকরি না করে ব্যবসা করবেন বলে রাগ— এতো রাগ নিয়ে মা সারাক্ষণ নেলী খালার ওপর টং হয়ে থাকতেন। মা যতো রাগতেন, নেলী খালা ততো হাসতেন। আর মাকে আরো চটাতেন। একদিন নেলী খালা বললেন, 'জানো শানুপা, আমাদের ল্যান্ডলেডি মিসেস থম্পসন লেখাপড়া তেমন কিছু করেন নি। অথচ নিজে দু'দুটো দোকান চালান, ক্যাশ দেখেন, লাইসেন্স রিনিউ করানোর জন্যে ছুটোছুটি করেন। তুমি এতো সব ডিগ্রী নিয়ে জামান সাহেবের হেঁশেল ঠেলবে আর বসে বসে মোটা হবে, এটা কেমনতরো কথা!' শুনে বাবা হেসে বললেন, 'আমার ওপর দোষ চাপিও না নেলী, এক বার চাকরির কথা বলাতে সাত দিন তোমার বোন আমার সঙ্গে কথা বলে নি।' আর মা রেগেমেগে বললেন, 'দ্যাখো, আমাকে চটাবে না কিন্তু। শেষে আমি অনর্থ করবো।' মোটা হবার কথা বললে মা ভীষণ রেগে যেতেন। 'মেয়েদের কাজ মেয়েদের করা উচিত। মেয়ে হয়ে ছেলেদের কাজে নাক গলানো আমি একদম পছন্দ করি না।'

নেলী খালা মাকে বলতেন, 'এখনো তুমি এক্কেবারে সেকেলে রয়ে গেছো। কাজই যখন করবে না, তখন ডিগ্রী নেয়ার কী দরকার ছিলো?' বাবা গম্ভীর হয়ে বলতেন, 'ডিগ্রী ছাড়া তোমার বোনকে আমি বিয়ে করতাম ভেবেছো?' নেলী খালা হেসে গুঁড়িয়ে যেতেন। 'এখন নিশ্চই আপনার মনে হচ্ছে ডিগ্রী থাকা আর না থাকা দুটোই শানুপার জন্যে সমান।' মা তখন এতো রেগে যেতেন যে কোনো কথা বলতে পারতেন না। উঠে গিয়ে রান্নাঘরে ক্ষেন্তির মাকে ঝেড়ে বকতেন, 'এতো বেলা হলো, এখনো তোমার...।'

মা যখন হার মানতেন, নেলী খালা তখন আমাকে নিয়ে পড়তেন। বলতেন, 'সকালবেলা ঝুপঝাপ করে কটা ডন আর বৈঠক করলেই শরীর ভালো থাকে না। তোমাকে তো খেলতে যেতে দেখি না আবির?'

আমি বলতাম, 'মাঠ কোথায় যে খেলতে যাবো? স্কুল খোলা থাকলে মাঝে মাঝে বাস্কেটবল প্র্যাকটিস করি।' শুনে নেলী খালা— 'কুছ পরোয়া নেই' বলে মিস্তিরি ডাকিয়ে তিন দিনের ভেতর আমাদের ছাদে টেবিল টেনিস খেলার টেবিল বানিয়ে ফেললেন। আমি শিরীষ কাগজ ঘষে টেবিলটা মসৃণ করলাম। নেলী খালা রং লাগালেন। তারপর সকাল-বিকেল টেবিল টেনিস, দুপুরে এয়ার গান দিয়ে চাঁদমারি তাক করা, ক্রসওয়ার্ড পাযল—এসব সমানে চলতে লাগলো। সন্ধেয় বাবা ঘরে ফিরলে নেলী খালা মার সঙ্গে খুনসুটি করতেন। আর রাতে বাবা, মা, আমি, নেলী খালা সবাই মিলে চাইনিজ চেকার খেলে গরমের ছুটির দুটো মাস যে কীভাবে কাটিয়ে দিলাম টেরই পেলাম না।

একদিন কক্সবাজার থেকে নানুর চিঠি পেয়ে নেলী খালা হুট করে চলে গেলেন। যাবার সময় মার সে কি ফোঁসফোঁস কান্না আর উপদেশ— 'নেলী, এটা বিলেত নয়, ঠিকমতো চলাফেরা করিস, আমার পছন্দমতো যখন বিয়ে করবি না, তখন নিজে দেখেশুনে একটা বিয়ে কর। মামারও তো বয়স হয়েছে। মামী বেঁচে থাকলে—' বলে মা আঁচলে চোখ মুছেছিলেন। মার কাণ্ডকারখানা দেখে আমার হাসি পেলেও নেলী খালা চলে যাচ্ছেন ভাবতে গিয়ে বুকের ভেতরটা কেমন যেন করছিলো।

'তুমি কিসসু ভেবো না শানুপা। আমি ঠিক থাকবো।' এই বলে নেলী খালা মার গালে আর আমার কপালে চুমো খেয়ে গাড়িতে উঠলেন। নেলী খালা চলে যাবার পর আমাদের পুরোনো বাড়িটা যেন আরো একা, সময়গুলো যেন আরো বিষণ্ন হয়ে গেলো। আমি আবার আগের মতো দশটা-চারটা স্কুলে যেতে শুরু করলাম।

মা বলেন, নেলী খালার নাকি বড়ো ভুলো মন। মা এরকম অনেক কথাই বলেন। তবে যখন নেলী খালাকে এভাবে বকেন, তখন আমার ভালো লাগে না। আমি মাকে বলি, 'ভুলো মন হলে তোমাকে মাসে দুটো করে চিঠি লিখতো না।' মা তখন পান চিবুতে চিবুতে একগাল হেসে বলেন, 'ও তো মামার বকুনি খেয়ে লেখে। আর আমার চিঠির জবাব না দিলে আমিই বা লিখবো কেন বল!' নেলী খালা বাবা-মা দু'জনকেই আগের মতো হাসি-খুশি করে দিয়ে গেছেন।

জলপাই-সবুজ কাগজে মাকে চিঠি লিখতেন নেলী খালা। আমি মাকে বলে সব চিঠিই পড়তাম। দেখতাম, আমার কথা কী লিখেছেন, আর তিনি নিজে কী 'উদভুট্টি কাণ্ড' করলেন। মার ভাষায় নেলী খালা নতুন যা কিছু করেন সব নাকি 'উদভুট্টি কাণ্ড'। চিঠি পড়ে পান চিবুনো বন্ধ করে মা খুব গম্ভীর মুখে বাবাকে পড়তে দিতেন, 'দেখ, নেলীর কাণ্ডখানা দেখ।' বাবা পড়ে হাসতেন। আর মা রেগে যেতেন, 'হেসো না বাপু। ওর এসব উদভুট্টি কাণ্ড দেখে গা জ্বলে যায়। মামাটাও দিন দিন কী যেন হচ্ছেন!' বাবা হেসে বলতেন, 'মন্দ কি। নেলী নতুন কিছু করছে। ওকে উৎসাহ দেয়া উচিত। আমাদের এখানে এমনটি আগে কখনো হয় নি।' শুনে মা আরো রেগে যেতেন। বলতেন, 'মামাকে দুটো কড়া কথা লিখতে হবে।' নেলী খালা সব চিঠিতে আমাকে চুমো পাঠাবেন আর একটা 'উদভুট্টি কাণ্ড' করার কথা লিখবেন— যেটা পড়ে মা রেগে যাবেন আর বাবা হাসবেন।

একদিন নেলী খালা লিখলেন, 'শানুপা, ডিমের কারবারে সুবিধে করতে পারছি না। পাইকারগুলো বিট্রে করছে। তাছাড়া এখানে কোল্ড স্টোরেজ সিস্টেম নেই। প্রচুর লোকসান হচ্ছে।' মা চিঠিখানা জোরে জোরে পড়ে শোনালেন বাবাকে। তারপর বললেন, 'কেমন, আগে বলি নি এটা বিলেত নয়? তখন তো

কানেই গেলো না। বোঝ এখন!' তারপর আরেক চিঠিতে নেলী খালা লিখলেন— 'ভারি বিচ্ছিরি রকমের ঝিমুনি ধরেছে মুরগিগুলোকে। নামমাত্র দামে ছেড়ে দিতে হচ্ছে। মুরগির ব্যবসা গুটিয়ে ফেলবো।' মা একগাল হেসে বাবাকে বললেন, 'যাক বাপু, এ্যাদ্দিনে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। ব্যবসার ভূত তাহলে নেলীর ঘাড় থেকে নেমেছে।' বাবা শুনে মুখ টিপে হাসলেন।

মাকে বেশিদিন হাঁপ ছেড়ে বাঁচতে হলো না। নেলী খালা পরের চিঠিতেই লিখলেন— 'চমৎকার বাজার পেয়েছি। তরকারির ব্যবসা শুরু করেছি। গ্রাম থেকে জীপে করে এনে শহরে ছাড়বো। সহজে নষ্ট হবার ভয় নেই। চমৎকার হবে! কী বলো শানুপা?' মা তক্ষুনি গোল রিমের চশমাটা পরে মুখ কালো করে নেলী খালাকে লিখলেন, 'নেলী, তুমি তো কখনো আমার পরামর্শ গ্রহণ কর নাই। তোমার ভালো-মন্দ তুমিই বোঝ। তবে মেয়ে মানুষের ব্যবসা করাটা আমি ভালো মনে করি না। আমার কথা যখন শুনিবে না তখন তোমার যাহা খুশি করিতে পার। মামী বাঁচিয়া থাকিলে কখনো এইরূপ হইতে দিতেন না। আমি এখনো বলি, তুমি লেখাপড়া শিখিয়াছ। যদিও তোমার বিচার-বুদ্ধির উপর আমার যথেষ্ট আস্থা নাই, তবুও বলি নিজে দেখিয়া শুনিয়া একটি বিবাহ কর। নতুবা বল তো আমরা পাত্র দেখি। মামা কোনো দিন এ বিষয়ে ভাবিবেন না বলিয়া যেন পণ করিয়াছেন।'

মার এ ধরনের গুরুগম্ভীর চিঠির জবাবে নেলী খালা লিখলেন, 'শানুপা, এতো সুন্দরভাবে কাজ এগুচ্ছে যে কী বলবো! ইচ্ছে করছে তোমাকে এনে দেখাই। দশ-বারোটা গ্রাম ঘুরে ভেজিটেবল সংগ্রহ করা ভারি থ্রিলিং ব্যাপার। আর দর-দস্তুরের মতো মজার জিনিস দুটো নেই। তুমি যদি দেখতে শানুপা, তাহলে তোমারও শেয়ারে নেমে যেতে ইচ্ছে করতো।' চিঠি পড়ে মা তো বাবাকেই একচোট বকলেন, 'তুমি তো নেলীকে কিছুই লিখবে না। ওর আক্কেলখানা কি, দেখ তো! আমার নাকি তরকারি বেচতে ইচ্ছে করবে। ভাবো দেখি ব্যাপারটা!'

বাবা খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে খুব গম্ভীর হয়ে মাকে ভালো করে দেখে বললেন, 'মানাবে। খুব একটা খারাপ লাগবে না।'

কথাটা শুনে আমার এতো হাসি পেলো যে, ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে হলো। মা রেগেমেগে দু'দিন বাবার সঙ্গে কথা বললেন না।

অনেক দিন হল নেলী খালার চিঠি আসছে না। বাবু ছাড়া আমাকে কেউ চিঠি লেখে না। অথচ চিঠি পেতে আমার খুব ভালো লাগে। নেলী খালার চিঠিগুলোতে যদিও মজার মজার কথা থাকে, কিন্তু আমার জন্যে শুধু একটা করে চুমো। বাবুর চিঠি সবটাই আমার। আমি বার বার পড়ি। তারপর লম্বা একটা চিঠি লিখে পনেরো দিন অপেক্ষা করি। ওর চিঠি পেতে এক দিন দেরি হলেও আমার ভীষণ রাগ হয়।

দমকল আপিসের পেটা ঘড়িতে দুটোর ঘন্টা বাজলো। বাবু বইটা শেষ করে হাসি হাসি মুখে আমার দিকে তাকালো। আমি বললাম, 'কেমন লাগলো?' বাবু শুধু বললো, 'চমৎকার!'

স্কুল না থাকলে আমরা বারোটা বাজার আগেই দুপুরের খাবার খাই। বিকেলে বাবা এলে জলখাবার। মা তখন লুচি, নয় ভাসা-পরোটা ভাজেন। আলুর দম তৈরি করেন। মা চমৎকার রান্না করেন। খাবার টেবিলে বসে বাবু এত প্রশংসা করে যে, মা লাল-টাল হয়ে ওর পাতে দুটোর বদলে চারটা মাছের টুকরো তুলে দেন। আমার তখন খুব হাসি পায়। মার বকুনির ভয়ে খাবার টেবিলে হাসা যায় না।

বাবু হাই তুলে বললো, 'আজ প্রচুর খাওয়া হয়ে গেছে।'

আমি বললাম, 'ঘুম পেলে ঘুমিয়ে নাও।'

ও মাথা নাড়লো— 'আমি দিনে ঘুমোই না।'

বাবু আকাশের দিকে তাকিয়ে ঘুড়ি ওড়া দেখছিলো। একটা ঘুড়ি সুতো ছিঁড়ে ভাসতে ভাসতে দূরে চলে গেলো। বাবু বললো, 'আমরা যদি হাক ফিনের মতো একটা এ্যাডভেঞ্চার করতে পারতাম, তাহলে দারুণ মজা হতো।'

আমি বললাম, 'তুমি তো ক'দিন পরই চলে যাবে। আমার তখন খারাপ লাগবে। একা থাকতে আমার খুব কষ্ট হয়। মনে হয় ভাইয়ার মতো কোথাও বেরিয়ে যাই।'

বাবু কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললো, 'তোমাকে তো বলেছি আবির, কলাম্বিয়াতে আমার কোনো বন্ধু নেই। তোমার চিঠি পেলে কী যে ভালো লাগে! তুমি খুব সুন্দর লিখতে পারো। আমি তোমার মতো লিখতে পারি না।'

'তুমি কি আমার কথা খুব ভাবো বাবু?'— আমি মনে মনে কথাগুলো বললাম।

বাবু কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর একটু হেসে বললো, 'আমাদের দুটো মেয়ে বন্ধু থাকলে খুব মজা হতো।'

আমি হেসে ফেললাম— 'ওখানে তো তোমার বান্ধবীর অভাব হবার কথা নয়।'

বাবু আগের মতো হেসে মাথা নাড়লো— 'ওখানকার মেয়েদের আমার ভালো লাগে না।'

গরমের দুপুরগুলো এতো বড় যে কাটতেই চায় না। চারিদিক কেমন সুমসাম। একটা ঘুমঘুম ভাব। চারপাশের দালান, কার্নিশে বসা শালিক, এখানে সেখানে একটা দুটো গাছের মাথা— সব কিছু যেন গরমে ক্লান্ত হয়ে ঝিমুচ্ছে। চিলেকোঠার পুরোনো ফ্যানটা পুরো স্পীডে কটকট শব্দ করে ঘুরছে। মনে হচ্ছে ফ্যানের ভেতর থেকেও গরম বাতাস বেরুচ্ছে।

বাবু বললো, 'তোমার নেলী খালা তো তোমাকে খুব ভালোবাসেন।'

আমি বললাম, 'বাসে। তবে নেলী খালা আমাকে তো চিঠি লেখে না।'

বাবু একটু গম্ভীর হয়ে বললো, 'এখানে তো তুমি ভালোই আছো। মা বাবা আছেন, নেলী খালা আছেন। ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়াতে পারো। ওখানে ডরমেটরিতে থেকে একা আমার সময়গুলো কীভাবে কাটে একবার ভাবো তো!'

আমি একা থাকি বলে একা থাকার কষ্ট সব সময় অনুভব করি। ওকে বললাম, 'বাবা বলেছে ইশকুল ফাইনালের পর আমাকে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দেবে। তারপর আমরা একসঙ্গে থাকবো।'

বাবু হেসে বললো, 'সে তো দু'বছর পরের কথা। এখন যে দু'মাস একসঙ্গে থাকবো, একটা কিছু তো করতে হবে। এভাবে ঘরে বসে আর কদ্দিন কাটাবো?'

আমি বললাম, 'কাল চলো, নদীর ওপারে যাবো। নৌকোয় ঘুরে বেড়াতে আমার খুব ভালো লাগে।'

চিলেকোঠার ছায়াটা ছাদের ওপর আস্তে আস্তে লম্বা হয়ে পড়লো। রোদের ঝাঁঝটা একটু কমে এলো। চৌধুরীদের কামরাঙ্গা গাছের কাকগুলো আর আমাদের ছাদের কার্নিশের ছায়ায় বসা শালিকগুলো উড়ে চলে গেলো। আকাশে একটা দুটো ঘুড়ি উড়তে শুরু করলো। আমি আর বাবু তখন টেবিল টেনিস খেলতে গেলাম।

ভাগ্যিস গত বছর নেলী খালা টেবিলটা বানিয়েছিলেন। রঙটা একটু ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। কিন্তু এখনো আগের মতো মসৃণ রয়েছে। ক্ষেন্তির মা রোজ দু'বেলা টেবিলটা মুছে রাখে। বলে, 'মেম খালাম্মা যখন আবার আসবেক তখন মোকে বোকবেক। আমি বাপু তার মদ্দি নেই।' তারপর বলে, 'আহা, কী ভালো ছিলেক গো মেম খালাম্মা! যাবার বেলায় মোকে নুকিয়ে দশটে টাকা দিলেক বটে। আর ক্ষেন্তির জন্যে একখান বাহারি বোম্বাই শাড়ি। শাড়িখান আমি তুলে রেখেচি। হ্যাগো ছোট মেয়া, আবার কবে আসবেক গো মেম খালাম্মা?'

ক্ষেন্তির মা নেলী খালাকে বলে 'মেম খালা'। প্রথম দিন দেখে গালে হাত দিয়ে মাকে বলেছিলো, 'ও আম্মা, আপনার বুনটিকে দেখে মেম নোকের পারা মনে লয় গো।' নেলী খালা শুনে হেসে কুটোপাটি! বললেন, 'তাহলে আমাকে তুমি মেমই ডেকো।'

'নেলী খালা গতবারের মতো যদি এবারও আসতেন, তাহলে খুব মজা হতো।' খেলতে খেলতে কথাটা বাবুকে বললাম। বাবু শুনে দারুণ খুশি হয়ে বললো, 'তাহলে আজই একটা চিঠি লিখে দাও।'

আমার চিঠি লেখার আগেই নেলী খালার চিঠি এসে গেলো। বিকেলে খাবার টেবিলে যখন ফুলকো লুচি দিয়ে ডিমের কালিয়া খাচ্ছি, তখন দেখলাম মার চেহারাটা খুব গম্ভীর। বাবা বাবুকে বললেন, 'কি বাবু, কেমন লাগছে সব?'

বাবুর মুখে তখন আস্ত একখানা লুচি। কথা বলার মতো অবস্থা ছিলো না। ও শুধু ঘাড় নাড়লো। আমি হাসি চাপতে গিয়ে ফিক করে হেসে ফেললাম। মা কটমট করে আমার দিকে তাকালেন। বাবু মুখের লুচিটা সাবাড় করে মাকে বললো, 'কী চমৎকার কালিয়া! আমি জীবনেও এতো চমৎকার রান্না খাই নি।' আমি মার দিকে তাকালাম। নির্ঘাত একগাল হেসে বাবুর পাতে আরেক চামচ তুলে দেবেন। কিন্তু মা হাসলেন না। লালও হলেন না। যেন কথাটা তাঁর কানেই যায় নি। গম্ভীর হয়ে বাবাকে বললেন, 'নেলীর চিঠি এসেছে।'

আমি বাবার দিকে তাকালাম। আগের মতো বাবা নিশ্চয়ই মাকে পড়তে বলবেন। বাবা খেতে খেতে বললেন, 'কী লিখেছে?'

বাবার খাওয়া শেষ হয়ে এসেছে। মা নিজে না পড়ে চিঠিখানা বাবার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'পড়ে দেখো।'

হাত ধুয়ে বাবা চিঠিখানা পড়লেন। পড়তে পড়তে তাঁর কপালে ভাঁজ পড়লো। আগের মতো চিঠি শেষ করে হাসলেন না। বরং গম্ভীর হয়ে মাকে বললেন, 'এ কাজটা নেলী ভালো করে নি।'

মা উদাস গলায় বললেন, 'তুমি তো এ্যাদ্দিন গা করো নি। নেলী কোনদিনই বা ভালো কাজ করেছিলো! মামার জন্যে কষ্ট হচ্ছে আমার। বুড়ো বয়সে এরকম টানা-হ্যাঁচড়া!'

বাবা বললেন, 'মামার মত দেয়া উচিত হয় নি।'

আমি আর বাবু দু'জন দু'জনের দিকে তাকালাম। বাবুর চোখে প্রশ্ন। আমারও। বাবু আমাকে ইশারা করে জিজ্ঞেস করতে বললো। আমি ঢোক গিলে মাকে বললাম, 'মা, নেলী খালার কী হয়েছে।'

মা মহা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'হবে আর কি! মাথায় ভূত চেপেছে।'

বাবা আমার দিকে তাকালেন— 'তোমার নেলী খালা কক্সবাজারের বাড়িটা বিক্রি করে দিয়ে কোথায় কোন নুলিয়াছড়িতে একটা অনেক দিনের পুরোনো জমিদার বাড়ি কিনেছে। কক্সবাজার থেকে তিরিশ মাইলের মতো দক্ষিণে সমুদ্রের তীরে। বার্মার বর্ডার নাকি ওখান থেকে মাত্র পাঁচ মাইল দূরে।'

মা বললেন, 'আর বাড়িরও বলিহারি যাই। আশেপাশে আধ মাইলের ভেতর কোনো জনমানুষ নেই। নেলী নাকি ওটাকে সরাইখানা বানাবে। পেয়িংগেস্ট রাখবে। শুনে পিত্তি জ্বলে যায়।'

বাবা কিছু না বলে উঠে চলে গেলেন। বোঝা গেলো নেলী খালার এই 'উদভুট্টি কাণ্ড'খানা বাবাও পছন্দ করেন নি। আমার কাছে সবকিছু ঝাপসা মনে হলো।

রাতে খাবার পর মা যখন পান চিবুতে চিবুতে আমাকে ডেকে তাকের ওপর থেকে দোক্তার কৌটোটা নামিয়ে আনতে বললেন, তখন আমি বললাম, 'নেলী

খালার চিঠিটা পড়তে দেবে মা?'

'আলমারির মাথায় রেখেছি, আবার হারায় না যেন। ওতে নেলীর নতুন ঠিকানা লেখা আছে।'

নেলী খালার চিঠি নিয়ে এক ছুটে আমার ঘরে এলাম। বাবু সেখানে আমার জন্যে বসে ছিলো। চার পাতার মস্ত চিঠি। দু'জন হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। চিঠির সবটাই সেই অচেনা নুলিয়াছড়ির বর্ণনা। নেলী খালা যেভাবে লিখেছেন, মনে হয় না বাংলাদেশে এতো সুন্দর আর রহস্যময় কোনো জায়গা থাকতে পারে। চিঠির শেষ ক'লাইন পড়ে আমি আর বাবু দু'জন একসঙ্গে দু'জনের দিকে চোখ তুলে তাকালাম! নেলী খালা লিখেছেন, 'আবিরের তো পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। এই গরমে ওকে রূপলাল লেনের গলিতে আটকে রাখার কোনো মানে হয় না। ছেলেটাকে তুমি যেভাবে আঁচলের তলায় রেখে দিয়েছো, ভবিষ্যতে ও কোনোদিন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে না। ছুটির ক'টা দিন আমার কাছে থাকুক। সমুদ্রের বাতাসে শরীরটাও ভালো হবে। আসছে রোববার দুপুরে আমি ওকে আনার জন্যে চট্টগ্রাম স্টেশনে থাকবো। তোমার কর্তার নিশ্চয়ই অমত হবে না।' এরপর নেলী খালা বাবার কথা লিখেছেন।

চিঠি পড়া শেষ করে দু'জন চুপচাপ বসে রইলাম। আমি কী বলবো ভেবে পেলাম না। নেলী খালার জলপাই-সবুজ রঙের চিঠিটাকে মনে হলো ভূমধ্যসাগরের কোনো জলপাই দ্বীপে যাবার ডাক এসেছে। বাবু কী যেন ভাবলো। তারপর আস্তে আস্তে বললো, 'তুমি তাহলে নুলিয়াছড়ি যাচ্ছো?'

ওর গলটা কেমন যেন বিষণ্ন মনে হলো। আমি ওর কাঁধে হাত রাখলাম। বললাম, 'তোমাকে বাদ দিয়ে নয়।'

বাবু হাসলো। হাসলে ওকে ভারি সুন্দর দেখায়। বললো, 'রোববারের আর তিন দিন।'

পরদিন সকালে খাবার টেবিলে মাকে বললাম, 'মা, নেলী খালা যে আমাকে যেতে বলেছে তুমি বলো নি কেন?

মা রুটিতে মাখন লাগাতে লাগাতে বললেন, 'বলি নি আমার ঘাট হয়েছে। যাও, রোববার সকালের ট্রেনে উঠে আমায় কেতাথ করো।'

আমি বললাম, 'বাবুও আমার সঙ্গে যাবে।'

বাবা বললেন, 'তা তো যাবেই। ও এখানে একা থাকবে নাকি! তোমাদের যাবার ব্যাপারে কাল রাতে তোমার মার সঙ্গে কথা বলেছি। নেলীকে আমি আজই টেলিগ্রাম করে দেবো।'

তারপর দুটো দিন যেন চোখের পলকে কেটে গেলো। আমি আর বাবু সারাদিন টেবিল টেনিস, চাইনিজ চেকার খেলে আর নানারকম প্ল্যান কষে সময় কাটিয়ে দিলাম। মা সারাক্ষণ পেছনে লেগে রইলেন— 'জামাকাপড় কী নিতে

হবে, সব কি আমাকে করতে হবে? আচার আর ডালের বড়ির কথা যাবার সময় যেন ভুলে যেও না।'

একগাদা লটবহর নিয়ে মা-বাবা রোববার কাক-ভোরে আমাদের ট্রেনে তুলে দিতে এলেন। মা ফোঁসফোঁস কান্না জুড়ে দিলেন। ট্রেন চলতে শুরু করলো। বাবা হাত নাড়লেন। বললেন, 'নেলীকে টেলিগ্রাম করতে বোলো।'

প্ল্যাটফর্মটা যতোক্ষণ দেখা গেলো, ততোক্ষণ মা আর বাবাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। মার জন্যে আমার কষ্ট হলো। মা সবার জন্যে এতো ভাবেন যে সামান্য কিছুতেই কেঁদে ফেলেন। মা-বাবাকে ছেড়ে এই প্রথম আমি বাইরে যাচ্ছি। যখন প্ল্যাটফর্মটা আর দেখা গেলো না, তখন আমি কামরার ভেতরে তাকালাম। বাবু জিনিসপত্র সব গুটিয়ে রেখে আমার পাশে এসে বসলো। কানের কাছে মুখ এনে ফিস্‌ফিস্ করে বললো, 'আমরা সত্যিই তাহলে নুলিয়াছড়ি যাচ্ছি।'

আমিও তেমনি তেমনি ফিস্‌ফিস্ করে বললাম, 'না, জলপাই দ্বীপ!'

নুলিয়াছড়ির অভিশপ্ত বাড়ি

স্টেশনে শ্যাওলা-সবুজ রঙের শাড়ি পরা নেলী খালাকে দেখামাত্র সারা পথের একঘেয়েমির কথা সঙ্গে সঙ্গে ভুলে গেলাম। ট্রেনে উঠলে প্রথম দিকে আমার ভালো লাগলেও শেষে মনে হয় পথ ফুরোলেই বাঁচি। ট্রেনটা আস্তে আস্তে থামছিলো। নেলী খালা এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিলেন। আমি জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে ডাকলাম 'নেলী খালা!'

নেলী খালা আমাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে চলন্ত কামরার সঙ্গে দৌড়োতে শুরু করলেন। প্ল্যাটফর্মের ওপর মস্ত বড়ো এক ট্রাঙ্কের ওপর পানদান হাতে বসেছিলেন ইয়া মোটা এক বিহারী ভদ্রমহিলা। দৌড়োতে গিয়ে নেলী খালা ভদ্রমহিলার দামী কাতান শাড়ির জরির কাজ করা আঁচলটা মাড়িয়ে দিলেন। ভদ্রমহিলা কটমট করে উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাত নেড়ে কি সব বলে চেঁচাতে লাগলেন। আমি আর বাবু নেলী খালার 'উদভুট্টি কাণ্ড' দেখে হেসে খুন।

ট্রেন থামলো। হাঁপাতে হাঁপাতে নেলী খালা বললেন, 'তোরা এলি তাহলে! ঝাড়া আধা ঘন্টা বসে আছি।' এই বলে আমাদের বড়ো সুটকেস দুটো টেনে নামালেন। আমরা এয়ার-ব্যাগ আর বেতের ঝুড়িটা নিয়ে নামলাম।

বাবুকে দেখে নেলী খালা বললেন, 'এই বুঝি বাবু? এ তো দেখি ক্ষুদে ওমর শরীফ!'

ক'দিন আগে আমি ওমর শরীফের একটা ছবি দেখেছিলাম। ওই ছবিতে ওমর শরীফ এক পাদ্রী সেজেছিলো। মাথার মাঝখানে ছোট্ট বাটির মতো সাদা টুপিটা দেখে মনে হয়েছিলো, ওখানটায় বুঝি গোলা করে চুলগুলো কেউ চেঁছে দিয়েছে। মনে পড়তেই আমি হেসে গড়িয়ে পড়লাম। আর বাবুর তো কান লাল হয়ে গেলো।

নেলী খালা ভুরু কুঁচকে বললেন, 'এতো হাসির কী হলো! ওমর শরীফ আমার ফেভারিট এ্যাকটর। ঝুড়িটা আমাকে দাও। সুটকেসগুলো আশা করি তোমরা নিতে পারবে।'

একটা কুলি এসে নেলী খালার হাত থেকে ঝুড়িটা নিতে চাইলো। নেলী খালা বিনয়ে গলে গিয়ে বললেন, 'কেন ভাই কষ্ট করবেন। আমিই তো দিব্যি নিতে পারি।' নেলী খালার কথা বলার ভঙ্গি দেখে কুলিটা জিব কেটে পালিয়ে বাঁচলো।

স্টেশনের বাইরে যেতে যেতে নেলী খালা আমাকে বললেন, 'ওজন দেখে তো মনে হচ্ছে তোমরা সারা বছর থাকার মতলব নিয়ে এসেছো।'

আমি হাসি চেপে গম্ভীর হয়ে বললাম, 'বেতের ঝুড়ির সব জিনিসই তোমার নেলী খালা। রীতিমতো একখানা হেঁশেল সাজিয়ে দিয়েছেন বলতে পারো।'

দু'হাতে ধরে বেতের ঝুড়িটা জীপের পেছনে তুলে নেলী খালা ড্রাইভিং সীটে বসলেন। আমরা দু'জন বসলাম তাঁর পাশে। ব্যাক গিয়ারে চমৎকার পাশ কাটিয়ে নেলী খালা স্টেশন থেকে বেরিয়ে এলেন। বললেন, 'আমার আরো দুটো গেস্ট আছে। মিরাবুর মেয়েরাও আমাদের সঙ্গে যাবে। বেচারীরা এতোক্ষণে নির্ঘাত আমার ওপর চটে আছে। আমি ওদের দেড়টায় তুলে নেবো বলেছি।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'তোমার মিরাবু কে নেলী খালা? আগে তো কখনো বলো নি!'

নেলী খালা মুখ টিপে হেসে বললেন, 'বলি নি তোকে অবাক করে দেবো বলে। ওঁর দুটো চমৎকার মেয়ে আছে। ললি আর টুনি। তোর কথা শুনে আলাপ করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। তুই যে লুকিয়ে কবিতা লিখিস, এ কথা ওদের বলে দিয়েছি।'

আমি আড়চোখে বাবুর দিকে তাকালাম। বাবু ঘাড় ফিরিয়ে দোকানপাট দেখতে লাগলো। পাঁচ মিনিটের ভেতর আমরা ললি, টুনিদের বাড়িতে এসে

গেলাম। মার বয়েসী স্মার্ট এক জন ভদ্রমহিলার সঙ্গে ওরা বারান্দায় বসেছিলো। নেলী খালা গাড়ি থেকে নামলেন না। বললেন, 'ললি টুনি ঝটপট পেছনে উঠে পড়ো। আলাপ-টালাপ সব পরে হবে। অনেক দেরি হয়ে গেছে। সন্ধের ভেতরে বাড়ি ফিরতে পারলে বাঁচি।' তারপর আমাকে আর বাবুকেও ঠেলে পেছনে পাঠিয়ে দিলেন। আমাদের পেছনে উঠতে দেখে ললি টুনির ছোটটি জিব বের করে ভেংচি কাটলো। ওর সাহস দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম।

নেলী খালা বললেন, 'বুড়ো মুৎসুদ্দিকে তুলতে হবে। আমার জন্যে বেচারা দাঁড়িয়ে থাকবেন। মিরাবু, তুমি কিসসু ভেবো না। আমি কক্সবাজার থেকে ফোন করবো।'

নেলী খালা গাড়ি ঘোরালেন। ওর মিরাবু পেছন থেকে চেঁচিয়ে বললেন, 'ভাবতে সময় দিলি কই নেলী, সাবধানে ড্রাইভ করিস বাছা। ছোট মামাকে মনে করে, আমার...' তাঁর কথা আর শোনা গেলো না। নেলী খালা প্রচণ্ড স্পীডে গাড়ি চালালেন।

আমি আর বাবু ললি টুনির মুখোমুখি বসেছিলাম। দু'জনেই বেলবটম প্যান্ট আর ফ্রিলের জামা পরেছে। নেলী খালা বললেন, 'ললি, তোমাদের ব্যাগ নিয়েছো তো?' একটা মেয়ে মিষ্টি হেসে বললো, 'নিয়েছি নেলী খালা।' বুঝলাম, ওরই নাম ললি।

ললির চুলগুলো বব্‌ছাঁট করা। মুখটা আদুরে রাশান পুতলের মতো। চোখে রোল গোল্ডের চশমা। আর টুনি যে আমাকে দেখছিলো—ওর চুলগুলো লম্বা হলেও ওকে ললির চেয়ে বেশি স্মার্ট মনে হলো। লম্বা চুল দিয়ে ও মাথার দু'পাশে বেণীর বদলে দুটো খোঁপা করেছে। খোঁপা দুটো আরেকটু উঁচুতে বাঁধা হলে ঠিক দুটো শিং-এর মতো মনে হতো। কথাটা ভেবে আমি হেসে ফেললাম। টুনি সঙ্গে সঙ্গে বললো, 'এই, আমাকে দেখে হাসছেন কেন? খবরদার, হাসতে পারবেন না।'

ওর কথা বলার ধরন দেখে আমি আর বাবু দু'জনেই হেসে ফেললাম। ললি একটু লজ্জা পেয়ে বললো, 'তুমিই ওকে হাসাচ্ছো টুনি। গাড়িতে ওঠার সময় তুমি জিব বের করেছিলে কেন? তোমার জামার কলার ঠিক করো।'

টুনি তড়বড় করে বলে উঠলো, 'এ মা, তুমি কী মিথ্যুক ললিপা! তুমিই তো আমাকে জিব দেখাতে বললে। আর নিজে এখন—।'

ললি হেসে ফেলে বললো, 'ভালো হবে না বলছি টুনি।'

ললি আর টুনি দু'জনকেই আমার ভালো লেগে গেলো। বাবুর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে দেখলাম ও মিটি মিটি হাসছে। মনে হলো বাবুরও ভালো লেগেছে।

শহর থেকে বেরিয়ে মস্ত বড়ো এক ছাতিম গাছের তলায় এসে নামলেন

নেলী খালা। ছাতিমতলা থেকে গুটি গুটি পায়ে এক জন বুড়ো ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। 'আসুন মিঃ মুৎসুদ্দি।' নেলী খালা বললেন, 'আধঘন্টা দেরি হয়ে গেছে। ভারি দুঃখিত।'

বুড়ো মুৎসুদ্দি গাড়িতে উঠতে উঠতে চেঁচিয়ে বললেন, 'শরীর খারাপের কথা বলছেন? তা বয়স তো আর কম হয় নি।'

আমরা সবাই হেসে উঠলাম। বুড়ো মুৎসুদ্দি কিছুই দেখতে পেলেন না। গাড়ি ছাড়ার একটু পরেই তিনি ডান হাতটা ডান কানের পাশে নিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, 'শুনলাম মিস চৌধুরীরা নাকি নুলিয়াছড়ির হার্মাদদের ভূতুড়ে বাড়িটা কিনেছেন?'

নেলী খালা বললেন, 'তা একরকম কিনেছি বলতে পারেন। আপনি কার কাছে শুনলেন?'

বুড়ো মুৎসুদ্দি আগের মতো চেঁচিয়ে বললেন, 'কী বললেন? ভূত বলে কিছু নেই নাকি?'

বাবু বললো, 'এ যে দেখি প্রফেসর হেঁশোরাম হুঁশিয়ারের চিল্লানোরাসের মতো চ্যাঁচাচ্ছে?'

বাবু আমাদের বাসায় সুকুমার রায়ের লেখা প্রফেসর হেঁশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়রী গল্পটা পড়েছিলো। আমি হেসে নেলী খালাকে বললাম, 'এই চিল্লানোরাস মুৎসুদ্দি সায়েবটি করেন কী?' নেলী খালা পেছনে না তাকিয়ে জবাব দিলেন— 'উনি কক্সবাজারের একটা মোটেলের মালিক।'

বুড়ো মুৎসুদ্দি বললেন, 'ওটা যে ভূতুড়ে বাড়ি, আপনার বিশ্বাস হয় না বুঝি! তালুকদারদের ওয়ারিশটা তো দিব্যি মোটেল ফেঁদে বসেছিলো। কেন আপনাকে আদ্ধেক দামে বেচে রেঙ্গুন পালালো, বুঝতে পারেন নি? আসলে ওটা একটা অভিশপ্ত বাড়ি।'

ললি বললো, 'অভিশপ্ত বাড়ি কেন বলছে নেলী খালা?'

নেলী খালা বললেন, 'কী জানি বাপু। সস্তায় পেয়েছি বলে সবার হয়তো গা জ্বালা করছে, তাই আর কি।'

বুড়ো মুৎসুদ্দি বললেন, 'তাই বলুন, আমি ভেবেছিলাম আপনি বুঝি আজকালকার ছেলেদের মতো ভূত বিশ্বাস করেন না। ঠিক আছে, আমাদের মঠ থেকে আপনাকে রক্ষাকবচ এনে দেবো।'

নেলী খালা হেসে বললেন, 'বুড়োকে নিয়ে এ এক জ্বালা! সারাক্ষণ কানের কাছে চ্যাঁচাবেন। আবির ঠিকই বলেছো— আস্ত একখানা চিল্লানোরাস।'

বুড়ো মুৎসুদ্দি একগাল হাসলেন— 'না, না, ধন্যবাদের কী আছে! প্রতিবেশীর যদি এটুকু উপকার না করতে পারি।'

আমরা সবাই আরেক দফা কোরাসে হাসলাম। পকেট থেকে একটা চুইংগাম

বের করে বুড়ো মুৎসুদ্দি টুপ করে মুখে ফেলে নেলী খালার সঙ্গে তাঁর মোটেলের গল্প জুড়ে দিলেন। নেলী খালার যে সে-সব গপ্প শোনার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ছিলো না—তাঁর চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছিলো। কিন্তু দু'হাত নেড়ে বুড়ো যেভাবে চেঁচিয়ে কথা বলছিলেন, না শুনে উপায়ও ছিলো না।

আমি চোখ তুলে ললির দিকে তাকালাম। ললি আমাকেই দেখছিলো। মুখ টিপে হেসে ও বাইরের গাছপালা দেখতে লাগলো। বাবু টুনির সঙ্গে কোন ক্লাসে পড়া হয়-টয়, এ ধরনের কথা বলা শুরু করে দিয়েছে। আর টুনিও ওর ঝোলানো শিং-এর মতো খোঁপা দুটো নেড়ে নেড়ে সে-সব কথার জবাব দিচ্ছে। আমার কেমন যেন ঘুম ঘুম লাগছিলো। আড়চোখে আর এক বার ললির দিকে তাকালাম। তখনো ললি পাহাড়-নদী এসব দেখছিলো। বাতাসে ওর রেশমের মতো নরোম লালচে চুলগুলো এলোমেলো হয়ে উড়ছে। ললির চেহারা দেখে মনে হয় ওর বোধ হয় কোনো দুঃখ-টুঃখ নেই। একটু আদুরে ভাব। অথচ আমাকে আর বাবুকে দেখলেই মনে হয় আমাদের অনেক দুঃখ। একা থাকার দুঃখটা সারাক্ষণ আমাদের পেছনে ছায়ার মতো ঘুরে বেড়ায়। মনে মনে ভাবলাম নুলিয়াছড়িতে গিয়ে ললিকে আমার বন্ধু হতে বলবো। বাবুর মনে হয় টুনিকে ভারি পছন্দ হয়ে গেছে। ওরা দু'জন হাসছিলো আর কথার ঝর্ণা বইয়ে দিচ্ছিলো। বাবু যে এত কথা বলতে পারে, আগে কখনও টের পাই নি। ললিকে মনে হলো, ও বোধ হয় চুপচাপ থাকতে ভালোবাসে। আমি নিজেও বেশি কথা বলতে পারি না।

শেষ বিকেলে আমরা কক্সবাজারে এলাম। বুড়ো মুৎসুদ্দিকে তাঁর মোটেলে নামিয়ে দেয়া হলো। নেলী খালাকে একগাদা ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি আমাদের দিকে তাকালেন। একগাল হেসে বললেন, 'হায় ঈশ্বর! এই ক্ষুদে ডাকাতদের এতোক্ষণ আমার চোখেই পড়ে নি!'

টুনি ফিক করে হেসে ফেললো। বললো, 'আগে দেখতে পেলে যে চুইংগামের ভাগ দিতে হতো! গাড়িতে ওঠার পর একটার পর একটা কেবল খেয়েই যাচ্ছেন।'

চুইংগাম কথাটা বোধ হয় বুড়ো মুৎসুদ্দির কানে ঢুকেছে। বত্রিশ পাটি দাঁত দেখিয়ে—না, ভুল বললাম, ওঁর সামনের চারটা দাঁত নেই—আটাশটা দাঁত বের করে তিনি পকেটে হাত দিলেন। একগাদা চকলেট আর চুইংগাম বের করে আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন, 'চললাম ভাই ডাকাতের দল। পরে দেখা হবে।'

নেলী খালা গাড়িতে স্টার্ট দিলেন। আমাকে বললেন, 'আবির সামনে আসবে নাকি'? ললির দিকে তাকালাম। একটু হেসে বললাম, 'থাক নেলী খালা, এখানে বেশ আছি।'

'গুড বাই কক্সবাজার' লেখা সাইনবোর্ডটাকে পেছনে ফেলে আমরা এগিয়ে গেলাম। কিছু দূর গিয়ে নেলী খালা সমুদ্রের বীচে নেমে গেলেন। বললেন, 'বীচ দিয়ে গেলে তাড়াতাড়ি পৌঁছুতে পারবো।'

সমুদ্র তখন শেষ বিকেলের সোনালি রোদের আলোতে ঝলমল করছিলো। বড়ো বড়ো ঢেউগুলো তীর থেকে ভেতরে এসে অনেক দূর পর্যন্ত নরম বালিগুলো ভিজিয়ে দিচ্ছিলো। আমাদের বাঁ পাশে খাড়া পাহাড়গুলো সোজা উঠে গেছে। পাহাড়ের মাথায় ঘরবাড়ি। ঝাউবনে শাঁ শাঁ বাতাস বইছে। বাতাসে আমাদের সবার চুল-টুল সব এলোমেলো হয়ে গেছে। ললি চুইংগাম চিবুতে চিবুতে বললো, 'চিল্লানোরাস মুৎসুদ্দি আসলে কিন্তু খারাপ লোক নয়।'

নেলী খালা বললেন, 'ক'টা চুইংগাম পেয়েই পছন্দ হয় গেলো! আবিরের কপালটা দেখছি ভালো নয়।'

লজ্জায় গাল দুটো লাল হয়ে গেলো ললির—'নেলী খালা, ভালো হবে না বলছি।' আমি মুখ ফিরিয়ে সমুদ্র দেখতে লাগলাম।

হিমছড়ি পেরুনোর পর আমাদের পাহাড়ী পথ ধরতে হলো। দু'পাশে পাহাড়ের ভেতর দিয়ে সরু রাস্তা এঁকেবেঁকে ওপরে উঠে গেছে। কিছু দূর যাবার পর ছোট একটা বাজারের মতো মনে হলো। কয়েকটা খড়ের ঘর, দোকানপাট এইসব। লোকগুলোর চেহারা দেখে মনে হলো বার্মিজ। মেয়েরাও লুঙ্গি পরেছে। নেলী খালা বললেন, 'এটা নুলিয়াছড়ির হাট। আর প্রায় এক মাইল পথ যেতে হবে।'

রাস্তার ওপর গজিয়ে থাকা ঘাস দেখে যে কেউ বলে দিতে পারবে এ পথে কেউ খুব একটা চলাফেরা করে না। চারদিক কেমন ঠাণ্ডা, সুমসাম। সন্ধে হয়ে এসেছে। দু'পাশে বুনো ঝাউ আর দেবদারু বন পাহাড়ের গা বেয়ে নিচে নেমে গেছে।

একটু পরে গাড়িটা পশ্চিম দিকে ছোট্ট একটা মোড় নিতেই চোখে পড়লো নেলী খালার সেই বাড়ি। পাহাড়ের মাথায় কালো ছায়ার মতো একটা দুর্গ যেন। পশ্চিমের বিশাল আকাশে লাল বেগুনি আর কালো মেঘের ঘনঘটা। সন্ধেবেলার আবছা আলোতে বাড়িটা অজানা সব রহস্য গায়ে জড়িয়ে একা গর্বিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ছিলো। মস্ত কাঠের গেট পেরিয়ে গাড়ি বারান্দার নিচে আসা পর্যন্ত কেউ কোনো কথাও বলতে পারলাম না।

গাড়ির শব্দ শুনে ঘেউ ঘেউ করে প্রকাণ্ড কালো শরীর আর লোমঅলা একটা কুকুর ছুটে এলো। আর হারিকেন হাতে এলো বর্মী চেহারার একটা ক্ষুদে দৈত্যের মতো লোক।

নেলী খালা মিষ্টি গলায় ডাকলেন, 'স্ক্যাটরা!' কুকুরটা এক লাফে নেলী খালার গায়ে উঠে তাঁর গাল-টাল সব চেটে একাকার করে দিলো। হাসতে

হাসতে নেলী খালা বললেন, 'থাক থাক খুব হয়েছে। বাথিন, জিনিসপত্রগুলো নামিয়ে ফেলো। আবিরবা দাঁড়িয়ে আছো কেন?'

ক্ষুদে দৈত্যটা আমাদের দিকে তাকিয়ে বোকার মতো হাসলো। ললি ঢোক গিললো। আমি ওর কাছে এসে বললাম, 'চলো ললি, ভেতরে যাই।

নেলী খালা ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, 'বড়িবি, গ্যাস লাইটগুলো জ্বালো নি কেন? বাড়িটাকে একেবারে কবর বানিয়ে রেখেছো দেখছি!'

আমরা চার জন নেলী খালার পেছন পেছন ভেতরে ঢুকলাম। এক-একটা ঘর প্রকাণ্ড বড়ো। দেয়ালে বাতিদানে টিমটিমে আলো জ্বলছে। ঘর জুড়ে একটা ছায়া ছায়া ফিকে অন্ধকার। স্টাডিরুমে বসে মোটা একটা চুরুট টানছিলেন নানু। আমি গিয়ে পা ছুঁয়ে সালাম করলাম। আসার সময় মা পই পই করে নানুকে সালাম করার কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। আমার দেখাদেখি বাবু, ললি আর টুনিও নানুকে সালাম করলো। নানু বললেন, 'তোমাদের কোনো কষ্ট হয় নি তো আবির?'

আমি মাথা নেড়ে বললাম, 'না, নানু। একটুও কষ্ট হয় নি।'

নানু নেলী খালাকে বললেন, 'নেলী, ওদের ঘরে নিয়ে যাও। সবার চোখমুখ কেমন শুকিয়ে গেছে। আমি খাবার টেবিলে আলাপ করবো।'

নেলী খালা বললেন, 'চলো সবাই। দোতালায় তোমাদের জন্যে দুটো রুম রেডি করে রেখেছি। সবগুলো ঘর এখনো গুছিয়ে উঠতে পারি নি। কাল থেকে তোমরা সবাই আমাকে ঘর সাজাতে সাহায্য করবে।'

দোতালায় ওঠার সিঁড়ির ধাপগুলো যেমন উঁচু তেমনি চওড়া। ভারি সেগুন কাঠের সিঁড়ির বাঁকগুলোতে মিটমিটে দেয়াল-বাতি জ্বলছিলো। নেলী খালা বললেন, 'ইলেকট্রিসিটির জন্যে এ্যাপ্লাই করেছি। আশেপাশে কোথাও নেই বলে ঝামেলা হচ্ছে।'

সিঁড়ির শেষে দোতালার লম্বা করিডোর। নেলী খালা দুটো মুখোমুখি ঘর দেখিয়ে বললেন, 'একটা আবির আর বাবুর, আরেকটা ললি আর টুনির। ভাগ্যিস ফার্নিচারসহ পেয়েছিলাম। নইলে এতো বড়ো বাড়ির ফার্নিচার কিনতে কিনতে আমাকে ফতুর হতে হতো। একা থাকতে ভয় করবে না তো ললি টুনি?'

টুনি শুকনো গলায় বললো, 'না, ভয় করবে কেন?' বোঝা গেলো টুনি বেশ ভয় পেয়েছে।

বাবু হেসে বললো, 'ভয় কী টুনি! আমরা তো কাছেই আছি।'

টুনির ভয়টা ধরা পড়ে যাওয়াতে ও চটে গিয়ে বললো, 'থাক, বেশি বাহাদুরি করতে হবে না! দেখা যাবে কারা ভয় পায়।'

ঘরের ভেতর প্রকাণ্ড একটা খাট। নতুন বিছানা পাতা। দেয়ালে একটা ডিমের মতো বড়ো আয়না। তার সামনে পেল্লাই এক কাঠের সিন্দুক। কোনায়

শ্বেতপাথরের টেবিলে কালো পাথরের ফুলদানি। ফার্নিচারগুলোতে নতুন পালিশ দেয়া হয়েছে। হালকা নীল ডিসটেম্পার করা দেয়াল। ফুলদানিতে ফুলসুদ্ধো এক কামিনীর ডাল। ঠাণ্ডা মিষ্টি একটা গন্ধ সারা ঘরে ছড়িয়ে ছিলো। আমি বুক ভরে নিশ্বাস নিয়ে বললাম, 'চমৎকার নেলী খালা!'

নেলী খালা এগিয়ে এসে ভারি কাঠের জানালাগুলো খুলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক দমকা তাজা বাতাস আর সমুদ্রের গর্জন ভেসে এলো। আমরা চার জন জানালার ধারে ছুটে গেলাম। পাহাড়টা সোজা সমুদ্রের ভেতর নেমে গেছে। সামনে বিশাল সমুদ্র। তারার আলোতে কালো ঢেউগুলো চকচক করছে। বাবু ফিসফিস করে বললো, 'এতো সুন্দর বাড়ির কথা আমি ভাবতেই পারি নি।'

আমি বেশ জোর গলায় ঘোষণা করলাম, 'নেলী খালা, এ ঘরটা আমাদের। মেয়েদের তুমি অন্য ঘরে নিয়ে যাও।'

ললি, টুনি, নেলী খালার সঙ্গে বেরিয়ে গেলো। যাবার আগে টুনি আমার দিকে তাকিয়ে ভেংচি কাটলো, আমি না দেখার ভান করে বাবুর কাছে গিয়ে বললাম, 'চমৎকার, তাই না বাবু!'

বাবু আমাকে জড়িয়ে ধরে বললো, 'সিম্পলি মার্ভেলাস।'

ঘরের পাশেই বাথরুম। বেসিন- টেসিন নেই। বড়ো বড়ো বাথটাবে তোলা পানি। আমাদের ঘরের মেঝেটা ভারি কাঠের, কিন্তু বাথরুমের মেঝে শ্বেতপাথরের। আমরা দু'জন মুখ-হাত ধুয়ে চুল-টুল আঁচড়ে নিচে খাবারের ঘরে গিয়ে দেখি বিরাট এক টেবিল বোঝাই খাবার সামনে নিয়ে নানু আর নেলী খালা বসে আছেন। আমাদের দেখে বললেন, 'ললি টুনি এলো না? বড়িবি যাও তো, ওদের ডেকে আনো।'

গ্যাস বাতির আলোতে খাবার ঘরটা বেশি উজ্জ্বল দেখাচ্ছিলো। আমরা দুটো ভারি মেহগনি কাঠের চেয়ার টেনে বসলাম। একটু পরে ললি টুনি এলো। ওরাও জামাকাপড় পাল্টে এসেছে। বাবু টুনির দিকে তাকিয়ে বললো, 'মেয়েদের সব কিছুতেই দেরি।'

নেলী খালা খাবার বেড়ে দিতে দিতে বললেন, 'মেয়েদের সঙ্গে ওভাবে লাগতে যেও না বাবু। আমিও মেয়েদের দলে।'

বাবু সঙ্গে সঙ্গে বললো, 'আপনি তো আর সাধারণ মেয়ে নন।'

নেলী খালা চোখ দুটো গোল করে বললেন, 'একেবারে অসাধারণ বানিয়ে ফেললে?'

টুনি বললো, 'আমিও সাধারণ মেয়েদের দলে নই।'

বাবু বললো, 'সেটা এখনো প্রমাণ হয় নি।'

ওদের কাণ্ড দেখে আমি আর ললি একসঙ্গে হেসে ফেললাম। খেতে খেতে নেলী খালা হেসে বললেন, 'হ্যাঁরে আবির, আমার এই বাড়ি কেনা নিয়ে শানুপা

চ্যাঁচামেচি করেন নি?'

আমি বললাম, 'করে নি আবার! বাবাও বললো, তোমার এ কাজটা নাকি ভালো হয় নি।'

নেলী খালা হেসে বললেন, 'তোর বাবা আবার শানুপার সঙ্গে গলা মেলাচ্ছেন কেন? ওঁকে তো বেশ বুদ্ধিমান বলেই জানতাম। তবে যাই বলিস, আমি যে ঠকি নি, এখন নিশ্চয়ই তোরা বুঝতে পারছিস।'

আস্ত একখানা হাঁসের মাংস মুখে পুরে আমি কোনো রকমে বললাম, 'সে আর বলতে!'

বাবু বললো, 'চমৎকার হয়েছে মাছের কোপ্তাটা।'

আমি খেতে খেতে নেলী খালাকে গম্ভীর হয়ে বললাম, 'বাবুকে আরো দুটো কোপ্তা দাও নেলী খালা।'

নেলী খালা কোপ্তার বাটি বাবুর দিকে ঠেলে দিয়ে অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালেন। আমি বললাম, 'বাবুর যখন কোনো কিছুর দরকার হয়, তখন ওভাবেই বলে।'

সবাই ওর দিকে তাকিয়ে একসঙ্গে হেসে উঠলো। বাবুও রাগতে গিয়ে হেসে ফেললো। বললো, 'এটা কোনো কথা হলো? আমি যদি বলি, ওই ঝাড়বাতিটা চমৎকার, তাহলে আমার পাতে ঝাড়বাতি তুলে দেবে নাকি!' সবাই আরেক দফা হাসলো।

টুনি বললো, 'বলে দেখলেই হয়।'

নানু প্রসঙ্গ পাল্টে বললেন, 'তবে যাই বলিস নেলী, নিজেদের জন্যে বাড়িটা চমৎকার হলেও এখানে তুই মোটেলে থাকার লোক কোথায় পাবি? এত দূর কেউ কি এখানে এসে থাকতে চাইবে?'

নেলী খালা বললেন, 'ওসব আমার হাতে ছেড়ে দাও আব্বু। আমি অলরেডি টুরিস্ট ব্যুরোকে পাঠাবো বলে একটা প্রজেক্টের স্কীম তৈরি করে ফেলেছি।'

সবশেষে পুডিং খেতে খেতে নেলী খালা বললেন, 'তোমাদের সবাইকে আমি কাল সকালে একটা অবাক করা সংবাদ উপহার দেবো। এখন খেয়েই ঘুমোতে যাবে।'

আমরা সবাই হৈচৈ করে উঠলাম— 'তা হবে না নেলী খালা। এখন যদি কিছু না বলো, তাহলে আমাদের ঘুমই হবে না। এতোক্ষণ কেন বলো নি!'

নেলী খালা এ ধরনের আক্রমণের জন্যে তৈরি ছিলেন না। লাজুক হেসে আমতা আমতা করে বললেন, 'এখনও আমি শিওর নই। তবে আমার মনে হচ্ছে, এই নুলিয়াছড়ির কোথাও বোধ হয় আমরা একটা সোনার খনি-টনির সন্ধান পেতে পারি। সোনার খনি খুঁজতে গিয়ে তোমাদের ছুটির দিনগুলো বেশি একঘেঁয়ে মনে হবে না। ব্যাস, এর বেশি কিছু এখন বলবো না। এতে যদি

তোমাদের ঘুম হয় তবে আমি রেহাই পাই।'

সিঁড়ি বেয়ে দোতালায় উঠতে উঠতে বাবু বললো, 'নেলী খালা যা বললেন, এ নিয়ে আলাপ করে সারারাত জেগে কাটিয়ে দেয়া যায়। একবার ভাবো তো— সোনার খনি আবিষ্কার করবো আমরা! আমার মনে হচ্ছে আমরা ওয়াল্ট ডিজনীর কোনো এ্যাডভেঞ্চার ওয়ার্ল্ডে এসে পড়েছি।'

ললি টুনি আমাদের 'গুড নাইট' বলে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলো। টুনিটা বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিলো। সোনার খনি আবিষ্কারের উত্তেজনায় ওর ভয় যদি কিছুটা কাটে।

বাবু ঘরে ঢুকে বললো, 'কী করে ছুটি কাটাবো ভেবেই পাচ্ছিলাম না। এখন মনে হচ্ছে ছুটিটা আরো লম্বা হলে ভালো হতো।'

ঘরের ভেতর এতো বাতাস যে একটু শীত শীত করছিলো। নেলী খালা অবশ্য বিছানার ওপর কম্বলও রেখে গেছেন। সারা ঘর চাঁদের আলোয় ভরে আছে। কামিনী ফুলের গন্ধ পাচ্ছিলাম। বাবু যদিও বলছিলো গল্প করে সারারাত কাটিয়ে দেবে, তবু আমরা এতো ক্লান্ত ছিলাম যে বিছানায় শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লাম।

সোনার খনি আর অতৃপ্ত প্রেতাত্মা

স্ক্যাটরার ঘেউ ঘেউ আর অনেকগুলো হাঁসের প্যাকপ্যাক ডাকে আমাদের ঘুম ভাঙলো। চোখ মেলে দেখি বাবু ততক্ষণে উঠে বসেছে। জানালার বাইরে আলো ঝলমল সমুদ্র। বাবু ফোলা ফোলা চোখে তাকিয়ে নরোম হাসলো। বললো, 'কী মনে হচ্ছে আবির?'

আমিও হেসে বললাম, 'ভূমধ্যসাগরের কোনো জলপাই দ্বীপ।'

মুখ ধুয়ে নিচে এসে দেখি ললি টুনি আগে থেকেই রাশান মাক্রশকা পুতুলের মতো সেজেগুজে বসে আছে। বাবু বললো, 'হা-ই টুনি।'

টুনি ওকে জিব দেখালো। ললি ফিক করে হেসে ফেললো। বাবু ভুরু কুঁচকে গম্ভীর হয়ে চেয়ারে বসলো। নেলী খালা সবার রুটিতে মাখন আর জেলি লাগিয়ে

দিচ্ছিলেন। বাবু বললো, 'নেলী খালা কাল বলেছিলেন না আপনার ঘরগুলো সাজাতে হবে?'

'নেলী খালা হেসে বললেন, 'তাই বলে এক্ষুনি লেগে যেতে হবে না।'

বাবু বললো 'মেয়েরা আপনাকে ঘরের কাজে সাহায্য করবে। আমি আর আবির সোনার খনি খুঁজতে যাবো।'

আমি হেসে ফেললাম। ললি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, 'টুনির মুখ-ভেংচি খেয়ে সব মেয়ের ওপর ক্ষেপে গেলে দেখছি। আমি তো কিছু করি নি বাবু।'

বাবু গম্ভীর হয়ে বললো, 'তুমি টুনির কান টেনে দেয়ার বদলে হেসেছো।'

টুনি তড়বড় করে বলে উঠলো, 'দেখা যাবে কে কার কান টানে। ললিপা, আমরা আলাদা বেরুবো। বয়েই গেছে ওদের সঙ্গে যেতে।'

নেলী খালা মুখ টিপে হেসে বললেন, 'আজ কাউকেই বেরুতে হবে না। ঘরের কাজ মেয়েরা করবে আর ছেলেরা করবে বাইরের কাজ।' এই বলে নেলী খালা সারা দিনের কাজের ফিরিস্তি দিলেন—'দোতালার দুটো ঘর গোছাবে ললি, টুনি, আমি দুটো সাইনবোর্ডে রং লাগাবো, আর আবির, বাবু মালীকে গোলাপের বেডে সাহায্য করবে। আমি কিছু বসরাই গোলাপের কাটিং এনে রেখেছি।'

আমি বললাম, 'এখানে বসরাই গোলাপ কোথায় পেলে?'

নেলী খালা একটু লাজুক হেসে বললেন, 'মেজর জাহেদ আহমেদের বাড়ি থেকে এনেছি। তোমাদের তো বলা হয় নি, এখানে একটা গোপন আর্মি ক্যাম্প আছে। ক'দিন ধরে বর্ডারে স্মাগলিং খুব বেড়ে গেছে। তাছাড়া এ বর্ডারে কয়েকটা কুখ্যাত ডাকাত দল রয়েছে। পুলিস কিছু করতে পারে নি। মেজর জাহেদ এই বেযটার কমান্ডে আছেন। সাবধান, কারো সঙ্গে ওঁর ব্যাপার নিয়ে আলাপ করো না।'

আমরা কিছুক্ষণ চুপচাপ খেলাম। নেলী খালা কেবলই আমাদের ভাবিয়ে তুলছেন। দরজায় গরগর শব্দ হতে চেয়ে দেখি হেলেদুলে বেশ চিন্তিত মুখে স্ক্যাটরা এসে ঘরে ঢুকে নেলী খালার গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। নেলী খালা ওর মুখে একটা টোস্ট ধরিয়ে দিলেন। 'সকালে হাঁসদের তাড়া করেছিলো বলে ওকে খুব বকেছি। এখন দেখতে এসেছে আমার রাগ কমেছে কিনা'— এই বলে নেলী খালা ওর পিঠ চাপড়ে দিলেন— 'যাও আর দুষ্টুমি কোরো না।'

স্ক্যাটরা তখন বেশ রাজকীয় ভঙ্গিতে সবার দিকে তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। ওর কাণ্ডকারখানা দেখে আমরা হেসে বাঁচি না। ওর জন্য নেলী খালাকেও বেশ গর্বিত মনে হলো। বললেন, 'স্প্যানিয়েল আর গ্রে হাউন্ডের ক্রস। এতো সস্তায় পেয়েছি যে বলার কথা নয়। কক্সবাজারের মিসেস ডিক্রুজের কাছ থেকে গত বছর মাত্র সাড়ে তিন শ' টাকায় কিনেছি।'

গরম কোকো খেতে খেতে নেলী খালাকে বললাম, 'এবার তোমার সোনার

খনির কথা বলো নেলী খালা।'

নেলী খালা লাজুক হাসলেন— 'আমার বলছিস কেন? তোদের তাহলে খুলেই বলি। আমাদের বাড়ি থেকে দু' ফার্লং দূরে একটা পাহাড়ী নদী আছে। নাম হচ্ছে সোনাবালি নদী। আমি মাঝে মাঝে ওখানে মাছ ধরতে যাই। পানির রং এতো স্বচ্ছ যে, নিচের বালি পর্যন্ত দেখা যায়। মাছ লুকিয়ে থাকতে পারে না। এক দিন লক্ষ্য করলাম বালির রঙগুলো বেশি চকচকে, আর মাঝে মাঝে কেমন যেন সোনালি আভা ছড়াচ্ছে। কিছু বালি তুলে এনে ভালো করে পরিষ্কার করে দেখি, বালিতে সোনার গুঁড়ো রয়েছে। ক'দিন তো বেশ উত্তেজনার ভেতর কাটলো। রোজ কাঠের বারকোশে বালি তুলে পরিষ্কার করি আর ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে সোনার গুঁড়ো বার করি। অবশ্য পরিমাণে খুবই সামান্য। সব মিলিয়ে আমি মাত্র কয়েক রত্তি সোনা পেয়েছি। তবে মনে হয় এ নদী কোথাও কোনো সোনার খনির পাশ দিয়ে বইছে। আমি পুরো ব্যাপারটা জানিয়ে জিওলজিক্যাল সার্ভে আর মিনারেল ডেভলাপমেন্ট কর্পোরেশনকে দুটো চিঠি দিয়েছি। আশা করি দু'-এক দিনের মধ্যে জবাব পেয়ে যাবো।'— এই বলে নেলী খালা মিষ্টি করে হাসলেন— 'চিঠির জবাব পেলে সবাই মিলে আমরা সোনার খনি খুঁজবো।'

টুনি বাচ্চাদের মতো হাততালি দিয়ে বললো, 'কী মজা, আমরা তাহলে একটা সোনার খনির মালিক হয়ে যাবো।'

আমি হেসে বললাম, 'ভেবেই সুখ। সোনার খনি পেলে ওটা যে গভমেন্টের হবে, তাও বুঝি জানো না!'

'তাতে কী!' একটু চুপসে গিয়ে টুনি বলল, 'আমরা আবিষ্কার করেছি বলে কয়েক তাল সোনাও পাবো না?'

নেলী খালা বললেন 'সোনা পাবে কিনা জানি না, তবে খবরের কাগজে আবিষ্কারকদের ছবি উঠতে পারে।'

ললি আস্তে আস্তে বললো, 'সেটা আরো মজার হবে।'

খাবার পর আমরা বাইরে এলাম। নানু লনে একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে বই পড়ছেন। আমি বললাম, 'নানু, নাস্তা খান নি যে?'

নানু একটু হেসে বললেন, 'আমার খাওয়া হয়ে গেছে। আমাকে সব সময় ঘড়ি ধরে খেতে হয়। রাতে তোমাদের ভালো ঘুম হয়েছিলো তো?'

বাবু বললো, 'রীতিমতো নাক ডেকে ঘুমিয়েছি।'

বাগানে যেতে যেতে আমি বললাম, 'নিজের নাক ডাকা বুঝি শোনা যায় কখনো?'

বাবু বললো, 'তোমারটা শুনে বুঝেছি আমারও নিশ্চয় ডেকেছিলো।'

'কক্ষনো আমার নাক ডাকে না। আর তোমার ডাকলেও আমি শুনতে পেতাম।'

বাবু হেসে ফেললো— 'আমি তো এমনি বলেছি। চটছো কেন?'

আমিও হাসলাম— 'মনে হয় খুব ফুর্তিতে আছো!'

বাবু অবাক হয়ে বললো, 'কেন, থাকারই তো কথা! তোমার কি ভালো লাগছে না?'

'আমি বুঝি তাই বলেছি? আমি তোমাকে টুনির কথা জিজ্ঞেস করেছি।'

বাবু শুধু বললো, 'চমৎকার!'

আমি বললাম, 'ললিও খুব ভালো মেয়ে। আসলে এরকম মেয়েদের সঙ্গেই আমাদের বন্ধুত্ব হওয়া উচিত।'

বাগানে গিয়ে দেখি বুড়ো মালী বেচারা একগাদা গোলাপের কাটিং নিয়ে হিমশিম খাচ্ছে। আমরা যখন বললাম আমরাও ওর সঙ্গে কাজ করবো, তখন মালী আমাদের হাতে নিড়ানিটা ধরিয়ে দিয়ে বললো, 'তোমরা দু'দিনের জন্যে এসেছো, তোমরা কেন মিছেমিছি কষ্ট করবে।'

আমি বললাম, 'দু'দিন নয় মালী, দু'মাস।'

'ওই হলো। দু'মাস হলেও তো আমাদের অতিথ বটে।'

আমি আর বাবু সুতো ধরে গোলাপের বেডের জায়গা ঠিক করে নিলাম। সারের গাদা থেকে সারও এনে দিলাম। নেলী খালা দুটো গরু পুষছেন। দুধের সঙ্গে সঙ্গে সারের জন্যেও ভাবতে হয় না। মাটি পরিষ্কার করতে করতে মালী বললো, 'তাও ভালো, দু'মাস থাকবে। বাড়িটা যেন এ্যাদ্দিন মিত্যুপুরী হয়ে ছিলো। যেখানেই যাই, লোকে বলে এটা নাকি ভূতের বাড়ি। আমার বাপু দম আটকে আসছিলো। জেনেশুনে কেউ এমন বাড়ি কেনে!'

আমি বললাম, 'ভূতের বাড়ি কেন বলে মালী?'

ঠোঁট উল্টে খুরপি নেড়ে মালী বললো, 'কি জানি বাপু! লোকে বলে, তাই আমিও বলি। বিবিজির মাথা খারাপ না হলে কক্সবাজারের অমন বাড়িটা বেচে দেয়! বড়ো হুজুরকে কতো বোঝালাম। পাত্তাই দিলেন না। তবে এও তোমাদের বলে রাখি বাপু, কাঙালের কথা বাসি হলে কাজে দেয়।'

বাবু হেসে বললো, 'মনে হচ্ছে এটা সত্যি সত্যি ভূতের বাড়ি হলেই যেন তুমি খুশি হও।'

মালী বিরক্ত হয়ে বললো, তা কেন হবো বাপু! কক্সবাজারের বাড়িটা আরো ভালো ছিলো, তাই বলছি। নইলে আমার কি! কত্তারা যেখানে নেবেন সেখানেই যাবো। বুড়ো বয়েসে মানুষের দোরে ফিরবো নাকি!'

আমি জানতে চাইলাম, 'লোকে কেন এটাকে ভূতের বাড়ি বলে, তুমি কখনো কাউকে জিজ্ঞেস করো নি?'

মালী আবার হাতের কাজ থামিয়ে খুরপি নেড়ে বললো, 'তা আর করি নি ভেবেছো? হাজার বার করেছি। এই যে ধরোগে হাটের লোকগুলোন। ওরা বলে

আগে নাকি এ বাড়িটা লালমুখো হার্মাদদের আড্ডাখানা ছিলো। ওরা নাকি ডাকাতি করে কে ক'টা খুন করলো— মানুষ কেটে মুণ্ডুখানা সঙ্গে নিয়ে আসতো। এ পাহাড়টাকে অনেকে মুণ্ডুখালি পাহাড় বলে। হার্মাদরা সেই মুণ্ডু বস্তায় ভরে পুঁতে রাখতো। আর সেই মুণ্ডু খোঁজার জন্যে তেনাদের আত্মারা এখনো নাকি এ বাড়ির চারপাশে ঘুরে বেড়ায়। অনেকে নাকি দেখেছে— পুণ্নিমার রাতে সাদা কাপড় পরে নদীর কিনার ধরে হেঁটে হেঁটে সমুদ্দুরে গিয়ে বাতাসে মিলিয়ে যায়। তেনাদের গা থেকে আলো বেরোয়। এই দেখে তো এই নেই।' হঠাৎ কী মনে পড়াতে মালী ব্যস্ত হয়ে কাজ শুরু করে দিলো, 'আমি বাপু তোমাদের এসব কথা বলি নি। বিবিজি জানতে চাইলে বোলো হাটের লোকগুলোন বলেছে। আর এও বলি বাপু, জঙ্গলে যদি কখনো যাও, তাহলে মড়ার খুলি আঁকা কোনো গাছের নিচে যেয়ো না।'

বাবু বললো, 'জঙ্গলে আবার মড়ার খুলি আঁকা গাছও আছে নাকি?'

'নেই আবার!' মালী উত্তেজিত হয়ে বললো, 'আমি নিজ চোখে দেখেছি। বিবিজির যখন নদীর কাদামাটি ঘাঁটার বাই উঠলো, তখন তো আমিই সঙ্গে যেতাম। একদিন দেখি পুরোনো এক সেগুন গাছের গায়ে কিসের যেন আঁকিবুকি। কাছে গিয়ে দেখি মড়ার মাথার খুলি আঁকা। চারপাশে তাকিয়ে দেখি মাটির ভেতর থেকে একটি খুলি আমার দিকে চেয়ে আছে। আমি তখন দোয়া পড়তে পড়তে কেনো রকমে পালিয়ে বাঁচি। বাথিনও আমাকে ওসব গাছের কাছে যেতে বারণ করেছে।'

আমি বললাম, 'তুমি তো বড়ো ভাবিয়ে তুললে মালী!'

বিচক্ষণ লোকের মতো মাথা নেড়ে মালী বললো, 'ভাববার কথাই বটে। বিবিজিকেও বলেছি। তিনি তো কানেই তোলেন না। বলেন, কোনো পাজি লোক ওসব করেছে। আমি বাপু এ তল্লাটে কোনো পাজি লোক দেখি নি। হাটের লোকগুলোন দেখা হলেই সুখ-দুঃখের খবর নেয়, বাড়ির অবস্থা-টবস্থা জিজ্ঞেস করে। কবে থেকে মোটেল খুলবো জানতে চায়। বলে— শহরে গেলে ওরা বলবে, এখানে ভালো মোটেল আছে।'

আমি মুখ টিপে হেসে বললাম, 'তবে এটাও বলে যে বাড়িটা ভালো নয়, ভূতের আড্ডা এটা। এখানে থাকা উচিত নয়। তাই না মালী?'

মালী বুঝলো, কথাটা আমি অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে বলেছি। তাই বিরক্ত হয়ে বললো, 'ভালো লোক বলেই সাবধান করে দেয়। নইলে ওদের কী দায় পড়েছে? এই তো সেদিন পাকড়াশীদের চাকরটা আমাকে এক গণ্ডা সাদা পাতা দিয়ে বললো, 'এখানে তেনাদের যা দৌরাত্ম্য, ওর নাকি মন টিকছে না। ও নিজ চোখে দেখেছে। বলে, মাইনেটা পেলেই কেটে পড়তো। নেহাৎ মনিবটি এতো ভালো বলে থেকে গেছে।'

বাবু বললো, 'পাকড়াশীটা আবার কে?'

মালী বললো, 'নিকুঞ্জ পাকড়াশী। হাটের পুব দিকে ওনার একটা পাহাড় আছে। ওখানেই থাকেন। ভারি দয়ার শরীল গো। এখানে নতুন এসে ওনার সঙ্গে যখন দেখা করতে গেলাম— আমাকে দশ টাকা বকশিশ দিলেন। আরো কতো খোঁজখবর নিলেন। এতো পয়সা ওনার, একটুও দেমাক নেই। ধরতে গেলে একেবারে মটির মানুষ।'

বাবু হঠাৎ আমার কানে কানে বললো, 'নেলী খালা যে সোনা খুঁজতেন, মালী কি সেটা জানে না? ও যে বললো, কাদামাটি ঘাঁটতেন?'

আমি সঙ্গে সঙ্গে মালীকে বললাম, 'জানো মালী, নেলী খালা বলেছেন, তোমাদের এই নদীটার কোথাও নাকি সোনার খনি আছে। নদীর বালিতে সোনা পাওয়া যায়।'

মালী ঠোঁট উল্টে বললো, 'বিবিজি কথাটা আমাকেও বলেছিলেন। এ আমার পেত্যয় হয় নি। আমি পাকড়াশী বাবুকে বলেছিলাম বটে। শুনে তিনি হেসে বাঁচেন না। বললেন, 'তাহলে তো তোমরা কোটিপতি হয়ে গেলে হে। এখন থেকে দেখি বুঝে-সমঝে কথা বলতে হবে।' আমি তখন লজ্জায় মরি আর কি!'

আমি বললাম, 'নেলী খালা যে কিছু সোনা পেয়েছেন, তুমি দেখো নি?'

মালী বললো, 'তোমাদের বুড়িগঙ্গার নদ্দমাতেও কাদা ঘেঁটে ওরকম সোনা পেতে আমি দেখেছি। সেটাকে তো আর খনি পাওয়া বলে না।'

বাগানে কাজ করতে করতে দিনের আলোয় বাড়িটাকে ভালো করে দেখলাম। কাঠামো দেখে মনে হয় কয়েক শ বছরের পুরোনো হবে। নেলী খালা যাদের কাছ থেকে কিনেছেন, অর্থাৎ তালুকদাররা নাকি কয়েক পুরুষ ধরে এ বাড়িতে থেকেছেন। যত্ন নিয়েছেন যে বোঝা যায়। কবেকার লাগানো সারি বাঁধা কৃষ্ণচূড়া, আর রাধাচূড়ার গাছগুলো লাল আর হলদে ফুলে ফুলে রঙের বন্যা বইয়ে দিচ্ছে। গাছের তলায়, পথের ওপর সোনার গুঁড়োর মতো রাধাচূড়া ফুল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে চমৎকার নকশা এঁকেছে। তালুকদারদের পূর্বপুরুষের রুচির প্রশংসা করতে হয়। পয়সাও যথেষ্ট ছিলো বলতে হবে। নইলে এতো বড়ো বাড়ির— বাড়ির না বলে প্রাসাদই বলা উচিত; যত্ন করা চাট্টিখানি কথা নয়। আশেপাশের পাহাড়গুলো থেকে এ পাহাড়টাই বেশি উঁচু। পুব দিকের পাহাড়গুলো বর্ডার পেরিয়ে বার্মায় গিয়ে মেঘের আড়ালে হারিয়ে গেছে। উত্তরে পাহাড়, দক্ষিণে কিছু দূর পাহাড়, তারপর সমুদ্র আর পশ্চিমে শুধু সমুদ্র। সারাক্ষণ সমুদ্রের গর্জন শোনা যাচ্ছে। এমন বাড়িকে ঘিরে যদি রহস্যের পাহাড় না জমে, তবে কি আমাদের রূপলাল লেনের এঁদো গলির ঘিঞ্জি বাড়িটা রহস্যময় হবে? এ বাড়ি হার্মাদদের আড্ডা হতে পারে। এ বাড়ির চারপাশে অসংখ্য অতৃপ্ত আত্মা অষ্টপ্রহর ফোঁস ফোঁস নিশ্বাস ফেলে ঘুরে বেড়াতে পারে। এ পাহাড়টায়

হার্মাদদের পুঁতে রাখা কঙ্কাল থাকতে পারে। এমনও তো হতে পারে, সোনার খনি খুঁজতে গিয়ে আমরা হার্মাদদের এক বিশাল গুপ্তধন পেয়ে গেলাম— চিলেকোঠায় বসে অলস দুপুরগুলোতে আমি যার স্বপ্ন দেখতাম। ভাবতে ভাবতে আমার লোম-টোম সব খাড়া হয়ে গেলো। বাবুকে বললাম, 'চলো, বাকিটুকু মালী সারতে পারবে। আমরা আরো বড়ো কিছু নিয়ে মাথা ঘামাবো।'

বাবু হাত ঝেড়ে আমার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বললো, 'সোনার খনির ব্যাপারে তুমি কি খুব সিরিয়াস?'

আমি বললাম, 'শুধু সোনার খনি নয়, আরো অনেক কিছু নিয়ে আমি ভাবছি। দুপুরের পর ললি টুনিকে নিয়ে আমরা একটা প্ল্যান করবো।'

আমাদের আসতে দেখে নেলী খালা ডাকলেন, 'আবির, বাবু, দেখে যাও। আমার সাইনবোর্ড তৈরি হয়ে গেছে।'

এরই মধ্যে হয়ে গেলো! আমরা দু'জন থামঅলা গেটের কাছে ছুটে গেলাম। চমৎকার লিখেছেন নেলী খালা—

সী ভিউ প্যালেস

অবকাশ যাপনের একটি

মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ

আমাদের স্কুলে ক্যান্ডি লেটারিং শিখিয়েছিলেন ব্রাদার হবার্ট। নেলী খালা 'সী ভিউ প্যালেস'টা ক্যান্ডি হরফে লিখেছেন। বাংলায় যে ক্যান্ডি লেখা হতে পারে, আর সেটা এতো সুন্দরভাবে— আমার ধারণাই ছিলো না। আমি হেসে বললাম, 'তোমার এতো সুন্দর লেখার প্রশংসা করার লোক খুব কমই পাবে।'

নেলী খালা লাজুক হেসে বললেন, 'তুমি বুঝি সেই কমের দলে! আমার এখানে সব গেঁয়ো লোকেরা আসবে, এটা ভাবছো কেন আবির?'

বাবু বললো, 'বরং শহরের সৌখিন লোকেরাই শুধু এখানে থাকতে চাইবে। কী বলেন নেলী খালা?'

নেলী খালা তেমনি হেসে বললেন, 'তোমাদের মতো সৌখিন ফুলবাবুরা।' প্রশংসা শুনলে নেলী খালা লাল হয়ে যান।

আমি বললাম, 'মোটেই আমরা ফুলবাবু নই। বাগানে গিয়ে দেখো গে কতো কাজ করেছি আমরা।'

নেলী খালা আদর করে আমাদের কপালে চুমো খেয়ে বললেন, 'এবার তাহলে নাইতে যাও। বাথিন টবে পানি তুলে রেখেছে।'

দুপুরে খাবার পর বাবু ললি টুনিকে ডেকে বললো, 'আমরা দারুণ একটা কাজে হাত দিতে চাই। তোমরা যদি যোগ দিতে চাও, তাহলে আমাদের ঘরে চলে এসো।'

ললি আমার দিকে তাকালো। আমি বললাম, 'ঘরে চলো, সব খুলে বলবো।'

ঘরে ঢুকে দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিলাম। আমার মনে হলো, জীবনে এই প্রথম একটা রোমাঞ্চকর কাজে হাত দিতে যাচ্ছি। সেগুন কাঠের পালিশ করা মেঝের ওপর আমরা চার জন বসলাম। ওদের মুখের দিকে তাকালাম। সবচেয়ে বেশি অবাক হয়েছে টুনি। আমি গলাটা ঝেড়ে বেশ গম্ভীরভাবেই বললাম, 'তোমরা কি কেউ এ বাড়ির অভিশাপটা নিয়ে ভেবেছো?

বাবু ললি টুনির দিকে তাকালো। টুনি ঢোক গিলে বললো, 'আমার মনে হয় এখানে ভূত-টুত থাকতে পারে।।'

'ওসব বাজে কথা।' আমি ওকে আশ্বস্ত করে বললাম, 'ভূত বলে কিছু নেই।'

টুনি বললো, 'তবে যে বুড়ো মুৎসুদ্দি বললো, এটা ভূতুড়ে বাড়ি?'

বাবু বললো, 'মুৎসুদ্দি তো ভালোই বলেছে। মালীটা যা বললো, তার ছটাকও যদি সত্যি হয়, তাহলে বুঝতে হবে এর পেছনে বিরাট রহস্য আছে কোথাও।'

ললি অবাক হয়ে বললো, 'মালী কী বলেছে?'

মালীর সব কথা ললি টুনিকে খুলে বললাম। শুনে ললি টুনি অবাক হয়ে একে অপরের দিকে তাকালো। ললি বললো, 'কী আশ্চর্য, ঠিক এ কথাগুলোই যে বাথিন আমাদের বলেছে। ওকে নিয়ে যখন আমরা ঘর সাজাচ্ছিলাম, তখন এসব বললো। কাউকে বলতেও বারণ করেছে।'

এবার আমার আর বাবুর অবাক হাবার পালা। আমার মনে হলো, এমন তো হতে পারে যে, দু'জনেই হাট থেকে এসব কথা শুনেছে। এ্যাদ্দিন বলার মতো কাউকে পাচ্ছিলো না। এখন পেয়ে সব কথা হুড়মুড় করে বলে ফেলছে। আমি কী বলবো, মনে মনে কথাগুলো গুছিয়ে নিলাম। তারপর ধীরে ধীরে বললাম, 'দেখো, এসব কথার ভেতর থেকে একটা ব্যাপারই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, এখানে আমাদের থাকাটা কেউ পছন্দ করছে না, সেজন্যে ভয় দেখিয়ে তালুকদারদের মতো তাড়িয়ে দিতে চাইছে। নেলী খালা বললেন, তালুকদাররা নাকি ভূতের ভয়ে কেটে পড়েছে। এর দুটো কারণ আমার মনে হয়েছে। এক হলো, নেলী খালার কথা মতো এখানে কোনো সোনার খনি আছে। হয়তো সেটা এই পাহাড়েই হতে পারে। কারো হয়তো ইচ্ছে আছে আমরা সবাই নেলী খালারা সুদ্ধো যদি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাই, তাহলে মনের সুখে লুকিয়ে লুকিয়ে সোনা তুলতে পারবে। আরেকটা হতে পারে'— বলে আমি একটু ঢোক গিলে বললাম, 'ওরা যখন বলছে, আগে এটা হার্মাদদের আস্তানা ছিলো, তখন এখানে কোথাও মাটির নিচে লুকোনো গুপ্তধন থাকাটা এমন কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। হয়তো এ বাড়ির কোথাও একখানা নকশা লুকোনো আছে। সেই গুপ্তধনের লোভে কেউ চাইছে, আমরা এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাই। আর সেজন্যেই এসব

আত্মা আর ভূতের আজগুবি গল্পো ছড়াচ্ছে।'

টুনি বললো, 'তবে যে বাথিন বললো, মড়ার খুলি আঁকা গাছের নিচে এখনো মানুষের হাড়গোড় পাওয়া যায়?'

আমি বললাম, 'সেটা আরো সন্দেহের ব্যাপার। এখানে স্মাগলার আছে, সে কথা তো নেলী খালাই বললেন। ওদের ভেতর তো ডাকাতও থাকতে পারে, যারা এখনো মানুষ খুন করে মাটির নিচে পুঁতে রাখে।'

আমার কথা শুনে টুনি কাঁদো কাঁদো গলায় বললো, 'আপনি মিছেমিছি ভয় দেখাচ্ছেন কেন? বাথিন বলেছে হার্মাদরা খুন করতো।'

বাবু বিরক্ত হয়ে বললো, 'আহ টুনি, নাকী কান্নার সময় নয় এটা। হাড়গুলো কাউকে দিয়ে পরীক্ষা করালেই বোঝা যাবে ওগুলো কবে পুঁতেছিলো। তবে আবির মনে হয় একটু বেশি ভেবে ফেলেছে।'

ললি আস্তে আস্তে বললো, 'তোমার কি সত্যিই মনে হয় আবির, এখানে কোনো গুপ্তধন লুকোনো আছে?'

আমি একটু আমতা আমতা করে বললাম, 'কথাটা অস্বাভাবিক নয়। আমি অনেক বইয়ে পড়েছি, এরকম বাড়িতেই গুপ্তধন থাকে। গুপ্তধন না পেলেও লুকোনো এমন কোনো জিনিস তো আমরা পেতে পারি, যা জাদুঘরঅলারা লুফে নেবে।'

ললি গম্ভীর হয়ে মাথা নেড়ে সায় জানালো। বললো, 'কাজ কীভাবে শুরু করতে চাও?'

আমি মাথা চুলকে বললাম, 'সেটা ভেবে দেখতে হবে।'

ললি বললো, 'আজ সকালে পাশের ঘরগুলো ঝাড়তে ঝাড়তে অনেক জিনিসপত্র দেখেছি। থালা, বাসন, ফুলদানি, ঝাড়বাতি এসব। আমার মনে হয় নকশা-টকশার জন্যে আমরা সবগুলো ঘর খুঁজে দেখতে পারি। এখনো বেশিরভাগ ঘরেরই তালা খোলা হয় নি।'

টুনি ফিক করে হেসে বললো, 'ললিপা বুঝি এই সুযোগে ওদেরকে দিয়ে ঘরগুলো পরিষ্কার করিয়ে নিতে চাইছো!'

এবার ললি টুনিকে ধমক লাগালো— 'হাসির কী হলো টুনি! দেখছো না, একটা গুরুতর ব্যাপার নিয়ে আমরা কথা বলছি? এরপর তাহলে আমাদের কথার সময় তোমাকে ডাকা হবে না।'

বোঝা গেলো আমার আইডিয়াটা ললির খুব পছন্দ হয়েছে। টুনি অবশ্য গাঁইগুঁই করে বলতে লাগলো, 'গুরুতর না ঘোড়ার ডিম। ওরা প্ল্যান করে আমাদের ভয় দেখাতে চাইছে।'

বাবু বললো, 'তুমি তাহলে কেটে পড়তে পারো। শোনো আবির, ডাকাত যদি থেকে থাকে, তাহলে আমাদের আর্মি ক্যাম্পে গিয়ে জানানো উচিত। নেলী

খালা তো বললেন ওরা নাকি নতুন এসেছে, এসব নাও জানতে পারে। মেজরের সঙ্গে মনে হয় নেলী খালার ভালোই আলাপ আছে। আমাদের অসুবিধে হবে না।'

ললি মাথা নেড়ে জানালো— 'কথাটা মন্দ বলো নি বাবু। তবে আমার ভয় হচ্ছে, তিনি এসব কথা নেলী খালাকে বলবেন, আর শেষে সবাই মিলে হাসাহাসি করবে। বড়োরা কখনো আমাদের প্ল্যান মতো কাজ করবে না।'

আমি বললাম, 'প্ল্যানের কথা মেজরকে না বললেই হয়। আমরা তাঁর কাছে গিয়ে জায়গাটা সম্পর্কে খোঁজখবর নেবো। সেই সঙ্গে হাটের লোকজনকে একটু বাজিয়ে দেখা যাবে। আমার তো মনে হয় শত্রু পক্ষের কোনো চর নিশ্চয় হাট থেকে আমাদের ওপর নজর রাখছে।'

'শত্রু পক্ষের' কথাটা শুনে ভেবেছিলাম টুনি হেসে ফেলবে। কিন্তু দেখলাম, টুনিও বেশ মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শেষ পর্যন্ত শুনলো।

রহস্যময় অতিথি

দুপুরের পর এক ঘন্টারও বেশি সময় আমরা আলোচনার জন্যে খরচ করেছিলাম। শেষে বাবু যখন হাই তুলে বললো, 'আমার ঘুম পাচ্ছে'— তখন ললি টুনি ওদের ঘরে চলে গেলো। বাবু কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লো। আমি খাটের গায়ে হেলান দিয়ে সমুদ্র দেখতে দেখতে রবিনসন ক্রুসোর দ্বীপে চলে গেলাম।

নেলী খালা কখন যে চুপি চুপি আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, টেরও পাই নি। আমার কাঁধে আলতোভাবে হাত রেখে বললেন, 'কিরে, বাবু ঘুমোচ্ছে, তুই যে জেগে আছিস?'

আমি একটু চমকে উঠে নেলী খালাকে দেখলাম। সাদা শাড়ি পরা নেলী খালাকে মার মতো পবিত্র মনে হলো। নেলী খালা আস্তে খাটের উপর বসলেন, যেন বাবুর ঘুম না ভাঙে। তারপর কোমল গলায় বললেন, 'হ্যাঁরে, অপুর কোনো খবর পেয়েছিস?'

আমি গত মাসে পাওয়া চিঠির কথা বললাম। নেলী খালা আমার মুখের দিকে

তাকিয়ে মিষ্টি করে হেসে বললেন, 'কক্সবাজারে একদিন অপুর সঙ্গে দেখা হয়েছিলো।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'সে কি নেলী খালা! তুমি ভাইয়াকে চিনলে কী করে?'

নেলী খালা আগের মতো হেসে বললেন, 'বোকা ছেলে! চিনবো না কেন? অপু যে বার ম্যাট্রিক দিলো, সেবার যে আমি তিন দিনের জন্যে তোদের বাড়িতে এসেছিলাম, ভুলে গেছিস নাকি?'

আমি উত্তেজিত হয়ে বললাম, 'ভাইয়ার সঙ্গে তোমার কথা হয়েছে নেলী খালা? ভাইয়া কী করছে এখন?'

নেলী খালা শান্ত গলায় বললেন, 'অনেক কথা হয়েছে। তোর মাকে অবশ্য চিঠিতে কিছুই লিখি নি। ওর রঙটা শুধু কালো হয়ে গেছে। শরীর আগের চেয়ে ভালো হয়েছে। কী করছে, সব কথা তো আর তোকে বলা যাবে না। এটুকু জানলেই চলবে, অপু দেশের জন্যে কাজ করছে। ওর জন্যে আমাদের গর্বিত হওয়া উচিত।'

নেলী খালা আমাকে এখনো ছোট্ট ছেলে ভাবেন বলে দুঃখ পেলাম। বললাম, জানো নেলী খালা, আমারও ইচ্ছে হয় ভাইয়ার মতো বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি। ভাইয়ার সঙ্গে কখনো দেখা হলে আমি বলবো, আমাকে যেন সাথে নেয়।'

নেলী খালা মৃদু হেসে বললেন, 'পাগল ছেলে, তুই এখনো একেবারে ছোট্টটি রয়ে গেছিস। অপুর মতো হতে চাইলে তোকে অনেক পড়াশোনা করতে হবে।'

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। ভাইয়াকে দারুণ স্বার্থপর মনে হলো। কী হতো আমাকে সব কথা বললে! নেলী খালাকে যে-কথা বলা যায়, সে-কথা কি আমাকে বলা যায় না?

দূরে কয়েকটা সমুদ্রে পাখি ডাকছিলো। নেলী খালা কান পেতে সেই ডাক শুনলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'কাউকে বলিস না আবির। অপুর কথাতেই আমি তো এই বাড়িটা কিনেছি। ও বলেছে মাঝে মাঝে ওর বন্ধুরা এসে থাকবে। আমি তো সারা জীবন দেশের কোনো কাজেই লাগলাম না।'

আমি উত্তেজিত হয়ে বললাম 'সত্যি বলছো নেলী খালা! তাহলে ভাইয়ার সঙ্গে নিশ্চয় এখানে দেখা হতে পারে?'

নেলী খালা মৃদু হেসে বললেন, 'হতে পারে। আমার সঙ্গে ওর দেখা হয়েছিলো প্রায় দেড় মাস আগে। তবে ও বলেছে, এলে খবর দিয়ে আসবে। এখানে এসেই আমি জাহেদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেলেছি। দেখ না, ওকেও ঠিক দলে ভিড়িয়ে ফেলবো।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'সে কি নেলী খালা, তুমিও কি ভাইয়াদের দলে আছো?'

নেলী খালা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললেন, 'এসব কথা কখনো তোর বন্ধুদের বলবি না। বাবু ললি টুনিকে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো ছাড়া তোর আর কোনো কাজ নেই। অপুর কথা তোর মার সঙ্গে দেখা হলে বলবো।'

নেলী খালা উঠে চলে গেলেন। আমি মনে মনে ভাবলাম, এক দিন ঠিকই ভাইয়ার মতো ঘরবাড়ি সবকিছু ছেড়ে বেরিয়ে যাবো। ভাইয়ার আলমারির বাংলা বইগুলো পড়ে শেষ করতে নিশ্চয়ই বেশি দিন লাগবে না।

বিকেলে আমরা লনে গিয়ে কিছুক্ষণ 'পাজি রাজা' খেললাম। টসে বাবু রাজা হয়ে ভালো রকম নাকানি-চোবানি খেলো। খেলতে গিয়ে স্ক্যাটরার সঙ্গে আমাদের খুব ভাব হয়ে গেলো। টেনিস বলটা দূরে গড়িয়ে গেলে স্ক্যাটরা ছুটে গিয়ে ওটা মুখে করে তুলে আনছিলো। কাছে এসে ছুঁড়ে দিচ্ছিলো। নেলী খালা বললেন, 'ক'দিন ওর সঙ্গে আমি খেলার সময় পাই নি বলে বেচারার ভারি মন খারাপ করেছিলো।'

খেলার পর নেলী খালাকে বললাম, 'আমরা চারপাশে একটু ঘুরে দেখবো নেলী খালা। তুমি যে আর্মি ক্যাম্পের কথা বললে, ওটা কোন দিকে?

নেলী খালা বললেন, 'হাট থেকে সরু যে-রাস্তাটা ডানদিকে নেমে গেছে, সেই রাস্তা ধরে কিছু দূরে গেলেই বাঁ পাশে দেখতে পাবে। হাটে গিয়ে আবার আর্মি ক্যাম্প কোন দিকে বলে গলাবাজি কোরো না।'

বাবু বললো, 'আমাদের অতো বোকা ভাবছেন কেন?'

নেলী খালা হেসে বললেন, 'যেখানে যাও, রাত কোরো না। আর জাহেদকে বোলো ওদের ওখানে যদি কোনো কাঠের মিস্ত্রি থাকে, কাল সকালে যেন পাঠিয়ে দেয়।'

টুনি বললো, 'জাহেদ কে নেলী খালা?'

একটু অবাক হয়ে নেলী খালা বললেন, 'কেন, মেজর জাহেদের কথা বলি নি তোমাদের? কোন ক্যাম্পে যাচ্ছো তাহলে?

বাবু বললো, 'সেখানেই যাবো নেলী খালা।' তারপর টুনির দিকে তাকালো— 'কাল রাতে খাবার টেবিলে টুনি কানে কুলুপ এঁটে বসেছিলো।'

টুনি চটে গিয়ে আমাকে বললো, 'আবির, আপনার বন্ধুকে বলুন সব সময় যেন আমার পেছনে লাগতে না আসে। ভালো হবে না বলে দিচ্ছি।'

বাবু বললো, 'খারাপ হলেই বাঁচি।'

টুনি ওকে মারার জন্যে ছুটে এলো। বাবু তার আগেই ছুটলো। ওদের দু'জনের পেছনে স্ক্যাটরাও ছুটলো। আমি আর ললি পাহাড়ী পথ বেয়ে পাশাপাশি হাঁটতে লাগলাম।

ললিটা সব সময় বড়ো বেশি গম্ভীর থাকে। আমি চাই, ললি অন্তত আমার সঙ্গে একটু বেশি কথা বলুক। এটা আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম, ললি আমার

এক জন ভালো বন্ধু হবে। বাবু জানলে হয়তো মন খারাপ করতে পারে। ও টুনির সঙ্গে ভাব জমাক না; আমি কিছু মনে করবো না।

আমি এক সময় বললাম, 'তুমি এতো গম্ভীর থাকো কেন ললি? কথাটথা বলো।'

ললি একটু হেসে বললো, 'মাঝে মাঝে তুমিও তো আমার চেয়ে বেশি গম্ভীর হয়ে যাও। মনে হয় অনেক কিছু যেন ভাবো।'

আমি বড়দের মতো বিষণ্ন গলায় বললাম, 'নিজেকে কখনো খুব একা মনে হয় ললি। তখন হয়তো চুপচাপ থাকি।'

ললি বললো, 'একা কেন মনে হবে? বাবু আছে তো!'

'বাবু তো দু'মাস পরেই চলে যাচ্ছে।'

কিছুক্ষণ পর ললি আস্তে আস্তে বললো, 'আমাকে এখন থেকে তোমার বন্ধু ভেবো। তাহলে আর একা মনে হবে না।'

আমি একটু হেসে বললাম, 'আমি ভাবলে তো আর হবে না। তোমাকেও ভাবতে হবে।'

ললি একটু লজ্জা পেলো। তারপর বললো, 'যখন নেলী খালার কাছে তোমার সব কথা শুনেছি, তখন থেকেই তোমাকে আমি বন্ধু ভেবেছি।' কিছুক্ষণ চুপ থেকে ললি বললো, 'আসলে আমি তোমার চেয়েও বেশি একা। টুনি ছাড়া কেউ আমাকে ভালোবাসে না।'

এর পর আমি চুপ করে রইলাম। বুকের ভেতর কেমন যেন শিরশির করে উঠলো। ললির কাঁধে হাত রাখলাম। ও কোনো কথা বললো না। সামনের মোড়টা পেরোতে দেখি, বাবু আর টুনি স্ক্যাটরাকে নিয়ে পথের পাশে ঘাসের ওপর বসে আছে।

টুনি বললো, 'এতো আস্তে হাঁটছো কেন তোমরা? যেতে যেতেই তো সন্ধ্যে হয়ে যাবে।'

ললি বললো, 'তুমি তো জানো টুনি, ডাক্তার আমাকে জোরে হাঁটতে বারণ করেছেন।'

আমি অবাক হলাম— 'কেন ললি?'

ললি খুব আস্তে করে বললো, 'আমার বুকের ভেতর একটা অসুখ আছে।'

আমি ললির মুখের দিকে তাকালাম। হঠাৎ আমার মনে হলো, ওর বুকের ভেতর অনেক দুঃখ জমে আছে। অনেক দিন ধরে যে দুঃখগুলো জমে জমে অসুখ হয়ে গেছে। কাউকে যন্ত্রণা পেতে দেখলে আমার কষ্ট হয়। মনে মনে ভাবলাম, বড় হয়ে যখন নিজের পায়ে দাঁড়াবো, তখন সবার দুঃখ দূর করে দেবো।

পাহাড়ের বিকেলগুলো যে এতো সুন্দর হয়, আগে আমি ভাবতেই পারি নি। সমুদ্রের বাতাসে পথের ওপর ঝুরঝুর করে রাধাচূড়ার হলদে পাপড়ির বৃষ্টি

ঝরছে। দূরের পাহাড়গুলো লাল, গোলাপি, বেগুনি মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়েছে। পুরোনো ঢাকার এক সরু গলির কথা মনে পড়লো। সেখানে কোনো দিন এতো বড়ো আকাশ দেখি নি।

আমরা হাটে এসে দেখি দোকানপাট সব বন্ধ। বাবু বললো, 'আজ বোধ হয় হাটবার নয়। গ্রামে শুনেছি হপ্তায় এক দিন নয় দু'দিন হাটের দোকান খোলা থাকে।'

আমি বললাম, 'কাজ নেই হাটে। চলো ক্যাম্পে যাওয়া যাক।'

নেলী খালার কথা মতো ডান পাশের সরু রাস্তায় মোড় ঘুরতেই দেখি একটা বন্ধ দোকানের চালের নিচে লরেল হার্ডির মতো দু'জন ভদ্রলোক একটা বেঞ্চে বসে আছে। সিনেমার লরেল হার্ডির কথা বললাম বটে, তবে ওদের প্যান্ট-শার্ট পরা দেখে যাত্রা দলের সং-এর মতো মনে হচ্ছিলো। কাছে যেতেই মোটা লোকটা আমাকে মোলায়েম গলায় বললো, 'এই যে খোকা, এদিকে শুনলাম একটা মোটেল নাকি আছে। কোন এক বিলেতি মেম চালান ওটা? কোন পথে যাবো বলতে পারো?'

লোকটা আমাকে ললি টুনির সামনে খোকা বলাতে যেমন রাগ হলো, আবার নেলী খালাকে বিলেতি মেম বলাতে হাসিও পেলো। এরই ভেতর টুনি ফিক ফিক করে হাসতে শুরু করেছে।

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, 'এ পথ ধরে সোজা চলে যান।'

স্ক্যাটরা ওদের দিকে ভয়ানক সন্দেহের চোখে তাকিয়ে গরগর করছিলো। লরেলের মতো সরু লোকটা দেখতে পেয়ে মিহি গলায় বললো, 'কামড়ে-টামড়ে দেবে না তো! কুত্তোটা সামলে রেখো বাপু।' এই বলে বকের মতো লম্বা লম্বা পা ফেলে সঙ্গীকে বললো, 'চল ফতে। ঈশ্বরের পৃথিবীতে এই প্রাণীটাকে আমি দু' চোখে দেখতে পারি না। ওরাও আমাকে পছন্দ করে না।'

লোক দুটো চোখের আড়ালে যেতেই আমরা সবাই হেসে কুটোপাটি। স্ক্যাটরাকে মোটেলে দেখলে ওদের যে কী অবস্থা হবে, বিশেষ করে ওই রোগা লিকপিকে লোকটার—যতোবার ভাবলাম ততোবারই শুধু হাসি পেলো। ললি বললো, 'নেলী খালার প্রথম গেস্ট হিসেবে রীতিমতো মনে রাখার মতো।'

নেলী খালা বলেছিলেন আর্মি ক্যাম্প, কিন্তু আমরা কোনো ক্যাম্প অর্থাৎ তাঁবু-টাবু দেখতে পেলাম না। তার বদলে সেখানে রয়েছে চমৎকার এক বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি। আর পেছনে টালির ছাদঅলা একটা লম্বা ঘর। বোঝা গেলো এটাকেই নেলী খালা ক্যাম্প বলেছেন। গেটের কাছে দারোয়ানের মতো একটা লোক ঘুরঘুর করছিলো। ওকে গিয়ে বললাম, 'মেজর জাহেদ আহমেদ কি এখানে থাকেন?'

কথাটা শুনে লোকটা খেঁকিয়ে উঠলো— 'এখানে আবার মেজর আসবে

কোত্থেকে। আমাদের সায়েব রবারের চাষ করেন আর শিকার করেন।'

লোকটা হয়তো আমাদের তাড়িয়েই দিতো। কিন্তু স্ক্যাটরা ওর দিকে যেভাবে গরগর করছিলো, তাতে সাহস পেলো না। তার বদলে আমার দিকে এমন কটমট করে তাকালো যে, মনে হলো আমরা বিদেয় হলেই সে খুশি হয়। এমন সময় বাংলোর বারান্দা থেকে এক জন ভদ্রলোক নেমে এসে— 'কী হয়েছে বনমালী,' বলে আমাদের দিকে তাকিয়েই— 'আরে এসো এসো, আমার ক্ষুদে প্রতিবেশীরা। নেলীর কাছে তোমাদের কথা শুনে শুনে সবার চেহারা পর্যন্ত মুখস্থ হয়ে গেছে।'

এগিয়ে এসে আমার সঙ্গে হাত মিলিয়ে বললেন, 'তুমি হচ্ছো আবির। আর এ হচ্ছে আমেরিকান বাবু'— তারপর ললির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'শান্ত মেয়েটি যে ললি, সেটা কাউকে বলে দিতে হবে না। বাকি থাকলো শুধু টুনি। জিব না দেখলেও ওকে চেনা যায়।'

টুনি ওর অভ্যেস মতো ফিক করে হেসে ফেললো। মেজর জাহেদের মতো চমৎকার চেহারার ভদ্রলোক আমি শুধু টিভির বিদেশী ছবিগুলোতেই দেখেছি। টুনিও দেখলাম হাঁ করে তাঁকে দেখছে। স্ক্যাটরার সঙ্গে তাঁর আগেই পরিচয় ছিলো। 'স্ক্যাটরা'— বলে নরোম গলায় যখন তিনি ডাকলেন, তখন স্ক্যাটরা তাঁর সাদা ট্রাউজার আর নীল গেঞ্জিতে ধুলোটুলো মাখিয়ে নাক-মুখ সব চেটে একাকার করে ফেললো। তিনি হাসতে হাসতে বললেন, 'ওরে থাম থাম। সুড়সুড়ি আর আদরের বহরে হাসতে হাসতে আমার দমটা বেরিয়ে যাবে।' তারপর আমাদের বললেন, 'চলো ঘরে যাই।'

মেজর জাহেদ বাবুর্চিকে মিল্ক চকোলেট বানাতে বলে সবাইকে একগাদা ক্যান্ডি বের করে দিলেন। স্ক্যাটরাও বাদ পড়লো না। আমরা সবাই বাংলোর বারান্দায় বসে কথার ফুলঝুরি ছড়িয়ে দিলাম। বড়ো বড়ো কাপে করে গরম মিল্ক চকোলেট না আসা পর্যন্ত কে কি করি, তার ফিরিস্তি দিতে দিতেই সময় কেটে গেলো। এখানে আসার পর কী ঘটেছে তাও বললাম। বাবু আর টুনিই বেশি কথা বলছিলো। তিনি শুধু মিটিমিটি হাসছিলেন।

আমরা চকোলেটের কাপে চুমুক দেবার জন্যে যখন কথা থামালাম, তখন বনমালী নামের সেই খিটখিটে লোকটা এসে মেজরের কানে কানে কি যেন বললো। মেজর শুধু একটু হেসে ওকে ইশারায় চলে যেতে বললেন। টুনি বললো, 'আপনার এ লোকটাকে আমার একদম পছন্দ হয় নি।'

মেজর হেসে বললেন, 'ও নিশ্চয়ই বলেছে, মেজর জাহেদ আহমেদ বলে এখানে কেউ থাকে না। নেলী কি তোমাদের বলে নি, আমরা সবাই এখানে গোপনে ছদ্মবেশে আছি? এখানে যিনি থাকেন— '

তাঁকে বাধা দিয়ে হেসে ফেলে আমি বললাম, 'তিনি শুধু রবারের চাষ করেন,

আর মাঝে মাঝে শিকার-টিকারে বেরোন।'

সবাই একসঙ্গে হেসে উঠলো। স্ক্যাটরা কী বুঝলো কে জানে, ছুটে গিয়ে আরেক দফা মেজরের গাল-টাল চেটে দিলো। মেজর বললেন, 'শিকারের জন্যে এসেছি বটে, তবে এই এলাকায় তেমন সুবিধে করতে পারছি না। শিকারগুলো বড্ডো বেশি বেরসিক। সব সময় নাগালের বাইরে চলাফেরা করে।'

তারপর মেজর বললেন, 'এ অঞ্চলে যে একটা বড়ো রকমের স্মাগলারের দল কাজ করছে, সে রিপোর্ট আমাদের আছে। বর্ডারে সব রকম কড়াকড়ি করা হয়েছে। কিন্তু বার বার পাখি ঠিকই উড়ে যাচ্ছে।'

আমি বললাম, 'নেলী খালা বলছিলেন, এখানে নাকি সোনার খনি থাকতে পারে। আপনার কি মনে হয় কোনো পাজি লোক সোনার খনি খোঁজার জন্যে আমাদের ভয় দেখাচ্ছে?'

মেজর একটু চিন্তিত হয়ে বললেন, 'সোনার খনির ব্যাপারে আমার সে রকম ধারণা নেই। নেলী অবশ্য জিওলজিক্যাল সার্ভে অফিসে চিঠি পাঠিয়েছে। সোনার খনি এখানে না হলে বার্মাতেও হতে পারে। তবে আমার মনে হয়, কেউ হয়তো নেলীর বাড়িটা সস্তায় কিনে নিতে চায়। সে জন্যে হয়তো ভয় দেখাচ্ছে। আসল কথা হলো, তোমাদের বোধ হয় এখানকার কেউ পছন্দ করছে না। আমি নেলীকে বলেছি, আমরা যতক্ষণ আছি ভয়ের কোনো কারণ নেই। আমাদের এখানে এক কোম্পানি সৈন্য আছে— আপাতত যারা রবারের চাষ করছে।' এই বলে মেজর মুখ টিপে হাসলেন।

বাইরে তখন সন্ধে ঘনিয়ে আসছিলো। সূর্যটা অনেক আগেই সামনের পাহাড়ের আড়ালে চলে গেছে। ঠাণ্ডা তাজা বাতাস বইছে। বাংলোর ঝুল বারান্দার থাম বেয়ে দুটো লতা গোলাপের ঝাড় ওপরে উঠে গেছে। ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে গাছ দুটো। মিষ্টি একটা গন্ধ বাতাসে ভাসছে। ললি বললো, 'এ জায়গাটা ভারি সুন্দর!'

মেজর একটু হেসে বললেন, 'হুঁ, সুন্দরের ভেতরই অসুন্দর বাসা বাঁধে।'

হঠাৎ মনে পড়লো, মেজরকে নেলী খালার কথা বলা হয় নি। বলতেই তিনি হেসে উঠলেন— 'কাঠের মিস্ত্রি এখানে কোথায় পাবো? নেলীর যদি খুব দরকার হয়, আমার পুরোনো বিদ্যে কিছু জাহির করতে পারি। ওকে বলো আমি কাল সকালে যাবো।'

সন্ধ্যের আগে ফিরে যেতে হবে। মেজরকে বললাম, 'আমরা চলি তাহলে। কাল সকালে দেখা হবে।'

তিনি হেসে উঠে দাঁড়ালেন। আমাদের গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। আড়চোখে বনমালীর দিকে তাকিয়ে দেখি, ওর মুখের সেই খিটখিটে ভাবটা আর নেই। স্ক্যাটরা অবশ্য ওকে দেখে গরগর করে যেন বললো, 'তোমাকে বাপু পছন্দ

হয় নি। আমাকে কখনো ঘাঁটাতে এসো না।'

পথের পাশে একটা ঝোপের ভেতর বুনো লিলি ফুটেছিলো। মিষ্টি হলেও গন্ধটা ভারি ঝাঁঝালো। টুনি ললিকে বললো, 'ললিপা এসো, নেলী খালার জন্যে কিছু ফুল নিয়ে যাই।'

ললি টুনির সঙ্গে ফুল তুলতে গেলো। বাবু এক বার আমার মুখের দিকে তাকালো। তারপর গুটিগুটি ললি টুনিদের কাছে চলে গেলো। আমি ঘাসের ওপর বসে আকাশে রঙের খেলা দেখছিলাম। হঠাৎ মনে হলো, ডান পাশের পাহাড়ে একটা আলো এক বার জ্বলে উঠেই নিভে গেলো। তারপর ভালো করে চারদিকে তাকিয়ে কিছুই দেখতে পেলাম না। এমন সময় স্ক্যটরা হঠাৎ গরগর করে উঠলো। আলোটা যেখানে দেখেছিলাম, তার অল্প দূরে তাকিয়ে দেখি একটা মানুষ। দেখে আমার গায়ের লোমগুলো সব খাড়া হয়ে গেলো। বুকের ভেতরটা ধুপধুপ করতে লাগলো। মানুষ বললাম বটে— তবে মানুষ যে কখনো এতো লম্বা হতে পারে না, এ আমি হলপ করে বলতে পারি। আগাগোড়া সাদা আলখাল্লা পরা সেই মানুষটা অথবা অন্য যা কিছু হোক— পাহাড়ের প্রায় অন্ধকার গাছের তলায় হাঁটছিলো। ইচ্ছে করলেই অবশ্য ওটা আমাদের কাছে আসতে পারবে না, কারণ দুই পাহাড়ের মাঝখানে যে ঢাল জায়গা, সেটা এতো গভীর যে অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। তবে একেবারে নিচে বিকেলে একটা রূপোলি ফিতের মতো সরু নালা দেখেছি। পাহাড়ে এরকম প্রায়ই থাকে। কেউ ওটা পেরিয়ে এখানে আসতে চাইলে কম করে হলেও তিন-চার ঘন্টা লেগে যাবে, ততোক্ষণে আমরা ঘরে ফিরে খেয়ে-দেয়ে কম্বলের তলায় ঢুকে পড়বো; কিন্তু যদি মানুষ না হয়—কথাটা মনে হওয়া মাত্র আমার গলা-টলা সব শুকিয়ে গেলো। আর তখনই স্ক্যাটরা ওটার দিকে তাকিয়ে এতো জোরে ঘেউ ঘেউ করে উঠলো যে বাবু, ললি, টুনি সবাই 'কী হয়েছে'— বলে ছুটে এলো। ততোক্ষণে ওই আজগুবি মানুষটা একটা ঝাঁকড়া ছাতিম গাছের আড়ালে বাতাসের মতো মিলিয়ে গেছে।

ওদের সবার হাত ভর্তি বুনো লিলি। বাবু বললো, 'স্ক্যাটরা ও রকম চ্যাঁচালো কেন?'

আমি একবার টুনির দিকে তাকালাম। তারপর বললাম, 'ও কিছু নয়। ইঁদুর-টিদুর কিছু দেখেছে বোধ হয়। স্ক্যাটরা পাহাড়ী ধেড়ে ইঁদুর দু'চোখে দেখতে পারে না।'

বাবু কথাটা বিশ্বাস করলো কিনা জানি না। আমি ওর কাঁধে হাত রেখে বললাম, 'চলো, রাত হয়ে গেছে।'

আমাদের দেখে নেলী খালা বললেন, 'তোমাদের আরো আগে ফেরা উচিত ছিলো'। তারপর ফুলগুলো দেখেই লুফে নিলেন— 'কী চমৎকার লিলি! অনেক দিন আমার ইচ্ছে হয়েছে কিছু তুলে আনি। কোনোদিন আর আনা হয় নি।'

টুনি বললো, 'আজ আমার ইচ্ছে হলো— ।'

বাধা দিয়ে বাবু বললো, 'তাই আমরা সবাই তুলে আনলাম।'

নেলী খালা হেসে বললেন, 'থাক, এখন আর ঝগড়া করতে হবে না। আমাদের দু'জন গেস্ট এসেছে।'

টুনি বললো, 'লরেল হার্ডি তো? ওদের তো আমরাই পাঠালাম।'

নেলী খালার চোখ দুটো গোল হয়ে গেলো— 'লরেল হার্ডি কোথায় পেলে। মিষ্টার ফতেউল্লা আর শ্রী গোবর্ধন নিয়োগী এসেছেন। চাটগাঁয়ে শুঁটকির কারবার আছে। যাবেন সেন্ট মার্টিনসে। এই এলাকায় সুবিধে মতো শুঁটকি পাওয়া যায় কিনা দেখবেন। যাও, বেশি হৈচৈ কোরো না। তোমাদের ঠিক নিচের ঘর দুটোই ওঁরা নিয়েছেন।

ললি বললো, 'ওগুলো যে সাজানো হয় নি নেলী খালা!'

নেলী খালা কাঁধ ঝাঁকালেন— 'বলেছিলাম দোতালায় যে কোনো ঘরে থাকতে। ওঁরা রাজি হলেন না। বললেন, সিঁড়ি বেয়ে ওঠা-নামা করতে নাকি কষ্ট হয়। শ্রী গোবর্ধনের হাঁপানির রোগ আছে। তাই বড়িবি আর বাথিন মিলে তাড়াহুড়ো করে রুম দুটো কোনো রকমে গুছিয়ে দিয়েছে। ঘরে বেশি দাপাদাপি কোরো না। কাঠের মেঝেতে শব্দ হয় খুব।'

আমরা কি কচি খোকা যে দাপাদাপি করবো? নেলী খালা যেন কথা আর খুঁজে পেলেন না। বোঝা গেলো প্রথম গেস্ট পেয়ে নেলী খালা রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। আমরা চার জন একে অপরের দিকে তাকালাম। তারপর পা টিপে টিপে দোতালায় উঠলাম। ললি টুনিকে বললাম, 'খাবার পাটটা তাড়াতাড়ি মিটিয়ে ফেলে আমরা আবার কনফারেন্সে বসবো। জরুরি কথা আছে।'

টুনি বললো, 'খবরদার, কোনো ভূতের গল্পো শোনাতে পারবে না।'

বাবু বললো, 'তুমি তাহলে একলা ও-ঘরে থাকতে পারো। আমরা ললিকে নিয়েই প্ল্যান করবো।'

টুনি এগিয়ে এসে বাবুর পিঠে নরোম একটা কিল মেরে আদুরে গলায় বললো, 'আমাকে ভয় দেখালে ভালো হবে না বলছি।'

বাবু বললো, 'আমরা কি বলেছি তোমাকে ভয় দেখাবো?'

বাবু টুনির মিষ্টি ঝগড়াগুলো আমার আর ললির কাছে বেশ মজাই লাগলো। ললি বললো, 'আমরা কি গেস্টদের সঙ্গে খাবো?'

আমি বললাম, 'আমরা থাকলে কি লরেল হার্ডির খাওয়ার অসুবিধে হবে?'

ললি হেসে বললো, 'আমরা থাকলে হবে না। স্ক্যাটরা থাকলে হবে।'

অসুবিধেটা খাবার টেবিলে আমরা সবাই রীতিমতো উপভোগ করলাম। নেলী খালা চীনে হাঁসের রোস্ট করেছিলেন। লিকপিকে শ্রী গোবর্ধন এতো প্রশংসা

করছিলো যে নেলী খালা বার বার লাল হয়ে শুধু— 'ধন্যবাদ, কী যে বলেন' বলছিলেন। আর শ্রী গোবর্ধনও এক টুকরো মাংস গিলেই 'মাইরি বলছি দিদি, এমন ফাস্টো কেলাস রান্না আমার বাপের জন্মে খাই নি'—এসব বলছিলো।

শ্রী গোবর্ধনের প্রশংসার বহর দেখে বাবু আর প্রশংসা করার সুযোগ পেলো না। অবশ্য প্রশংসা না করলেও আমি ওকে খাবার ঠিকই তুলে দিচ্ছিলাম। এমন সময় হেলেদুলে স্ক্যাটরা এসে নতুন মানুষদের একটু শুঁকে দেখবার জন্যে ওদের দিকে এগিয়ে গেলো। শ্রী গোবর্ধনের মুখে তখন হাঁসের একখানা আস্ত বুকের মাংস। স্ক্যাটরাকে দেখে ওই অবস্থাতেই তার চোখ দু'টো আলুর মতো গোল হয়ে কপালে উঠে গেলো। শুধু আঁ আঁ করতে লাগলো। নেলী খালা তখনো স্ক্যাটরাকে দেখেন নি। অবাক হয়ে শ্রী গোবর্ধনকে দেখছিলেন। শ্রী গোবর্ধন হাত নাচিয়ে কোনো রকমে মুখ কালো করে বললো, 'দিদি!—'

বলার সঙ্গে সঙ্গে মাংসের টুকরোটা মিস্টার ফতের কোলের উপর ছিঁটকে পড়লো। আর স্ক্যাটরা এগিয়ে এসে আড়চোখে এক বার নেলী খালাকে দেখে মিস্টার ফতের কোল থেকে মাংসের টুকরোটা তুলে নিলো।

শ্রী গোবর্ধন ততোক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। নেলী খালা গম্ভীর হয়ে বললেন, 'শরীর খারাপ করেছে? বাথরুমে যাবেন?'

বেরসিক লোকটার কাণ্ডকারখানা দেখে স্ক্যাটরা ততোক্ষণে ধমক খাবার ভয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। শ্রী গোবর্ধন লম্বা একটা নিশ্বাস ফেলে ধপ করে বসে পড়ে বললো, 'জল।'

নেলী খালা তাড়াতাড়ি পানি ভর্তি জগটা এগিয়ে দিলেন। শ্রী গোবর্ধন পানিটা গ্লাসে না ঢেলে জগের মুখেই খেতে শুরু করলো। সবাই প্রাণপণে হাসি চাপলেও টুনিটা ফিক করে হেসে ফেললো। নেলী খালা শুধু গম্ভীর মুখে একবার টুনির দিকে তাকালেন। টুনি সঙ্গে সঙ্গে চুপ।

ঢকঢক করে জগের আদ্ধেক খালি করে সে হাঁপাতে লাগলো। নেলী খালা বললেন, 'আপনি কি অসুস্থ বোধ করছেন?'

হাঁপাতে হাঁপাতে শ্রী গোবর্ধন বললো, 'কালো কুত্তোটা। এই ছোঁড়াদের সঙ্গে সেই যে সন্ধেবেলা দেখেছিলাম।'

নেলী খালা পেছনে তাকিয়ে কিছুই দেখতে পেলেন না। শ্রী গোবর্ধন বললো, 'আরেকটু হলেই প্রাণ-পাখিটা বেরিয়ে যেতো। ঈশ্বরের পৃথিবীতে এই প্রাণীটাকে আমি দু' চোখে দেখতে পারি না।'

নেলী খালা বললেন, 'কোথায় দেখলেন?'

শ্রী গোবর্ধন তেমনি হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, 'চলে গেছে।'

মিস্টার ফতেকে দেখলাম মহা বিরক্ত হয়ে কটমট করে শ্রী গোবর্ধনের দিকে তাকালো। শ্রী গোবর্ধনের সেদিকে কোনো খেয়ালই নেই। তখন আমি পষ্ট

শুনতে পেলাম, মিষ্টার ফতে বিড়বিড় করে বলছে, 'ওস্তাদ যে কেন এমন কাজে এসব ভীতুর ডিমগুলোকে সঙ্গে দেয়, বুঝি না। গোবরটা দেখছি একটা কেলেঙ্কারি না করে ছাড়বে না।'

অন্য কেউ অবশ্য মিস্টার ফতের কথাগুলো খেয়াল করে নি। সবাই শ্রী গোবর্ধনকে দেখছিলো। নেলী খালা তখন বড়িবিকে ডেকে বললেন, 'খাবার সময় স্ক্যাটরাকে কেন এদিকে আসতে দিয়েছো?' এই বলে শ্রী গোবর্ধনের দিকে তাকালেন—'ওটা আমার কুকুর স্ক্যাটরা। ভয় পাবার কিছু নেই।'

'কি ক্যাটরা?' শ্রী গোবর্ধনের কথার ভঙ্গিতে হাসি চাপা দায় হলো।

'স্ক্যাটরা।' নেলী খালা বললেন, 'বড়ো ভালো কুকুর।'

শ্রী গোবর্ধন ততোক্ষণে খাবারের দিকে মনোযোগ দিয়েছে। প্লেট থেকে আরেকখানা মাংস তুলে নিতে নিতে বললো, 'কুত্তো যে কখনো ভালো হয়, আপনার কাছে এই প্রথম শুনলাম।'

কথাটা নেলী খালার পছন্দ হলো না। তিনি গম্ভীর মুখে খেতে লাগলেন। মিস্টার ফতে আরেক বার কটমট করে শ্রী গোবর্ধনের দিকে তাকালো। ভাগ্যিস নানু আমাদের আগেই খেয়ে নিয়েছিলেন। নইলে নেলী খালার গেস্টদের এ ধরনের ব্যবহার যে তিনি বিন্দুমাত্র পছন্দ করতেন না, এ কথা হলপ করে বলা যায়। এর পর খাবার পর্বটুকু নির্বিঘ্নেই শেষ হলো। আমরা সবাই চুপচাপ খাওয়া শেষ করে বেরিয়ে এলাম।

নানু স্টাডিতে বসে বই পড়ছেন। একটু পরে দুধ খেয়ে ঘুমোতে যাবেন। নেলী খালাও আর দোতালায় উঠবেন না। আমরা নিশ্চিন্ত মনে আলোচনায় বসলাম।

প্রথমেই ওদের সন্ধেবেলা দেখা সেই ঘটনাটা খুলে বললাম। আলো জ্বলে নিভে যাওয়া থেকে শুরু করে মানুষ না কি যেন তার বাতাসে মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত সবকিছু শুনতে শুনতে টুনি একেবারে বাবুর গা ঘেঁষে বসেছে। বাবু বললো, 'টুনি সরে বসো। তোমার চুল আমার ঘাড়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছে।'

আমি বললাম, 'এই লোক দুটোকে তোমাদের কী মনে হয়? মিস্টার ফতেউল্লা আর শ্রী গোবর্ধন নিয়োগীকে?'

টুনি বললো, 'বেশ মজার লোক। লরেল খাবার টেবিলে যা করলো—' বলে ও একচোট হেসে নিলো, নেলী খালার ধমকের ভয়ে তখন যে হাসিটুকু এতোক্ষণ চেপে রেখেছিলো।

আমি তখন ফতের বিড়বিড় করে বলা কথাগুলো ওদের বললাম। শ্রী গোবর্ধনকে ফতে 'গোবর' বলেছে শুনে টুনি আবার হেসে উঠলো। ললি তখন টুনিকে ধমকে দিলো—'হেসো না টুনি, এটা হাসির কথা নয়।'

বাবু বললো, 'তোমার কী মনে হয়?'

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, 'শুঁটকির ব্যবসায়ীদের যে সাহসী হতেই হবে, এমন কোনো কথা নেই। ফতের কথাগুলো লক্ষ করো। ও বলেছে, "ওস্তাদ কেন যে এমন কাজে"—কথা হচ্ছে ব্যবসায়ীদের কখনো ওস্তাদ থাকে বলে আমার জানা নেই। মালিক মহাজন থাকতে পারে। কিন্তু ওস্তাদ কথাটা আমি বইয়ে পড়েছি চোর-ডাকাতের দলের লোকেরাই বলে। আর "এমন কাজ" মানেটা কী? তাছাড়া কুকুরকে এরকম ভয় পেতে আমি কোনো ভালো লোককে কখনো দেখি নি। চোর-ডাকাতেরাই কুকুর ভয় পায়। এই ভয় চেপে রাখতে পারে নি বলেই ফতে বলেছে, "গোবরটা দেখছি কেলেঙ্কারি না করে ছাড়বে না"।'

'তাই তো!' বেশ চিন্তিত গলায় বাবু বললো, 'লোকগুলোকে তো সুবিধের বলে মনে হচ্ছে না। পাহাড়ের ওটা না হয় কাল সকালে গিয়ে দেখা যাবে। কিন্তু এ দুটো কে?'

ললি বললো, 'আমাদের সাবধানে থাকা উচিত।'

বাবু বললো, 'ডাকাত দলের কেউ নয় তো? রাতে ডাকাতি করে পালিয়ে যাবে?'

আমি বললাম, 'রাতে কিছু করতে পারবে না, স্ক্যাটরা আছে।'

ললি বললো, 'ওদের ওপর নজর রাখতে হবে।'

টুনি হাই তুলে বললো, 'আমার ঘুম পাচ্ছে।'

বাবু বললো, 'ঠিক আছে। চলো, তোমাদের ঘরে পৌঁছে দিই। ছিটকিনিটা লাগাতে ভুলো না যেন।'

কম্বল মুড়ি দিয়ে বিছানায় শুয়ে সারাদিনের ব্যস্ততার কথা ভাবতে ভাবতে আমরা গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলাম।

আন্নাকালীর পাহাড়ে আলোর সংকেত

পরদিন সকালে খাবার টেবিলে গিয়ে দেখি শ্রী গোবর্ধন আর মিস্টার ফতেউল্লা সেখানে নেই। নানু খেয়ে উঠে গেছেন। শুধু নেলী খালা স্ক্যাটরাকে বসে বসে শুকনো টোস্ট খাওয়াচ্ছেন। ললি বললো, 'তোমার গেস্টদের এখনো ঘুম

ভাঙে নি নেলী খালা?'

নেলী খালা বললেন, 'ওরা খুব সকালে উঠে টেকনাফ গেছে। রাতে আসতে পারে। নইলে কাল ফিরবে।'

আমরা খেতে বসে গেলাম। পরিজ, টোস্ট, ডিম, মাখন টেবিলে সব স্তুপ হয়ে আছে। মনে হলো দু'মাসে শরীরটা বোধহয় ডবল হয়ে যাবে। বাবু বললো, 'নেলী খালা, আজ আমরা পাহাড়ে বেড়াতে যাবো।'

আমি আড়চোখে নেলী খালার দিকে তাকালাম। নেলী খালা মুখ টিপে হেসে বললেন, 'সোনার খনি খুঁজবে বুঝি?'

টুনি বললো, শুধু সোনার খনি খুঁজবো কেন, আবির বলেছে পাহাড়ে নাকি হার্মাদদের লুকোনো গুপ্তধন আছে।'

আমি তখন টুনিকে ধমক লাগাতে গিয়ে বিষম খেলাম। ললি ভুরু কুঁচকে টুনির দিকে তাকালো। নেলী খালা আমাকে দেখে হেসে ফেললেন— 'যেখানেই যাও, দুপুরের আগে ফিরে আসবে। আমি একটু হিমছড়ি যাবো। কিছু জিনিসপত্তোর কিনতে হবে।'

ঘর থেকে বেরুতে বেরুতে বাবু টুনিকে বললো,— 'তোমাকে নিয়ে আর পারা গেলো না। গুপ্তধনের কথা নেলী খালাকে বলার কী হলো শুনি?'

টুনি শুধু বাবুকে খানিকটা জিব বের করে দেখালো।

বাইরে রোদ ঝলমল করছিলো। বাতাস ঠাণ্ডা বলে রোদের তাপ গায়ে লাগলো না। সে কি জোর বাতাস! ললির খোলা চুল একেবারে এলোমেলো হয়ে গেলো। টুনি রোজই ঝোলানো সিং-এর মতো দুটো খোঁপা করে। তাই ওর চুল কিছুটা ঠিক ছিলো। আমার আর বাবুর তো কথাই নেই। ললির চুলের ওপর কটা রাধাচূড়ার পাপড়ি উড়ে এসে পড়লো। আমি দেখলাম, ললির চোখের পাতা দুটো অল্প অল্প কাঁপছে। বাবু আর টুনি হাত ধরাধরি করে আমাদের আগে আগে হাঁটতে লাগলো। স্ক্যাটরা আমার পাশে হাঁটছিলো। আমরা সেই সোনাবালি নদীর দিকে যাচ্ছিলাম, যেখানে নেলী খালা তিন রত্তি সোনা পেয়েছিলেন।

নদীতে যেতে হলে পাহাড়ী পথ ছেড়ে জঙ্গলের ভেতর কিছু দূর হাঁটতে হয়, নেলী খালা পথ বলে দিয়েছিলেন।

আমরা তখন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হাঁটছিলাম। বাবু আমাকে বললো, 'মড়ার মাথার খুলি আঁকা কোনো গাছ চোখে পড়ে কিনা দেখো তো।'

টুনি বুনোফুল, প্রজাপতি আর পাখি দেখতে দেখতে একটু পেছনে পড়ে গিয়েছিলো। বাবুর কথা ওর কানে যাওয়া মাত্র ও তিন লাফে ললির কাছে এসে গেলো। বাবু গম্ভীর হতে গিয়ে হেসে ফেললো— 'দিনের আলোতেও ভয়!'

মড়ার খুলি আঁকা গাছের আগে সোনাবালি নদীটাই চোখে পড়লো। ঠাণ্ডা ইস্পাতের চাদরের মতো চকচক করছিলো নদীটা। কাছে এসে বোঝা গেলো

পানিটা চুপচাপ বসে নেই— মসৃণ এক স্রোতের মতো বয়ে যাচ্ছে। আর নদীতে এতো স্বচ্ছ পানি থাকতে পারে, আগে কখনো দেখি নি। অবশ্য আমার নদী দেখা মানে বুড়িগঙ্গা আর ট্রেনে যে ক'টা নদী দূর থেকে চোখে পড়ে। নদীর তলায় সূর্যের আলো পড়ে সারা নদী আলো হয়ে আছে। তলায় সোনালি বালি চিকচিক করছে। এতটুকু শ্যাওলা নেই কোথাও। ছোট বড়ো অনেক রকম মাছ পরম নিশ্চিন্তে সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে। কয়েকটা মাছ আমাদের পায়ের শব্দ শুনে পানির ওপর মাথা তুলে দেখলো, আবার সঙ্গে সঙ্গে স্ক্যাটরার গরগর গলার শব্দ শুনে কয়েকটা বুদবুদ উড়িয়ে টুপ করে পালিয়ে গেলো।

ললি বললো, 'মাঝখানে খুব বেশি গভীর নয়।'

টুনি গম্ভীর হয়ে বললো, 'তবু তুমি ডুবে যাবে।'

ললি ওর কথায় কান না দিয়ে বললো, 'আরো হাঁটবে, না এখানে বসবে?'

বাবু বললো, 'বসবে কি? আমরা নিশ্চয়ই পিকনিক করতে আসি নি!'

আমি বললাম, কিছুক্ষণ বসা যাক বাবু। ভারি সুন্দর লাগছে। এরকম নিরিবিলি পাহাড়ী নদীর কথা শুধু বইয়ে পড়েছি।'

বাবুর খুব একটা বসার ইচ্ছে ছিলো না। তবু বসলো। বিড়বিড় করে বললো, 'মাঝে মাঝে তোমার যে কী হয়!'

আমি মনে মনে হাসলাম। ললি বসতে চাইলো বলেই তো বসলাম। ও অবশ্য বসার কথা বলে নি, তবে আমি ঠিক বুঝতে পেরেছিলাম বসতে চাইছে। ললি গভীর চোখে আমার দিকে তাকালো। আমি একটু হাসলাম। টুনি ততোক্ষণে পাতলা পাথরের টুকরো নিয়ে নদীতে ব্যাঙ লাফানোর খেলা শুরু করে দিয়েছে।

আমি আর ললি একটা গাছের ছায়ায় বসেছিলাম। স্ক্যাটরা শুয়েছিলো আমাদের পাশেই। গরমে ওর জিব বেরিয়ে গেছে। নদীর ওপারে সেগুন আর বুনো ঝাউয়ের ঘন জঙ্গল। আমি ভাবছিলাম, এক দিন চার জন মিলে যদি ওই জঙ্গলে হারিয়ে যাই, তাহলে বেশ হয়। কথাটা ললিকে বলবো, এমন সময় দেখি নদীর ওপারে অনেক দূর দিয়ে দুটো লোক হনহন করে হেঁটে কোথায় যেন যাচ্ছে। ললিও ওদের দেখতে পেলো। উত্তেজিত গলায় বললো, 'দেখো, দেখো— আমাদের সেই লরেল হার্ডি।'

ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম— 'তাই তো, এ যে দেখি মিস্টার ফতে আর শ্রী গোবর্ধন!' বাবু টুনিকে ডেকে দেখালাম। ওরা এতো অবাক হয়ে গেলো যে কিছুই বলতে পারলো না। বাবু অনেকক্ষণ পর বললো, 'ওরা না টেকনাফ গেছে? রাতের আগে ফিরবে না?'

আমি বললাম, 'দেখা যাক দুপুরে ওরা খেতে আসে কিনা। যদি আসে তাহলে বুঝবো, হয়তো কোনো কারণে টেকনাফ যায় নি।'

ললি বললো, 'টেকনাফ না গেলেও ওরা ওদিকে কোথায় যাচ্ছে?'

টুনি হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো। বললো, 'চলো, আমরা এপার থেকে ওদের ফলো করি। দেখি ওরা কোথায় যায়।'

টুনির কথাটা আমাদের সবারই পছন্দ হলো। টুনি একটা কাজের কথা বলেছে বটে। আমি ওর পিঠ চাপড়ে বললাম, 'ঠিক বলেছো টুনি। চলো, ওদের ফলো করি।'

ফলো করার কথা শুনে স্ক্যাটরা কী বুঝলো জানি না। তবে ও লাফিয়ে উঠে গা ঝাড়া দিয়ে ঘনঘন লেজ নাড়তে লাগলো।

আমরা চার জন গাছের আড়ালে থেকে ওদের ফলো করতে লাগলাম। প্রথম দিকে অনেকখানি পথ দৌড়ে ওদের কাছে এসে গিয়েছিলাম। শ্রী গোবর্ধনরা বেশ জোরেই হাঁটছিলো। জায়গাটা দুটো পাহাড়ের মাঝখানে অনেকটা মালভূমির মতো। তাই গাছপালা খুব ঘন ঘন হয়ে গজিয়েছে। টুনি তো এক বার একটা বুনো লতার সঙ্গে পা আটকে ধপাস করে পড়ে গেলো। বাবু ছুটে গিয়ে টেনে তুললো ওকে। ঘাসের ভেতর পড়েছে বলে খুব একটা লাগে নি। স্ক্যাটরা শ্রী গোবর্ধনদের দেখতে পেয়েছে। এক বার জোরে ডেকে উঠতে যাচ্ছিলো, ইশারায় ওকে থামিয়ে দিয়েছি। এ ধরনের ইশারা-ইঙ্গিত স্ক্যাটরা খুব ভালো বোঝে।

টুনির পর এবার বাবুর পালা। বাবু শুধু বুনো লতায় পা আটকেই পড়লো না, সেই সঙ্গে ওর জামাটা শক্ত কাঁটা ঝোপের ভেতর আটকে গেলো। টানতে গেলে সুন্দর জামাটা ছিঁড়ে যাবে, তাই আমরা সবাই মিলে একটা একটা করে কাঁটা ছাড়িয়ে ওকে উদ্ধার করলাম। ওর হাতেও কাঁটার আঁচড় লেগেছে। কিন্তু সেদিকে মনোযোগ দেয়ার সময় নেই। শুধু টুনি কিছু ঘাস চিবিয়ে ওর হাতে লাগিয়ে দিলো। উঠে দাঁড়িয়ে দেখলাম শ্রী গোবর্ধনরা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। প্রায় পাহাড়ের কাছাকাছি।

আমরা আবার ছুটলাম। এবার আরো বেশি করে ঝোপে আটকে গেলাম। অচেনা পথে যা হয়। আমরা যখন পাহাড়ের কাছে পৌঁছলাম, তখন দেখি শ্রী গোবর্ধনরা পাহাড় বেয়ে এটা-ওটা ধরে তরতর করে ওপরে উঠে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। ওদের মতো আমরাও যদি নদীর এ পাড়ে পাহাড় বেয়ে উঠি, তাহলে ওদের সঙ্গে আমাদের দূরত্বটা অনেক বেড়ে যাবে। এক হতে পারে নদী পার হয়ে ওপারে যাওয়া। কিন্তু এদিকে নদীটা পাহাড় থেকে নামছে বলে স্রোতের বেগ খুব বেশি; মাঝে মাঝে পাথর-টাথরও গড়িয়ে পড়ছিলো।

আমরা ওদের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েই ছিলাম। হঠাৎ দেখি একটা ঝাঁকড়া ছাতিম গাছের আড়ালে ওরা হারিয়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে আমার আগের দিনের ঘটনাটা মনে পড়লো। সেই লম্বা মানুষটাও এই রকম একটা ছাতিম গাছের

আড়ালে গিয়ে মিলিয়ে গিয়েছিলো। আমাদের পাহাড়টার ওপরে তাকালাম। গাছপালার মাথার ভেতর দিয়ে অনেক দূরে মেজর জাহেদের লাল টালির ছাদঅলা বাংলোটা চোখে পড়লো। বাবুকে বললাম, 'কিছু বুঝতে পারছো?'

বাবু ললি টুনি অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালো। আমি বললাম, 'কাল ঠিক এই গাছটার তলা থেকেই সেই লোকটা কর্পুরের মতো উবে গিয়েছিলো। আশেপাশে আর কোথাও ছাতিম গাছ নেই। ওদিকে চেয়ে দেখো, মেজরের বাড়িটা; কাল বিকেলে আমরা যেখানে গিয়েছিলাম।'

ওরা সবাই এক বার ছাতিম গাছ আর এক বার মেজরের বাংলোটা দেখলো। সবাই রীতিমতো অবাক হয়ে গেছে। টুনি বললো, 'আমরা তাহলে মেজরের বাড়ির কাছেই আছি!'

বাবু বললো, 'চলো, ওপরে ওঠা যাক।'

আমরা সবাই পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগলাম। এ পাহাড়ে গাছপালা খুব বেশি নেই। রবারের চাষ করার জন্যে মেজর জমি-টমি পরিষ্কার করে ফেলেছেন। কয়েকজন লোক মাটি কাটছিলো। চুলের ছাঁট দেখেই বোঝা যায় এরা কারা।

ওপরে উঠে সবাই রীতিমতো ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। গেটের কাছে আগের মতো বনমালী দাঁড়িয়ে ছিলো। ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বললাম, 'জাহেদ মামা আছেন না?'

বনমালী ভুরু কুঁচকে বললো, 'সে কি বাছা! তিনি তো সকালেই তোমাদের বাড়িতে গেছেন।'

বাবু বললো, 'তাই তো, মনেই ছিলো না। আমাদের পানি খাওয়াতে পারেন বনমালী বাবু?'

বনমালী এতখানি জিব কেটে বললো, 'তা কেন পারবো না বাছা। এসো, ঘরে এসো।'

আমরা সবাই বারান্দায় হাত-পা ছড়িয়ে বসলাম।

বনমালী ফ্রীজ থেকে পানির বোতল আর তবক-মোড়া সন্দেশ বের করে দিলো। প্রত্যেকে পুরো এক বোতল পানি শেষ করে বুঝলাম আমাদের আসলে ভয়ানক তেষ্টা পেয়েছিলো। স্ক্যাটরাও এক বাটি পানি সাবাড় করে জিব বের করে গরমে হাঁপাতে লাগলো। আমি আর বাবু বাংলোর ঠাণ্ডা লাল সিমেন্টের মেঝেতে শুয়ে পড়েছিলাম। টুনি বললো, 'অতো শুয়ে আর কাজ নেই। দেরি করলে নেলী খালা আবার আমাদের খুঁজতে বেরুবে।'

আমরা উঠে পড়লাম। স্ক্যাটরা বেচারা আরো কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে চেয়েছিলো। আমাদের হাঁটতে দেখে ও একটা হাই তুলে পেছন পেছন আসতে লাগলো।

মেজরের সঙ্গে আমাদের দেখা হলো পথে। তিনি রীতিমতো হৈচৈ করে

উঠলেন— 'কিহে, কাল যে বললে সকালে দেখা হচ্ছে। আজ দেখি সকাল না হতেই সব হাওয়া। আমি এতোক্ষণ তোমাদের জন্যে বসে ছিলাম।'

টুনি বললো, 'আপনার বাসা থেকে ফ্রীজের পানি আর সন্দেশ খেয়ে এলাম।'

আমি বললাম, 'দুপুরে আপনি আমাদের সঙ্গে খাবেন ভেবেছিলাম। তাই এদিকটা ঘুরেফিরে দেখছিলাম'

'নেলী তাই বলছিলো। কিন্তু আমাকে খেয়েই এক জায়গায় বেরুতে হবে।' এই বলে মেজর ডান চোখ টিপলেন— 'খবর পেলাম সন্ধ্যের দিকে ওদিকটায় কিছু শিকার-টিকার পাওয়া যাবে। যাই দেখি।'

আমরা সবাই হাসলাম। ললি বললো, 'কাল এসে শিকারের গল্প শুনিয়ে যাবেন।'

মেজর হেসে বললেন, 'নেলীও আমাকে ঠিক তাই বলেছে। ঠিক আছে, কাল যাবো। সকালে অন্য কোথাও পালিয়ে যেও না। চলি তাহলে।'

আমরা এগিয়ে গেলাম। টুনি হঠাৎ ফিক করে হেসে বললো, 'আবির যে তখন মেজরকে জাহেদ মামা বললেন? উনি কি আপনার মামা?'

আমি একটু আমতা আমতা করে বললাম, 'বারে, নেলী খালার বন্ধু তো! মামা বললে দোষ কী? তাছাড়া মেজর জাহেদ বললে বনমালী ক্ষেপে যেতো। এখন ভাববে সত্যিই বুঝি মামা হন।'

বাবু গম্ভীর হয়ে বললো, 'এমনও তো হতে পারে, ক'দিন পরে খালু হয়ে গেলেন। নেলী খালার বন্ধু যখন— !'

টুনি ছুটে এসে বাবুর পিঠে একটা কিল বসিয়ে দিয়ে বললো, 'যাঃ, কী অসভ্য! দাঁড়াও, আমি নেলী খালাকে বলে দেবো।'

আমাদের নেলী খালা এক চোট বকলেন— 'জাহেদ এতোক্ষণ বসে রইলো তোমাদের জন্যে। এই ভরদুপুরে কেউ বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়ায়!'

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, 'জাহেদ মামার সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছে।'

নেলী খালা রাগতে গিয়ে হেসে ফেললেন— 'এর ভেতর আবার মামাও বানানো হয়েছে!'

টুনি ফিক করে হেসে বললো, 'বারে, তোমার বন্ধু যে!'

নেলী খালা তখন লাল-টাল হয়ে বললেন, 'হয়েছে। এবার খাওয়ার পর্বটা সেরে আমাকে উদ্ধার করো।'

বাবু বললো, 'লরেল হার্ডি এসেছিলো নেলী খালা?'

নেলী খালা অবাক হয়ে বললেন, 'ওরা কেন আসবে? ওরা টেকনাফ গেছে, তোমাদের বলি নি?'

টুনি এমন সময় তড়বড় করে বললো, 'জানো নেলী খালা, আমরা না—'

সঙ্গে সঙ্গে বাবু টুনির কনুইতে এক রাম চিমটি কাটলো। টুনি চুপসে গিয়ে

মিনমিন করে বললো, 'আমরা যে জাহেদ মামার বাড়িতে সন্দেশ খেয়েছি, সে কথাও বুঝি কাউকে বলতে পারবো না?'

আমি আর ললি একসঙ্গে হেসে উঠলাম। বাবুও হেসে ফেললো। টুনি রেগেমেগে সিঁড়িতে ধুপধাপ পা ফেলে দোতালায় উঠে গেলো।

খেয়ে উঠে আমরা আবার আলোচনায় বসলাম। আমি বললাম, 'নেলী খলার গেস্ট দু'জন যে নিরীহ শুঁটকির ব্যাপারি নয়, এর আরেকটা প্রমাণ পাওয়া গেলো।'

টুনি বললো, 'নিশ্চয়ই ভীষণ পাজি লোক হবে ওরা।'

বাবু পরিষ্কার জানিয়ে দিলো— 'লরেল হার্ডি গুপ্তধন খোঁজার জন্যেই এখানে আসুক, কিম্বা সোনার খনির লোভেই আসুক— আসল রহস্যটা আমরা খুঁজে বার করবোই। আমি বাপু বড়োদের সাহায্য নিয়ে কোনো কাজ করা পছন্দ করি না।'

কথাটা বাবু মন্দ বলে নি। তাছাড়া সত্যি সত্যিই যদি এসব কিছু না হয়, অর্থাৎ এই পাহাড়গুলোতে যদি সোনার খনি বা গুপ্তধন জাতীয় কিছু না পাওয়া যায়, তাহলে বড়োদের বলে শেষে ভাবি লজ্জায় পড়তে হবে। তাই এ ব্যাপারে আমরা সবাই একমত হলাম যে, বড়োদের কাউকে আমাদের তদন্তের কথা বলা যাবে না। 'তদন্ত' কথাটা আমি এতো গভীরভাবে বলেছিলাম, ঠিক যেভাবে শার্লক হোমস তাঁর সহকারী ওয়াটসনকে বলতেন। টুনি হাসবার সুযোগই পেলো না।

আমরা ঠিক করেছিলাম বিকেলে ছাতিম গাছঅলা সেই পাহাড়টায় যাবো। মালীকে ওটার কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম। মালী বললো, 'ওটা তো আন্নাকালীর পাহাড়। ছাতিমতলায় আন্নাকালীর একটা মন্দির আছে। সেই পাহাড়ে পাকড়াশী মশাইও থাকেন।'

আমাদের দরকার ছাতিমতলা। আন্নাকালী বা পাকড়াশী মশাই নয়। বিকেলে যখন বেরুতে যাবো, তখনই নেলী খালা বাধা দিলেন, 'উঁহু। আজ বাইরে যাওয়া হবে না। আকাশের অবস্থা দেখো নি!'

বাইরে এসে দেখি আকাশের পশ্চিম কোণে দূরে সমুদ্রের ওপর এক টুকরো ভারি কালো মেঘ। তাছাড়া সারা আকাশে কোথাও সামান্য মেঘের ছায়াও নেই। আমি বললাম, 'ওইটুক মেঘে আর কতটুকু বৃষ্টি হবে নেলী খালা?'

নেলী খালা বললেন, 'বৃষ্টি নয়, ঝড়। তিন নম্বর ডেঞ্জার সিগন্যাল দিয়েছে। আব্বু যদি শোনেন তোমাদের এ সময় বেরুতে দিয়েছি, তাহলে আমাকে আর আস্ত রাখবেন না।'

দুপুরে বাবু টুনির উৎসাহটা ছিলো সবচেয়ে বেশি। ওদের চেহারাটা সেই কালো মেঘের মতো গম্ভীর হয়ে গেলো। আমরা চারজন বাইরে লনে গিয়ে বসলাম।

নেলী খালাদের এই পাহাড়টা আশেপাশের পাহাড়গুলোর চেয়ে বেশি উঁচু। এখানে বসে সব দেখা যায়। বিরাট লনের চারপাশটা কাঠের রেলিং দিয়ে ঘেরা। মাঝে মাঝে অবশ্য এক-আধটা রেলিং ভেঙে গেছে। আমরা একেবারে পশ্চিমের রেলিংটার ধারে বসেছিলাম। রেলিং-এর ওপাশে অল্প একটু সমান জায়গা। তারপরই পাহাড়টা একগাদা বুনো ঝাউগাছ মাথায় নিয়ে একেবারে সমুদ্রে নেমে গেছে। দেড় শ' ফুটের মতো খাড়া নেমেছে। তারপর অবশ্য ধাপ আছে। তবে ইচ্ছে করলেই এখান থেকে কেউ সমুদ্রে নেমে যেতে পারবে না। আমি ছাতিম গাছঅলা পাহাড়টাও খুঁজে বের করলাম। ললি বললো, 'আবির যে বলছিলে এ বাড়ির কোথাও গুপ্তধনের নকশা আছে কিনা খুঁজে দেখবে? আমার মনে হয় ওটা আমাদের খোঁজা উচিত।'

বাবু এতোক্ষণ আনমনে ঘাসের কচি ডগা ছিঁড়ে ছিঁড়ে চিবোচ্ছিলো। ও বললো, 'ঠিক বলেছো ললি। আমার মনে হয় লরেল হার্ডি সেই গুপ্তধনের খোঁজেও এখানে আসতে পারে।'

আমি বললাম, 'কথাটা আমিও ভেবেছি। বিশেষ করে ওরা যে-দুটো ঘরে আছে সে-দুটো ঘরই ভালো করে খুঁজতে হবে। নইলে বাড়ি ভর্তি এতো ঘর থাকতে ওরা ও দুটো ঘরে কেন থাকতে চাইবে।'

টুনি বললো, 'ওরা যে বললো, ওদের হাঁপানি আছে?'

বাবু বললো, 'হাঁপানি থাকলে কেউ ওরকম তরতর করে খাড়া পাহাড় বেয়ে উঠতে পারে না।'

আমি বললাম, 'ওরা ফিরে এলেই আমাদের কাজ হবে সারাক্ষণ ওদের দিকে নজর রাখা। ওদের টেকনাফ তো ওই আন্নাকালীর পাহাড়ে।' বলে আঙুল তুলে দেখালাম।

বাবু বললো, 'এখান থেকে তো মনে হয় বেশি দূরে নয়। ওরা এলে জিজ্ঞেস করবো ওরা টেকনাফ গিয়েছিলো কিনা; কী বলো তোমরা?'

ললি বললো, 'ওরা যদি স্বীকার করে ওরা আন্নাকালীর পাহাড়ে গিয়েছিলো, তাহলে বুঝতে হবে হয় তারা খুবই বোকা নয়তো ভালো লোক।'

টুনি বললো, 'ভালো লোক হলে কেউ ওভাবে কথা বলে নাকি। নির্ঘাত ওরা খারাপ মতলবে এসেছে।'

কালো মেঘটা কিছুক্ষণের মধ্যে পশ্চিমের সারা আকাশে ছড়িয়ে পড়লো। ললি বললো, 'সত্যিই তাহলে ঝড় আসছে।'

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, 'ঝড় তো আসবেই। জাহেদ মামাও বিপদসংকেত পেয়েছেন।'

দেখতে দেখতে সারা আকাশ ঘন কালো মেঘে ছেয়ে গেলো। ঝড়ো-বাতাস বইতে শুরু করলো। সমুদ্রটা হিংস্র হয়ে প্রচণ্ড গর্জন শুরু করে দিলো। সমুদ্রকে

নিজের প্রতিপক্ষ ভেবে স্ক্যাটরাও সমানে ঘেউ ঘেউ শুরু করলো। ভাবখানা এই— একবার কাছেই এসো না বাছা, টুঁটিটা কামড়ে ধরবো না! নেলী খালার হাঁকডাক শুনে আমরা ঘরে ফিরে গেলাম।

জানালা-দরজা সব বন্ধ করে নানুর সঙ্গে স্টাডিতে বসে চা খেলাম। নানু বললেন, 'কেমন লাগছে জায়গাটা?'

বাবু বললো, 'অদ্ভুত সুন্দর জায়গা!'

টুনি বললো, 'রূপকথার মতো!'

নানু হেসে বললেন, 'সবাই নেলীকে এখানে আসার জন্যে বকেছে। কিন্তু আমি বকি নি। বুড়ো বয়সে সময় কাটানোর জন্যে আমি এরকম একটা নিরিবিলি, নির্ঝঞ্ঝাটা জায়গাই খুঁজছিলাম।'

আমি মনে মনে হাসলাম। এই জায়গাটাকে ঘিরে এত সব পাজি লোকের ষড়যন্ত্র চলছে, এ বাড়িটা, এ বাড়ির মানুষরা কেউ যে সেই ষড়যন্ত্রের বাইরে নয়— নানু যদি ঘুণাক্ষরেও টের পান, তাহলে পর দিনই নেলী খালাকে বাড়ি ছেড়ে দেয়ার নোটিশ দেবেন। কোনো রকম ঝামেলাই নানু পছন্দ করেন না।

নেলী খালা বললেন, 'মনে হয় মিস্টার ফতে আর শ্রী গোবর্ধন আজ রাতে ফিরবে না। যা ঝড় শুরু হয়েছে!'

আমি ভাবলাম, টেকনাফ গেলে হয়তো ফিরতো না, কিন্তু যায় নি যখন ফিরতেও পারে।

শেষ পর্যন্ত ওরা এলো বটে, তবে ঝড়বৃষ্টিতে একাকার হয়ে। সারা গায়ে কাদা-টাদা লেগে সে এক দেখার মতো দৃশ্য বটে। আমরা যখন রাতের খাবার শেষ করে শুতে যাচ্ছিলাম, তখনই ওরা দু'জন মূর্তিমান ঝড়ো কাক এসে হাজির হলো। স্ক্যাটরা প্রথমে চিনতে পারে নি; পরে শ্রী গোবর্ধনের ভয়ের বহর দেখে বুঝলো ইনিই কাল রাতের তিনি। হুঙ্কার ছাড়তে যাবে— তখনই নেলী খালা ওকে ধমক দিয়ে ভেতরে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তারপর ওদের দু'জনকে বললেন, 'একেবারে ভিজে গেছেন দেখি! এতো রাতে না ফিরলেও পারতেন। ঝড়বৃষ্টিতে পাহাড়ী রাস্তার অবস্থা ভালো থাকে না।'

শ্রী গোবর্ধন হিহি করে কাঁপতে কাঁপতে বললো, 'ওসব আমাদের অব্যেশ আছে।'

মিস্টার ফতে ওর দিকে কটমট করে এক বার তাকিয়ে খুব মোলায়েম গলায় নেলী খালাকে বললো, 'আমরা ফিরেছি সন্ধ্যের অল্প আগে। এতোক্ষণ হাটে বসে আলাপ করছিলাম এক মহাজনের সঙ্গে। এইটুকু পথ আসতেই এই অবস্থা।'

বাবু বললো, 'আপনারা কি সারাদিনই টেকনাফে কাটালেন? নাকি আরও কোথাও গিয়েছিলেন?'

মিস্টার ফতে বাবুকে সব ক'টা দাঁত দেখিয়ে বললো, 'আর কোথায় যাবো!

টেকনাফের আড়তদারদের সঙ্গে কথা বলতেই দিন কেটে গেলো। দেখে এসো এক দিন; ভারি সুন্দর জায়গা।'

মিস্টার ফতের মিথ্যে বলার বহর দেখে শ্রী গোবর্ধনও হাঁ করে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলো। নেলী খালা বললেন, 'বাথরুমে পানি আছে। হাত-মুখ ধুয়ে খেতে আসুন।'

ওরা যখন খাচ্ছিলো, আমরা চার জন তখন আমাদের ঘরে। খাবার শেষ করে ঘরে ঢুকে ওরা দরজা বন্ধ করলো— শব্দ শুনে ঠিক টের পেলাম ললিদের নিচের ঘরে মিস্টার ফতে আর আমাদের নিচের ঘরে শ্রী গোবর্ধন আস্তানা গেড়েছে।

হঠাৎ ভারি একটা কিছু সরানোর শব্দ পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমি মেঝের উপর কান পাতলাম। একটু পরে ফতের গলা শোনা গেলো— 'আমি যাচ্ছি গোবরা। আলোটা দেখাতে ভুলিস না।' আবার আগের মতো ভারি কিছু সরানোর শব্দ হলো।

শ্রী গোবর্ধন গজগজ করে বলতে লাগলো, 'বাব্বা! ওজন বটে একখানা! উনি তো দিব্যি আলো দেখাতে বলে গেলেন। রাতে যদি কুত্তোটা ছাড়া থাকে, তবেই আমি মরেছি।'

একটু পরে চটাশ করে মশা মারার শব্দ শুনলাম। তারপরই শ্রী গোবর্ধন বললো, 'ধুত্তোরি ছাই, কবে যে পাওনা-গণ্ডা নিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরবো, ঈশ্বরই জানেন।' তারপর কোনে শব্দ শোনা গেলো না।

বাবুও আমার মতো কান পেতে ওদের সব কথা শুনেছে। বললো, 'যাই বলে কোথায় গেলো ফতে! ওর ঘরে যাবার শব্দ তো পেলাম না?'

আমি বললাম, 'তোমরা একটু বসো। আমি দেখে আসি।'

পা টিপে টিপে নিচে এসে ফতের দরজায় আস্তে করে ধাক্কা দিলাম। যা ভেবেছিলাম, তা-ই। দরজা খোলা, ঘরে ফতে নেই। দরজাটা আবার টেনে দিয়ে পাশের বাথরুমেও দেখলাম। কেউ নেই। ওপরে এসে ওদের বললাম। ললি ফিসফিস করে বললো, 'পাশের ঘরে যায় নি তো!'

আমি বললাম, 'ওটার তো এখনো তালাই খোলা হয় নি।'

লিল বললো, 'সেজন্যেই তো বলছি। ভেতরের দরজা দিয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। গুপ্তধনের নকশাটা হয়তো ও ঘরেই আছে।'

আমি তখন আমাদের পাশের ঘরে গিয়ে মেঝেতে কান পাতলাম। কোনো সাড়াশব্দ পেলাম না। ফিরে এসে বললাম, 'না, ওখানে নেই। গুপ্তধনের নকশা খুঁজতে গেলে ওর চলাফেরার শব্দ অন্তত শুনতে পেতাম।'

টুনি গালে হাত দিয়ে বললো, 'তাই তো, কোথায় গেলো তাহলে?'

শ্রী গোবর্ধনের আলো দেখার জন্যে আমরা বেশ রাত অব্দি জেগে রইলাম।

হঠাৎ এক সময় খুট করে ছিটকিনি খোলার শব্দ হলো। বাবু আর টুনিকে ললিদের ঘরে পাঠিয়ে দিলাম, বললাম, 'ওদিকটায় তোমরা নজর রাখো। আমরা এদিকে দেখছি।'

ওরা চলে গেলো। আমি আর ললি অন্ধকার ঘরে বসে রইলাম। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হলো। বুঝলাম, শ্রী গোবর্ধন ওপরে উঠছে। দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখি ও দোতালায় এসেও থামলো না। সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে গেলো। আমরা জানালার কাছে গেলাম।

বাইরে ঝড়ের বেগ কিছু কমলেও জোর বাতাস বইছিলো। তবে বৃষ্টিটা থেমে গেছে। হঠাৎ দেখি সমুদ্রের ভেতর অন্ধকারে একটা ছোট্ট আলো জ্বলে উঠলো। একটু পরে আবার নিভে গেলো। আবার জ্বললো। কয়েক বার এরকম করে শেষে একেবারে নিভে গেলো।

কিছুক্ষণ পর সিঁড়িতে শ্রী গোবর্ধনের পায়ের শব্দ শুনলাম। সিঁড়িতে দেয়াল-বাতি জ্বলছিলো। দরজাটা একটু ফাঁক করে দেখলাম, ওর হাতে বিরাট লম্বা একটা টর্চ। টর্চ যে কখনো এতো লম্বা হতে পারে, আমার ধারণা ছিলো না। ও বিড়বিড় করে বলছিলো, 'ভাগ্যিস কুত্তোটা টের পায় নি। কালকের রাতটা এভাবে কাটাতে পারলে বাঁচি।'

নিচের ঘরে ঢুকে শ্রী গোবর্ধন ছিটকিনি লাগিয়ে দিলো। একটু পর বাবু আর টুনি উত্তেজিত গলায় বললো, 'কিছু দেখেছো তোমরা?'

আমি ফিসফিস করে বললাম, 'আস্তে। তোমরা কী দেখলে?'

টুনি বললো, 'আলো দেখেছি।'

বাবু বললো, 'দূরের সেই ছাতিম গাছঅলা আন্নাকালীর পাহাড়ে আলো জ্বলতে দেখেছি। একটা আলো কয়েক বার জ্বললো আর নিভলো। বেশ কিছুক্ষণ এ রকম করেছিলো।'

টুনি বললো, 'কিন্তু গোবরটা কোত্থেকে আলো দেখালো? তোমরা কিছু দেখলে?'

এরপর আমি আমাদের দেখার কথা বললাম, 'শ্রী গোবর্ধনের হাতে বিরাট টর্চ ছিলো। ও ছাদে গিয়ে আলো দেখিয়েছে।'

বাবু বললো, 'আমরা ছাদের দিকেও দেখেছিলাম। কই, সেখানে তো কোনো আলো দেখি নি!'

আমি বললাম, 'সোজা আকাশের দিকে আলো দেখালে তুমি এখান থেকে দেখতে পাবে না। কিন্তু ওই পাহাড় আর সমুদ্র থেকে ঠিকই দেখা যাবে।'

একটু পরে নিচের ঘরে ঘর্ঘর শব্দ হলো। মনে হলো শ্রী গোবর্ধন ভারি কিছু নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া করছে। মেঝেতে কান পাতলাম। শ্রী গোবর্ধন বললো, 'কিরে ফতে, পেলি কিছু?'

ফতে জবাব দিলো, 'না, কাল পাবো।'

এরপর ছিটকিনি খোলার শব্দ হলো। বোঝা গেলো ফতে এতক্ষণে ওর নিজের ঘরে গেছে।

সে রাতে আমরা কেউ ভালোমতো ঘুমোতে পারলাম না। আমি শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম— কালও তাহলে ওরা আলো দেখাবে। মনে মনে ঠিক করলাম— কাল সকাল থেকে পুরোদমে তদন্ত শুরু করবো।

আমাদের তদন্ত শুরু হলো

ঘুম থেকে উঠে যখন নিচে এলাম, তখন নেলী খালা বললেন, 'বাব্বা, এতো ঘুমোতে পারো তোমরা! আমি দু'বার ডাকতে গিয়েছিলাম তোমাদের। সবার নাস্তা খাওয়া হয়ে গেছে। তোমরা চার মূর্তিই শুধু বাকি।'

বাবু বললো, 'খুব বেশি দেরি করেছি কি নেলী খালা?'

নেলী খালা তাঁর হাত-ঘড়িটা দেখে হেসে ফেললেন— 'মাত্র সাড়ে ন'টা বাজে! খুব বেশি আর দেরি কোথায়?'

টেবিলে বসে খেতে খেতে আমি বললাম, 'তোমার গেস্টরা কী করছে নেলী খালা?'

নেলী খালা বললেন 'কী আর করবে! সকাল থেকে দু'জন ঘরে বসে আছে। বললো, বৃষ্টিতে ভিজে নাকি ওদের গা ম্যাজম্যাজ করছে। এ বেলা আর বেরুবে না।'

টুনির তখনো দু'চোখ ভরা ঘুম। নেলী খালা বললেন, 'টুনি, আরেকটা ডিম নাও।'

টুনি ঢুলঢুলু চোখে বললো, 'কখন গেলাম।!'

নেলী খালা একটু অবাক হয়ে বললেন, 'তোমাকে ডিম নিতে বলছি টুনি!'

টুনি বাবুর পাতে একটা ডিম তুলে দিলো। নেলী খালা তখন ললিকে বললেন, 'টুনি কি কাল সারা রাত ঘুমোয় নি ললি?'

ললি বললো, 'আমি তো সারা রাতই ঘুমিয়েছি নেলী খালা।'

নেলী খালা তখন রেগেমেগে লেস বুনতে শুরু করলেন। গজগজ করতে করতে বললেন, 'বুঝেছি, রাতে তোমরা কেউ ঘুমোও নি।'

স্ক্যাটরা এমন সময় সুর করে— 'ঘেউ-উ' বলে কাউকে অভ্যর্থনা জানালো। তাকিয়ে দেখি জাহেদ মামা। হাতে একখানা চিঠি। বললেন, 'সুখবর নেলী! জিওলজিক্যাল সার্ভে থেকে তোমার চিঠি এসেছে।'

সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ঘুমঘুম ভাব আর নেলী খালার রাগ কর্পূরের মতো উবে গেলো। একগাল হেসে নেলী খালা বললেন, 'বসো, এক কাপ কোকো খাও। কী লিখেছে ওরা?'

'তাহলে পড়ে শোনাই?' এই বলে একটা চেয়ার টেনে বসে জাহেদ মামা চিঠিটা খুললেন— 'শোনো সবাই, প্রিয় মহাশয়া, আপনার পত্র পাঠে অবগত হইলাম যে, আপনি অনুমান করিতেছেন পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চলে স্বর্ণের খনি আবিষ্কারের সমূহ সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং ব্যাপক অনুসন্ধান করা আবশ্যক। অত্র অঞ্চলের একটি নদীর বালি হইতে আপনি কিছু পরিমাণ স্বর্ণ উদ্ধারও করিয়াছেন। স্বাধীনতার পূর্বে উক্ত অঞ্চলে কিঞ্চিৎ জরিপ হইলেও বর্তমানে উহার ব্যাপক ভূতাত্ত্বিক জরিপ কার্য চালানো আবশ্যক। এ বিষয়ে আমরা একটি পরিকল্পনাও গ্রহণ করিয়াছি। দুই-তিন দিনের মধ্যে ওই অঞ্চলে আমরা তৈল অনুসন্ধানের জন্য একদল ভূতত্ত্ববিদকে পাঠাইতেছি। তাঁহাদের সঙ্গে দুই জনকে স্বর্ণ অনুসন্ধানের জন্য পাঠানো হইতেছে। আপনার পরামর্শ ও সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ। আশা করি ভবিষ্যতেও আপনার মুল্যবান পরামর্শ হইতে আমরা বঞ্চিত হইব না। ভবদীয়— নামটা পড়া যাচ্ছে না, পরিচালক বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ।'

চিঠি পড়া শেষ করে জাহেদ মামা নেলী খালার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমিও কি এরকম ভাষায় ওদের লিখেছিলে?'

নেলী খালা সে-কথায় কান না দিয়ে একটু উত্তেজিত গলায় বললেন, 'তোমার কি মনে হয় জাহেদ, এখানে সোনার খনি পাওয়া যাবে?'

জাহেদ মামা হেসে বললেন, 'সম্ভাবনাটাকে এরা একেবারে উড়িয়ে দেয় নি। আর হলে তো তোমারই লাভ। সী ভিউ প্যালেস সারা মাস গেস্ট-ভর্তি থাকবে।'

নেলী খালা লজ্জায় লাল হয়ে বললেন 'কী যে বলো! নাও, কোকোটা ঢেলে খাও।'

গত রাতে আমি স্বপ্নে দেখেছি, এখানে সত্যিই সোনার খনি আছে। আর কে যেন সেখান থেকে গোপনে সব সোনা সরিয়ে ফেলেছে। আমরা যখন খনিটা আবিষ্কার করলাম, তখন এক রত্তি সোনাও আমাদের জন্যে সেখানে পড়ে নেই। শুনলে ওরা সবাই হাসাহাসি করবে বলে স্বপ্নের কথা আমি কাউকে বলি নি। জিওলজিক্যাল সার্ভের চিঠিখানা আমি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলাম। সোনার খনি

আবিষ্কার করে ফেলেছি ভেবে দারুণ উত্তেজনা হলো।

বাবু জাহেদ মামাকে বললো, 'কাল শিকারে কিছু পেয়েছেন?'

জাহেদ মামা একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'পাখি জাল কেটে বেরিয়ে গেছে। ধরা গেলো না।'

নেলী খালা সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'বার বার তো আর বেরিয়ে যেতে পারবে না। একবার ঠিকই ধরা পড়বে।'

জাহেদ মামা হেসে ফেললেন— 'তদ্দিনে আমার পাখি ধরার চাকরিটা থাকলে হয় আর কি।'

একবার ভাবলাম, গত রাতে আলো দেখার কথাটা জাহেদ মামাকে বলেই ফেলি। কিন্তু তাতে কি আসল অপরাধী ধরা পড়বে? শ্রী গোবর্ধনরা যে আসল লোক নয়, এটুকু বুঝতে আর আমাদের বকি নেই। বরং ওদেরকে কিছু করলে আসল পাখি ঠিকই উড়ে পালিয়ে যাবে। তাছাড়া যখন ঠিক করেছি বড়দের সাহায্য নেবো না, তখন দেখাই যাক না আমরা কি করতে পারি। এখনো তো তদন্তের কাজ শেষ হয় নি। আমি জাহেদ মামাকে বললাম, 'আপনাদের উল্টো দিকে যে ছাতিম গাছঅলা একটা পাহাড় আছে, ওখানে কখনো গিয়েছিলেন আপনি? শুনলাম ওদিকে কোথায় যেন কোন এক পাকড়াশী থাকেন।'

জাহেদ মামা বললেন, 'শিকার করতে যখন এসেছি, তখন সব জায়গাতেই যেতে হয়েছে। ওই পাহাড়েই বুড়ো পাকড়াশীর খামার-বাড়ি রয়েছে। ভারি ভালো লোক। প্রচুর পয়সাও আছে। কক্সবাজারে আর হিমছড়িতে দুটো চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারি চালাচ্ছেন। কলেজ আর হাসপাতালের জন্যেও মোটা টাকা ডোনেট করেছেন। ওঁর পোলট্রি থেকে আমাদের ডিম আর মুরগির বাচ্চা দেন; ভাবি সস্তা। কেন, নেলীও তো ওঁর পোলট্রি থেকে ডিম কেনে!'

'পোলট্রিও আছে বুছি!' টুনি সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহী গলায় বললো, 'আমার গ্রামের খামার-বাড়ি দেখার ভারি সখ। নিশ্চয়ই ষাঁড়, গরু এসবও আছে।'—এই বলে আড়চোখে ললির দিকে তাকালো। ললির আবার বৃষরাশি। কেউ ওর সামনে ষাঁড়-টাড়ের নাম করলে চটে যায়। ভাগ্যিস ও টুনির কথাটা খেয়াল করে নি। ও চুপচাপ নেলী খালার লেস বোনা দেখছিলো।

জাহেদ মামা হেসে বললেন, 'শুধু গরু কেন, ঘোড়া, গাধাও আছে। বুড়োর আবার এগুলো পোষার ভারি সখ। বলে— একা থাকি। ওরাই আমার বন্ধু।'

টুনি ফিক করে হেসে ফেললো— 'গাধার বন্ধু।'

ললি চোখ তুলে তাকালো, 'কে গাধার বন্ধু?'

টুনি বললো, 'তোমাকে নয়, বাবুকে বলছি।'

বাবু বললো, 'তা তোমার বন্ধু হতে যে আমার আপত্তি নেই, একথা তো তোমাকে আগেই বলেছি।'

আমি হেসে বললাম, 'কেমন জব্দ হলে টুনি?'

টুনি বললো, 'আমি কখনো জব্দ হই না।'

বাবু গম্ভীর হয়ে বললো, 'জব্দ হতে হতে টুনি একেবারে জব্দ-প্রুফ হয়ে গেছে।'

টুনি এবার চটে গিয়ে বললো, 'দেখো বাবু, আমার সঙ্গে লাগতে এসো না। ভালো হবে না বলছি!'

ললি বললো, 'তুমিই তো ওর সঙ্গে লাগতে গেলে টুনি!'

টুনি কী যেন ওকে বলতে যাচ্ছিলো, নেলী খালা বাধা দিয়ে বললেন, 'খাবার টেবিলে বসে বসে আর ঝগড়া করতে হবে না। আজ তোমরা সোনার খনি খুঁজতে যাবে না?'

আমি বললাম, 'বিকেলে যাবো। এখন আমরা ঘরে বসে চাইনিজ চেকার খেলবো।'

জাহেদ মামা মৃদু হেসে বললেন, 'সুবোধ বালক।'

ঘরে ফিরে আমরা আমাদের তদন্তের ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ করলাম। শ্রী গোবর্ধন আর মিস্টার ফতে যদি সারা দিন ঘরে বসে থাকে, তাহলে তো ওদিক দিয়ে এগুনো যায় না। আমরা ভাবছিলাম ওদের দু'জনের ঘর দুটো একবার সার্চ করে দেখবো। বিশেষ করে কাল রাতে, 'যাই গোবর'— বলে ফতে যে কোথায় উধাও হয়ে গেলো টেরই পেলাম না। ললি বলছিলো, পাশের ঘরে যেতে পারে। যেখানেই যাক, সৎ উদ্দেশ্যে যে যায় নি, সেকথা তো সবাই জানি। আর ফতে যাবার পর গোবর পাহাড়ে আর সমুদ্রে কাদের কাছে কাছে আলোর সংকেত পাঠালো? রহস্যের যতো গভীরে ঢুকছি, গোটা ব্যাপারটা আরো রহস্যময় হয়ে উঠতে লাগলো।

ললি বললো, 'লরেল হার্ডির ওপর নজর রাখা যায় কীভাবে?'

বাবু বললো, 'ওরা তো এমনিতেই নজরবন্দী হয়ে আছে।'

আমি মাথা নাড়লাম— 'পুরোপুরি নেই। ঘর থেকে যখন-তখন উধাও হয়ে যেতে পারে। অন্য কোথাও গিয়ে দিব্যি গুপ্তধনের নকশা খুঁজতে পারে। আমরা তো এগুলো দেখতে পাচ্ছি না।'

টুনি বললো, 'অন্য ঘরে ওদের যেতে না দিলেই হয়। সে-সব ঘরের দরজা যদি ভেতর থেকে বন্ধ থাকে, তাহলে যাবে কী করে?'

আমি বললাম, 'না টুনি, সেটাও বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। আমরা তো চাই ওরা অন্য ঘরে যাক। নকশাটা কোথায়, খুঁজে বার করুক। তারপর আমাদের স্ক্যাটরাই নকশাটা ওদের হাত থেকে উদ্ধার করে আনতে পারবে। আমাদের কাজ হচ্ছে ওদের ওপর নজর রাখা।'

টুনি বললো, 'ওরা দরজা বন্ধ করে ঘরে বসে থাকলে আপনি নজর রাখবেন

কী করে?'

বাবু একটু ভেবে বললো, 'আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। নেলী খালার কাছে কাঠমিস্ত্রিদের কাজ করার জিনিসপত্র সব আছে। আমরা যদি আমাদের কাঠের মেঝে দুটো ওপর থেকে ফুটো করে ফেলতে পারি, তাহলে ঘরে বসে ওরা কী করছে, এখান থেকে সব স্বচ্ছন্দে দেখা যাবে।'

বাবুর প্ল্যানটা আমাদের সবারই পছন্দ হলো। কাঠের পুতুল বানাবে বলে টুনি নেলী খালার কাছ থেকে যন্ত্রের বাক্সটা চেয়ে আনলো। নেলী খালা তখন জাহেদ মামার সঙ্গে এতো কথা বলছিলেন যে, চাওয়ামাত্র টুনিকে বাক্সটা নিতে বললেন। বাক্স আনার পর আমি বাবুকে বললাম, 'এবার দেখতে হবে, এই মুহূর্তে ওরা কোন ঘরে আছে।'

বাবু মেঝেতে কান পেতে শুনলো। বললো, 'দু'জনের গুজগুজ করে কথা বলা শুনে তো মনে হচ্ছে ওরা এ ঘরেই আছে।'

ললি বললো, 'মনে হচ্ছে কি, বলো এ ঘরে আছে।'

বাবু ঘাড় চুলকে বললো, 'কী জানি বাপু। হার্ডি তো আবার যখন-তখন উধাও হয়ে যেতে পারে। কখন হয়তো দেখবো, হঠাৎ এসে ওখানটায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।'

সঙ্গে সঙ্গে টুনি পেছন ফিরে তাকালো। তারপর ছুটে গিয়ে বাবুকে একটা চিমটি কেটে বললো, 'আমাকে এভাবে ভয় দেখাতে বারণ করি নি?'

আমি বললাম, 'ওরা এ ঘরে থাকলে আমরা পরম নিশ্চিন্তে ললিদের ঘর ফুটো করতে পারি।'

অসম্ভব প্যাঁচালো একটা তুরপুন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমি ললিদের ঘরের কাঠের মেঝের দু'মাথায় দুটো আর মাঝখানে একটা ফুটো করলাম। অবশ্য তিনটে ফুটো করতেই আমাদের দু'জনের ঝাড়া এক ঘন্টা সময় লাগলো। ললি টুনি ও ঘরের মেঝেতে কান পেতে শুয়েছিলো, যদি ওদের কথা শেষ হয়ে যায় আর ফতে যদি এ ঘরে ফিরে আসে সেটা শোনার জন্যে। অবশ্য এই এক ঘন্টার ভেতর টুনি পাঁচ বার এসে শুধু বলেছে, 'কই হলো?' আর প্রত্যেক বারই আমরা ঘাবড়ে গিয়েছি, ফতে বুঝি এই এসে পড়লো। শেষে বাবু ওকে ধমক লাগালো- 'কাজ শেষ হলে আমরাই যাবো। তুমি চুপচাপ তোমার কাজ করোগে। ফতে ঘর থেকে বেরুলেই শুধু খবর দেবে।'

চমৎকার তিনটে ফুটো বানিয়ে আমরা ঘরের ভেতর উঁকি মেরে দেখলাম, দিব্যি সব দেখা যাচ্ছে। খাট, টেবিল, চেয়ার, ফুলদানি, চেয়ারের ওপর ফতের কাদামাখা মস্তো বড়ো প্যান্টটা; সবই চোখে পড়লো। আমরা যখন কাজ শেষ করে ললি টুনিকে ডাকলাম, তখনো গোবর ফতের কথা শেষ হয় নি। টুনি দেখেই হাততালি দিয়ে বললো, 'কী মজা, ডান পাশের এই ফুটো দিয়ে আমি

দেখবো।'

বাবু বললো, 'এবার আমাদের ঘরেও যে ক'টা ফুটো করা দরকার।'

আমি বললাম, 'ওরা না বেরুলে তো আর করা যাবে না। যখন খেতে যাবে, তখনই কাজ সেরে ফেলবো।'

তারপর টুনি চাইনিজ চেকারের বোর্ডটা আনলো। বললো, 'অনেক কাজ হয়েছে। এবার খেলা যাক।'

টুনি যখন চেকারের ঘরগুলো সব সাজালো, তখনই নেলী খালা এসে উঁকি মারলেন— 'এখনো তোমরা খেলছো বুঝি? তোমাদের জাহেদ মামা দুপুরে আমাদের সঙ্গে খাবেন। তোমরা তৈরি হয়ে নাও। জাহেদ আবার বেরুবে।'

বাবু বললো, 'লরেল হার্ডিও বুঝি আমাদের সঙ্গে খাবে?'

নেলী খালা বললেন, 'ওরা পরে খাবে। আমি চাই না জাহেদের সামনে খেতে বসে শ্রী গোবর্ধন কোনো বাজে কাজ করে বসুক।'

নেলী খালা দুপুরে চমৎকার পাহাড়ী মোরগ রান্না করেছিলেন। খেয়ে-দেয়ে আমরা যখন ওপরে গেলাম, তখন বড়িবি ফতে আর গোবরকে ডাকতে গেলো। বুঝলাম, পুরো একটা ঘন্টার আগে ওরা কেউ খাবার টেবিল থেকে উঠবে না। আমরা পরম নিশ্চিন্তে বসে আমাদের ঘরের মেঝে ফুটো করলাম, টুনি উঁকি মেরে দেখে বললো, 'ঘরের সবকিছু তো দেখা যাচ্ছে না। লরেলের এ ঘর থেকে পাশের ঘরে যাবার দরজাগুলো কোথায়?'

আমি ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম, পাশের দেয়ালটা ঠিকই দেখা যাচ্ছে না। ফুটোটা একটু সরিয়ে করলে ভালো হতো। কিন্তু ততোক্ষণে এক ঘন্টা কেটে গেছে। কারণ ঠিক তখনই 'হেউ হেউ' করে ঢেকুর তুলতে তুলতে ফতে আর গোবর ঘরে ঢুকলো।

বাবু বললো, 'এতেই চলবে, নইলে পরে আরো দুটো করে নেয়া যাবে। বিকেলের প্রোগ্রাম ঠিক করো।'

আমি বললাম, 'প্রোগ্রাম আর কি! চলো সবাই মিলে আন্নাকালীর পাহাড়ে একবার ঢুঁ মেরে আসি।'

সত্যি বলতে কি, সেদিন ছাতিমতলায় অস্বাভাবিক মানুষটাকে ভোজবাজির মতো মিলিয়ে যেতে দেখার পর থেকে আমি মোটেই স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। তারপর ফতে গোবরও সেই একই গাছের তলা থেকে উধাও হলো। ঝাঁকড়া মাথাঅলা মস্ত বড়ো ছাতিম গাছটা যেন আমার বুকের ভেতর শেকড় গেড়ে বসেছিলো।

সোজা পথে নয়, বাঁকা পথেই আমরা এগুলাম। অর্থাৎ হাটের ওপর দিয়ে না গিয়ে আমরা সোনাবালি নদীর তীর ধরে আন্নাকালীর পাহাড়ের দিকে এগুলাম। নদীর পানি বিকেলের সোনালি রোদে চকচক করছিলো। বাবু বললো, 'কবে যে এই নদীতে তাল তাল সোনা পাবো!'

টুনি বললো, 'তারপর তোমার পিঠে পুলিসের তাল তাল কিল পড়ুক।'

বাবু কোনো কথা না বলে নদীর কিনারের পানিতে হাত ডুবিয়ে এক মুঠো ভেজা বালি তুলে আনলো। বালির রঙও সোনালি। আমি বললাম, 'যত্ন করে রেখে দাও। ভরি খানেক সোনা নির্ঘাত পাবে।'

ললি মৃদু হেসে বললো, 'পাহাড়ে কোন দিক দিয়ে উঠবে ঠিক করো।'

বেশ খাড়া পাহাড়। অনেক খুঁজে একটা ঢালু খাঁজ বেয়ে উঠতে গিয়ে রীতিমতো খবর হয়ে গেলো। ফতে আর গোবরা এতো তাড়াতাড়ি কী করে উঠলো, ভেবেই পেলাম না। স্ক্যাটরার জিব বেরিয়ে গেলো, টুনি দু'বার হোঁচট খেয়ে পড়লো, বাবুর পা চমকে গেলো আর ললি ওপরে উঠেই বললো, 'একটু না বসলে আমি আর হাঁটতে পারবো না। আমার বুকের ভেতর ব্যথা করছে।'

ডাক্তার ললিকে ছুটোছুটি করতে বারণ করেছে। ও পাহাড়ে উঠবে জানলে নিশ্চয়ই এটাও বারণ করতো।

আমরা একটা জায়গায় বসলাম। ছাতিম গাছটা আরেক ধাপ ওপরে। এখান থেকে শুধু গাছের ঘন সবুজ মাথাটা দেখা যাচ্ছে। দু'-একটা পাহাড়ী ঘুঘু ছাড়া বিকেলের আন্নাকালীর পাহাড়ে এতটুকু শব্দ ছিলো না। সামনের পাহাড়ে অনেক দূরে জাহেদ মামার লাল টালির বাংলো। নিচে সোনাবালি নদী। বিকেলের রোদে নদীটাকে মসৃণ চকচকে সোনালি সিল্কের ফিতের মতো মনে হচ্ছিলো। বাবু এক টুকরো পাথর ছুঁড়ে মারলো। কিছুক্ষণ পর টুপ করে সামান্য একটু শব্দ হলো। তারপর আবার সব কিছু চুপচাপ। বাবু আরেকটা পাথর ছুঁড়লো।

টুনি বললো, 'আন্নাকালীর পাহাড়েই যখন এলাম, তখন সেই গাধার বন্ধুটাকে দেখে গেলে হতো না?'

বাবু বললো, 'গাধার বন্ধু কে?'

টুনি ফিক করে হেসে বললো, 'আমি না, সেই বুড়ো পাকড়াশী—যার নাকি বিরাট এক খামার আছে।'

আমি বললাম, 'আমার মনে আছে টুনি। ছাতিমতলায় আন্নাকালীর মন্দির দর্শন করেই আমরা পাকড়াশী মশাইকে দর্শন করতে যাবো।'

আমার কথার ঢঙে সবাই হেসে উঠলো। কয়েকটা সবুজ টিয়ে পাখি গাছের ভেতর থেকে ঝটপট করে বেরিয়ে এসে আমাদের মুখের ওপর দিয়ে উড়ে গেলো। একটা সবুজ পালক উড়ে এসে ললির হাতের কাছে পড়লো। কচি কলার পাতার রঙের মতো হালকা নরোম পালকটা ললি তুলে নিয়ে দেখলো। তারপর ওটা আমার হাতে বুলিয়ে দিয়ে বললো, 'সুন্দর না!'

আমি হেসে বললাম, 'সুন্দর। তবে সুড়সুড়ি লাগছে।'

ললি লাল হয়ে গেলো। বাবু বললো, 'এবার ওঠা যাক। আন্নাকালীর মন্দির আর পাকড়াশীর খামার দেখে ফিরতে গেলে রাত হয়ে যাবে।'

বাবুটা এত চঞ্চল হয়ে পড়েছে কেন বুঝি না। এমনিতে ও অবশ্য বেশিক্ষণ চুপচাপ বসে থাকতে পারে না। এতোক্ষণ শুধু নদীতে পাথর ছুঁড়ছিলো, আর ঘাসের কচি ডগা চিবোচ্ছিলো। আমি ললিকে বললাম, 'বুকের ব্যথাটা কমেছে?'

ললি মাথা নাড়লো— 'কমেছে। চলো, রাত হলে আবার নেলী খালার বকুনি খেতে হবে।'

আমরা আরো কিছু দূর পাহাড় বেয়ে উঠলাম। একটু পরে ছাতিম গাছটা যেন আকাশ ফুঁড়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালো। সেই ছাতিম গাছ, যেটা আমার বুকে শেকড় গেড়ে বসেছিলো। তেমন ভয়াবহ কিছু মনে হলো না। তবে গাছের নিচে একটুখানি ছায়া ছায়া ফিরে অন্ধকার। তার ভেতর ছোট্ট একটা মন্দির। কয়েকটা বুনো লতা, মন্দির আর ছাতিম গাছের গোড়া পেঁচিয়ে ওপরের দিকে উঠে গেছে।

টুনি বললো, 'এতো ছোট মন্দির আমি আগে কখনো দেখি নি।'

বাবু বললো, 'এ মন্দিরে কোনো দিন পুজো হয়েছে একথা কেউ বলতে পারবে না।'

টুনি বললো, 'পুজো হবে যে—মূর্তি কোথায়?

ললি বললো, 'আমার মনে হচ্ছে কাল রাতে ঠিক এখানেই আলো জ্বলতে দেখেছি।'

আমি ঘুরেফিরে সব দেখছিলাম। ছাতিম গাছটার বয়স যদি কেউ বলে পাঁচ 'শ—তাহলে অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই। হঠাৎ গাছের গায়ে এক জায়গায় আমার চোখ দুটো চুম্বকের মতো আটকে গেলো। ফিসফিস করে বাবুকে ডাকলাম, 'দেখে যাও।'

ওরা তখনো মন্দির দেখছিলো। বাবুর সঙ্গে ললি টুনিও এলো। দেখে ওদের চোখগুলো ঠিকরে বেরিয়ে আসার মতো হলো। টুনি বাবুর একটা হাত আঁকড়ে ধরলো। গাছের গায়ে ভয়ঙ্কর দেখতে একটা কঙ্কালের খুলি আঁকা। ধারালো কিছু দিয়ে খোদাই করে এঁকেছে।'

হঠাৎ স্ক্যাটরার গরগর শব্দ শুনে ফিরে তাকালাম। অচেনা কিছু দেখলে স্ক্যাটরা এরকম করে। এক জন বুড়ো— বয়স আশি বছরের কম হবে না, গুটিগুটি পায়ে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে মন্দিরের দিকেই আসছিলেন। আমাদের দেখে অসম্ভব রকম অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, 'কাদের বাড়ির বাছা গো তোমরা? এয়েচো কী কত্তে? ওমা, এটা নেলীর সেই পাজি কুত্তোটা না? আমার খামারের হাঁসগুলো ওকে দু'চোখে দেখতে পারে না। আমার কুত্তো খেঁদীও ওকে পছন্দ করে না।'

বুড়োর কথা শুনে বুঝলাম, ইনিই সেই পাকড়াশী মশাই, ভারি দয়ালু আর ভালোমানুষ বলে এ তল্লাটে যার খুব সুনাম। স্ক্যাটরা ওঁকে পছন্দ না করলেও

আমি বিনীত গলায় বললাম, 'আমরা নেলী খালার বাড়িতে বেড়াতে এসেছি।'

একগাল হেসে বুড়ো পাকড়াশী বললেন 'অ, তাই বলো। আমি ভাবলাম আর কেউ বুঝি। তা নেলী আমাকে বলেছিলো বটে তোমরা আসবে। আমি হলুমগে নিকুঞ্জ পাকড়াশী।'

টুনি ফিক করে হেসে বললো, 'আমরা আপনাকে চিনি।'

ভুরু কুঁচকে চোখ দুটো পিটপিট করে বুড়ো বললেন, 'চেনো মানে? তোমাদের সঙ্গে তো আমার আগে কখনো আলাপ হয় নি বাপু!'

আমি বললাম, 'জাহেদ মামার কাছে শুনেছি আপনার কথা। আপনার নাকি খুব দয়ার শরীর। নেলী খালার মালীকে দশটা টাকা দিয়েছিলেন। কক্সবাজারের কলেজ আর হাসপাতাল আপনার টাকায় চলে।'

টুনি বললো, 'আপনার একটা সুন্দর খামার আছে, তাও শুনেছি।'

বুড়োর পিটপিটে ভাবটা চলে গেলো। একগাল হেসে বললেন, 'তা বাপু লোকে একটু বাড়িয়েই বলে। জাহেদ ছোঁড়টা আমাকে পছন্দ করে কিনা, তাই অমন বলেছে। তোমরা আমার খামার দেখবে?'

টুনি বললো, 'বা রে, খামার দেখার জন্যই তো আমরা এসেছি!'

আমি দেখলাম বুড়ো পাকড়াশী টুনির কথা বলার মাঝখানে আড়চোখে ছাতিম গাছের গায়ে আঁকা সেই কঙ্কালের খুলিটার দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, 'তাহলে আর এখানে দাঁড়িয়ে কেন! চল বাছারা, খামারটা তোদের বেলা থাকতে দেখিয়ে আনি। সাঁঝে আবার এদিকে ঘোরাফেরা করা ভালো নয়।'

ললি এতোক্ষণে কথা বললো, 'কেন, ভূতের ভয় আছে নাকি!'

বুড়ো পাকড়াশী হাঁটতে হাঁটতে বললেন, 'তা বাছা তেনাদের ভূতই বলতে পারিস। হার্মাদদের আমলে ওরা যে কতো মানুষকে এসব পাহাড়ে জ্যান্ত পুঁতে রেখেছে, তার কি কোন ইয়ত্তা আছে! তেনাদের কারো তো আর সদগতি হয় নি। তাই তেনাদের আত্মারা এখনো এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ান।'

টুনি ভয়ে কাঁদো কাঁদো গলায় বললো, 'আপনি মিছেমিছি ভয় দেখাচ্ছেন কেন? আমরা তাহলে এক্ষুনি চলে যাবো।'

বুড়ো যেন জীবনে এমন হাসির কথা শোনেন নি। খিকখিক করে হাসতে হাসতে বললেন 'ওই দেখ, ভয় পাবার কী হলো এতে! যতোক্ষণ সুয্যির আলো আছে, ততোক্ষণ কোনো ভয় নেই। তা ছাড়া আমি সঙ্গে আছি না!'

আমরা যখন পাকড়াশীর খামারে এলাম, সূর্য তখন পাহাড়ের আড়ালে চলে গেছে। ছাতিম গাছের উল্টো দিকে বলে খামার থেকে জাহেদ মামার বাংলো দেখা গেলো না। পাকড়াশী আমাদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব দেখালেন। গাধা দেখে টুনি হেসে ফেললো। সেই সঙ্গে বাবুও।

সব দেখানোর পর পাকড়াশী বললেন, 'সাঁঝ হয়ে এলো। এবার তোরা বাড়ি

যা বাছা। নে ধর, চাটগাঁ থেকে বেলা বিস্কুট এনেছিলাম, খেতে খেতে যা। খবদ্দার, ছাতিমতলা দিয়ে যাস নে। এতোক্ষণে তেনারা হয়তো বেরিয়ে পড়েছেন।' এই বলে বুড়ো পাকড়াশী দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকালেন।

পকেট ভর্তি বিস্কুট নিয়ে আমরা বেরিয়ে এলাম। কিছু দূর যাবার পর হঠাৎ মনে হলো অল্প দূরে সামনে থেকে কী যেন সরে গেলো। স্ক্যাটরা ঘেউঘেউ করে সে দিকে ছুটে গেলো। আর একটু পরেই শ্রী গোবর্ধন ঝোপের আড়াল থেকে তীরের বেগে আমাদের দিকে ছুটে এলো। পেছনে দেখি স্ক্যাটরাও মহা আনন্দে ছুটে আসছে। বাবু একটু সামনে ছিলো। গোবর্ধন এসে বাবুকেই জড়িয়ে ধরলো—'তোদের পায়ে পড়ি বাপ। কুত্তোটাকে ধর।'

আমি হাসি চেয়ে স্ক্যাটরাকে ধমক দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে স্ক্যাটরা মাথা নিচু করে ঘনঘন লেজ নাড়তে লাগলো।

'তোকে নিয়ে হয়েছে এক জ্বালা।'— এই বলে ফতেও আমাদের দিকে এগিয়ে এলো—'তোর লজ্জাও করে না গোবর, কুত্তোর ভয়ে তুই একরত্তি ছেলেটিকে জড়িয়ে ধরেছিস!'

ফতের বিশাল বপুর কাছে বাবুকে অবশ্য একরত্তিই মনে হয়। ফতে তখন আমার দিকে ফিরে মোলায়েম গলায় বললো, 'তোমরা বুঝি বেড়াতে এসেছো? তা বেশ করেছো। বিকেলে পাহাড়ের বাতাস গায়ে লাগানো ভালো। তবে সন্ধ্যের বাতাস ভালো নয়। সন্ধ্যেবেলা নাম নিতে নেই—তেনারা একটু পরেই বেরিয়ে পড়বেন।'

আমি বললাম, 'আমরা পাকড়াশী মশাইকে দেখতে এসেছিলাম। আপনারা বুঝি সেখানে যাচ্ছেন?'

'তা না— তা নয়।' আমতা আমতা করে ফতে বললো, 'আমরাও বেড়াতে বেরিয়েছি। ভালো কথা মনে করিয়ে দিয়েছো। এসে যখন পড়েছি, তখন যাই পাকড়াশী বাবুকে একটা সালাম দিয়ে আসি। চল গোবরা, পা চালিয়ে চল।'

গোবরা তো যাওয়ার জন্যে এক পায়ে খাড়া। আড়চোখে স্ক্যাটরার দিকে তাকিয়ে ওর দৌড়ানোর সাহস হলো না। নইলে ওর ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছিলো, স্ক্যাটরা সামনে না থাকলে ঠিকই বাঁইবাঁই করে ছুট লাগাতো। ফতের একটা হাত খামচে ধরে গোবরা দু' পা হাঁটে, এক বার পেছনে তাকায়। একটু পরে ওরা চোখের আড়ালে চলে গেলো।

বাবু বললো, 'কী করবে, ফিরে যাবে, না ফতেরা ফেরা পর্যন্ত দাঁড়াবে?'

ললি বললো, 'পাকড়াশীকে সালাম দেয়ার জন্য ফতে হঠাৎ ক্ষেপে গেলো কেন বুঝলাম না।'

টুনি বললো, 'বারে, পাকড়াশী এখানকার নামকরা লোক। ওকে তো সবাই খাতির করবে।'

ললি বললো, 'ফতে গোবরকে আমরা খারাপ লোক বলেই জানি। পাকড়াশীর মতো ভালো লোককে ওরা কোনো বিপদেও ফেলতে পারে।'

আমি বললাম, 'ঠিক বলেছো ললি। আমাদের উচিত ফতে গোবরাকে চোখে চোখে রাখা। ওদের প্রত্যেকটা কাজ সন্দেহজনক। চলো আবার পাকড়াশীর বাড়ির দিকে যাই।

টুনি একটু গাঁইগুঁই করে বললো, 'শেষে দেখো, দেরি করার জন্যে নেলী খালা না আবার বকা শুরু করে।'

বাবু তখন বললো, 'সে ভয় থাকলে এক্ষুনি তোমাকে রেখে আসতে পারি।' টুনি কথা না বলে বাবুকে শুধু একটু ভেংচি কেটে আমাদের সঙ্গে এলো।

গভীর বনে মড়ার খুলি

তখন চারদিকে প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে কালো অন্ধকার জমছিলো। আমরা দূর থেকে পাকড়াশীর ঘরের বারান্দায় আলো দেখতে পেলাম। বারান্দায় বসা পাকড়াশীকে ফতে আর গোবর হাত নেড়ে কী যেন বোঝাচ্ছিলো। মাঝে মাঝে পাকড়াশী ওদের ধমকে দিচ্ছিলেন।

হঠাৎ 'কেঁই কেঁই' করে বিচ্ছিরি গলায় ডাকতে ডাকতে পাকড়াশীর কুকুর খেঁদী বারান্দার দিকে ছুটে গেলো। বুঝলাম পাজি কুকুরটা আমাদের দেখে ফেলেছে। স্ক্যাটরা গরগর করে একটা হুঙ্কার ছাড়তে যাচ্ছিলো। সঙ্গে সঙ্গে ইশারায় ওকে থামিয়ে দিলাম। কিন্তু বারান্দায় গিয়ে খেঁদী আমাদের দিকে তাকিয়ে সমানে কেঁই কেঁই করতে লাগলো।

পাকড়াশী চেঁচিয়ে 'গদা, গদা' বলে কাকে যেন ডাকলেন। তারপর বিরক্ত হয়ে বললেন 'গদা, দেখ তো খেঁদী এমন ভয় পেলো কেন? নির্ঘাত শেয়াল-টেয়াল দেখেছে। শেয়ালের জ্বালায় হাঁস-মুরগির কারবার আমাকে গোটাতে হবে। নাকি চোর-ছ্যাঁচড় এলো— দেখ নারে গদা।'

শেয়াল দেখে কোনো কুকুর ভয় পায়— কথাটা আমি জীবনে প্রথম শুনলাম। খুব হাসি পেলো। কিন্তু হাসার বদলে আমাদের পালাতে হলো, কারণ

ততোক্ষণে গদা নামধারী একটা দৈত্যের মতো লোক হেলেদুলে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছিলো আর বলছিলো, 'শেয়াল নয় কত্তা, মানুষ।'

ভাগ্যিস এদিকটায় গাছপালা বেশি ছিলো বলে, গদা আমাদের চিনতে পারে নি। নইলে ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিলো আমাদের চার জনকে বগলদাবা কর পাকড়াশীর কাছে নিয়ে যেতে ওর দু' মিনিটের বেশি সময় লাগবে না। আর পাকড়াশী যে আমাদের গোয়েন্দাগিরি আদৌ পছন্দ করবেন না, সে-কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। তার ওপর কথাটা যদি জাহেদ মামা আর নেলী খালার কানে একবার উঠিয়ে দেয়, তাহলে লজ্জায় মাথা কাটা যাবে। তাই আমরা কোনো দিকে না তাকিয়ে সটান দৌড় দিলাম। কাউকে কিছু বলতে হয় নি। আমরা চারজন একই সঙ্গে ছুটছিলাম। স্ক্যাটরাও তাল মিলিয়ে সমানে ছুটলো। কিছুক্ষণ পর যখন মনে হলো নিরাপদ দূরত্বে চলে এসেছি, তখন আমরা থামলাম।

গদা'র— 'শেয়াল নয় মানুষ' শুনে পাকড়াশী এমন জোরে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন যে, তখনো সেই চ্যাঁচানি আমাদের কানে বিঁধে ছিলো। ললি বললো, 'বাব্বা, পাকড়াশী মশাই এতো জোরে চ্যাঁচাতে পারেন।!'

বাবু বললো, 'আমার মনে হচ্ছে কানের ভেতর বুঝি প্রজাপতি উড়ছে।'

টুনি ওদের কথায় কান না দিয়ে কাঁদো গলায় বললো, 'ললিপা তোমরা কোথায় এসেছো? আমার ভয় লাগছে।'

টুনির কথা শুনে বাবু ধমক দিতে যাচ্ছিলো। ঠিক তখনই স্ক্যাটরা এমন ভাবে গরগর করে উঠলো যে, বাবু টুনিকে কিছু বলার সুযোগ পেলো না। সন্দেহজনক কিছু দেখলেই স্ক্যাটরা এভাবে শব্দ করে। তখন ওর ঘাড়ের কাছের লোমগুলো খাড়া হয়ে যায়। টুনি ললির গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। আমরা চারপাশে তাকিয়ে কিছুই দেখতে পেলাম না।

হঠাৎ খেয়াল হলো গদার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে আমরা উলটো পথে দৌড়েছিলাম। ফিরে যেতে হলে আমাদের আবার পাকড়াশীর বাড়ির ওপর দিয়েই যেতে হবে। এদিকটায় গাছপালা বেশ ঘন হয়ে বেড়ে উঠেছে। আকাশে তখনো শেষ সন্ধ্যার কিছু ম্লান আলো মেঘের ফাঁকে ছড়িয়ে ছিলো। কিন্তু গাছের নিচে অন্ধকার ভালো রকমই জেঁকে বসেছে।

কিছুক্ষণ গরগর করে স্ক্যাটরা থেমে গেলো। ওর ঝোলা কান দুটোকে যতোখানি খাড়া করা সম্ভব, তার চেয়ে বেশি খাড়া করে কোনো অচেনা শব্দ শোনার চেষ্টা করলো। আমরা কোথাও কিছু দেখতে না পেয়ে অবাক হয়ে স্ক্যাটরার দিকে তাকিয়ে রইলাম। একটু পরে স্ক্যাটরা আবার গরগর করে শব্দ করলো। বেশ কিছু দূরে ঝোপঝাড়ের ভেতরে একটা পুরোনো সেগুন গাছের দিকে ও তাকিয়ে ছিলো। মনে হলো সাদা মতো কী যেন একটা নড়াচড়া করছে। স্ক্যাটরাকে আমি ইশারায় থামিয়ে দিলাম। বাবু ললি টুনি একসঙ্গে আমার ওপর হুমড়ি খেয়ে

পড়লো। কোনো কথা না বলে ওদের ঝোপটার দিকে আঙুল তুলে দেখালাম।

কিছুক্ষণ পর ওরাও দেখতে পেলো। টুনির অবস্থা দেখে মনে হলো ও বুঝি ফিট হয়ে যাবে। আমি ওর হাতটা ধরে টের পেলাম— ঠকঠক করে কাঁপছে।

আমি ওর কানে ফিসফিস করে বললাম, 'ভয় কি টুনি! আমি আছি, বাবু আছে। তাছাড়া স্ক্যাটরা একাই তো এক শ'।'

টুনির কাঁপুনি কমলো। তবে ললি কতটুকু ভয় পেয়েছে সেটা বোঝা গেলো না। বাবু ওর কাঁধে হাত রেখেছিলো। স্ক্যাটরার ভাবসাব দেখে মনে হলো ইশারা পেলে ও ঝোপটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

আচমকা আমাদের চোখের সামনে সাদা বস্তুটা একটা লম্বা মানুষ হয়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে আমি ভাবলাম, পরশু সন্ধ্যেয় যখন জাহেদ মামার বাংলো থেকে ফিরছিলাম, তখন কি এই লোকটাকেই দেখেছিলাম? লোকটা লম্বায় আট ফুটের কম হবে না। চেহারাটা দেখা যাচ্ছে না। মাথা থেকে পা পর্যন্ত সাদা আলখাল্লায় ঢাকা।

দু'হাতে আমাকে আঁকড়ে ধরে টুনি তোতলাতে লাগলো— 'ভূ-ভূ-ভূত!'

আমি চাপা গলায় বললাম, 'না মানুষ। এটাকেই সেদিন ছাতিমতলায় দেখেছিলাম।'

ললি ফিসফিস করে বললো, 'এতো লম্বা মানুষ!'

বাবু বললো, 'হতে পারে। হার্মাদারা তো এদেশী মানুষ নয়। আফ্রিকায় কেথায় যেন আট ফুট লম্বা মানুষ থাকে।'

বাবুর যুক্তি শুনেও টুনির ভয় গেলো না। আমিও কম ভয় পাই নি। তবে এখন ভয় পেলে যে টুনিকে সামলানোই দায় হবে। ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, 'লোকটাকে আমার চেনা মনে হচ্ছে। দেখি ও কী করতে চায়।'

এমন সময় স্ক্যাটরা আবার গরগর করে উঠতে যাচ্ছিলো। ওকে চাপা গলায় ধমকে দিলাম। সেই লোকা ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে সোজা গভীর বনের দিকে হাঁটতে শুরু করলো। আমরাও সমান দূরত্ব রেখে ওকে অনুসরণ করলাম। স্ক্যাটরা সঙ্গে ছিলো বলেই সেদিন এরকম সাহস দেখাতে পেরেছিলাম।

লোকটাকে প্রথম যেখানে দেখছিলাম, সেই সেগুন গাছটার কাছে আসার পর হঠাৎ ওকে হারিয়ে ফেললাম। চোখের পলকে লোকটা কর্পূরের মতো উবে গেলো। আকাশে চাঁদ উঠেছে। তবু বনের ভেতর বেশ অন্ধকার। সাদা কাপড় পরা না থাকলে দশ হাত দূরের কাউকেও দেখা যেতো না। কোথাও কাউকে দেখতে না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়লাম।

আমি টের পাচ্ছিলাম, টুনি এসব বাজে কাজের চেয়ে ঘরে ফেরার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। সেগুন গাছের তলায় এসে বাবু বললো, 'লোকটা এখানে বসে

এতোক্ষণ কী করছিলো'?

আমি একটু হেসে বললাম, 'তোমার কথা মতো যদি হার্মাদ হয়, তাহলে নিশ্চয়ই গুপ্তধন পুঁতে রেখেছে।'

টুনি বিরক্ত হয়ে বললো, 'এটা কি ঠাট্টা করার সময়! চলুন ফিরে যাই।'

আমি বললাম, 'একা যেতে পারবে?'

টুনি তক্ষুনি আমার পিঠে একটা কিল বসিয়ে দিলো। আমি বললাম, 'তাহলে বারবার যাওয়ার কথা বলবে না।'

গুরুতর কিছু ঘটতে দেখলে ললি সব সময় গম্ভীর হয়ে যায়। ও আস্তে আস্তে বললো, 'লোকটা কোথায় গেলো দেখলে হতো না?'

টুনি ললিকে ধমকে বললো, 'তুমিও বুঝি ওদের দলে ঢুকলে ললিপা?'

ললি ভয় পায় নি দেখে আমার খুব ভালো লাগলো।

বাবু সত্যি সত্যিই গুপ্তধন খোঁজার জন্যে সেগুন গাছের চারপাশে ঘুরে ঘুরে দেখছিলো। হঠাৎ চাপাগলায় আমাকে বললো, 'আবির, দেখে যাও জলদি।'

আমরা তিন জন ওর কাছে ছুটে গেলাম। বাবু বললো, 'দেখ, মড়ার খুলি।'

চাঁদের ফ্যাকাশে আলোয় দেখলাম, সেগুন গাছের গায়ে একটা কঙ্কালের মাথার খুলি আঁকা রয়েছে। আমি হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখলাম। একটু ভেজা ভেজা মনে হলো। শুঁকে দেখলাম তাজা সেগুন কাঠের গন্ধ। বললাম, 'লম্বু তাহলে এতোক্ষণ বসে বসে এটাই আঁকছিলো।'

ললি শুকনো গলায় বললো, 'তবে যে বাথিন বলছিলো মড়ার খুলি হার্মাদদের আমলের আঁকা।'

বাবু বললো, 'আমিও তো তাই বলছি। এই লোকটা নির্ঘাত হার্মাদদের কেউ হবে। নইলে এতো লম্বা হয় কী করে!'

আমি বললাম, 'চৌদ্দ পুরুষ আগে ওর কেউ হার্মাদ থাকতে পারে। তবে রণ-পা পরে তুমিও ওর মতো লম্বা হতে পারো বাবু।'

বাবু বললো, তুমি কী করে বুঝলে ও রণ-পা পরেছে?"

আমি বললাম, 'ওর হাঁটার ধরন দেখেই বোঝা যায়। আমি এক বার সার্কাসে দেখেছিলাম একটা জোকার রণ-পা পরে কিভাবে হেঁটেছিলো।'

টুনি ভয়-টয় ভুলে অবাক হয়ে বললো, 'রণ-পা কী আবির?'

আমি পাণ্ডিত্য ফলানোর জন্যে ধীরেসুস্থে বলতে আরম্ভ করলাম, 'রণ-পা হলো—'

বাবু বাধা দিয়ে বললো, 'এক ধরনের বাঁশের পায়ের মতো। দুটো বাঁশের গিঁটে পা রেখে পা-টা লম্বা করে নেয়। তাড়াতাড়ি হাঁটা যায় এতে।'

ললি বললো, 'ভয়ও দেখানো যায়।'

আমি একটু হাসলাম— 'ললি কি ভয় পেয়েছো?'

ললি কথার জবাব দেয়ার আগে বাবু বললো, 'তুমি কী করে বুঝলে যে এই খুলিটা ওই লোকটা ছাড়া আর কেউ আঁকে নি?'

আমি বললাম, 'সেগুন কাঠের তাজা গন্ধ বেরুচ্ছে। তাছাড়া ভেজাও রয়েছে। দু' শ' বছর আগের আঁকা কোনো মড়ার খুলি থেকে তাজা সেগুন কাঠের গন্ধ বেরুবে না।'

টুনি হাঁপ ছেড়ে বললো, 'তাই বলো। আমি তো ভয়েই মরি, সত্যিই বুঝি লোকটা তখনকার দিনের কোনো প্রেতাত্মা হবে।'

ললি গম্ভীর হয়ে বললো, 'তা তো বুঝলাম, লোকটা প্রেতাত্মা নয়— মানুষ। বাথিন আমাদের মিছে কথা বলেছে। কিন্তু লোকটা রণ-পা পরেই বা কেন ঘুরছে, আর কেনই বা সেগুন গাছের গোড়ায় মড়ার খুলি আঁকছে!'

বাবু বললো, 'হয়তো কোনো গুপ্তধন লুকিয়ে রেখেছে এখানে।'

টুনি বললো, 'তুমি কি বলতে চাও, যতগুলো গাছে এরকম মড়ার খুলি আঁকা রয়েছে, ততগুলো গাছের নিচে লোকটা গুপ্তধন লুকিয়ে রেখেছে?'

বাবু বিরক্ত হয়ে বললো 'আহ, সব সময় তর্ক করো কেন টুনি! এমনও তো হতে পারে, লোকটা কোনো গুপ্তধন খুঁজছে। যে-সব গাছের নিচে খোঁজা শেষ হয়েছে, হয়তো লোকটা সে-সব গাছে চিহ্ন দিয়ে রাখছে।'

আমি হেসে বললাম, 'তর্ক করো না টুনি। বাবুর মাথায় গুপ্তধনের ভূত চেপেছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, লোকটা কে?'

ললি বললো, 'আর মড়ার খুলিই বা কেন আঁকছে?'

আমি বললাম, 'গুপ্তধন হোক বা অন্য কিছুর জন্যে হোক, কিছু গাছ চিহ্ন দিয়ে আলাদা করে রাখছে। মড়ার খুলি আঁকার আরেকটা উদ্দেশ্য হতে পারে স্রেফ ভয় দেখানো।'

টুনি বললো, 'এ মা! লোকটা কী পাজি!'

আমি হাসলাম— 'ভালো যে নয় আমি হলপ কর বলতে পারি। এই জঙ্গলে রাতের বেলা এভাবে ভয় দেখিয়ে কোনো ভালো লোক নিশ্চয়ই ঘুরে বেড়াবে না।'

টুনি বললো, 'আমার কিন্তু এখনো ভয় লাগছে।'

বাবু ধমক দিয়ে বললো, 'আবার ভয়ের কথা—' শেষ না করেই বাবু তিন লাফে আমার কাছে ছুটে এসে— 'ওরে বাবা ওটা কি!'— বলে ভয়-টয় পেয়ে এক যাচ্ছেতাই কাণ্ড করে বসলো। সুযোগ পেয়ে স্ক্যাটরাও ঘেউ ঘেউ করে বার দুই ডেকে নিলো। আর টুনি কাঁদো কাঁদো গলায় 'ললিপা, দেখ না আমাকে কেন মিছেমিছি ভয় দেখাচ্ছে' বলে নাকীকান্না জুড়ে দিলো।

আমি দিশেহারা হয়ে প্রথমে বাবুকে ধমক দিলাম, তারপর স্ক্যাটরা আর টুনিকে। বাবুকে বললাম, 'কী দেখেছো বলবে তো!'

বাবু একটু লজ্জা পেয়ে বললো, 'আমার পায়ের ওপর দিয়ে কী যেন ছুটে গেলো। আমি—' কথা শেষ না করে আরেক লাফে বাবু ললির কাছে চলে গেলো।

বাবুর ভয়ের কারণটা দেখলাম। আমার হাসি চাপা দায় হয়ে পড়লো। দুটো কাঠবেড়ালীর ছুটোছুটিতে ও যদি এভাবে ভয় পায়, তাহলে আমি কোথায় যাই! কাঠবেড়ালী দেখে ললিও হেসে বললো, 'ও তো কাঠবেড়ালী বাবু। ভয় পাচ্ছো কেন।?'

তবে এরকম কাঠবেড়ালী আমি আগে কখনো দেখি নি। একেবারে কুচকুচে কালো দেখতে। ছোট চোখ দুটো চাঁদের আলোয় হীরের কণার মতো চকচক করছে।

বাবু হাঁপ ছেড়ে বললো, 'তাই বলো। আমি ভাবি আর কি যেন!'

এমন সময় বেশ দূরে একটা নারকেল গাছের দিকে তাকিয়ে স্ক্যাটরা আবার আগের মতো গরগর করে উঠলো। আমরা চার জন চমকে উঠে একসঙ্গে তাকিয়ে দেখি, সেই লম্বা লোকটা। স্ক্যাটরাকে কিছু বলার আগেই ও ঘেউ ঘেউ করে লোকটার দিকে ছুটে গেলো। আর স্ক্যাটরার সেই বন-কাঁপানো, পিলে চমকানো ডাক শুনে লোকটা মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে আট ফুট লম্বা লোকটার বদলে খুবই সাধারণ একটা লিকলিকে শরীরের লোক লাফ দিয়ে উঠে ছুটে পালাতে পালাতে চেঁচিয়ে বললো, 'ওরে বাবারে খেয়ে ফেল্লেরে! ওরে ফতে, ওরে পঁচারে! তোরা আমাকে ফেলে কোথায় গেলিরে!' চোখের পলকে আমাদের পরিচিত শ্রী গোবর্ধন অন্ধকারে হারিয়ে গেলো।

আমরা চার জন এক অপরের দিকে তাকালাম। কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা বলতে পারলাম না। লোকটাকে ওভাবে ছুটে পালাতে দেখে স্ক্যাটরাও ফিরে এলো। গলার স্বরটা স্ক্যাটরার কাছেও অচেনা নয়। ললি বললো, 'শ্রী গোবর্ধনই তাহলে এতোক্ষণ রণ-পা পরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো!'

বাবু উত্তেজিত গলায় বললো, 'ফতে আর পঁচা নিশ্চয় ওর সঙ্গে আছে।'

ললি বললো, 'কিন্তু ওরা এখানে কী করছে, সেটাই তো জানা গেলো না।'

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, 'আজ রাতে সব জানা যাবে। আজ রাতেই—'

আমার কথা শেষ না হতে স্ক্যাটরা আবার গরগর করে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে ইশারায় ওকে থামিয়ে দিয়ে সামনে তাকিয়ে দেখি, চিমনি-ঢাকা বাতি হাতে তিনটে লোক আমাদের দিকে আসছে।

বাবু ফিসফিস করে বললো, 'ফতেরা আসছে।'

আমি চাপা গলায় ওদের সতর্ক করে দিয়ে বললাম, 'চুপ। কোনো কথা নয়। পাশের ঝোপটার ভেতরে ঢুকে পড়ো।'

স্ক্যাটরাকে নিয়ে আমরা চার জন পাশের কেয়া গাছের ঝোপটার ভেতর ঢুকে

পড়লাম। ওরা কথা বলতে বলতে এগিয়ে এলো। কথা ঠিক নয়, ফতে সারাক্ষণ গোবরকে ধমক দিচ্ছিলো— 'ওই কুত্তোই তোকে খাবে। আজ যদি বড়ো কত্তাকে না বলেছি, তাহলে আমার নামে যেন লোকে সাতটা নেড়ি কুত্তো পোষে। শেষ কালে খেঁদীর ডাক শুনে তুই ভয় পেতে শুরু করলি? তোকে নিয়ে কী করে চলবে র‍্যা!'

গোবর মিনমিন করে বললো 'মা কালীর দিব্যি ওস্তাদ। ওটা খেঁদী নয়। ওই ছোঁড়াগুলো যেটাকে নিয়ে ঘোরে, সেটা।'

ফতে বললো, 'তোর মুণ্ড।' তারপর গলা তুলে আদর করে ডাকলো, 'খেঁদী, খেঁদী! কোথায় গেলি বাছা। রাতে-বিরেতে বাইরে কেন ঘুরছিস? খেঁদী!' কোনো সাড়া না পেয়ে ফতে ক্ষেপে গিয়ে বললো— 'কোথায় গেলো হারামজাদা কুত্তোটা!'

আমাদের ঝোপটার প্রায় গা ঘেঁষে ফতেরা বেরিয়ে গেলো। স্ক্যাটরার গলাটা যে চ্যাঁচানোর জন্যে কী রকম নিশপিশ করছে, বুঝতে এতোটুকু অসুবিধে হলো না। খেঁদী হলে এতোক্ষণে কী করতো জানি না, তবে স্ক্যাটরার মতো ভালো কুকুর আর হয় না।

ফতেদের আলোটা বনের ভেতর হারিয়ে যাবার পর টুনি বললো, 'ললিপা, ফিরে চলো।'

ললি আমাকে বললো, 'আবির কি আরো থাকতে চাও?'

আমি একটু ভেবে বললাম, 'ঠিক আছে ফিরে চলো।'

যেতে যেতে ললি বললো, 'নেলী খালা এতোক্ষণে নিশ্চয় আমাদের কথা ভাবতে শুরু করেছেন।'

বাবু বললো, 'তবে নেলী খালা এটাও জানেন যে, স্ক্যাটরা আমাদের সঙ্গে আছে।'

ভাঙা চাঁদটা আরেকটু ওপরে উঠে এসেছে। বনের ভেতরটা অদ্ভুত রকম সুমসাম। দূরে কয়েকটা পাখির ডানা ঝাপটানো শুনতে পেলাম। কোথাও নাম-না-জানা ফুল ফুটেছে। অচেনা মিষ্টি বুনো গন্ধে বাতাসটা ভারি হয়ে আছে। আমরা চার জন চুপচাপ হাঁটছিলাম। পায়ের নিচে শুকনো পাতার খসখস শব্দ হচ্ছিলো। খেয়াল করলাম কেউ কোনো কথা বলছে না। মাঝে মাঝে এমন একটা সময় আসে, যখন অনেক কথা বলার থাকলেও কিছুই বলা হয় না। এতোক্ষণ প্রচণ্ড এক উত্তেজনার সময় কাটানোর পর আমাদের অবস্থাও সে রকম হয়েছিলো।

বাবু হাঁটতে হাঁটতে একসময় বললো, 'আমরা ঠিক পথে যাচ্ছি তো আবির?'

আমি চারপাশে তাকিয়ে দেখলাম। দূরে পাহাড়ের নিচে সোনাবালি নদী চাঁদের আলোয় চিকচিক করছিলো। আমি একটু হেসে বললাম, 'নদী পেয়েছি,

পথ চিনতে অসুবিধে হবে না। হয়তো একটু বেশি ঘুরতে হতে পারে।'

ললি আস্তে আস্তে বললো, 'হাঁটতে আমার ভালোই লাগছে।'

আমি ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বললাম, 'আমারও।'

বাবু বললো, 'মড়ার খুলির রহস্যটা কিছুই বোঝা গেলো না আবির। তুমি কি কিছু ভাবছো?'

আমি বললাম, 'ভেবেছি। আজ রাতে আমরা অনেক কিছু জানতে পারবো। হয়তো সবই জেনে যাবো। জাহেদ মামার সঙ্গে দেখা হলে ভালো হতো।'

বাবু একটু হেসে বললো, 'গিয়ে দেখবে, নেলী খালা আর জাহেদ মামা বসে গপ্পো করছে।'

টুনি মুখ টিপে হেসে বললো, 'তাহলে তো বেঁচে যাই।'

ললি বললো, 'তুমি খুব পাজি হয়েছো টুনি।'

আমি টুনিকে নিয়ে একটা হাসির কথা বলতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় বাবু বললো, 'নদীতে ওগুলো কী, দেখ তো আবির।'

স্ক্যাটরাও গরগর করে উঠলো। ওকে একটা ধমক দিয়ে নদীতে তাকিয়ে দেখি অনেকগুলো মোষের মতো জন্তু সারি বেঁধে পানি খাচ্ছে।

টুনি বললো, 'গরুই তো মনে হচ্ছে।'— বলে আড়চোখে একবার ললির দিকে তাকাতে ভুললো না।

আমরা আরো কাছে এগিয়ে গেলাম। বাবু উত্তেজিত গলায় বললো, 'গরু নয়, বাইসন। আমি ওয়াইল্ড ওয়েস্টের ছবিতে এরকম বাইসন দেখেছি।'

ভালো করে বাবুর বাইসনগুলো দেখে আমি পাণ্ডিত্য ফলানোর সুযোগ পেয়ে গেলাম। বললাম, 'বাইসন নয় বাবু। এগুলো হচ্ছে নীল গাই। হিল ট্র্যাক্টের জঙ্গলে এক সময় প্রচুর নীল গাই পাওয়া যেতো। বাবা অনেক নীল গাই শিকার করেছেন। আজকাল অবশ্য খুব কমই দেখা যায়।'

টুনি বললো, 'সত্যি বলছেন এগুলো নীল গাই! কী মজা ললিপা! স্কুলে গিয়ে নীল গাইর গপ্পো করা যাবে।'

আমি বললাম, 'কেন, কালো কাঠবেড়ালী যে দেখলে, সেটা তো আরো দুর্লভ।

বাবু বললো, 'লরেল হার্ডিই বা কম কিসে! গোবর যা দেখালো— আমি তো কোনো দিনই ভুলবো না।'

আমি বললাম, 'পা চালিয়ে চলো সবাই। নীল গাইরা মাঝে মাঝে ক্ষেপে গিয়ে তাড়া করে। তখন এরা বাইসনের চেয়েও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে।'

টুনি শুকনো গলায় বললো, 'আপনি খালি ভয় দেখাতে পারেন।'

বাকি পথটা আমরা সবাই মিলে দৌড়ে পার হলাম। শেষের দিকে অবশ্য খুবই আস্তে হাঁটতে হয়েছে, কারণ ললির বুকের ব্যাথাটা আবার বেড়েছিলো।

আমরা যখন ঘরে ফিরলাম, ঘড়িতে তখন আটটা বাজে।

নেলী খালা গাড়ি বারান্দার নিচে পায়চারি করছিলেন। স্ক্যাটরা ছুটে গিয়ে ওঁকে আদর করতেই এক ধমক লাগালেন— 'থাক থাক, ওসব শুকনো আদর দেখাতে হবে না।'

আমি ভাবলাম, এ সময়ে জাহেদ মামার থাকাটা খুব দরকার ছিলো। নেলী খালা রীতিমতো রেগে গেছেন। আকাশের দিকে তাকিয়ে নেলী খালা বললেন 'বেড়াতে তো কাউকে আমি বারণ করি নি। জাহেদ বলে গেলো ওর দুটো লোককে কারা যেন খুন করে সমুদ্রের তীরে ফেলে রেখেছে। বেচারা জাহেদ হিমছড়ি আর কক্সবাজার ছুটোছুটি করে মরছে। আমি একা কত জনের কথা ভাববো!'

আমি উত্তেজিত হয়ে বললাম, 'বলো কি নেলী খালা! কারা খুন করলো?'

নেলী খালা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'সেটা যদি কেউ জানতো, তাহলে জাহেদকে এতো ছুটোছুটি করতে হতো না। আমি শুধু শুনেছি দুটো খুন হয়েছে, আর লাশ দুটোর পাশে বালিতে দুটো মড়ার খুলি আঁকা রয়েছে।'

আবার মড়ার খুলি! তার মানে গোবররা কি খুনের সঙ্গেও জড়িত? গভীর উত্তেজনায় আমাদের সবার চোখ চকচক করছিলো। বাবু কী যেন বলতে যাচ্ছিলো। নেলী খালা বাধা দিয়ে বললেন, 'আর কোনো কথা নয়। এক্ষুনি খেয়ে শুতে যাও।'

আমরা যখন রাতের খাবার খেয়ে ওপরে উঠতে যাবো, তখনই ফতে গোবর এসে ঘরে ঢুকলো। নেলী খালার পাশে স্ক্যাটরাকে দেখে গোবর ফতের একটা হাত আঁকড়ে ধরলো। নেলী খালা গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আপনারা খেয়ে নিন। আমি অত্যন্ত দুঃখিত, সঙ্গে বসতে পারছি না।'

গোবর বললো, 'তাতে কি, তাতে কি! তবে কুত্তোটাকে দিদি আপনার সঙ্গে না নিয়ে গেলে একটা ভাতও গিলতে পারবো না।'

দোতালায় এসে ঘরে ঢুকে আমি বাবুকে বললাম, 'আজ রাতেই একটা কিছু ঘটবে।'

বাবুর দু'চোখে তখন ঘুমের জোয়ার নেমেছে। ঘুম-জড়ানো চোখে পিটপিট করে তাকিয়ে বললো, 'কী ঘটবে?'

আমি বললাম, 'বোসো। এত ব্যস্ত হচ্ছো কেন, আমাকে একটু ভাবতে দাও।'

এতো বড়ো প্ল্যানটা একটু ভূমিকা ছাড়া কীভাবে বলা যায় আমি ভেবে পেলাম না। বাবু বিরক্ত হয়ে বললো, 'তুমি সারারাত ধরে বসে বসে ভাবো।' বলেই পাশ-বালিশটা টেনে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

বাবুর ওপর আমার খুব রাগ হলো। আমি ভাবছিলাম ফতে গোবরকে আজ

রাতে অনুসরণ করবো। ললির বুকের অসুখটা আবার বেড়েছে বলে ও খাবার পরই ঘরে চলে গেছে। টুনিও নিশ্চয় এতোক্ষণে আলো দেখবার কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে নাক ডাকতে শুরু করেছে। বাবু, ললি, টুনি সব কটাকে দারুণ স্বার্থপর মনে হলো। মনে মনে ঠিক করলাম, আগামী তিন দিন বাবুর সঙ্গে কথাই বলবো না।

আরও কিছু সূত্র

বাবুদের স্বার্থপরতার কথা ভেবে যখন সব কিছু অসার মনে হচ্ছিলো, ঠিক তখন দেখি নেলী খালা পা টিপে টিপে আমাদের ঘরে ঢুকলেন। আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, 'তুমি অমন করে হাঁটছো কেন নেলী খালা? পায়ে কি কিছু বিঁধেছে!'

নেলী খালা ঠোঁটের উপর আঙুল চেপে ফিসফিস করে বললেন, 'চুপ!' তারপর কাছে এসে বললেন, 'আমার ঘরে চল। একটা জিনিস দেখাবো।'

আমি অবাক হয়ে নেলী খালাকে অনুসরণ করলাম। নেলী খালা আবার কখন থেকে আমাদের মতো গোয়েন্দাগিরি শুরু করলেন, ভেবে কোনো কূলকিনারা পেলাম না।

নেলী খালার মতো পা টিপে টিপে নিচে এসে তাঁর ঘরে ঢুকলাম। ঢুকতেই আমার চোখ দুটো কপালে উঠে গেলো, আর মুখটা হাঁ হয়ে গেলো। কী বলবো কিছুই ভেবে পেলাম না। চোখের সামনে দেয়ালের মিটমিটে আলোর নিচে ভাইয়া হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে।

'অমন করে তাকিয়ে আছিস কেন? কথা বল। তুই তো দেখছি আমার চেয়েও লম্বা হবি!'— বলতে বলতে ভাইয়া এগিয়ে এসে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলো।

আমি কথা না বলে শুধু ভাইয়াকেই দেখছিলাম। নেলী খালা গত বছর জিনসের যে নীল ট্রাউজারটা ভাইয়ার জন্যে এনেছিলেন, সেটাই তার পরনে। গায়ে একটা খদ্দরের পাঞ্জাবি। ভাইয়া দাড়ি রেখেছে। দাড়ি রাখলে যে কাউকে

সুন্দর লাগতে পারে, ভাইয়াকে দেখার আগে কোনো দিনই কথাটা আমি বিশ্বাস করতাম না।

আমি বললাম, 'তুমি কেমন আছো ভাইয়া? কোথায় থাকো? কী করছো?'

ভাইয়া হেসে বললো, 'আস্তে আস্তে। খুব ভালো আছি। কোথায় থাকি, কী করে বলি! বলতে পারিস সারা বাংলাদেশেই আছি। কী করছি, এক কথায় কি আর বলা যাবে? বরং কখনো নেলী খালার কাছে শুনিস আমরা কী করছি। তোদের কথা বল। তুই তো ফার্স্ট হবি আমি জানি। মা-বাবা কেমন আছেন রে?'

আমি বললাম, 'ভালো। তোমার প্রথম চিঠি পড়ে মা কেঁদেছিলেন। আগে খুব কাঁদতেন। এখন আর কাঁদেন না।'

ভাইয়া বললো, 'না কাঁদলেই বাঁচি। কাল তোকে হাটে দেখেছিলাম। সঙ্গে ওরা ছিলো বলে ডাকি নি। মনে হচ্ছে নতুন জায়গাটা তোদের খুব ভালো লেগে গেছে।'

আমি বললাম, 'ভালো আর বলতে! এত সুন্দর জায়গার কথা আমি ভাবতেই পারি না।'

ভাইয়া মুখ টিপে হেসে রহস্য করে বললো, 'প্রদীপের নিচেই যে অন্ধকার!'

'অন্ধকার কোথায় দেখলে ভাইয়া?' আমি অবাক হলাম।

'আগে বল, সেদিন নদীর পানিতে সবাই মিলে কী খুঁজছিলি?'

আমি নেলী খালার দিকে তাকালাম। নেলী খালা লাজুক হেসে বললেন, 'তোমাকে বলি নি অপু। আমার ধারণা, এ নদীর কাছাকাছি কোথাও সোনার খনি আছে। আমি নদীর বালুর সঙ্গে সোনার গুঁড়ো পেয়েছি।

'বলো কী নেলী খালা! এমন একটা জিনিস তুমি এদ্দিন চেপে ছিলে?'

'না, না। আমি এখনো পুরোপুরি শিওর নই।' নেলী খালা বললেন, 'জিওলজিক্যাল সার্ভে ডিপার্টমেন্টকে চিঠি লিখেছি। ওরা একটা সার্ভে টীম পাঠিয়েছে। ওদের একটা জার্নালে পড়েছি। মনে হচ্ছে হিল ট্রাক্টে সোনা পাওয়াটা বিচিত্র কিছু নয়।'

নেলী খালার কথা শুনতে শুনতে কী যেন ভাবছিলো ভাইয়া। চিন্তিত গলায় বললো, 'এখন মনে হচ্ছে একটা সূত্র খুঁজে পেয়েছি।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কিসের সূত্র?'

'বলছি।' নেলী খালার দিকে তাকালো ভাইয়া— 'পাকড়াশীকে তোমার কেমন মনে হয় বলো তো?'

'নিকুঞ্জ পাকড়াশীর কথা বলছিস? কেন, ভালোই তো!'

'কী রকম ভালো?' ভাইয়া রহস্যময় হাসলো।

'আমি বাড়ি কেনার পর নিজে এসে দেখা করে গেছেন। প্রথম দু'দিন রান্না করে খাবার পাঠিয়ে দিয়েছেন। সব সময় লোকজন পাঠিয়ে খোঁজখবর নেন।

এক বার অবশ্য বলেছিলেন, 'এ বাড়িটার ভীষণ বদনাম। কিনে ভালো করি নি। এখনো নাকি কী সব আশরীরী আত্মা এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ায়। এক জন ওয়েল উইশারের মতো বাড়ির কাজের লোকজনদেরও সাবধান করে দিয়েছেন। আমি ওতে কান দিই নি। পুরোনো দিনের লোকজন এসব বলেই থাকে।'

'তার সম্পর্কে তোমার আর্মি অফিসার বন্ধুর কী ধারণা?'

একটু লাল হয়ে নেলী খালা বললেন, 'জাহেদ বলেছে, কক্সবাজার আর হিমছড়িতে নাকি দুটো চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারি চালান পাকড়াশী মশাই। নির্বিরোধী শান্তিপ্রিয় লোক। বড় খামার আছে একটা। একা মানুষ। খামারে প্রচুর আয় হয়। তাই দান-খয়রাতের সুযোগ পেলে ছাড়েন না।'

'হুঁ।' গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়লো ভাইয়া। কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললো, 'পাকড়াশীকে তোমরা যতোটা ভালো বলে জানো, আমরা তা মনে করি না।'

নেলী খালা ভুরু কুঁচকে বললেন, "খারাপ কী দেখলে?'

মৃদু হেসে ভাইয়া বললো, 'এটা তো স্বীকার করবে, তোমার আর জাহেদ সাহেবের চেয়ে এই এলাকাটা আমি বেশি চিনি?'

'তাতে কী হলো?'

'পাকড়াশীকে আমরা প্রথম থেকেই সন্দ করছি। জায়গাটার ন্যাচারাল বিউটি দারুণ। তবে এত বড় একটা খামার চালাবার জন্যে মোটেই সুবিধের নয়। তুমি নিজেই তো ভেজিটেবলের ব্যবসা করতে গিয়ে গচ্চা দিলে। কক্সবাজারের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই খারাপ। টেকনাফ বা উখিয়ার অবস্থাও এর চেয়ে ভালো। তবু সেখানে এ ধরনের কোনো খামার নেই। অথচ এখানে এত বড় একটা খামার ফেঁদে বসার তাৎপর্যটা কী— এ নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাতে হয়েছে।'

'হয়তো জায়গাটা পাকড়াশীর কোনো কারণে ভালো লেগেছে। যেমন আমার লেগেছে। এতে সন্দ করার কী আছে?'

'পাকড়াশী তোমার মতো এ্যাডভেঞ্চার-প্রিয় নয় নেলী খালা। অত্যন্ত প্র্যাকটিক্যাল লোক। পাকড়াশীর এখানে আসার পর অচেনা লোকের আনাগোনা অনেক বেড়েছে। আমাদের কাজ করতে হয় স্থানীয় লোকদের সঙ্গে। ওদেরও অনেকের ধারণা, এখানে থাকার পেছনে পাকড়াশীর বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য আছে। এখানকার লোকজন এত ভালো যে, মানুষ খুন করা দূরে থাক, সামান্য চুরি পর্যন্ত করে না। অথচ পাকড়াশী আসার পর বেশ কয়েকটা লোক খুন হয়েছে।'

'তোর যুক্তি মোটেই জোরালো মনে হচ্ছে না অপু।' মাথা নেড়ে নেলী খালা বললেন, 'আমাকে যারা ভূতের ভয় দেখিয়ে এ বাড়ি থেকে তাড়াতে চায়, হয়তো তারাই পাকড়াশীকে নিয়ে এসব কথা বলে বেড়াচ্ছে। তুই যেভাবে বলছিস,

সেভাবে তো বুড়ো মুৎসুদ্দিকেও সন্দ করা যায়।'

'কেন, মুৎসুদ্দি বুড়ো কী বললো?'

'তিনিও আমাকে ভূতের ভয় দেখিয়েছেন। সে দিন আসার সময় আবিররাও শুনেছে।'

'তাঁর স্বার্থ?'

'স্বার্থ তো একটাই। আমি চলে গেলে এ বাড়িটায় তিনি মোটেল চালু করতে পারেন। অলরেডি কক্সবাজারে একটা মোটেল উনি চালাচ্ছেন।'

কিছুক্ষণ চুপ করে কী যেন ভাবলো ভাইয়া। তারপর বললো, 'মুৎসুদ্দিও খারাপ লোক হতে পারে, তাতে করে পাকড়াশী ভালো হচ্ছে না। তুমি যে একটু আগে নদীর কথা বললে, আমার মনে হচ্ছে পাকড়াশীও বোধ হয় এটা জানে। নইলে সমুদ্র পর্যন্ত নদীর দু'পাশে দেড় শ' একর জমি কী কারণে লীজ নিয়ে রেখেছে? খামারে তো পাঁচ-ছয় একরের বেশি জমি নেই।'

'এই কথা?' হাসলেন নেলী খালা— 'পাকড়াশী মশাই আমাকে বলেছেন রাবারের চাষ করবেন। জমি নাকি তাঁর আরও লাগবে।'

এতোক্ষণ চুপচাপ নেলী খালা আর ভাইয়ার কথা শুনছিলাম। যেখানে আমার সন্দেহের জট পেকে আছে, সেটা ভাইয়া কিছুটা ধরতে পেরেছে। আজ সন্ধ্যার ঘটনার পর আমারও মনে হয়েছে পাকড়াশী নিপাট ভালোমানুষ নয়। কিন্তু ফতে আর গোবর কী উদ্দেশ্যে এখানে এসেছে, তার সঙ্গে পাকড়াশীর কী সম্পর্ক— সেটা জানতে না পারলে জট খোলা যাবে না। ফতে গোবর যে লোক ভালো নয়, এর প্রমাণ তো আমরা পেয়েই গেছি। ভাইয়া আর নেলী খালাকে ওদের সম্পর্কে যতোটুকু জানতাম বললাম, শুধু বাড়ির ভেতরের ঘটনাগুলো বাদ দিয়ে।

ভাইয়া সব শুনে বললো, 'রণ-পা শুধু ভয় দেখাবার জন্য পরে না। এসব জায়গায় যেখানে যোগাযোগ সবচেয়ে খারাপ, সেখানে দূরের পথে যাবার জন্য কেউ কেউ এখনো রণ-পা পরে।'

নেলী খালা বললেন, 'ওদের ব্যবসার কাজে পাকড়াশীর সঙ্গে দেখা করা বা কথা বলার ভেতর অন্যায় কিছু নেই। আমি লোক দুটোকে পছন্দ করি না ম্যানার শেখে নি বলে।'

গত রাতে ফতে আর গোবর আন্নাকালীর পাহাড়ে যে আলোর সংকেত পাঠিয়েছিলো, সে কথা নেলী খালাদের আর বললাম না। এ কথা কে না জানে, বড়োরা কখনো ছোটদের স্বাধীনভাবে কোনো কাজ করতে দেয় না। ফতে গোবরের ব্যাপারে আমাদের তদন্ত চালিয়ে যেতে হবে।

ভাইয়া নেলী খালাকে বললো, 'মেজর জাহেদের সঙ্গে একটা ব্যাপারে আমি একমত। এই এলাকায় যে স্মাগলিং হচ্ছে, তার সঙ্গে স্থানীয় কোনো লোক জড়িত নয়। তুমি বরং তাকে পাকড়াশী আর মুৎসুদ্দির ওপর বিশেষভাবে নজর রাখতে

বোলো। আবিররা তো ফতে গোবরের ওপর নজর রেখেছেই।'

নেলী খালা বললেন, 'তুই তাহলে বলতে চাস খুনটাও বাইরের লোকে করেছে।'

'আমার তাই ধারণা।'

'অথচ জাহেদ খুনের ব্যাপারে স্থানীয় লোকদের সন্দ করে বসে আছে। এখানকার স্থানীয়রা বাইরের লোকদের নাকি একেবারেই পছন্দ করে না।'

'সেটা ঠিক। আর পছন্দ করবেই-বা কেন? বাইরের লোকেরা এসে এখানকার জমি-টমি সব লীজ নিয়ে স্থানীয়দের ওপর অত্যাচার তো কম করছে না। তবে সমস্যাটা খুনোখুনির পর্যায়ে এখনো যায় নি। আমি অনেক দিন ধরে এদের ভেতর কাজ করছি তো। আসলে লোকগুলো খুবই নিরীহ আর শান্তিপ্রিয়। একটু থেমে ভাইয়া কী যেন ভাবলো। তারপর বললো, 'অবশ্য কতোদিন এরকম নিরীহ থাকবে বলা মুশকিল। বান্দরবন আর খাগড়াছড়ির দিকে গোলমাল শুরু হয়ে গেছে।'

নেলী খালা বললেন, 'তোরা সাবধানে থাকিস অপু।'

ভাইয়া মৃদু হাসলো— 'তোমার বন্ধুকে বলে দিও, স্মাগলার খুঁজতে গিয়ে আবার যেন আমাদের পেছনে না লাগে। আমি অবশ্য মেজর জাহেদের কথা বলছি না। তিনি ছাত্র ইউনিয়ন করতেন, এটা আমরা জানি। কিন্তু নর্থে আর্মির লোকেরা আমাদের ওপর কম অত্যাচার করছে না।

ভাইয়ার শেষের কথাগুলো আমার কাছে ভীষণ রোমাঞ্চকর মনে হলো। বাবু বলছিলো, সাউথ আমেরিকায় বিপ্লবীদের সঙ্গে আর্মির সব সময় যুদ্ধ হচ্ছে। সেখানে বিপ্লবীরা গেরিলা যুদ্ধ শুরু করেছে। ভাইয়ারা কি সেরকম কিছু করেছে?

ভাইয়া আমার মুখের দিকে তাকালো। বুঝলো আমি কী জানতে চাইছি। মৃদু হেসে বললো, 'তোর সঙ্গে আলাদাভাবে আরেক দিন কথা বলবো আবির। কি বলতে চাইছিস বুঝতে পারছি। আজ আমার সময় নেই। নেলী খালা, তুমি বরং ওকে বোলো আমরা কী করছি।'

আমি বললাম, 'তুমি শুধু এটুকু বলো, পাকড়াশী কি তোমাদের কাজের কোনো ক্ষতি করছে?'

'নিশ্চয়ই করছে।' ভাইয়া শক্ত গলায় বললো, 'পাকড়াশীর মতো লোকেরা দেশের শত্রু। চোরাচালান যারা করে, তারা সবাই দেশের শত্রু। আর আমরা তো দেশের জন্যেই কাজ করি।'

নেলী খালা নিরীহ গলায় বললেন, 'পাকড়াশী চোরাচালান করে, এটা তোমার ধারণা। প্রমাণ তো কিছু পাওয়া যায় নি?'

আমি মনে মনে বললাম, 'প্রমাণ আমরাই খুঁজে বের করবো।'

ভাইয়া হেসে বললো, 'তাছাড়া পাকড়াশীদের ধরার জন্যে যেভাবে আর্মি

ক্যাম্প বসানো হয়েছে, এতেও আমাদের কম ক্ষতি হচ্ছে না।'

এরপর ভাইয়া উঠে দাঁড়ালো— 'আজ আর কোনো কথা নয় আবির। তোরা তো আছিস কিছু দিন। পরে কথা বলবো। আশা করি তোর বন্ধুদের আমার ব্যাপারে কিছু বলবি না। বাবুর কথা শুনেছি, খুব শার্প ছেলে। সামান্য একটু আঁচ পেলেই অনেক কিছু বুঝে ফেলবে।'

আমি একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললাম, 'তোমার সঙ্গে এখানে দেখা হওয়ার কথা বলবো না ভাইয়া। তবে তোমার চিঠির কথা ওকে বলেছি। ওই তো বললো তুমি বিপ্লবীদের গোপন দল করছো।'

'তবেই দ্যাখ, কী রকম ছেলে ও।' ভাইয়া হাসলো— 'আমি তো দলের কথা চিঠিতে কিছু লিখি নি।'

'তুমি আমাকে যে-সব বই পড়তে বলেছো, সেগুলো দেখেই ওর অমন ধারণা হয়েছে।'

ভাইয়া নেলী খালাকে বললো, 'কই, আমার জিনিসটা দাও।'

নেলী খালা আলমারি খুলে একটা খাম এনে দিলেন ভাইয়াকে। ভাইয়া সেটা না খুলে পকেটে গুঁজে বললো, 'এবার তাহলে যাই।'

নেলী খালা ম্লান হেসে বললেন, 'সাবধানে থাকিস অপু।'

ভাইয়া আমার চিবুক নেড়ে আদর করে আর কোনো কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। আমি আর নেলী খালা কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলাম। ভাবছিলাম, ভাইয়ার জীবনটা শুধু রোমাঞ্চের নয়, কষ্টেরও। নেলী খালা আস্তে আস্তে বললেন, 'অপুটা এ রকমই। মাঝে মাঝে হুট করে আসে, আবার হুট করে চলে যায়। আজ এসেই বললো, খেতে দাও। সারা দিনে দুটো পাহাড়ী কলা ছাড়া আর কিছু খাই নি।'

আমি বললাম, 'রোজ রাতে এসে খেয়ে গেলেই তো পারে। রাতে কে দেখবে!'

একটু হেসে নেলী খালা বললেন, 'ও কি এখানে থাকে! মাসে এক বার, বড় জোর দু'বার আসে, আবার কখনো দু'মাস পরেও আসে। তোরা আসবি খবর পাঠিয়েছিলাম। তাই এসেছিলো এবার।'

আমি বললাম, 'ভাইয়ার হাতে খামে করে কাকে চিঠি পাঠালে নেলী খালা?'

নেলী খালা মৃদু হেসে বললেন, 'চিঠি নয়, টাকা। আমি প্রতি মাসে ওদের দলের জন্যে কিছু চাঁদা দিই। ওদের টাকা-পয়সার ভীষণ টানাটানি। অপু তো একা নয়, ওর মতো বহু ছেলে আছে যারা ঘরবাড়ি সব ছেড়ে সর্বক্ষণ পার্টির কাজ করছে। ওদের জন্যে তো খরচ আছে।'

নেলী খালার জন্য গভীর ভালোবাসায় বুকটা ভরে গেলো। আমরা ভাইয়ার জন্য যতো না ভাবি, তার চেয়ে বেশি ভাবেন তিনি। বললাম, 'নেলী খালা,

আমার স্কলারশিপের টাকা থেকে ভাইয়াদের জন্য যদি কিছু পাঠাই, তুমি ওদের দিতে পারবে?'

'কেন পারবো না!' মিষ্টি হেসে নেলী খালা বললেন, 'অপু আমাকে বলেছে, পারলে জাহেদের কাছ থেকেও টাকা নিতে।'

আমি উৎসাহের সঙ্গে বললাম, 'বাবুকে যদি বলি, ও নিজেও খুশি হয়ে দেবে।'

'সেটা কি উচিত হবে?' চিন্তিত গলায় নেলী খালা বললেন, 'সব জানাজানি হয়ে যাবে না?'

'ও নিয়ে তুমি ভেবো না। আমি এমনভাবে চাইবো যে বাবু বুঝতে পারলেও কিছু জানতে চাইবে না।'

নেলী খালা কাছে এসে আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'তুই তাড়াতাড়ি বড় হ। তোকে আরও কাজ করতে হবে। বাবা একা না হলে আমিও পুরোপুরি কাজে নেমে পড়তাম। এবার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়। রাত কম হয় নি।'

নেলী খালার ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় মনে হলো, এতক্ষণ বুঝি স্বপ্ন দেখছিলাম, যে স্বপ্নের কথা বাবু, ললি, টুনি— কাউকে বলা যাবে না, যা কিনা একান্তভাবেই আমার।

ভাইয়া বলেছে পাকড়াশীর জন্য তাদের কাজের অসুবিধে হচ্ছে। তার মানে তাহলে এই দাঁড়াচ্ছে যে, আমরা যদি প্রমাণ করতে পারি পাকড়াশী আসলে এক জন স্মাগলার, তাহলে ভাইয়াদেরও উপকার হবে।

নুলিয়াছড়িতে বেড়াতে এসে এতোসব ঘটনার ভেতর জড়িয়ে যাবো, স্বপ্নেও ভাবি নি। নেলী খালা একটু আগে বললেন, বড় হলে নাকি কাজের ভার দেবেন। কাজ তো এরই মধ্যে আমরা শুরু করে দিয়েছি। পাকড়াশীকে ধরতে গিয়ে মেজর জাহেদের মতো অফিসারও হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন। অথচ পাকড়াশী সম্পর্কে আমরা যতোটুকু জানি, তার অর্ধেকও তিনি জানেন কিনা সন্দেহ। ঠিক করলাম, আজ রাতেই একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলবো।

ভাইয়ার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম, 'বাবুর সঙ্গে কথা বলবো না', 'পৃথিবীটা কি অসার',— এইসব। সে-সব কথা মনে পড়াতে হাসি পেলো। মনে হলো ভাইয়ার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর আমার বয়স অনেক বেড়ে গেছে। সাহস আর মনের জোরও বেড়ে গেছে অনেক।

পথ হারিয়ে গুপ্তধনের গুহায়

ফতেদের ঘরের পাশ দিয়ে আসার সময় ওদের অনুসরণ করার প্ল্যানটার কথা মনে পড়লো। ছুটে গিয়ে বাবুকে ঘুম থেকে ডেকে তুললাম। বাবু ঘুমঘুম চোখে উঠে বসলো। অবাক হয়ে বললো, 'কী হয়েছে!'

উত্তেজিত গলায় বললাম, 'আজ রাতে ফতে আর গোবর কোথায় যায় দেখবো।'

বাবু ঘুমজড়ানো গলায় বললো, 'তুমি কি ভেবেছো ওরা আজ রাতেও আলো দেখাবে?'

আমি বললাম, 'ভাববো কেন, কাল গোবর বিড়বিড় করে বলতে বলতে সিঁড়ি দিয়ে যখন নিচে নামছিলো, তখন আমি শুনেছিলাম।'

মনে হলো আমার কথা বাবুর বোধগম্য হয়েছে। ফুটো দিয়ে তাকানোর কথা বলতে ও আপত্তি করলো না।

মেঝের ফুটো দিয়ে আমরা আমাদের চোখ দুটো ওদের ওপর সারাক্ষণ বিঁধিয়ে রাখলাম। গোবর একসময় বললো, 'এ বাড়ির ছোঁড়াগুলো বাপু সুবিধের নয়। অষ্টপহর কুত্তো একটা নিয়ে যেন পেছনে লেগেই আছে।'

ফতো খেঁকিয়ে উঠে বললো, 'তুইও তো বাপু কম যাস না। এক শ' বার তোকে বলেছি, কুত্তো দেখে কক্ষনো ওরকম করিস নে। গিলে খাবে নাকি?'

নিজের রোগা লিকপিকে শরীরটাকে ভালো করে দেখে গোবর বললো, 'গিলে খেতে কতক্ষণ! তোর মতো বপু থাকলে না হয় কথা ছিলো।'

ফতে ধমক দিয়ে বললো, 'ম্যালা ফ্যাচাফ্যাচ করিস নে গোবরা।'

এরপর ফতে কালো ব্যাগটা খুলে একটা চ্যাপটা মদের বোতল বের করলো। ছিপি খুলে ঢকঢক করে খানিকটা গলায় ঢেলে আবার ছিপি বন্ধ করে ওটা ব্যাগের ভেতর রেখে দিলো। আড়চোখে করুণ মুখে গোবর ওটা এক বার দেখলো। তারপর বললো, 'যাবার তো সময় হয়ে এলো, যাবি নে?'

কব্জি উল্টে হাতঘড়িটা এক বার দেখলো ফতে। বললো, 'যেতে হয়

তাহলে।' ব্যাগ থেকে লম্বা একটা টর্চ বের করে কয়েক বার জ্বালিয়ে দেখে বললো, 'আন্নাকালীর মন্দিরে ক' বার আলো জ্বলে দেখিস। গুনে গুনে ঠিক ততোবার জ্বালাবি।'

গোবর একটু বিরক্ত হয়ে বললো, 'হয়েছে, আর জ্ঞান দিতে এসো না বাপু! এই করে চুল পাকিয়ে ফেললাম। নাও, সিন্দুকটা ধরো। যা ভারি! কাল একা সরাতে গিয়ে আমার প্রাণ-পাখিটা আরেকটু হলে বেরিয়ে যেতো।'

আমি আর বাবু ফুটো দিয়ে পরিষ্কার দেখতে পেলাম দেয়ালের দিক থেকে ওরা সিন্দুকটা সরিয়ে আনলো। ফতে বললো, 'ঠিক আছে, যাচ্ছি। এখন আর বন্ধ করে কাজ নেই। ঘরে তো আর কেউ আসছে না।

ফতে দেয়ালের দিকে এগিয়ে গেলো। সিন্দুকের আড়ালে সম্ভবত কোনো দরজা রয়েছে। দরজাটা দেখা গেলো না। ফতে চলে যাওয়ার পর কালো ব্যাগ খুলে গোবর আরেকটা লম্বা টর্চ বের করলো। তারপর এদিক-ওদিক তাকিয়ে মদের বোতলটা বের করে কয়েক ঢোক গিলে ফেললো। পাশের টেবিল থেকে পানির গ্লাসটা এনে খানিকটা পানি বোতলে ঢেলে ছিপি বন্ধ করে আগের মতো রেখে দিলো। তারপর আপন মনে 'যাই, ছাদের ঠাণ্ডা বাতাসে নেশাটা একটু ধরবে।'—এই বলে গোবর টর্চ হাতে ঘর থেকে বের হয়ে গেলো।

সিঁড়িতে ওর পায়ের শব্দ শুনে আমি আর বাবু দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। উঁকি মেরে দেখি, স্ক্যাটরার ভয়ে একেবারে সিঁটিয়ে গিয়ে পা টিপেটিপে গোবর দোতালার ছাদে উঠে যাচ্ছে। একটু পরে আমরা দু'জন একছুটে গোবরের ঘরে এসে ঢুকলাম।

ভেবেছিলাম সিন্দুকের আড়ালে বুঝি কোনো দরজা আছে। কাছে এসে দেখলাম দরজা নয়, একটা সুড়ঙ্গের মতো— নিচে নেমে গেছে। কয়েক ধাপ সিঁড়িও আছে। ভেতরটা একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার। বাবু আমার দিকে তাকালো একবার। আমি বললাম, 'একটা দেয়াশলাই হলে ভালো হতো।'

'দাঁড়াও, আমার ছোট টর্চটা নিয়ে আসি।' এই বলে বাবু ছুটে গিয়ে এক মিনিটের মধ্যে একটা খেলনার মতো ছোট্ট টর্চ নিয়ে হাজির হলো। আলো জ্বালিয়ে দেখালো। আলো কম হলেও পথ দেখা যাবে।

আমি টর্চটা হাতে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে পড়লাম। বাবু আমার পেছন পেছন এলো। সিঁড়ির কয়েক ধাপ নিচে একটা ঘরের মতো। দু'দিকে দুটো পথ রয়েছে। একটা সমুদ্রের দিকে, আরেকটা পাহাড়ের দিকে। ফতের কথা মনে পড়লো। ও গোবরকে পাহাড়ের আলোর দিকে লক্ষ্য রাখতে বলেছে। তার মানে পাহাড়ে অন্য কেউ আলো দেখাবে। যে-পথ সমুদ্রের দিকে গেছে আমরা সে-পথ ধরে এগুলাম।

পথ মানে সুড়ঙ্গ। একটা স্যাঁতসেঁতে ভাব, ভ্যাপসা গন্ধ। উত্তেজনায় বুকের

ভেতরটা ঢিবঢিব করছিলো। ললি টুনির কথা মনে পড়লো। কাল যদি ওরা শোনে আমরা ওদের ফেলে এসব কাণ্ড করেছি, তাহলে মহা হৈচৈ বাধাবে। ওদের বুঝিয়ে বলতে হবে। দরকার হলে টুনিকে না হয় একটা ভয়ের কথা বলে দেবো।

বেশ কিছু দূর যাওয়ার পর মুখে ঠাণ্ডা বাতাস এসে লাগলো। আমি টর্চ নিভিয়ে ফেললাম। একটা বাঁক পেরুতেই সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ শুনলাম। অন্ধকার ফিকে হয়ে এলো। একটু পরেই সুড়ঙ্গের মুখে সমুদ্র চোখে পড়লো। চাঁদের ম্লান আলোয় দেখলাম সমুদ্রের তীর থেকে বেশ দূরে মস্ত বড়ো একটা কালো নৌকো।

বাইরে গিয়ে সামনে তাকিয়ে দেখি একেবারে সমুদ্রের তীরে এসে গেছি। অনেক ওপরে বিশাল বাড়িটা সারা শরীরে অন্ধকার মেখে পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে আছে। গাটা ছমছম করে উঠলো। কিন্তু ফতে কোথায়? আশেপাশে তাকিয়ে ওকে দেখতে পেলাম না। বাবু হঠাৎ চাপা গলায় বললো, 'আবির দেখে যাও।'

আমি এগিয়ে গেলাম। বাবু আঙুল তুলে বললো, 'ওই দেখ! আরেকটা নৌকো।'

এদিকটায় খালের মতো একটা পানির স্রোত এসে সমুদ্রে মিশেছে। আমাদের সেই সোনাবালি নদীও হতে পারে। নদীতে নয়, তীরের বালির ওপর একটা ছোট্ট স্পীড বোটের মতো, চাঁদের ফ্যাকাশে আলোতেও চকচক করছিলো। আমি বললাম, 'ফতে তাহলে এখনো আসে নি।'

আমার কথা শেষ না হতেই ফতের গলা শুনলাম। আরেক জন লোকের সঙ্গে বকবক করতে করতে এদিকেই আসছে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা খোলা জায়গা ছেড়ে পাহাড়ের দিকে চলে গেলাম।

ফতে বলছিলো, 'কোন এক ব্যাটা এসেছে— রবারের চাষ করার নামে গোয়েন্দাগিরি করছে। কালও মাল বেশি সরাতে পারি নি। এদিকে রোজই তো শুধু জমছে। বড়ো কত্তা ক্ষেপে গেছে। বলেছে আজ যদি কিছু হয়, তাহলে আমাদের কারো মুখ দর্শন করবেন না। গোবরাকে তো বলেছেন, তুই যখন কুত্তো দেখে ভয় পাস, তখন তোকে ডালকুত্তো দিয়ে খাওয়াবো। সেই থেকে গোবরা খচে আছে।'

ফতের সঙ্গী লোকটা বপুর দিক থেকে ফতেকেও ছাড়িয়ে গেছে। তবে ফতের মতো চর্বি জমা নয়, রীতিমতো মাসলঅলা পেটা শরীর। একমুখ কালো দাড়ি— অনেকটা পাইরেটদের মতো। যেন কিছু সন্দেহ করছে, ঠিক এভাবে চারপাশে এক বার তাকিয়ে দেখে বাজখাঁই গলায় বললো, 'আমার যেন মনে হলো ফতে, কিছু একটা যেন সরে গেলো। যেন মানুষের মতো। যেন—' শুনে আমাদের সারা শরীর হিম হয়ে গেলো।

ফতে ধমক দিয়ে বললো, 'মানুষ দেখার আর জায়গা পেলি নে। কোথায় কি শেয়াল না ভাম দেখেছিস। তুই অযথা ভাবছিস।'

ছক্কা নামধারী ফতের সঙ্গীটা খুঁতখুঁত করতে লাগলো। এক বার আমাদের দিকেও মাথা ঘুরিয়ে তাকালো। আমরা দু'জন একেবারে পাহাড়ের গায়ে লেপ্টে আছি। দেখতে পেয়েছে বলে মনে হলো না। হাঁটতে হাঁটতে আবার বললো, 'অমন করছিস কেন ছক্কা! তোদের এক শ' বার বলি কাজের সময় বেশি মাল টানিসনে! কেমন, নেশা ধরেছে তো!'

ছক্কা বিড়বিড় করে কী যেন বললো, শুনতে পেলাম না। এরপর ফতে একটু চুপ থেকে বেশ জোরেই বললো, 'ছক্কা, তেলের টিন দুটো এনেছিস?'

ছক্কা বললো, 'কোথায় আনলাম! তুই কি আনতে বলেছিলি নাকি?'

ফতে তখন একটু রেগে গিয়ে বললো, 'যা, এক্ষুনি গিয়ে নিয়ে আয়। আমি এদিকটা দেখছি।'

ছক্কা তখন পেছন ফিরে আমাদের পাশ দিয়ে হনহন করে হেঁটে সুড়ঙ্গের ভেতর ঢুকে গেলো। আর ফতে বড়ো কালো নৌকোর দিকে কয়েক বার টর্চের আলো ফেললো। নৌকোর ভেতর থেকে একটু পরে কাল রাতের মতো আলো জ্বলে উঠলো, আবার নিভে গেলো। আমরা অবাক হয়ে ফতে আর কালো নৌকোর সংকেত দেখছিলাম। ঠিক এমন সময় আমার একটা হাত কে যেন সাঁড়াশির মতো চেপে ধরলো। চমকে উঠে এক ঝটকা মেরে পেছনে তাকিয়ে দেখি ছক্কা— সব কটা দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসছে। যেভাবে চেপে ধরেছিলো, ঠিক সেভাবেই ধরে রইলো। বাবুর অবস্থা ঠিক আমার মতো। বাবু প্রাণপণে হাত ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করলো। কিছুই হলো না, বরং ছক্কার দাঁতগুলো আরো বেশি দেখা গেলো।

'ওসব চেষ্টা ছক্কার কাছে করে লাভ নেই চান্দু। বাড়াবাড়ি করলে হাত ভেঙে যেতে পারে। হয়তো আমিও ভুল করে একটু মোচড় দিতে পারি।' খুব শান্ত গলায় কথাগুলো বললো ছক্কা। তারপর গলা চড়িয়ে ফতেকে ডাকলো— 'আজও দুটো পাখি ধরেছি ফতে, তবে রাম পাখি নয়, চড়ুই পাখি।'

আসলে ছক্কার কাছে আমরা চড়ুই পাখির মতোই। অমন লোহার মতো শরীর আমি টেলিভিশনের কোনো ছবিতেও দেখি নি। ফতে একগাল হেসে বললো, 'ধরে রাখ। চড়ুই পাখি আবার বেশি ছটফট করে।'

ছক্কা আমাদের দু'জনকে প্রায় শূন্যে দুলিয়ে ফতের কাছে নিয়ে গেলো। ফিকে অন্ধকারে ফতে প্রথমে আমাদের চেহারা দেখে নি— 'রাবার মাস্টার দেখি ক্ষুদে গোয়েন্দা লাগিয়েছে। বল ছোঁড়া এখানে কি করে এলি!' এই বলে এগিয়ে এসে বাবুর থুতনিটা তুলে ধরে ফতে যেন ধাক্কা খেলো— 'এ কি, তোমরা!' তারপর কর্কশ গলায় ধমক দিয়ে বললো, 'তোমরা এখানে এলে কীভাবে?'

বাবু রেগে গিয়ে বললো, 'আমাদের খবরদারী করতে হবে না। ভালো চাও তো এক্ষুনি ছেড়ে দাও, নইলে সব্বাইকে পুলিশে দেবো।'

খিকখিক করে ফতে বিচ্ছিরি রকম হেসে বললো, 'ও বাবা, তেজ কতো! রোসো বাছা, গোয়েন্দাগিরির মজা দেখাচ্ছি। কান দুটো যদি মাথার সঙ্গে লাগানো দেখতে চাও, এই বেলায় ভালোয় ভালোয় বলে ফেল বাপু, তোমরা কোন পথে এখানে এসেছো?'

বাবু চুপ করে রইলো। ফতে ওর কান ধরার জন্যে হাত বাড়ালো। আমি বললাম, 'ওর কান ধরতে হবে না। আমি বলছি। তুমি যে-পথে এসেছো, আমরাও সে-পথে এসেছি।'

'বটে বটে! এই তো দিব্যি কথা বেরুচ্ছে। তা বাপু তোমার বন্ধুটি গোঁয়ার কম নয়। তুমি বেশ বুদ্ধিমান। তাহলে বাছা এবার তুমিই বলো দিকি নি, আমার ঘরে কেন ঢুকেছিলে? আর আমি যে এখানে, সেটাই-বা জানলে কী করে? তাছাড়া অন্ধকারে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে ছিলে কেন?'

একসঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন শুনে আমি একটু ঘাবড়ে গেলাম। তারপর ঢোক গিলে বললাম, 'বারে, তোমাকে ডাকার জন্যে একটা লোক এলো যে! দরজার ঘন্টা শুনে আমরা নিচে এলাম। এক জন লোক বললো, এখানে মিস্টার ফতেউল্লা বলে একজন গেস্ট থাকেন না? ওঁকে ডেকে দিন। আমরা তখন তোমার ঘরে এসে নক করলাম। দেখি সাড়াশব্দ নেই। তারপর দরজা ধাক্কা দিতে খুলে গেলো। দেখি তুমি ঘরে নেই। তারপর শ্রী গোবর্ধনের ঘরে গেলাম। সেখানেও কেউ নেই। আমি তো ভয় পেয়ে গেলাম, যদি বিপদ-টিপদ কিছু হয়! তারপর আবার তোমার ঘরে এসে ভালো করে খুঁজলাম! তখনই এই পথটা চোখে পড়লো। ভাবলাম হয়তো এ-পথেই কোথাও গেছো। তাই খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসেছি। এসে যখন তোমাকে ডাকতে যাবো তখনই তো ছক্কা এসে ধরলো।'

কথাগুলো এতো সুন্দরভাবে গুছিয়ে বললাম যে, বলার পর আমি নিজেই অবাক হয়ে গেলাম। ফতেও দেখলাম একটু চিন্তায় পড়ে গেছে। বললো, 'যে লোকটা ডাকতে এসেছিলো, সে দেখতে কেমন?'

আমার হঠাৎ বুড়ো মুৎসুদ্দির কথা মনে পড়লো। অবিকল ওঁর চেহারার বর্ণনা দিয়ে বললাম, 'কানেও কম শোনেন।' শুনে ফতে আরো চিন্তিত হয়ে পড়লো। বিড়বিড় করে বললো, 'মনে হচ্ছে বুড়ো মুৎসুদ্দি এসেছিলো। তবে কি আমাদের কথায় বুড়ো রাজি হয়েছে! আমার তো কিছুই মাথায় ঢুকছে না।' কিছুক্ষণ চুপ থেকে কী যেন ভাবলো ফতে। তারপর বললো, 'দেখ বাছারা, আমি মানতে পারি তোমরা কোনো পাপ মন নিয়ে আমাদের পেছনে লাগো নি। কিন্তু মনে পাপ জাগতে কতোক্ষণ। বিশেষ করে তোমরা আমাদের অনেক কথাই শুনে ফেলেছো। আমাদের ভালোর জন্যেই তোমাদের আটকে রাখা উচিত। বড়ো কত্তা

যদি ঝামেলা বাড়াতে না চান, তাহলে হয়তো মেরেও ফেলতে পারেন। তবে সে দায় বাপু আমি নিচ্ছি না। তোমাদের নুন খেয়েছি আমি। আমি শুধু তোমাদের দু'জনকে বড়ো কত্তার হাতে তুলে দেবো।'

আমি মন দিয়ে ফতের কথাগুলো শুনলাম। ওষুধে কিছুটা ধরেছে বটে, তবে আরো ধরা উচিত ছিলো। আমি একটু টিপ্পনি কেটে বললাম, 'তা নুন যখন খেয়েছো আর সেটা যখন মনেও রেখেছো, তখন সবচেয়ে পুণ্যের কাজ হবে আমাদের বাড়িতে যেতে দেয়া।'

ফতে একটু বিষণ্ন গলায় বললো, 'ওটি মাপ করতে হবে বাছা। অনেক পাপ করেছি জীবনে। এটুকু পুণ্যে তার কিছুই কাটবে না। বরং এই পুণ্যের লোভ করলে হাতে হাতকড়া পড়তে আর বেশি দেরি হবে না। ছক্কা, তুই গোবরাকে আলো দেখিয়ে আজকের মতো বারণ করে দে। ও দু'টিকে আমার হাতে দে। কী আর করা। আজও মাল গেলো না। বড়ো কত্তা এমনিতে রেগে বাঁখারি হয়ে আছেন। এ দুটোকে দেখিয়ে যদি শান্ত করা যায়, দে দেখি।'

ফতের হাতে আমাদের তুলে দেয়ার জন্য ছক্কা যখন সাঁড়াশির বাঁধনটা হালকা করলো, ঠিক তখনই প্রাণপণ শক্তিতে এক ঝটকা মেরে ছক্কার হাত থেকে বেরিয়ে এলাম। বাবুও ঠিক তাই করলো। হতভম্ব ছক্কার চোখের সামনে দিয়ে আমরা কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সুড়ঙ্গে ঢুকে গেলাম।

বেশি দূর আর নিশ্চিন্তে যাওয়া গেলো না। একটু পরেই পেছনে ভারি ভারি পায়ের শব্দ শুনলাম। বুঝলাম ছক্কা আর ফতে দু'জনই ছুটে আসছে। ওদের কথাও শুনলাম। ছক্কা বলছে, 'এক্ষুনি ধরে ফেলবো ওস্তাদ। এটুকু পুঁচকে ছোঁড়া আমার সঙ্গে মামদোবাজি করবে? এ জন্মে আর হবার নয়।'

ফতে ধমক দিয়ে বললো, 'ম্যালা বকিস নে ছক্কা। ও দুটোকে না পেলে তোকে আজ শূলে চড়ানো হবে।'

পেছন থেকে ফতে টর্চের আলো ফেলছিলো। তাতেই আমরা পথ দেখে ছুটছিলাম। মাটি এবড়োথেবড়ো বলে বেশ জোরে দৌড়ানোও যায় না। বাবু একবার হোঁচট খেয়ে পড়েও গেলো। ওকে টেনে তুলে আবার প্রাণপণে ছুটতে লাগলাম।

বেশ কিছুক্ষণ পর মনে হলো ফতে আর ছক্কাকে একটু পেছনেই ফেলে এসেছি। এবার এতো জোরে না ছুটলেও চলবে। তাছাড়া ওদের টর্চের আলোও দেখা যাচ্ছিলো না। বাবু ওর ছোট টর্চটা বের করে বোতাম টিপলো। আর সঙ্গে সঙ্গে আমরা থমকে দাঁড়ালাম।

আমরা সুড়ঙ্গের ভেতরই দাঁড়িয়েছিলাম। কিন্তু এদিকে সুড়ঙ্গটা সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো। আগের চেয়ে অনেক চওড়া। বাবু হতভম্ব হয়ে আমার দিকে তাকালো। আমি আস্তে আস্তে বললাম, 'ওপরে ওঠার পথ অনেক আগেই পেছন ফেলে

এসেছি। দৌড়ে আসছিলাম বলে সময়টা ঠিক বুঝতে পারি নি। আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছি।'

বাবু বললো, 'এখন কী করবে? ফিরে যাবে?' আমি বললাম, 'পেছন গিয়ে লাভ নেই। ফতে আর ছক্কা নিশ্চয়ই এতো সহজে ছেড়ে দেবে না। চলো সামনে এগুই। মনে হচ্ছে সামনে একটা বের হবার পথ পাবো।'

বাবু কোনো কথা না বলে এগিয়ে চললো। আমি কাছে এসে ওর একটা হাত ধরলাম, 'তুমি ভয় পেয়েছো বাবু? ভয় পেলে আর কোনো দিন এখান থেকে বেরুতে পারবো না।'

বাবু আমার হাতটা চেপে ধরে বললো, 'না, ভয় পাই নি।'

একটু পরেই আমরা একটা বড়ো গুহার মতো ঘরে এসে পড়লাম। বাবু চারপাশে টর্চের আলো ফেললো। আমার একটা হাত বাবুর হাতে ধরা ছিলো। সে আমার হাতটা আরো চেপে ধরলো। আমি চমকে উঠে চারপাশে তাকালাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার মুখটা হাঁ হয়ে গেলো।

গুহার মতো যে-ঘরটাতে আমরা হতবাক হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, ওটাকে কী বলবো! মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত সাজানো শুধু রাশি রাশি টাকা আর সোনার তাল। সব এক শ' টাকার নোট আর ছোট ইটের মতো সোনার টুকরো। সিঁড়ির মতো চারপাশে ধাপে ধাপে উঠে গেছে। বাবুর ছোট্ট টর্চের ম্লান আলোতেও সেই সমস্ত সোনা রীতিমতো ঝলসে উঠলো। আমি কেন, আমাদের বংশের কেউ কোনো দিন একসঙ্গে এতো টাকা আর সোনা দেখে নি। আমার মনে হলো, কেউ যদি চোখ বেঁধে আমাকে এখানে নামিয়ে দিতো, তাহলে আমি বলতাম, 'এটা নিশ্চয় স্টেট ব্যাঙ্কের স্ট্রংরুম!'

বাবু অনেকক্ষণ পর ফিসফিস করে বললো, 'এটাই তাহলে সোনার খনি!'

আমি শুধু বললাম, 'সোনার খনি নয়, গুপ্তধন। টাকাগুলো মনে হচ্ছে আসল নয়।'

মুহূর্তের মধ্যে আমরা ভুলে গেলাম ছক্কা আর ফতে এখনো আমাদের তাড়া করে ফিরছে; খুব শিগগিরই ওরা এখানে এসে যাবে। বিস্ময়ে আর উত্তেজনায় আমরা রীতিমতো কাঁপছিলাম।

কতোক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে ছিলাম মনে নেই। ছক্কা আর ফতের গলা শুনে আমাদের চমক ভাঙলো। ফতেকে বলতে শুনলাম, 'কোথায় যে গেলো ছোঁড়া দুটো!' আর ছক্কা বললো, 'মালখানায় একবার দেখলে হয় না ওস্তাদ?'

আমরা আবার হুঁশ ফিরে পেলাম। সামনে শুধু একটাই যাবার পথ। পেছনের পথ ধরে ছক্কা আর ফতে আসছে। ছক্কার সেই সাঁড়াশির মতো হাত আর ফতের ভয়ঙ্কর কথাগুলো মনে পড়লো। দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে আমরা সামনের পথেই ছুটলাম, পেছনে শুধু ছক্কার গলা শুনলাম, 'ওস্তাদ, এদিকে পায়ের শব্দ শুনছি।'

এক গুহা থেকে আরেক গুহায়— এভাবে কয়েকটা গুহা থেকে বেরিয়ে আসার পর অবশেষে আমাদের থামতে হলো। আগে খেয়াল না করেই সেই গুহাটার ভিতরে ঢুকে পড়েছিলাম। এ ছাড়া অবশ্য অন্য কোনো পথও ছিলো না। ঢুকে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই টের পেলাম এবার আমরা সত্যিই ধরা পড়ে গেছি।

গুহার ভেতর আলো জ্বলছিলো। দশ-বারোটা যাচ্ছেতাই চেহারার লোক সেখানে গোল হয়ে বসে আছে। মাঝখানে এক বিশাল টাকার পাহাড়। সব দশ টাকা আর এক'শ টাকার নোট। লোকগুলো টাকা গুনে ব্যাগে ভরছিলো।

যে-লোকটা আমাদের প্রথম দেখলো, তার চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসার মতো হলো। হাত থেকে টাকার ব্যাগটা খসে পড়লো। এক জন—'তোর কি হলোরে পঁচা! অমন করছিস কেন?'— এই বলে পঁচার দৃষ্টি অনুসরণ করে যেইমাত্র আমাদের দিকে তাকালো, তক্ষুনি তার দশাও ঠিক পঁচার মতো হলো। এরপর সবাই আমাদের দিকে ফিরে তাকালো। আর চোখগুলোকে আলু বানালো।

আমরা দু'জন কিছুই বলতে পারলাম না। চুপচাপ পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। একটু পরে ছক্কা এসে ঢুকলো। চিৎকার করে আমাদের দিকে ছুটে এলো— 'এইবার চান্দু, কোথায় পালাবে?' এতোক্ষণ ঘুঘু দেখিয়েছি, এবার ফাঁদ দেখাবো।' এরপর ছক্কার সাঁড়াশির মতো দুটো হাত আমাদের দু'জনের কবজি চেপে ধরলো। প্রতিবাদ করার এতটুকু শক্তি ছিলো না। আমরা অবশেষে ছক্কার হাতে আত্মসমর্পণ করলাম।

তারপর আমাদের শুধু দেখার পালা। ছক্কা বললো, 'এক জন গিয়ে এক্ষুনি শক্ত দেখে দড়ি নিয়ে আয়। এ দুটোকে কোনো বিশ্বাস নেই। জাত কেউটের ছা!'

ঘরের লোকদের ভেতর পঁচা আমাদের প্রথম দেখেছিলো। ওর উৎসাহটাই দেখলাম সবচেয়ে বেশি। 'আমি আনছি ওস্তাদ'— এই বলে পঁচা চোখের পলকে দু'খানা নাইলনের কর্ড নিয়ে এলো। সেগুলো দেখে ছক্কা সব কটা দাঁত বের করে বললো, 'এবার হাত দু'খানা দেখি বাছাধন!'

বাবু একবার বুঝি দরজার দিকে তাকিয়েছিলো। ছক্কা বললো, 'ইতিউতি তাকিয়ে কোনো লাভ নেই। এবার কোনো গণ্ডগোল বাঁধিয়েছো তো বড়ো কত্তা আসা পর্যন্ত বসে থাকবো না। আমি নিজেই পিটিয়ে দুরমুশ করে দেবো।'

পঁচা এসে আমাদের প্রত্যেকের হাত দু'খানা পেছনে নিয়ে শক্ত করে বেঁধে দিলো। এর পর ছক্কা আমাদের ধাক্কা দিয়ে সামনে ঠেলে দিলো। বাবু হুমড়ি খেয়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে ওর কপাল কেটে দরদর করে রক্ত নেমে এলো। আমি পড়তে পড়তে সামলে নিলাম।'

এতোক্ষণে ফতে কথা বললো, 'ওদের পাশের ঘরে নিয়ে আয় ছক্কা। আর

পঁচা গিয়ে বড়ো কত্তাকে খবর দে!'

ছক্কা আমাদের ঘাড় ধরে শূন্যে ঝুলিয়ে পাশের গুহায় নিয়ে গেলো। ফতে বললো, 'ভেবেছিলাম বাছা তোমাদের জন্যে বড়ো কত্তার কাছে একটু ওকালতি করবো। তা তোমাদেরই বাপু কপাল মন্দ। আমার এই বাতের শরীর নিয়ে বাপের জন্মে কখনো এমনি ভাবে ছুটি নি। নিজের কপাল নিজেই খেলে। আমি কী করবো!'

আমি বললাম, 'নিজের চরকায় তেল দাও।'

বাবু বললো, 'এবার ম্যারাথন রেসের জন্যে তৈরি হওগে। জাহেদ মামা এক্ষুনি এলেন বলে।'

ছক্কা আমাদের মাথায় দুটো গাট্টা মেরে বললো, 'বলি নি ওস্তাদ, জাত কেউটের ছা! কিরকম চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলছে দেখ!'

ছক্কার গাট্টা খেয়ে আমি আর বাবু চোখে হলুদসর্ষে ফুল, নীল তারা—সব একসঙ্গে দেখতে লাগলাম। ফতে বললো, 'থাক এখানে বসে। যাই ওখানে একটা খবর দিয়ে আসি। তোদের বাড়ির কেউ টের পেলো কিনা কে জানে। আর পেলেই বা কি!'

ফতে বেরিয়ে যাওয়ার পর ছক্কা পকেট থেকে চ্যাপটা একটা মদের বোতল বের করে মেঝের ওপর পা ছড়িয়ে বসলো। ঢকঢক করে কয়েক ঢোক গিলে বললো, অনেক দিন নিজের হাতে কাউকে সাবাড় করি নি। হাত দুটো ভারি নিশপিশ করছে। বড়ো কত্তাকে বলে এবারের কাজটা আমি নিজেই করবো।'

পাশের ঘর থেকে একজন ছক্কাকে ডেকে বললো, 'ওস্তাদ, একা পুরো বোতল মেরে দেবে নাকি! আমরা তোমার পেসাদ পাবো বলে কখন থেকে বসে আছি।'

একগাল হেসে ছক্কা উঠে পাশের ঘরে গেলো। বাবু আমার দিকে তাকালো। ওর মুখে রক্তের দাগ। মুছে দিতে যাবো— খেয়াল হলো, আমারও হাত দুটো পেছনে বাঁধা। আমি ফিসফিস করে বললাম, 'তুমি বসে থাকো। আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে।'

বুদ্ধিটা এসেছিলো খোলা চিমনি ঢাকা বাতিটা দেখে। কোনো একটা ছবিতে দেখেছিলাম, এ রকম এক অবস্থায় নায়কটা বাতির আগুনে হাতের বাঁধন পুড়িয়ে ফেলেছিলো।

পাশের গুহায় ওদের জমজমাট আসর বসেছে। আমি চুপি চুপি বাতিটার কাছে গেলাম। একটা প্যাকিং বাক্সের ওপর রাখা ছিলো বাতিটা। বুকটা তখন টিবটিব করছে। আন্দাজের ওপর বাতির আগুনে হাতটা রাখলাম। বাবু একটু হাতটা ডানপাশে সরাতে বললো। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম আলোর অনেক দূরে

আমি হাত রেখেছি। একটু লজ্জাও পেলাম। হাতটা সরিয়ে ফেললাম। আর ততোক্ষণে হাতের ধাক্কা লেগে চিমনিটা কাত হয়ে পড়ে ঝনঝন শব্দ করে ভেঙে গেলো।

'কী হচ্ছে ওখানে'— বলে ছক্কা ছুটে এলো। ভাঙা চিমনি আর আলোর কাছে আমাকে দেখে ব্যাপারটা বুঝতে ওর একটুও অসুবিধে হলো না। মোলায়েম গলায় বললো, 'ছিঃ, অমন কাজ কেউ করে! হাতে ফোস্কা পড়বে যে।' তারপর এগিয়ে এসে মাথায় আরেকটা গাট্টা মেরে আমাকে দেয়ালের দিকে ছুঁড়ে দিলো— 'ফের মামদোবাজি করা হচ্ছে।' এই বলে ছক্কা আলোটা নিয়ে চলে গেলো।

মাথায় হাত না দিয়েও টের পেলাম ওখানে দুটো সুপারি গজিয়েছে। ছক্কার গাট্টা যারা খায় নি, তাদের কখনো বলে বোঝানো যাবে না, কী ভয়ঙ্কর গাট্টা মারতে পারে এই বদমাশটা! ললি টুনির কথা মনে পড়লো। ওরা এখনো কি নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে? ওদের বলে আসা উচিত ছিলো। কোনো রকমে যদি ওরা জানতে পারে, তাহলে এতোক্ষণে সবাই নিশ্চয়ই আমাদের খুঁজতে বেরিয়েছে। জাহেদ মামার লোকদের যারা খুন করেছে, তাদের খুঁজতে খুঁজতে তিনি যদি এমন সময় লোকজন নিয়ে এখানে এসে পড়তেন, তাহলে বেশ হতো।। দেয়ালে মাথা রেখে বসে বসে এমনি সব আজগুবি কথা ভাবছিলাম। এমন সময় পঁচা এলো। আমাদের দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসলো। তারপর পাশের গুহায় গিয়ে বললো, 'বড়ো কত্তা এক্ষুনি আসবেন। তোমরা সব গুছিয়ে নিয়ে বাইরে পাহারার ব্যবস্থা করো।'

এক জন পঁচাকে জিজ্ঞেস করলো, 'মাল কি আজও যাবে না ওস্তাদ! ট্যাক যে গড়ের মাঠ।'

লোকটার কথার ধরন দেখে মনে হলো কলকাত্তাইয়া। পঁচা বললো, 'ও নিয়ে তোরা ভাবিস না। যে দু'খানা হীরের টুকরো পেয়েছি— বড় কত্তা সব পুষিয়ে দেবেন।'

'আমাদের ওপর খেয়াল রেখো ওস্তাদ'— এই বলে ভেতরের লোকগুলো ঢুলতে ঢুলতে একে একে বেরিয়ে গেলো। গুহার ভেতর শুধু রইলো ছক্কা আর পঁচা। বসে বসে মদ খাচ্ছিলো ওরা। দুর্গন্ধে ভরে আছে গুহার ভেতরটা।

শুধু অবাক হবার পালা

আমাদের বোধ হয় একটু ঝিমুনির ভাব এসেছিলো। এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে একটা লোক ভেতরে ঢুকলো। চারপাশে তাকিয়ে ডাকলো, 'পঁচা ওস্তাদ, তুমি কোথায়?'

পঁচা ভেতরে থেকে জবাব দিলো— 'এখানে। ষাঁড়ের মতো চ্যাঁচাচ্ছিস কেন?

লোকট ভেতরে ঢুকলো। পঁচা ওকে ধমক দিয়ে বললো, 'তোদের এক শ' বার বারণ করেছি না আমাকে পঁচা বলে ডাকবি না। বাপ-মা আদর করে বলতো বলে তোরাও আমার মা-বাপ হলি নাকি! আমাকে পঞ্চানন ওস্তাদ বলবি, নইলে মুণ্ডুটা ধড় থেকে আলাদা করে ফুটবল খেলবো।'

লোকটা একটু বিরক্ত হয়ে বললো, 'তা না হয় খেললে। এখন লেকচার থামিয়ে ছোঁড়া দুটোকে নিয়ে খাস কামরায় এসো। বড়ো কত্তা ডাকছেন।'

বড়ো কত্তার কথা শুনে পঁচা মিনমিনে গলায় বললো, 'বড়ো কত্তা ডাকছেন, আগে বলবি তো।'

পঁচা আমাদের ঘাড় ধরে টেনে তুললো। ছক্কা বললো, 'খবদ্দার ছোঁড়া, তোদের মেরেছি বা ধমক দিয়েছি—এসব কথা যদি বড়ো কত্তাকে বলিস, তাহলে মরার সময় টের পাবি আমি কী রকম রসিয়ে রসিয়ে মারতে পারি।'

ছক্কা আর পঁচা আমাদের কয়েকটা গুহার ভেতর দিয়ে ওদের বড়ো কত্তার খাস কামরায় নিয়ে এলো। কিন্তু বড়ো কত্তা কোথায়? এযে দেখি আন্নাকালীর পাহাড়ের সেই নিকুঞ্জ পাকড়াশী! পাশে ফতে বসে আছে। আমাদের দেখে পাকড়াশী লোম ওঠা, উকুন-অলা, বেতো কুকুরের মতো খেঁকিয়ে উঠলো— 'তোদের আস্পদ্দা তো বাছা কম নয়, আমার পেছনে লাগতে আসিস? তোদের জ্যান্ত মাটিতে পুঁতে ফেললেও আমার রাগ যায় না।'

বাবু ভালোমানুষের মতো বললো, 'আপনার প্রশংসায় সবাই পঞ্চমুখ। আপনি এসবের মধ্যে আছেন আমরা জানবো কী করে?'

পাকড়াশী আগের মতো খ্যাঁকখ্যাঁক করে বললো, 'থাক থাক, আর আদিখ্যেতা দেখাতে আসিস নে। সবাই পঞ্চমুখ হোক আর পঞ্চাশ মুখ হোক, তোদের আমি ছাড়ছি নে। তোরা আমাকে পথে বসাবার জো করেছিলি। তোদের সঙ্গে ছুঁড়ি দুটো যে ঘুরতো, সেগুলো কোথায়?'

বাবু কী যেন বলতে যাবে, এমন সময় হঠাৎ ঘেউঘেউ শব্দ শুনে ঘরসুদ্ধো সবাই চমকে উঠলো। বাবু চাপা গলায় বললো, 'স্ক্যাটরা আসছে।'

আমি চিৎকার করে ডাকলাম, 'স্ক্যাটরা।'

সঙ্গে সঙ্গে ঘেউ করে স্ক্যাটরা ভেতরে ঢুকলো। ছুটে এসে আমার গাল চেটে দিলো। হাত বাঁধা বলে আমি আদর করতে পারলাম না। স্ক্যাটরা বুঝতে পেরে পেছনে গিয়ে দাঁত দিয়ে কর্ডটা ছেঁড়ার চেষ্টা করলো। আমরটা না পেরে বাবুর কাছে গেলো। তার পর ছক্কা আর পঁচাকে দেখে মহা চিৎকার জুড়ে দিলো।

পাকড়াশী চেঁচিয়ে বললো, 'এই কুত্তোটা এখানে এলো কী করে!' ওর কথা শেষ না হতেই ললি টুনি ছুটতে ছুটতে এসে ভেতর ঢুকলো। আমাদের এই অবস্থা দেখে ওরা হাঁ করে তাকিয়ে রইলো। স্ক্যাটরা তখন ওদের কাছে ছুটে গেলো।

আমি বললাম, 'তোমরা কী করে এখানে? গোবর্ধন কোথায়?'

টুনি হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, 'গোবর্ধনকে ধরে শেকল আটকে রেখে এসেছি। বাথিনকে পাঠিয়েছি জাহেদ মামার কাছে।'

পাকড়াশী খিকখিক করে হেসে বললো, 'ভালো কাজ করেছিস। কই রে বাথিন, 'টিকটিকিটাকে কী বলেছিস এসে এদের বল।'

ওপাশের পথ দিয়ে বাথিন এসে ভেতরে ঢুকলো। তারপর পাকড়াশী আদর করে ডাকলো, 'গোবর, তুই আবার কোথা গেলি!'

লাজুক মুখে গোবর এসে পাকড়াশীর পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। ললি আর টুনির চোখ দুটো ছানাবড়া হয়ে গেলো। পাকড়াশী বললো, 'অমন করে তাকাস নে বাছা, চোখের মণিটা ঠিকরে বেরিয়ে যাবে।' তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে বললো, 'সব কটাই তাহলে ধরা পড়লো। এবার টিকটিকিটার ব্যবস্থা করে এক্ষুনি আমরা জাহাজ নিয়ে কেটে পড়বো। গোবর, ছুঁড়ি দুটোকেও এগুলোর মতো বেঁধে ফেল।'

গোবর একটা দড়ি হাতে যেইমাত্র ললি টুনির দিকে এগিয়েছে, তখনই স্ক্যাটরা ঘেউ করে ওর দিকে তেড়ে গেলো। গোবর 'ওরে বাপ' বলে এক লাফে পিছিয়ে এসে একেবারে পাকড়াশীর কোলে বসে পড়লো।

পাকড়াশী ওকে কান ধরে টেনে তুললো। রেগে চেঁচিয়ে বললো, 'এখনো তোর কুত্তোর ভয় যায় নি দেখছি। বলেছি না ফের ভয় পেলে তোকে ডাল কুত্তো দিয়ে খাওয়াবো। দাঁড়া, ডাল কুত্তো নয়, আজ তোকে এই কেলে কুত্তো দিয়েই

খাওয়াবো।'

স্ক্যাটরা সমানে ঘেউঘেউ করতে লাগলো। পাকড়াশী বিরক্ত হয়ে বললো, 'কুত্তোটাও যেন সাপের পাঁচ পা দেখেছে। ছক্কা, এটাকেও বেঁধে ফেল।'

এবার স্ক্যাটরা চিৎকার করে ছক্কার দিকে তেড়ে গেলো। ছক্কা হাত দিয়ে বাধা দিতে গেলো। সেই হাতে স্ক্যাটরা গাঁক করে কামড় দিয়ে এক খাবলা মাংস তুলে নিলো। তারপর স্ক্যাটরা প্রচণ্ড গর্জন করে পাকড়াশীর দিকে ছুটে গেলো। স্ক্যাটরার দাঁতে রক্ত, চোয়াল বেয়ে রক্ত পড়ছে। ওকে তখন রীতিমতো ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছিলো।

হাউমাউ করে চেঁচিয়ে পাকড়াশী বললো, 'এতোগুলো তোরা ঘরের মধ্যে—কুত্তোটাকে কেউ আটকাতে পারিস না!'

এমন সময় ফতে কোমর থেকে একটা ছুরি বের করে স্ক্যাটরার দিকে ছুঁড়ে মারলো। আমি সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে ডাকলাম, 'স্ক্যাটরা।'

স্ক্যাটরা যদি সেই মুহূর্তে ফিরে না তাকাতো, তাহলে ছুরিটা ওর চোখে গিয়ে বিঁধতো। তার বদলে মাথার চামড়ায় আঁচড় কেটে ছুরিটা ছিটকে বেরিয়ে গেলো। পাকড়াশীকে ফেলে স্ক্যাটরা ফতের টুটি কামড়ে ধরলো। ফতে তার বিশাল শরীর নিয়ে মেঝেতে দড়াম করে আছড়ে পড়লো।

এই ফাঁকে দুটো লোক এসে চোখের পলকে ললি টুনির হাত দুটো পিছমোড়া করে বেঁধে ফেললো। দু'জন গিয়ে জাপটে ধরলো স্ক্যাটরাকে। মনে হলো বাঁচবার আর বুঝি কোনো আশা নেই। বাবুর দিকে তাকালাম। অসহায়ভাবে ও মুখ ঘুরিয়ে নিলো।

পাকড়াশী দেওয়ালের সাথে লাগানো আলমারিটার কাছ ছুটে গেলো। এক ঝটকায় আলমারি খুলে ভেতর থেকে ভেতর থেকে কালো ছোট্ট একটা পিস্তল বের করে আনলো।

'আগে কুত্তোটাকে শেষ করবো'— এই বলে স্ক্যাটরার দিকে তাক করে ট্রিগার টিপতে যাবে, ঠিক তখনই দরজার কাছে যেন বোমা পড়লো—।

'হ্যান্ডস আপ এভরি বডি। সবাই মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়াও।'

পাকড়াশীর হাত থেকে পিস্তলটা খসে পড়ে গেলো। টুনি চিৎকার করে শুধু বললো, 'জাহেদ মামা!'

জাহেদ মামার সঙ্গে আরো কয়েক জন আর্মি অফিসার, পুরো ইউনিফর্ম পরা, প্রত্যেকের হাতে পিস্তল আর পেছনে দুটো স্টেনগানের নল চকচক করছে। দু'জন স্টেনগানধারী সৈন্য ভেতরে এসে পজিশন নিলো। স্ক্যাটরা ছুটে গিয়ে জাহেদ মামার গাল-টাল চেটে একাকার করে দিলো। এক জন অফিসার এগিয়ে এসে পাকড়াশী, ফতে, গোবর, ছক্কা, পঁচা আর বাথিনকে হাতকড়া পরিয়ে দিলেন। জাহেদ মামা আমাদের হাতের বাঁধন কেটে দিতে দিতে বললেন, 'তোমাদের এরা

বেশি মারধোর করে নি তো?'

আমি বললাম, 'বেশ কিছু করে নি। ছক্কা শুধু মাথায় গাট্টা মেরে কটা সুপুরি বানিয়ে দিয়েছে।'

হাতকড়া পরা ছক্কা কটমট করে আমার দিকে তাকালো। টুনি ওকে ভেংচি কাটলো। ললি শুধু মুখ টিপে হাসলো।

বাবু বললো, 'আরও তো ছিলো জাহেদ মামা। ওরা কোথায়?'

জাহেদ মামা একটা রুমাল বের করে বাবুর কপালের রক্তটা মুছে দিতে দিতে বললেন, 'সব কটা ধরা পড়েছে। তোমরা সাংঘাতিক একটা কিছু করে ফেলেছো!'

এমন সময় আমরা নেলী খালার গলা শুনলাম।— 'আমার ছেলেমেয়েরা কোথায়?' বলতে বলতে নেলী খালা এসে ভেতরে ঢুকলেন। স্ক্যাটরা যথারীতি ছুটে গিয়ে তাঁর গলা চেটে দিলো।

নেলী খালা এক বার আমাকে, এক বার বাবুকে আর এক বার ললি টুনিকে চুমো খেতে খেতে বললেন, 'আমাকে না জানিয়ে এতো সব করা হয়েছে! আমি শুধু ভেবে ভেবে মরি। আমি বুঝি তোদের কেউ নই!' বলতে বলতে নেলী খালা ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন।

জাহেদ মামা এগিয়ে নেলী খালার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'নেলী, ওদের নিয়ে ঘরে ফিরে যাও। আমি ঘন্টাখানেকের মধ্যে ফিরে আসছি।'

স্ক্যাটরাকে জড়িয়ে ধরে নেলী খালা বললেন, 'ইশ, তোর মাথা কেটে গেছে দেখছি! কী করে এমন হলো?'

টুনি বললো, 'ওই কালোদেড়ে ছক্কা শয়তানটা স্ক্যাটরাকে ছুরি মেরেছিলো।'

নেলী খালা এবার পাকড়াশীকে ধরলেন— 'আপনার পেটে পেটে যে এতো বিদ্যে, তা তো জানতাম না নিকুঞ্জ বাবু। আমার অতিথি দু'জনও দেখি বহাল তবিয়তে আছে।'

গোবর নালিশ জানাবার মতো করে করুণ গলায় বললো, 'আপনার কুত্তোটা ফতের গলা কামড়ে দিয়েছে দিদি।'

নেলী খালা এক বার ফতের দিকে তাকালেন। ওর গলা রক্তে ভেসে যাচ্ছিলো। 'বেশ করেছে।'— বলে নেলী খালা আমাদের নিয়ে বেরিয়ে এলেন।

আমরা যে-পথ দিয়ে এসেছিলাম, নেলী খালা তার উল্টো দিকের পথে গেলেন। টুনি বললো, 'এপথে তোমরা এলে কী করে?'

নেলী খালা অবাক হয়ে বললেন, 'কেন, আমরা সবাই এ পথে এসেছি। ওদের একটা লোককে দু'ঘা বসাতেই সব দেখিয়ে দিলো। বাইরে থেকে অবশ্য আমরা স্ক্যাটরার গলার শব্দ শুনেছিলাম।'

স্ক্যাটরা ওর নাম শুনে আরেক দফা নেলী খালাকে চেটে দিলো।

বাবু বললো, 'আমরা ফতের ঘরের ভেতর দিয়ে এখানে এসেছি। আপনি ওর ঘরের নিচে সুড়ঙ্গ দেখেন নি নেলী খালা?'

নেলী খালা বললেন, 'তাড়াহুড়োয় চোরাপথ একটা দেখেছিলাম বটে। ভেবেছি আণ্ডারগ্রাউণ্ড সেলারে যাবার পথ বুঝি ওটা। আমি তো তোমাদের না দেখে জীপ নিয়ে সোজা জাহাজের ওখানে গেলাম। ততক্ষণে অবশ্য জাহেদরা বেশ কটাকে ধরে ফেলেছে।'

আমরা সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলাম। ভেতরটা সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো। ওদিকের মতো এবড়োথেবড়ো নয়। বাবুর মিটমিটে টর্চের আলোতে চারপাশে দেখছিলাম। বাবু বললো, 'নেলী খালা সোনার খনি দেখেন নি?'

নেলী খালা চমকে উঠে বললেন, 'কোথায় সোনার খনি!'

টুনি অবাক হয়ে বললো, 'তুমি কোথায় দেখলে?'

আমি বললাম, 'সোনার খনি নয়। চোরাই সোনা। ওরা পাচার করার জন্যে তাল তাল সোনা একটা গুহার ভেতর স্তূপ করে রেখেছে। জাহেদ মামারা নিশ্চয়ই উদ্ধার করবেন।'

বাবু বললো, 'কিসের টাকা?'

আমি বললাম, 'টাকার পাহাড়। সব দশ টাকা আর এক শ' টাকার নোট। পাকড়াশীর লোকেরা গুনে গুনে বস্তায় ভরছিলো।'

ললি বললো, 'তোমরা সত্যিই তাহলে গুপ্তধন আবিষ্কার করেছো!'

আমি বললাম, 'বলতে পারো। তবে এ গুপ্তধন হার্মাদদের নয়, ওদের মতো আরেক পাজি নিকুঞ্জ পাকড়াশীর।'

আমরা এর পর একটা সরু সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলাম। ভ্যাপসা একটা গন্ধ নাকে আসছিলো। অনেক সিঁড়ি। নেলী খালা বলেলেন 'তোমরা তাহলে গুপ্তধন খুঁজতে এখানে এসেছিলে?'

বাবু বললো, 'প্রথমে গুপ্তধন খোঁজার প্ল্যান ছিলো। পরে লরেল হার্ডির আলোর সংকেত দেখে অন্য কিছু ভেবেছিলাম। তদন্ত করতে গিয়েই এতো কিছু।'

টুনি বললো, 'ওই পাজি দুটোকে লরেল হার্ডি বলো না। লরেল হার্ডি অনেক ভালো। গোবরটা কী শয়তান! তোমাদের ঘরে না দেখে আমরা ওকে শেকল আটকে রেখে এসেছিলাম। দিব্যি বেরিয়ে এসেছে।'

বাবু টুনিকে বললো, 'তোমরা স্ক্যাটরাকে না আনলে এতোক্ষণে আমাদের প্রাণ-পাখি খাঁচা ছেড়ে বেরিয়ে যেতো।'

টুনি বললো, 'ছিঃ, কী নোংরা কথা!'

নেলী খালা বললেন, 'আমার বাপু মাথায় কিছু ঢুকছে না। ললি টুনি কি তোমাদের সঙ্গে আসে নি?'

টুনি বললো, 'দেখ না নেলী খালা। আমাদের না বলে দিব্যি এ্যাডভেঞ্চার করতে বেরিয়েছেন। আমাকে আর ললিপাকে না বলে আসার মজাটা টের পেয়েছো তো?'

আমি বললাম, 'মজা আর বলতে! এখনো মাথায় দুটো সুপুরি টনটন করছে।'

বাবু ফিক করে হেসে বললো, 'আমার একটা।'

আমি বললাম, 'তাই বলে তোমার মতো আমার কপাল ফাটে নি।'

অবশেষে আমরা বাইরে এলাম। অবাক হয়ে চারপাশে তাকালাম। এ যে দেখি সেই ছাতিম গাছ আর আন্নাকালীর মন্দির! মন্দিরের প্রতিমা রাখার বেদিটার নিচে যে একরম একটা সুড়ঙ্গ আছে, আমরা কেউ ভাবতেও পারি নি।

অল্প দূরে নেলী খালার জীপটা দাঁড়িয়ে ছিলো। ড্রাইভিং সীটে বসে স্টার্ট দিতে দিতে নেলী খালা বললেন, 'এখনো আমার মাথায় ঢুকছে না। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমি শানুপাকে স্বপ্নে দেখছিলাম। আচারগুলো রোদে দিচ্ছি না বলে তিনি আমাকে বকছিলেন। তখনই বাইরে দরজা খোলার শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেলো। উঠে দেখি ফতে গোবর্ধন কেউ ঘরে নেই। ওপরে গিয়ে দেখি তোমরা চার মূর্তি নেই। স্ক্যাটরাকে ডাকলাম। ওটাও নেই। আব্বুকে শুধু বললাম, 'আমি জাহেদের কাছে যাচ্ছি। আবির, বাবু, ললি, টুনিকে বোধ হয় ফতে গোবরা কিডন্যাপ করে নিয়ে গেছে।'

জাহেদ মামার বাংলোর সামনে বনমালী দাড়িয়ে ছিলো। বাবু বললো, 'নেলী খালা, জাহেদ মামার ফ্রীজ থেকে একটু বরফ নিন।'

টুনি বললো, 'বরফ কী করবে, খাবে?'

বাবু বললো, 'অতো সখ নেই, মাথার সুপুরিগুলোর জন্যে।'

নেলী খালা জীপ থামাতেই বনমালী ছুটে এলো। বললো, 'সবকিছু ঠিক আছে তো বিবিজি?'

নেলী খালা এতোক্ষণে হাসলেন— 'সব ঠিক আছে। তুমি আমাদের একটু বরফ এনে দাও।'

বনমালী ছুটে গিয়ে ফ্লাস্কে করে বরফ এনে দিলো। নেলী খালা বললেন 'জাহেদের ফিরতে একটু দেরি হবে। আর কোনো ভয় নেই বনমালী।'

বনমালী সবগুলো দাঁত বের করে বললো, 'কী যে বলেন বিবিজি! বনমালী ভয় পাবার বান্দা নয়।'

গাড়িতে যেতে যেতে বাবু নেলী খালার প্রশ্নের জবাব দিতে লাগলো। অনেক রাত হয়েছে। পাহাড়ের ওপর কালো আকাশে শুধু তারার মিছিল। গুহার ভেতরের গুমোট বাতাসের রেশটুকু চলে গেলো। ললিকে আস্তে আস্তে বললাম,

'বুকের ব্যথাটা এখনো আছে ললি?'

ললি মাথা নেড়ে বললো, 'এখন নেই।'

ঘরে নানু আমাদের জন্যে স্টাডিতে পায়চারি করছিলেন, আমাদের দেখে তিনি রীতিমতো অবাক হলেন। নেলী খালাকে ধমক দিতে গিয়ে হেসে ফেললেন— 'আমার চার কাপ চা খাওয়া হয়েছে। তোমরা আমার ঘুম নষ্ট না করে ছাড়বে না দেখছি!'

নানুকে বললাম, 'আজ আর ঘুম হবে না। বসুন, আপনাকে সব খুলে বলছি। জাহেদ মামা এক্ষুনি এসে পড়বেন।'

নানু বললেন, 'মারামারি হয় নি তো? বাবুর কপাল কাটলো কী করে?'

বাবু বললো, 'অনেক কিছু হতে পারতো। তবে সে রকম কিছুই হয় নি।'

নেলী খালা ফ্লাস্ক থেকে আমাদের বরফ বের করে দিলেন। মাথার সুপুরিতে বরফ ঘষতে ঘষতে নানুকে সব খুলে বললাম। ততোক্ষণে জাহেদ মামাও এসে গিয়েছিলেন। তিনিও শুনলেন। কিছু কিছু জেরাও করলেন— 'পাকড়াশীকে তোমরা সন্দেহ করলে কীভাবে?'

আমি বললাম, 'প্রথমে ওরা পাহাড়ে আলো আর সেই অদ্ভুত লম্বা মানুষ দেখে, তারপর ফতে গোবরকে ওর বাসায় যেতে দেখে। ফতেরা যদিও অস্বীকার করেছিলো, পরে আমরা লুকিয়ে ফলো করে টের পেয়েছিলাম ওদের সঙ্গে পাকড়াশীর যে সম্পর্ক আছে— সেটা ওরা গোপন রাখতে চায়।' ভাইয়া যে বলেছিলো পাকড়াশীটা খুব পাজি, সে কথা আর জাহেদ মামাকে বললাম না। ভাইয়ার কথা কাউকেই বলবো না।

টুনি বললো, 'আবির যে লম্বা মানুষ দেখেছিলো, ওকে ধরেছো জাহেদ মামা?'

জাহেদ মামা হেসে বললেন, 'মানুষটা লম্বা নয়। রণ-পা পরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো। এতে এক ঢিলে দুই পাখি মারা হয়। লোকজনকে ভয় দেখানোও হয়, আবার তাড়াতাড়ি চলাফেরাও যায়। এবার বলো, ফতে গোবরকে প্রথম কী দেখে সন্দেহ করলে?'

আমি বললাম, 'সেই যে খাবার টেবিলে গোবর স্ক্যাটরাকে দেখে ভয় পেলো, তখন ফতে বিড়বিড় করে বলেছিলো, এসব কাজে ওস্তাদ কেন যে এমন ভীতুর ডিমগুলোকে সঙ্গে দেয় বুঝি না।— তাতেই প্রথম সন্দেহ হলো। তারপর হাঁপানির রোগী বলে দোতালায় থাকলো না, অথচ তরতর করে পাহাড় বেয়ে উঠলো। এ ছাড়া মেঝেতে কান পেতে ওদের কথা শুনেছিলাম। শেষে মেঝে ফুটো করে ওদের কাণ্ডকারখানা দেখে ফেললাম।'

জাহেদ মামা বললেন, 'ওরা যে পাহাড়ে পাহাড়ে কী রকম শেয়ালের মতো সুড়ঙ্গ কেটে রেখেছিলো, বাইরে থেকে বোঝার এতোটুকু সাধ্যি নেই। আমরা

পাঁচটা মুখ খুঁজে পেয়েছি। আরও খোঁজা হচ্ছে।'

আমি বললাম, 'সেই সব সুড়ঙ্গের মুখে নিশ্চয়ই একটা গাছ আছে, যেখানে মড়ার খুলি আঁকা রয়েছে?'

জাহেদ মামা হেসে মাথা নাড়লেন। নেলী খালা শুধু অবাক হচ্ছিলেন।

জাহেদ মামা এরপর নেলী খালাকে বললেন, 'তোমার স্ক্যাটরা যে কী উপকার করেছে নেলী। ওকে একটা মেডেল দেয়া দরকার। ও ভেতর থেকে না চ্যাঁচালে কিছুতেই বুঝতে পারতাম না, মাটির নিচে এতো কিছু ঘটছে। আসলে ওর চ্যাঁচানি শুনেই পাকড়াশীর লোকগুলো ঘাবড়ে গিয়েছিলো। নইলে হাজার পেটালেও ওরা স্বীকার করতো না।'

আমি বললাম, 'স্ক্যাটরা না এলে এতোক্ষণ আমরা জাহাজে থাকতাম। তবে বাথিন যে ওদের দলের এটা আমরা আগে কখনো ভাবি নি।'

স্ক্যাটরা যেই শুনলো ওকে নিয়ে কথা হচ্ছে, তক্ষুনি ছুটে এসে ময়লা পা নিয়ে জাহেদ মামার কোলে উঠে বসলো।

নেলী খালা গরম পানি এনে বাবুর কপালে আর স্ক্যাটরার মাথায় ভালো করে ব্যান্ডেজ করে দিলেন।

সেই রাতে আমাদের কথা যেন আর ফুরোতেই চায় না। নেলী খালা বললেন, 'আমি শুধু ভাবছি শানুপা শুনলে কী করবেন।'

আমি হেসে বললাম, 'কী আর করবেন। বুঝবেন উদভুট্টি কাণ্ড করার ব্যাপারটা শুধু একচেটিয়া তোমার নয়। আমরাও উদভুট্টি কাণ্ড করতে পারি।'

নানু হেসে বললেন, 'শানু আর জামানকে আসতে লিখে দাও। সাত দিনের ছুটি পেতে জামানের নিশ্চয়ই অসুবিধে হবে না।'

জাহেদ মামা একটু লাজুক হেসে বললেন, 'আমিও লম্বা একটা ছুটির দরখাস্ত দেবো ভাবছি।'

টুনি বললো, 'তারপর আমরা সবাই মিলে সত্যিকারের সোনার খনি আর হার্মাদদের গুপ্তধন খুঁজবো।'

ললি বললো, 'পিকনিকের কথা বাদ দিচ্ছো কেন? আমরা রোজ পিকনিক করবো।

মা এলে যে কী দারুণ মজা হবে, আমি ভাবতেই পারছিলাম না। এমনও তো হতে পারে যে, ভাইয়ার সঙ্গে মার দেখা হয়ে গেলো। নির্ঘাত আনন্দে ফিট হয়ে যাবেন। আর ভাইয়া যখন সব শুনবে, তখনও কি ভাববে আমি ছোট্টটি রয়ে গেছি, যাকে সব কথা বলা যায় না? সে-রাতে আমাদের কারোই ঘুম এলো না। বাইরে যখন কাক ডাকলো, তখন নেলী খালা আমাদের চার জনকে চার গ্লাস দুধ এনে দিলেন। দুধ খাওয়ার পর আধখানা ভেলিয়াম টু দিয়ে বললেন, 'এটা খেয়ে এক্ষুনি ঘুমুতে যাও। সন্ধেয় জাহেদের ওখানে বিরাট এক পার্টি আছে।'

পার্টিতে আরও চমক

পরদিন সকালে এগারোটায় আমাদের ঘুম ভাঙলো। মাথায় হাত দিয়ে দেখলাম ফুলোটা অনেক কমেছে। আমি যখন উঠে বসেছি, তখনো বাবু ঘুমিয়ে ছিলো। ওর মাথায় ব্যান্ডেজ করা। ভারি মায়া লাগলো ওকে দেখে। আস্তে আস্তে ওকে ডেকে তুললাম। ঘুমঘুম চোখে বাবু আমার দিকে তাকালো। নেলী খালা জানালার ভারি পর্দাগুলো সব টেনে দিয়েছেন বলে ঘরের ভেতরটা বেশ অন্ধকার ছিলো। বাবু বললো, 'আজকের প্রোগ্রাম বলো।'

আমি একটু হেসে বললাম, 'কেন জাহেদ মামার পার্টি!'

ললি টুনি দেখলাম আমাদের আগেই উঠে পড়েছে। টুনি ফুলো মুখে দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে বললো, 'হিরোদের দেখি ঘুম ভেঙেছে। নিচে গিয়ে দেখো যে জিওলজিক্যাল সার্ভে থেকে দু'জন বুড়ো ভদ্রমহিলা এসেছেন। নেলী খালা ওদের বোঝাচ্ছেন আসল হিরো হলো তোমরাই।'

আমি বললাম, 'জাহেদ মামা কি নকল হিরো?'

বাবু ললি টুনি একসঙ্গে হেসে ফেললো। আমি আর বাবু মুখ-হাত ধুয়ে ললি টুনিকে নিয়ে নিচে এলাম।

নেলী খালা জিওলজিক্যাল সার্ভের বুড়ো ভদ্রমহিলাদের সঙ্গে আমাদের এমনভাবে পরিচয় করিয়ে দিলেন যে, আমরা দু'জন পাকা টমেটোর মতো লাল হয়ে গেলাম।

খাবার টেবিলে বসে টুনি আমার কানে কানে বললো, 'ভদ্রমহিলারা তোমাদের দু'জনকে পছন্দ করে ফেলেছেন। কথাটা বোধহয় এবার পাকা করেই যাবেন। নইলে নেলী খালা, শানু খালাকে চিঠি দেয়ার জন্যে এতো ব্যস্ত হয়ে পড়তেন না।'

আমার মুখের ভেতর আস্ত একটা ডিম, তাই কোনো কথা বলতে পারলাম না। মারার জন্যে হাত তুললাম। টুনি একছুটে পালিয়ে গেলো। বাবু অবাক হয়ে বললো, 'কী বলেছে টুনি?'

টুনির কথা শুনে বাবু আর ললি হেসে গড়িয়ে পড়লো।

সন্ধেবেলা আমরা সবাই সেজেগুজে জাহেদ মামার বাংলোতে এলাম। নেলী খালা চমৎকার ময়ূরকণ্ঠী নীলের ভেতর ছাই রঙের নকশা-আঁকা সিল্কের শাড়ি পরেছেন। আমি পরেছিলাম, বাবু যে শার্টটা আমার জন্যে আমেরিকা থেকে এনেছিলো। বাবুকেই সবচেয়ে বেশি সুন্দর লাগছিলো। বেচারার মাথার ব্যান্ডেজটা নেলী খালা খুলতে দেন নি। ললি টুনি রাশান মাক্রুশকা পুতুলের মতো সেজেছিলো। টুনির চুলগুলো অবশ্য আগের মতোই ঝোলানো শিং-এর মতো খোঁপা করা। ললি জামার সঙ্গে রং মিলিয়ে চওড়া রিবন দিয়ে ওর রেশমের মতো নরোম আর চকচকে চুলগুলো বেণী বেঁধেছে। নানু পরেছেন হালকা ছাই নীল রঙের সামার স্যুট। স্ক্যাটরা বেচারাও বাবুর মতো ব্যান্ডেজ খুলতে পারে নি। ললি ওর গলায় একটা লাল রিবন বেঁধে দিয়েছে।

জাহেদ মামা দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিলেন। গাঢ় নীল প্যান্টের সঙ্গে হালকা নীল শার্টে জাহেদ মামাকে ঠিক বিদেশী ছবির নায়কদের মতো দেখাচ্ছিলো। ওঁর পাশে পুরো ইউনিফর্ম পরা একজন আর্মি কর্নেল। জাহেদ মামা হেসে আমাদের দেখিয়ে বললেন, 'এরা সেই ক্ষুদে গোয়েন্দার দল।'

কর্নেলের সঙ্গে আমরা হাত মেলালাম। তিনি বললেন, 'ইউ লিটল ডেভিলস। তোমাদের সত্যিই তুলনা হয় না!'

সেদিন সন্ধ্যায় জাহেদ মামার বাগানে একটা দারুণ পার্টি হলো। বাগানে ছোট ছোট টেবিল-চেয়ার পেতে রীতিমতো জমকালো আয়োজন করা হয়েছে। অতিথিরা আসার পর সবাইকে প্রথম লেবুর ঠাণ্ডা শরবৎ দেয়া হলো। শরবৎ খেতে খেতে জাহেদ মামা ছোটখাটো বক্তৃতা দিয়ে ফেললেন। পাকড়াশী যে কতো দুর্ধর্ষ এক স্মাগলার, কীভাবে তারা সকলের অগোচরে সোনা পাচার আর জাল টাকার কারবার করতো, আমরা কীভাবে সে-সব খুঁজে বের করলাম— শুনে গেস্টদের চোখ ছানাবড়া। কক্সবাজার থেকে কয়েক জন সাংবাদিক এসেছেন। তাঁরা ঘনঘন ছবি তুললেন। ছবি থেকে আমরা চার জনও বাদ পড়লাম না। টুনি এক জন বুড়ো সাংবাদিককে বললো, 'আমাদের ছবি আপনারা খবরের কাগজে ছাপবেন?'

মিষ্টি হেসে সাংবাদিক ভদ্রলোক বললেন, 'নিশ্চয়ই, দেখবে প্রথম পাতাতেই ছাপা হয়ে গেছে— যেখানে মন্ত্রী-টন্ত্রীদের ছবি ছাপা হয়।'

বুড়ো সাংবাদিকের গলার স্বরটা কেমন যেন চেনা চেনা মনে হলো। একটু অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাতেই মনে হলো চশমার ভেতর দিয়ে বুঝি আমাকে চোখ টিপলেন।

বাবু আরেক জন সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলছিলো। বুড়ো বললেন, 'চলো তোমার সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলবো।'

ললি টুনি তখন বাবুর কথা শুনছিলো। বুড়ো সাংবাদিকের সঙ্গে আমি জাহেদ মামার ড্রয়িংরুমে এলাম। মুখ টিপে হেসে চশমাটা খুলে বুড়ো বললেন, 'কি রে, চিনতে পারিস নি তো।'

আমি হাসলাম— 'চেহারা যতোই লুকোও না কেন ভাইয়া, তোমার গলা শুনে আমি ঠিক ধরে ফেলেছিলাম।'

ভাইয়া হাঁপ ছেড়ে বললো, 'যাক বাঁচা গেলো, নেলী খালাও চেহারা দেখে চিনতে পারে নি। গলা তো আর সবাই চেনে না। তবে যাই বলিস, তোরা যে কাজ করেছিস, এর কোনো তুলনা হয় না।'

আমি লজ্জা পেলাম— 'তুমি যখন বললে পাকড়াশী তোমাদেরও কাজের ক্ষতি করেছে, তখন আমার জিদ চেপে গিয়েছিলো।'

ভাইয়া মৃদু হেসে আমার হাত তার হাতের মুঠোয় পুরে বললো, 'তোকে নিয়ে আমার ভয় ছিলো। এতোদিনে নিশ্চিন্ত হলাম। চল এবার ওদিকে যাই। বেশি দেরি হলে সন্দ করবে।'

বাগানে এসে দেখি কক্সবাজার থেকে বুড়ো মুৎসুদ্দিও এসেছেন। কী আশ্চর্য! তিনি নাকি গোয়েন্দা বিভাগের একজন জাঁদরেল অফিসার। এদের ধরার জন্যে ছদ্মবেশে অনেক দিন ধরে অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর কানে কম শোনার ব্যাপারটা পুরোপুরি অভিনয় ছিলো। বললেন, কানে তিনি আমাদের কারো চেয়ে কম শোনেন না। এই বলে আড়চোখে একবার নেলী খালার দিকে তাকালেন— 'মিস চৌধুরীর সরস মন্তব্যগুলো আমি খুব উপভোগ করতাম। তবে সব পক্ষের কথাবার্তা শোনার জন্যে আমার না শোনার ভানটা অনেক কাজে লেগেছে।'

নেলী খালা এতখানি জিব কেটে লাল-টাল হয়ে সে যে কী কাণ্ড! আমরাও কম লজ্জা পাই নি। বাবু তো ওঁকে চিল্লানোরাস বলেছিলো। ফতে ওঁর কথা শুনে কী মন্তব্য করেছিলো সেটাও বললাম। তিনি হেসে বললেন, 'আমিও জাল প্রায় গুটিয়ে এনেছিলাম। তবে সব কটাকে একসঙ্গে ধরা আমার কম্মো ছিলো না।'

তারপর নানু সবাইকে অবাক করে দিয়ে ঘোষণা করলেন, 'আসছে শীতে মেজর জাহেদ আহমেদের সঙ্গে আমার মেয়ে নেলীর বিয়ে হবে।'

সবাই হাত তালিতে ভেঙে পড়লো। নেলী খালা লাল হলেন। জাহেদ মামা লাজুক হাসলেন। আমরা চার জন অবাক হয়ে একে অপরের দিকে তাকালাম। তারপর দ্বিগুণ জোরে হাততালি দিলাম।

মুৎসুদ্দি সায়েব নেলী খালাকে গান গাইবার জন্যে অনুরোধ করলেন। মুৎসুদ্দি আর বলি কেন, ওটা তো ছদ্মনাম। ওঁর আসল নাম হলো তানভীর হোসেন চৌধুরী। নেলী খালা একটু আপত্তি করে খালি গলায় পর পর অনেকগুলো রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইলেন। নেলী খালা যে এতো সুন্দর গাইতে পারেন, আগে কখনো আমরা টের পাই নি।

অনুষ্ঠানের শেষে এক বিশাল ভোজ। শুধু খেতে খেতেই ঝাড়া একটি ঘন্টা লেগে গেলো। খোলা লনে টেবিল-চেয়ার পেতে খাবার ব্যবস্থা হয়েছিলো। অল্প সময়ে জাহেদ মামা সব কিছু এতো সুন্দর করে আয়োজন করেছেন যে, সবাই খুব প্রশংসা করছিলো।

খাবার পর অতিথিরা একে একে নেলী খালা আর জাহেদ মামাকে অভিনন্দন জানিয়ে চলে গেলেন। সাংবাদিকরা সবাই জাহেদ মামার জীপে করে এসেছিলেন। ভাইয়াও ওদের সঙ্গে চলে গেলো। যাওয়ার সময় ভাইয়া আমাদের সবাইকে আবার অভিনন্দন জানালো। নেলী খালাকে বললো, 'মিস চৌধুরী, শুভ কাজের নেমন্তন্ন পাঠাতে ভুলে যাবেন না।' নেলী খালা লজ্জায় লাল হলেন। ওঁরা চলে যাবার পর শুধু রইলেন কর্নেল আর বুড়ো মুৎসুদ্দি, থুড়ি তানভীর সায়েব। এঁরা দু'জন আলাদা গাড়ি নিয়ে এসেছেন। নানু, জাহেদ মামা আর নেলী খালা বারান্দায় বসে ওঁদের সঙ্গে কথা বলছিলেন।

আমরা লনে একটা দেবদারু গাছের পাশে বসে ছিলাম। সমুদ্রের উদ্দাম বাতাসে বারান্দার লতা-গোলাপের ঝাড় থেকে এলোমেলো পাপড়ি খসে পড়ছিলো। দূরে ঝউবনে শাঁ শাঁ শব্দ হচ্ছিলো। বাবু আর টুনি অল্প দূরে বসে কী একটা কথা বলে হাসাহাসি করছিলো। আমি ভাবছিলাম নেলী খালা আর জাহেদ মামার কথা। নেলী খালা কী সুন্দরভাবে এক জন আর্মি মেজরকে ভাইয়াদের দলে নিয়ে এলেন।

ললি আমার পাশে বসেছিলো। গোলাপের দুটো পাপড়ি ওর মাথায় এসে পড়েছে। পাপড়িগুলো আলতোভাবে তুলে ললিকে বললাম, 'এতো চুপচাপ কেন ললি! কথা বলো!'

ললি আস্তে আস্তে বললো, 'সবকিছু স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে।'

স্ক্যাটারা আমাদের পাশে শুয়েছিলো। আমি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলাম। বললাম, 'আমি এই কটা দিনের কথা চিরদিন মনে রাখবো।' একটু থেমে আবার বললাম, 'বাড়ি ফিরে গেলে একা-একা আমার খুব খারাপ লাগবে। তুমি আমাকে চিঠি লিখবে ললি?'

আমার পিঠে আলতোভাবে একটা হাত রেখে ললি আস্তে আস্তে বললো, 'লিখবো। আমাকে তোমার খুব কাছের এক জন বন্ধু ভাববে।'

আমি বললাম, 'আমি তোমার মতো একজন বন্ধুর অপেক্ষায় ছিলাম।'

ললি মৃদু হাসলো। কোনো কথা বললো না। ওকে খুব পবিত্র, নরোম আর সুন্দর মনে হচ্ছিলো।

রাত আরো গভীর হলো। টুনি আর বাবু ঘাসের ওপর শুয়ে আছে। আমরা দু'জন চুপচাপ বসে সমুদ্রের গর্জন শুনছি। উতলা বাতাসে তখনো গোলাপের পাপড়িগুলো এলোমেলো ভেসে বেড়াচ্ছিলো।

হারিয়ে যাওয়ার ঠিকানা

অলংকরণ : হাশেম খান

হারিয়ে যাওয়ার সময়

অক্টোবরের মাঝামাঝি আমাদের স্কুলের বছর-শেষের পরীক্ষাটি হয়ে গেলো। ফলও বেরিয়ে গেলো দিন-পনের পরে। আমাদের সাধু নিকোলাসের স্কুলে পড়াশোনা এত তাড়াতাড়ি হয় যে, ছ'মাসের মাথায় ক্লাসের সব বই পড়া শেষ হয়ে যায়। পরের বার শেষ করতে দু'মাসের বেশি সময় লাগে না। তাই প্রত্যেক বছর অক্টোবরে ক্লাস শেষ করে আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। নবেম্বর, ডিসেম্বর দু'মাস একটানা ছুটি। জাফলং-এর হাড়কাঁপানো শীতের ভেতর ছুটির মাস দুটো ছোট-বড় এতসব ঝলমলে ঘটনায় ভরা থাকে যে, নতুন ক্লাসে উঠে সে-সব গল্প শেষ করতে জানুয়ারি মাস পেরিয়ে যায়। গত বছর বড়দিনের ছুটিতে বিজুকে ছেলেধরার দল ধরে নিয়ে গিয়েছিলো। স্কুলের সবাইকে সেই গল্প বলে শেষ করতে পুরো তিন মাস লেগেছে।

সেবার পরীক্ষার ফল বেরোবার দিন আমি, রামু আর বিজু বহুক্ষণ স্কুলের গির্জার সিঁড়িতে বসে গল্প করছিলাম। পরীক্ষার ফল দেখে আমরা এতটুকু উত্তেজিত হইনি। রামু ফার্স্ট হয়েছে; আমি আর বিজু সেকেন্ড। আমি আর রামু এবার ক্লাস নাইনে উঠেছি, বিজু সেভেনে। যেদিন থেকে আমরা তিনজন সাধু নিকোলাসের স্কুলে ভর্তি হয়েছি, তারপর থেকে প্রত্যেকটা পরীক্ষায় রামু ফার্স্ট আর আমি সেকেন্ড হয়েছি। গত চারবছর ধরে বিজু সব সময় সেকেন্ড হয়েছে। আগে স্কুলের টিচাররা আর বাড়ির বড়রা এ নিয়ে খুব হাসাহাসি করতেন। আজকাল ওঁরাও ধরে নিয়েছেন, সাধু নিকোলাসের স্কুলে আমরা যতদিন পড়ব, এতদিন এমনটি চলতেই থাকবে। ওঁদের মতো আমরাও এখন আর অবাক হই না। আমাদের হেডমাস্টার ব্রাদার এন্ডারসন যখন ক্লাসে এসে বলেন, 'এবার এ্যানুয়াল পরীক্ষায় তোমাদের ক্লাসে ফার্স্ট হইয়াছে'— তখন নাম বলার আগেই রামু দম দেয়া পুতুলের মতো উঠে দাঁড়ায়। তবে ব্রাদার এন্ডারসন এখনো রিপোর্ট কার্ডটি হাতে তুলে দিয়ে, রামু আর আমার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করার সময় মুখ টিপে হাসবেন। থার্ড হবার জন্যে খালেদ আর পরেশের সে কী ব্যস্ততা! আমার তাতে

বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই। ওরাও থার্ডের বেশি হতে চায় বলে মনে হয় না।

কালো পাথরে বাঁধানো সাধু নিকোলাসের গির্জার ঠাণ্ডা সিঁড়ির ওপর আমরা তিনজন বহুক্ষণ চুপচাপ বসেছিলাম। রামু আপন মনে পাহাড়ি নেপিয়ার ঘাসের গোড়ার নরম দিকটা চিবোচ্ছিলো। প্যাট্রিকের কাছ থেকে আমি 'সুইস ফ্যামিলি রবিনসন' বইটা নিয়েছিলাম পড়ার জন্যে। কয়েক পাতা পড়ে ভাঁজ করে রেখে দিয়েছি। এর আগে ওটা আমি তিনবার পড়েছি। আজকাল এসব পড়তে আর ভালো লাগে না। বিজু একটু দূরে বসে বেতফল খাচ্ছিলো। কিছু গেলার সময় বিজুর হুঁশ থাকে না। আশেপাশে কেউ আছে কি না, থাকলে তাদেরও কিছু দেয়া উচিত কি না; এসব কথা কখনো ওর মাথায় ঢুকবে না। অথচ আমরা কোনো খাবার জিনিস কিনলে ও এমন জুলজুল চোখে তাকাবে যে, পেটে অসুখ করার ভয়ে তাড়াতাড়ি ওকে একভাগ দিয়ে বাঁচি।

রামুর দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে দেখি কী যেন গভীরভাবে ভাবছে ও। নেপিয়ার ঘাসের গোড়াটা আপন মনে খেয়ে চলেছে। আমার কাছে বেতফল থাকলে নিশ্চয়ই ওকে কটা খেতে দিতাম। বিজুটা নিতান্তই স্বার্থপর। আমাদের বাড়ির ঝি পচার মাও বলে, 'বিজুদাদা কী স্বার্থপর! কাউকে কিছু দিতে জানে না।' আমি আর রামু কিছু খেলে পচাকেও খেতে দেই।

লম্বা নেপিয়ার ঘাসের ডগা পর্যন্ত চিবিয়ে খেয়ে রামু বললো, 'দূর ছাই কিছু ভালো লাগে না। সবকিছু কী রকম একঘেয়ে হয়ে গেছে, দেখেছিস আবু?'

আমি বললাম, 'কোন্‌টা একঘেয়ে, পরীক্ষায় এরকম ফার্স্ট-সেকেন্ড হওয়া?'

'সব কিছু।' রামু বিরক্ত হয়ে বললো, 'ক্লাস, পরীক্ষা, ছুটি কিছুই ভালে লাগে না।'

বিজু বেতফলগুলো শেষ করে জামার হাতায় মুখ মুছে আমাদের পাশে এসে বসলো।

আমি আস্তে আস্তে রামুকে বললাম, 'দুমাস ছুটি কীভাবে কাটাবি কিছু ভেবেছিস?'

রামু বললো, 'এতক্ষণ ধরে সেটাই তো ভাবছিলাম। এতবড় একটা বন্ধ অথচ কিছুই করবো না, ভাবতেই আমার হাত-পা সব হিম হয়ে যাচ্ছে।'

স্কুল ছুটি হওয়ার আগে, কী করে সময় কাটাবো এ নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি। বিশেষ করে পরীক্ষার পড়া তৈরি করতে বসলেই এসব চিন্তাভাবনা মাথার ভেতর গিজ-গিজ করে। ভূগোল বইয়ে শীতে পত্রঝরা বৃক্ষের অরণ্য অঞ্চল কিংবা স্তেপের তৃণভূমির কথা পড়তে গিয়ে কতবার সেই পাতা ঝরার বনে আর মানুষ সমান লম্বা ঘাসের সমুদ্রে হারিয়ে গেছি। যে-সব গল্পের বইয়ের চরিত্র পথ হারিয়ে অচেনা কোনো জায়গায় চলে যায় সে-সব বই পড়তে আমার বেশি ভালো লাগে। কতবার আর্কাদি গাইদারের 'ইশকুল' পড়েছি, তবু ওটা পুরোনো

মনে হয় না। ফিসফিস করে রামুকে বললাম, 'কোথাও হারিয়ে যেতে পারলে বেশ হতো।'

'কী বললি?' রামু ভুরু কুঁচকে আমার দিকে এমনভাবে তাকালো যে আমাকে সঙ্গে সঙ্গে বলতে হলো, 'কিছু না।'

আমার অনেক কথা নিয়ে রামু হাসাহাসি করে বলে ওকে সবসময় সবকথা বলতে পারি না। রামু আবার বলল, 'কোথায় যেন যাবার কথা বললি?'

আমি চুপ করে রইলাম। বিজু বললো, 'চল, যেদিকে দু'চোখ যায় বেরিয়ে পড়ি।'

বিজু মাঝেমাঝে এত পাকা কথা বলে যে আমিও অবাক হয়ে যাই। রামু অবশ্য বিজুর কথা শুনেই খেঁকিয়ে উঠলো, 'বললেই হল বেরিয়ে পড়ি! মার কানে একবার যাক, তারপর দেখিস কান দুটো আর মাথার সঙ্গে থাকবে না।'

বিজু মুখ কালো করে করুণ গলায় বললো, 'বারে মাকে কেন বলতে হবে!'

আমিও রামুর ওপর বিরক্ত হয়ে বললাম, 'বিজু না হয় একটা কথা বলেছে। তুই নিজেও তো আজেবাজে কথা কম বলিস না। অন্তুর সঙ্গে সেদিন তুই কী করেছিস সে কথা বললে জেঠু তোর কান দুটো খুলে নিয়ে টেমির গলায় ঝুলিয়ে দেবে।'

রামু গাঁইগুঁই করে বললো, 'তুই আবার আমার সঙ্গে লাগতে এলি কেন? তোকে তো কিছ বলি নি!'

'তুই আমাদের সব কথা বাড়িতে বলতে যাবি কেন?'

'বারে, আমি কি সত্যি সত্যি বলতে যাচ্ছি নাকি!'

রামুর গলায় এতটুকু তেজ নেই। সুযোগ পেয়ে ওকে বলে দিলাম, 'কথাটা সব সময় মনে রাখলেই খুশি হব।'

সাধু নিকোলাসের গির্জায় ঢংঢং করে বারোটার ঘন্টা বাজলো। আমি মনে মনে হিসেব করে দেখলাম, এক ঘন্টা চল্লিশ মিনিট হলো আমরা গির্জার সিঁড়িতে বসে আছি। বিজু একবার বললো, 'ঘরে যাবি না?' আমরা ওর কথার জবাব না দিয়ে চুপচাপ বসে রইলাম।

মাঝেমাঝে আমাদের এরকম হয়। যখন কারো কোনো কথা বলার থাকে না; শুধু চুপচাপ বসে থাকি। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মনের চিন্তাভাবনাগুলো কতরকম ডালপালা মেলতে শুরু করে। রামু আমার মেজ জ্যাঠার ছেলে আর বিজু হল সেজ কাকার ছেলে। আমরা তিনজন সবসময় একসঙ্গে থাকি বলে ছোটকা আমাদের বলে 'থ্রি মাস্কোটিয়ার্স'। এই নামে যে একটা বই আছে আমি জানি, তবে এখনো পড়ি নি। ছোটকা বলেছেন ঢাকা থেকে এনে দেবেন। আমাদের তিনজনের দলটা আরো ভারি হোক এটা আমরা কখনো চাই নি। বিজুকে যদি কখনো পেয়ারা খাওয়ার জন্যে দিগন্তের সঙ্গে ভাব জমাতে দেখেছি, তখন আমি

আর রামু ওকে কোরাসে বকে দিয়েছি। তেমনি একদিন রামু দেখেছিলো বই দেয়ার জন্যে আমি প্যাট্রিকের সঙ্গে হেসে দুটো কথা বলেছি, অমনি ওর মুখখানা হাঁড়ির মতো কালো হয়ে গেছে। আমি মাঝে মাঝে অন্তুর কথা বলে রামুকে চুপসে দেই। বাড়িতে মা আর জেঠিমা, কাকিমারা বলেন, 'হ্যাঁরে তোদের কোনো বন্ধু নেই?' আমরা তিনজন তখন গম্ভীর হয়ে যাই। রামু, বিজু কী চায় জানি না, আমি কিন্তু চাই আর একজন অন্তত আমার বন্ধু হোক। শুধু আমার নিজের, অন্য কারো নয়। কতদিন ভেবেছি সোনিয়ার সঙ্গে ভাব করবো, রামুদের জন্যে হয়ে ওঠে নি।

সোনিয়া আমাদের হাসি খালার ছোট মেয়ে। ওঁরা যখন নতুন এলেন তখন আমরা তিনজনই সোনিয়াকে দেখেছিলাম। গোলগাল পুতুল পুতুল চেহারা, চোখে চশমা আর মাথার দুপাশে লাল রিবন বাঁধা দুটো বেণি ঝোলানো। প্রথম দিকে ওর নাম জানতাম না বলে দুইবেণি ডাকতাম। সোনিয়ার বড় একটা ভাই আছে। অনেক বড়। কানাডায় কী যে পড়তে গেছে। হাসি খালা সব সময় অসম্ভরকম গম্ভীর থাকেন বলে তাঁর বাসায় ঢোকার সাহস এখনো পাই নি। রামু বলে দুইবেণির মার মতো সুন্দরী মহিলা ও জন্মেও দেখে নি।

একদিন সেজ কাকিমা রামুকে এ নিয়ে কী লজ্জায়ই না ফেলেছিলেন! রামু সেদিন সোনা হেন মুখ করে সেজ কাকিমাকে এসে বললো, 'সেজ কাকিমা, দুইবেণির মা তোমাকে যেতে বলেছে।' আমি ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকালাম এই ভেবে, দুইবেণির মার সঙ্গে রামুর আলাপ হল কবে? সেজ কাকিমা অবাক হয়ে বললেন, 'দুইবেণির মা কে রে?' রামু বলল, 'সেদিন তুমি যাকে আমলকির আচার পাঠালে!' অমনি সেজ কাকিমা হেসে খুন— 'দুইবেণি কি রে? ওতো হাসি'পার মেয়ে সোনিয়া। ওঁকে তোমরা হাসি খালা ডাকবে। দুইবেণির মা বলে কি কোনো ভদ্রমহিলাকে ডাকা যায়?'

এরপর রামু গাঁকগাঁক করে কী বললো শুনতে পাইনি। সেজ কাকিমাও বাড়ির মেয়ে-মহলে কথাটা ভালোমতেই ছড়িয়েছিলেন। তবে আমার সঙ্গে যে সোনিয়ার দুদিন কথা হয়েছে আর একদিন ও আমাকে দেখে মুখ টিপে হেসেছে, এ-কথা আমি কাউকে বলি নি। আমি রামুর মতো বোকা নই। রামু যদি কখনো অপ্রস্তুত হয়, তখন ওর মুখটা যা বোকা দেখায়—আমি হাসি চাপতে পারি না। আড়চোখে রামুর দিকে তাকিয়ে দেখি ও আবার নেপিয়ার ঘাসের গোড়া চিবোনো শুরু করেছে। আমি বললাম, 'ঘাসে বুঝি খুব ভিটামিন আছে রামু?'

রামু কিছু খেতে বসলে ভিটামিনের হিসেব করে। আমার কথা শুনে ঘাস চিবোনো বন্ধ করলো। অর্ধেক খাওয়া লম্বা ঘাসটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে হেসে বললো, 'কী করবো বল্! তুই তো সারাদিন বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে যাচ্ছেতাই সব বাংলা উপন্যাস পড়ে দু'মাস কাটিয়ে দিতে পারবি। পাজি বিজুটা

ডিটেকটিভ বই আর খাবার কিছু পেলে সবকিছু ভুলে যাবে। শুধু আমি পরীক্ষার পরদিন থেকেই ভেবে মরছি কীভাবে সময় কাটাবো।'

আমি হেসে বললাম, 'তুই পরীক্ষা দিয়ে ভাবছিস আর আমি ভাবছি পরীক্ষা দেয়ার আগে থেকে। যে-জন্যে তুই ফার্স্ট হতে পারলি। আমি ভাবছি না তোকে কে বললে?'

'এদ্দিন ধরে ভেবেও কোনো কুলকিনারা পেলি না?'

'তুই তো তখন বিজুর কথার কোনো পাত্তাই দিলি না। আমারও মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় কোথাও হারিয়ে যাই।'

'ওরকম ইচ্ছে তো সবারই হয়।' রামু বললো, 'শুধু ইচ্ছে হলেই তো হল না। হারিয়ে যাওয়ার মতো একটা ঠিকানা তো থাকতে হবে।'

বিজু হেসে বললো, 'ঠিকানাই যদি জানবি তাহলে হারাবি কী করে? ঠিকানা জেনে কি কখনো হারানো যায়? নাকি হারিয়ে যাওয়ার কোনো ঠিকানা থাকে?'

আমাদের তিনজনের ভেতর রামু বেশি বাস্তববাদী। একথা ওকে যদিও কখনো বলি নি, তবে মনে মনে সেটা মানতে বাধ্য। রামু বললো, 'ওরে হাঁদা, আমি কী বলছি সেটা তুই বুঝতে পারছিস না। কোথায় গিয়ে তুই পথ হারাতে চাস, জয়ন্তিয়া পাহাড়ে, না পিয়াইন নদীতে, সেটাও তো তোকে ঠিক করতে হবে। নাকি তুই বাড়ি থেকে বেরিয়ে উত্তর-দক্ষিণে যে-কোনো একদিকে হাঁটতে চাস, চোখ যেদিকে যায়? আমি বাপু অত বেশি এ্যাডভেঞ্চার যেতে রাজি নই।'

আমি বললাম, 'যেতে রাজি থাকলেই বা কী! দুদিন পরে বিশ্বাস দারোগা ঠিকই কান ধরে হিড় হিড় করে বাড়িতে এনে তুলবে।'

বিজু বললো, 'যাই বলিস, জাফলং জায়গাটা এমন অদ্ভুত যে, কেবল হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করে।'

আমি হেসে বললাম, 'সেইসঙ্গে আমাদের বয়সটাও যে এমনই—সবসময় কেবল হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করে।'

রামু আর বিজু একসঙ্গে হেসে উঠলো। রামু বলল, 'আসলে আমাদের এই বয়সটা নিয়েই যত গণ্ডগোল। হাবুল, মন্টুদের দেখ, মেয়েদের সঙ্গে দিব্যি এক্কাদোক্কা আর লুডু খেলে কী চমৎকার সময় কাটিয়ে দিচ্ছে। ঝন্টুদা ছোড়দারা নাটক করবে—সেখানে আমাদের নাক গলানো বারণ। আমরা কোথায় যাই বল্ তো?'

আমি বললাম, 'ভাবিস না রামু। আজ রাতের ভেতরই আমরা একটা কিছু ভেবে ঠিক করে ফেলবো। কাল থেকে কাজ শুরু করবো। কোথাও যেতে না পাই, বর্ডারে শহীদ মামাকে বলে পায়ে হেঁটে চেরাপুঞ্জির পাহাড় থেকে তো ঘুরে আসতে পারি!'

অনেক ভেবে দেখলাম, হারিয়ে যাওয়ার জন্যে জাফলং-এর চেয়ে ভালো

জায়গা পৃথিবীর আর কোথাও নেই। কেন অযথা পাতাঝরা বন আর স্তেপের ঘাসের কথা ভাবি। আমাদের বাড়ি থেকে উত্তরে মেঘের মতো জয়ন্তিয়া পাহাড় দেখা যায়। সেখানে আর কদিন পর সেগুন, তেলসুর আর বুনো নাশপাতির পাতাঝরা শুরু হয় যাবে। ঘাসের জন্যে জয়ন্তিয়া পাহাড়ে যেতে হবে না। আমাদের জাফলং-এ পাহাড়ি নেপিয়ার ঘাসের বনে শীতকালে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। খাসিয়া ছেলেমেয়েরাই সেই আগুনে বুনো খরগোশ পুড়িয়ে খায়।

আমি রামুদের চেরাপুঞ্জির কথা বলেছি, যেখানে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়। পাহাড়ি পথ ধরে গেলে মনে হয় জাফলং থেকে চেরাপুঞ্জি পনের-বিশ মাইলের বেশি হবে না। চেরাপুঞ্জির পাহাড়ে সবসময় মেঘ জমে থাকে। আমাদের বাড়ির ছাদে উঠলে সব ছবির মতো দেখা যায়।

রামু বলল, 'তুই এতক্ষণে একটা ভালো কথা বলেছিস আবু। হারাবার কোনো ঠিকানা না পেলে চেরাপুঞ্জিই যাবো।'

বিজু বলল, 'এবার তাহলে বাড়ি চল্। আমার ক্ষিদে পেয়েছে।'

আমি রামুর দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসলাম। রামু হেসে একবার বিজুর দিকে, তারপর আকাশের দিকে তাকালো। বিজু রেগেমেগে উঠে গেলো।

নুড়ি-ছড়ানো সরু পাহাড়ী পথে হাঁটতে হাঁটতে আমরা হারিয়ে যাওয়ার ঠিকানার কথা ভাবছিলাম। এটা ঠিক যে এ বয়সের সব ছেলেরই ইচ্ছে করে কোথাও হারিয়ে যেতে। তবে হারিয়ে যাওয়ার সত্যিকারের ঠিকানা সম্পর্কে যে আমাদের কোনো ধারণা ছিল না, সেটা বিকেলের আগে কেউ বুঝতে পারি নি।

জয়ন্তিয়া পাহাড়ের আগন্তুক

বাড়ি ফিরতেই মেজ জেঠিমা আমাদের বকুনি দিলেন। ক্লাশ নেই অথচ আমরা দেরি করে ফিরেছি, এতে নাকি আমাদের মহা অন্যায় হয়ে গেছে। জেঠিমা একবার বকতে শুরু করলে থামতে চান না। আমি বললাম, 'জেঠিমা, রামু ফার্স্ট হয়েছে।'

'তাতে কি আমার মাথা কিনে ফেলেছে! ইশকুলে থাকতে ওর বাপ দুবার

ডবল প্রমোশন পেয়েছিলো। ওকি একবারও পেয়েছে? বংশের নাম ডোবাবে এই ছেলে।' এই বলে মেজ জেঠিমা রামুর কান ধরার জন্য হাত বাড়ালেন।

এমন সময় সেজ কাকিমা এসে বললেন, 'সং-এর মতো সবাই ওখানে দাঁড়িয়ে আছো কেন? দয়া করে চাট্টি খেয়ে আমাকে উদ্ধার করো। কতক্ষণ তোমাদের খাবার নিয়ে বসে থাকবো!'

জেঠিমা যখন বকেন, তখন এভাবেই মা-কাকিমারা এসে আমাদের উদ্ধার করেন। মেজ জ্যাঠা মারা যাওয়ার পর থেকে জেঠিমা গোটা পৃথিবীটার ওপর চটে আছেন। তাঁর বকুনি থকে আজরাইলও রক্ষা পান না। তাঁর ধারণা এই ফেরেশতাটি নিশ্চয়ই অন্ধ, নইলে তাঁকে কেন এই যন্ত্রণার সংসারে এভাবে ফেলে রেখেছেন। দিদা মাঝে মাঝে আদর করে জেঠিমাকে বলেন, 'ছি মা, আজরাইল হলেন ফেরেশতা। ওঁদের কি এভাবে বলতে আছে? তোমার চেয়ে আমার জ্বালা কি কম!' এ-বাড়িতে একমাত্র দিদাই জেঠিমাকে শান্ত করতে পারেন। দিদাকে বাবা, বড় জেঠু, দাদু সবাই ভয় পান।

আমাদের খাওয়ার সময় দিদা এসে তদারকি করলেন। আমরা যে ফার্স্ট সেকেন্ড হব এটা বাড়ির সবাই আগে থেকেই জানতো। তবু দিদা সেজ কাকিমাকে বললেন, 'সেজ বৌমা আজ ওদের পাশের খবর বেরিয়েছে। মাছের মুড়োটা ওদের তিনজনকে ভাগ করে দাও। তিন টুকরো ভাজা মাছও দিও।'

সেজ কাকিমা বললেন, 'মাছ ভাজা তো ওবেলার জন্যে তুলে রেখেছি মা, এবেলা সবাই রান্না খেয়েছে।'

দিদা একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'রোজ তো ওদের ভালো-মন্দ দিতে পারি না বৌমা। উঠতি বয়েসের ছেলেদের খাওয়ার দিকে একটু বেশি খেয়াল রাখতে হয়। রাতে না হয় আমাকে কম দিও।'

এ বাড়ির তিনটি উঠতি বয়সের ছেলেকে দিদা একটু বেশি প্রশ্রয় দেন। আমরা পরীক্ষায় ভালো করি বলে দিদার কাছে সাতখুন মাপ। বিজু বললো, 'দেখ না দিদা, মা আমাকে সবসময় বলে এত খাইখাই কেন।'

দিদা হেসে বিজুর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'জালের আলমারিতে তোদের জন্যে পায়েস রেখেছি। তোরা তো নলেন গুড়ের পায়েস পছন্দ করিস!'

দুপুরে খাওয়াটা একটু বেশিমাত্রায় হয়েছিলো। খেয়ে উঠে আমরা আমাদের চিলেকোঠার ঘরের মস্ত বড় খাটটায় কিছুক্ষণ গড়িয়ে নিলাম।

আমাদের 'নয়নতারা কুটির' জাফলং-এর সবচেয়ে পুরোনো আর বড় বাড়ি। আগে ছিলো এটা জমিদারদের বাড়ি। দাদু আমাদের শিলং-এর বাড়ির সঙ্গে এটা বদল করেছিলেন। দাদু পাহাড়ে থাকতে ভালোবাসেন। সবাইকে বলেন বাড়ি বদল করে আমরা অনেক জিতেছি। বাড়িটা ছাড়াও জমিদারদের একটা কমলার বাগান ছিলো। সেটাও আমরা পেয়েছি! তবু দাদুর আড়ালে বড় জেঠু প্রায়ই

বাবা, কাকাদের বলেন, আমরা নাকি ঠকেছি! দাদুর নাকি এতটুকু বৈষয়িক বুদ্ধি নেই। জেঠুরা যখন এসব কথা আলোচনা করেন তখন আমাদের সেখানে থাকতে দেন না। তবে ওঁরা যে সুযোগ পেলেই দাদুকে বোকা বলবেন এটা আমাদের অজানা নয়। কতদিন লুকিয়ে বড়দের সে-সব কথা শুনেছি।

বিকেলে আমরা তিন জন তিন গ্লাস দুধ খেয়ে উলের চাদর গায়ে জড়িয়ে কমলাবাগানে বসে গল্প করছিলাম। জয়ন্তিয়া পাহাড়ের ওপর দিয়ে হিমালয় থেকে হু হু করে ঠাণ্ডা বাতাস আসছে। আগে নাকি একবার শীতের সময় ঘাসের শিশিরকণা জমে বরফ হয়ে গিয়েছিলো। পিয়াইন নদীতে বরফের টুকরো ভেসে এসেছিলো। এসব কথা বলেছেন সরকার দাদু। জাফলং-এর সবচেয়ে পুরোনো বাসিন্দা তাঁরা। আমাদের নয়নতারা কুটিরের জমিদারদের সঙ্গে ওঁর ভারি ভাব ছিলো। আমাদের দাদুর সঙ্গেও ভাব হয়ে গেছে। বিকেলে ওঁরা চৌধুরীদের পুকুরঘাটে বসে গল্প করেন। জাফলং-এর মতো তাজা বাতাস নাকি আর কোথাও নেই। এখানকার ঝর্নার পানিতে রোজ গা ডুবিয়ে বসে থাকলে অনেকদিনের পুরোনো বাতের অসুখ ভালো হয়ে যায়। খাসিয়ারা পাহাড়ে বাসমতি ধানের চাষ করে। যুঁইফুলের মতো সাদা ধবধবে সেই ভাত খেলে বহুক্ষণ হাতে মিষ্টি গন্ধ লেগে থাকে। এখানকার কমলা আর নাশপাতি যে একবার খেয়েছে, সারাজীবনও ভুলতে পারবে না। আমি দেখেছি বুড়োরা অসুখ আর খাবার ছাড়া অন্য কোনো বিষয় নিয়ে গল্প করতে পারেন না। মা-কাকিমার সবসময় শিলং-এর গল্প করেন। ওঁদের জন্যে বাড়িতে 'বেগম পত্রিকা' আসে। আমাদের জন্য আসে 'শুকতারা'। আজকাল শুকতারা আমার ভালো লাগে না। বিজু দেখি গোগ্রাসে গেলে। রামু পড়ার বই ছাড়া গল্পের বইপত্র খুব কমই পড়ে।

পাহাড়ের নিচে ঝর্নার পানিতে ছোট ছোট নুড়ি ছুড়ে মারছিলো রামু। পানিতে নুড়ি পড়ার টুংটাং শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। এদিকের পাহাড়াগুলো সব ছোটবড় নুড়িপাথরে বোঝাই হয়ে আছে। বর্ষার সময় পাহাড়ি ঝর্নায় অনেক সময় বড় পাথর গড়িয়ে আসে। এখন ঝর্নার পানি শান্ত সবুজ কাচের মতো। রোদেলা দুপুরে ঝর্নার গভীরে শুয়ে থাকা বড় পাথর আর রঙিন নুড়িগুলো ঝলমলে আলো ছড়ায়। আগে আমার রঙিন পাথর জমানোর সখ ছিলো। প্যাট্রিকের রঙিন পাথরের ওপর লোভ দেখে আমার সবগুলো পাথর ওকে দিয়ে ওর সঙ্গে ভাব জমিয়েছি। আমার লোভ ছিল ওদের চার আলমারি বইয়ের ওপর। এখনো আমি প্যাট্রিকদের সব বই পড়ে শেষ করতে পারি নি।

বিজু বললো, 'এবারের শুকতারায় তুষার-মানবের গল্পটা পড়েছিস আবু? আমাদের জাফলং-এ যদি হিমালয় থেকে ও রকম একটা ইয়েতি নেমে আসতো!'

আমি বললাম, 'ওটা একটা যাচ্ছেতাই গল্প। তার চেয়ে হিমালয়ের ভয়ংকর অনেক ভালো।'

বিজু বললো, 'তুই হিমালয়ের ভয়ংকর কোথায় পেলি?'

আমি জবাব দিলাম, 'প্যাট্রিকের কাছ থেকে। সে তো অনেক আগের কথা।'

বিজু মুখ কালো করে বললো, 'বারে, বইটা কবে থেকে আমি খুঁজছি আর তুই লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ে ফেলেছিস?'

বিজু এত সাধারণ ব্যাপার নিয়ে অভিমান করে যে মাঝেমাঝে আমার ভারি রাগ হয়। রামু ঝর্নায় নুড়ি ছুড়তে ছুড়তে হেসে বললো, 'তুই কবে শুকতারায় বিজ্ঞাপন দেখেছিস সেটা আবু কী করে জানবে! বই পড়তে চাইলে আবুর মতো লুকিয়ে প্যাট্রিকের সঙ্গে ভাব জমাগে, ওদের অনেক বই আছে।'

রামুর এ ধরনের বাঁকা কথা আমার ভালো লাগে না। আমি বললাম, 'কারো সঙ্গে ভাব জমাতে তো আমি কাউকে বারণ করি নি রামু। মেজ কাকিমা বললো, তুই নাকি সোনিয়ার সঙ্গে কথা বলতে চাস। তোকেও বলি রামু, ওভাবে কারো সঙ্গে ভাব জমানো যায় না।'

আমার কথা শুনে রামুর মুখটা বোকা-বোকা হয়ে গেলো। ও একটু হাসার চেষ্টা করে বললো, 'মেজ কাকিমা বুঝি তোকে বলেছে ওইসব! তুই যখন ভাব জমানোর ওস্তাদ, তখন সোনিয়ার সঙ্গে চেষ্টা করে দেখ না পারিস কিনা। ও তোকে পাত্তাই দেব না।'

আমি মুখ টিপে হেসে বললাম, 'দেয় কি না দেয় তুই জানিস কী করে? যখন দরকার হবে তখন ঠিকই ভাব জমাবো। তবে তোর মতো নিশ্চয়ই আমলকির আচার ঘুষ দিতে যাবো না'

'সোনিয়া প্যাট্রিকের মতো নয় যে রঙিন পাথর দিয়ে পটাবি।'

'আমার জানা আছে কার সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয়।'

আমাদের এরকম খোঁচা দেয়া শুরু হলে, বাধা না-পড়া পর্যন্ত চলতেই থাকে। একবার ছোড়দি বলেছিলো, 'মনে হচ্ছে তোরা অনন্তকাল ধরে এভাবে কথা বলে যেতে পারবি।' আমারও মাঝে মাঝে তাই মনে হয়।

হঠাৎ বিজু আমাদের কথার মাঝখানে বাধা দিলো। আঙুল তুলে বললো, 'দেখ দেখ, একটা লোক এদিকে আসছে।' আমি আর রামু একসঙ্গে সেদিকে তাকালাম।

তখনও বেশ দূরে ছিলেন তিনি। এই এলাকায় যে নতুন এসেছেন সেটা ওঁর হাঁটা দেখলেই বোঝা যায়। পাহাড়ের চড়াই দিয়ে ওঠার সময় বারবার নুড়িতে ওঁর পা পিছলে যাচ্ছিলো। আমাদের কখনো অমন হয় না। জাফলং-এর সবাই জানে কীভাবে নুড়ি-ছড়ানো পাহাড়ের চড়াই-উৎরাই দিয়ে হাঁটতে হয়। তিনি আসছিলেন জয়ন্তিয়া পাহাড় থেকে। জয়ন্তিয়া পাহাড়ে শুধু টং বেঁধে পাহাড়ি খাসিয়ারা থাকে। ওদের ওখানে এরকম একজন প্যান্টশার্টপরা, পিঠে ব্যাগ ঝোলানো ভদ্রলোক কোত্থেকে আসবেন আমরা ভেবে পেলাম না। আজকাল

অবশ্য কিছুকিছু খাসিয়া ছেলে খ্রিস্টান হয়ে প্যান্টশার্ট পরা শুরু করেছে।

আরো কাছে আসার পর দেখলাম রীতিমতো ভদ্রলোক। ছোড়দাদের বয়সী হবেন। বেশ লম্বা দেখতে, গায়ের রঙটা তামাটে, পরনে জিনস-এর প্যান্ট আর জ্যাকেট; অনেকটা সিনেমার হিচ হাইকারদের মতো।

বিজু ফিসফিস করে বললো, 'নিশ্চয়ই সোনিয়াদের বাড়িতে এসেছেন।'

রামু বললো, 'সোনিয়াদের বাড়িতে যাবার রাস্তা এটা নয়। ইনি যেদিক থেকে আসছেন তার আশেপাশে কোনো রাস্তাঘাট নেই।'

আমি বললাম, 'মনে হচ্ছে ইন্ডিয়া থেকে আসছেন।'

রামু তার সঙ্গে যোগ করলো, 'বিনা পাসপোর্টে।'

বিজু বললো, 'ঠিক বলেছিস। পাসপোর্ট থাকলে নিশ্চয়ই চেকপোস্ট দিয়ে আসতেন।'

রামু বললো, 'তখন আর তিনি আমাদের নজরে পড়তেন না।'

ভদ্রলোক আমাদের একেবারে কাছে এসে গেলেন। আমরা তিনজন হা করে তাঁর দিকে তাকিয়েছিলাম। ভদ্রলোক আমাদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। কাছে এসে ধুপ করে মাটিতে বসে পড়লেন। বললেন, 'তোমরা বুঝি এখানে থাকো?'

আমি মাথা নাড়লাম। রামু বলল, 'আপনি কোত্থেকে এসেছেন?'

ভদ্রলোক একটু হেসে বললেন, 'অনেক দূর থেকে। আপাতত আসছি চেরাপুঞ্জি থেকে।'

রামু আমার দিকে আড়চোখে তাকালো। বিজু বললো, 'আমরাও তাই ভেবেছিলাম। আপনি নিশ্চয়ই পাসপোর্ট করে আসেন নি।'

ভদ্রলোক এবারও হেসে শুধু মাথা নাড়লেন। রামু আবার আমার দিকে তাকালো। ভদ্রলোক একটা লম্বা দম টেনে বললেন, 'আহ কী তাজা বাতাস! সূর্য ওঠার আগে হাঁটা শুরু করেছি। পথে একবার মাত্র থেমেছিলাম।'

আমি বললাম, 'চেরাপুঞ্জি থেকে এখানে আসার পথ কি খুব খারাপ?'

ভদ্রলোক আগের মতো হেসে বললেন, 'পথ কোথায়? আমি তো আগাগোড়া পাহাড় ডিঙিয়ে এসেছি। কী বিচ্ছিরি পাহাড়, সব আলগা পাথর ছড়িয়ে আছে। আমি রামুর দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসলাম। রামু বলল, 'আপনি এই এলাকায় নতুন এসেছেন। এসব পাহাড়ে চলাফেরা করতে হলে অভ্যেস থাকা দরকার। খাসিয়ারা যখন ভারি বোঝা নিয়ে হাঁটে তখন ওদের পা একটুও পিছলে যায় না।'

ভদ্রলোক কোনো কথা না বলে লম্বা লম্বা দম টেনে বুকটা তাজা বাতাসে ভরে ফেললেন। আমি আস্তে আস্তে জানতে চাইলাম, 'আপনি কি জাফলং-এ এসেছেন?

ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন। লম্বা একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'কোথায় যাব আমি নিজেই জানি না।' একটু থেমে আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে কী জানি

ভাবলেন। তারপর বললেন, 'আমাকে পুলিস তাড়া করছে। আমি একজন পলাতক রাজনৈতিক কর্মী। আজকের রাতটা আমাকে জাফলং-এ কাটাতে হবে।'

পশ্চিমের ঝাউবনের আড়ালে শেষবিকেলের সূর্যটা কিছুক্ষণ আগে ডুবে গেছে। একটু পরে সন্ধ্যা নামবে। হিমালয় থেকে হু হু করে একঝলক উত্তুরে বাতাস আমাদের গা কাঁপিয়ে বয়ে গেলো। আমাদের সামনে বসে একুশ-বাইশ বছর বয়সের যে যুবকটি বসে সিগারেট খাচ্ছেন, যাঁকে দেখে বিদেশী ছবির নায়কের কথা মনে হয়েছিলো, তিনি আসলে একজন বিপ্লবী—ধাক্কাটা সামলাতে আমাদের তিনজনের বেশকিছু সময় লাগলো।

একটি উত্তেজনাময় সন্ধ্যা

পশ্চিমের লাল আকাশের দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক আপনমনে সিগারেট টানছিলেন। বিজু আর রামু দুজন একসঙ্গে আমার দিকে তাকালো। আমি বললাম, 'জাফলং-এ আপনার পরিচিত কেউ আছেন?'

ভদ্রলোক আকাশের ওপর চোখ রেখে শুধু মাথা নেড়ে অসম্মতি জানালেন। রামু আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললো, 'ওঁকে আমাদের বাসায় থাকতে বলবি?'

আমি চাপা গলায় বললাম, 'লুকিয়ে রাখতে হবে যে। বড় জেঠু জানতে পারলে হুলস্থুল কাণ্ড বাঁধাবে।'

রামু তেমনি ফিসফিস করে বললো, 'এক রাত আমাদের সঙ্গে চিলেকোঠার ঘরেই থাকতে পারেন।'

আমি মাথা নেড়ে সায় জানলাম। ভদ্রলোককে বললাম, 'আপনি ইচ্ছে করলে আমাদের সঙ্গে থাকতে পারেন।'

এইবার তিনি আমাদের দিকে তাকালেন। মিষ্টি হেসে বললেন 'এক রাতের ব্যাপার তো। তোমারা যদি আমার কথা কাউকে না বলো তাহলে এই পাহাড়েই রাতটা কাটিয়ে দিতে পারবো। গাছতলায় ঘুমোনোর অভ্যেস আছে আমার।'

আমি বললাম, 'এখানকার শীত সম্পর্কে আপনার তাহলে কোনো ধারণাই নেই। বাতির আগুন না জ্বেলে আপনি থাকতেই পারবেন না। আর বাগানে আগুন দেখলেই পাহারাদার এসে ধরবে।'

'আমাকে বাসায় নিয়ে কী বলবে?' ভদ্রলোক একটু গম্ভীর হয়ে জানতে চাইলেন।

'কাউকে কিছু বলতে হবে না। আপনাকে চিলেকোঠার ঘরে লুকিয়ে রাখবো।'

'তোমরা আমার জন্যে কেন এতটা করবে? পুলিসেরা টের পেলে তোমাদের সবারই বিপদ হবে!'

তাঁর কথার কী জবাব দেবো কিছুক্ষণ ভেবে পেলাম না। তারপর তাঁকে যে কথাটা বললাম সে কথা আমরা অচেনা কাউকে বলি না। আমি রীতিমতো গম্ভীর হয়ে বললাম, 'আমাদের বড়দাও একজন বিপ্লবী। তিনবছর ধরে তিনি জেলে আছেন। আপনাকে দেখে বড়দার কথা পড়লো বলেই আপনার জন্যে আমাদের ভাবতে হচ্ছে।'

বড়দা বড় জেঠুর ছেলে, আমাদের বংশের সবার বড়। বড়দা বহুদিন গোপন ছিলেন। সেবার জেঠিমা মারা যাবার খবর শুনে যখন দেখতে এলেন, তখনই পুলিস এসে তাঁকে ধরে নিয়ে গেলো। আমরা তখন ক্লাস সিক্সে পড়ি। বড়দাকে আমরা কখনো কাছে না পেলেও তাঁর জন্য আমাদের তিনজনের মনের ভেতর নরম একটা জায়গা ছিলো। বাড়িতে কেউ কখনো বড়দার কথা বলে না। বড়দার কথা শুনলেই বড় জেঠু বলেন, 'এ বাড়িতে ওর নাম কেউ উচ্চারণ করবে না। ও আমার ছেলে নয়।' জেল থেকে মাঝে মাঝে দিদা আর জেঠুর কাছে বড়দার চিঠি আসে। জেঠু কখনো বড়দার চিঠির জবাব দেন না। তবে মা জেঠুকে একদিন সেই চিঠি পড়ে কাঁদতে দেখেছেন।

আমার কথা শুনে ভদ্রলোক বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে আপনমনে বললেন, 'আমি জানি বাংলাদেশের ঘরে ঘরে বিপ্লবীরা আছে। তাদের ভাইবোনেরা আছে। একজন বিপ্লবীর এর চেয়ে নিরাপদ আশ্রয় আর কী হতে পারে!'

রামু খুশিতে চেঁচিয়ে উঠলো, 'আপনি তাহলে সত্যি আমাদের সঙ্গে থাকছেন?'

ভদ্রলোক হেসে রামুর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, 'নিশ্চয়ই। আমিও তোমাদের ভাই।'

আমি হেসে বললাম, 'তাহলে আপনাকে আমরা কী ডাকবো বলে দিন।'

তিনি একটু ভেবে মৃদু হেসে বললেন, 'ছোটবেলায় আমাকে বাড়িতে দুলাল ডাকতো। এ-নামে এখন আমাকে কেউ চেনে না! ডাকার মতো কেউ আর বেঁচেও নেই। তোমরা আমাকে দুলালদা ডাকতে পারো।'

রামু আর বিজু প্রায় একসঙ্গে বললো, 'কী সুন্দর নাম দুলালদা। কেউ না

ডাকুক আমরা ডাকবো।'

দুলালদাকে আমাদের প্রথম থেকেই ভালো লেগে গিয়েছিলো। সেজদা, ঝন্টুদা, ছোটদারা সবাই দল বেঁধে নাটক করেন, আমাদের কাছেও ঘেষঁতে দেন না। বলেন, বড়দের এখানে ঘুরঘুর করিস কেন? দুলালদা কী চমৎকার বন্ধুর মতো কথা বলেন। মনেই হয় না যে তিনি আমাদের চেয়ে ছ'সাত বছরের বড়।

রামু বললো, 'অন্ধকার হয়ে এলো। চল্ বাড়ি যাই।'

কখন যে আমাদের চারপাশে অন্ধকার জমতে শুরু করেছে টেরও পাই নি। জেঠিমা নির্ঘাত একচোট বকবেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বিজু বললো, 'দুলালদাকে নিয়ে বাসায় ঢুকবি কীভাবে?'

আমি বললাম, 'তোরা আগে চলে যা। পেছনের খিড়কি দরজাটা খুলে রাখিস। আমি দুলালদাকে নিয়ে একটু পরে আসছি। জেঠিমা জিজ্ঞেস করলে বলিস আমি প্যাট্রিকদের বাসায় গেছি।'

রামু আর বিজু উঠে চলে গেলো। দুলালদা আমাদের বাড়ির সব কথা শুনলেন। রামুর বাবা নেই শুনে দুঃখ পেলেন। মেজ জেঠু রোড এ্যাকসিডেন্টে কীভাবে মারা গেলেন, জেঠিমা আর রামু কীরকম আশ্চর্যজনকভাবে বেঁচে গিয়েছিল, সবই দুলালদাকে বললাম। এমনকি সোনিয়ার কথাও বাদ গেলো না। তবে একটু বাড়িয়ে বললাম, সোনিয়া আমার বন্ধু। দুলালদা বললেন, 'আমার কথা তোমাদেরকে রাতে বলবো। অবশ্য তোমরা যদি শুনতে চাও।'

আমি বললাম, 'আপনার সব কথা না শুনলে রাতে আমাদের ঘুম হবে না দুলাল দা।'

দুলালদাকে নিয়ে যখন বাড়িতে এলাম তখন রীতিমতো রাত হয়ে গেছে। উঠোনে ছোড়দারা হাত-পা ছুঁড়ে গলা ফাটিয়ে সিরাজউদ্দৌলা নাটকের মহড়া দিচ্ছেন। আমরা সদর দরজা দিয়ে না ঢুকে পাচিলের গা ঘেঁষে খিড়কি দরজার দিকে গেলাম। নানারকম ময়লা আবর্জনা মাড়িয়ে যখন লোহার ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে যাবো তখন অন্ধকার ফুঁড়ে রামু বেরিয়ে এলো। ফিসফিস করে বললো, 'এত দেরি করলি কেন? কখন থেকে দাঁড়িয়ে মশার কামড় খাচ্ছি! সোজা উঠে যা। আমি ছাদে যাবার বড় দরজা বন্ধ করে দিয়েছি।'

অন্ধকারে ভূতের মতো রামুকে দেখে আমি দারুণ চমকে উঠেছিলাম। রীতিমতো ভয়ই পেয়েছিলাম। কাঁধের ওপর দুলালদা হাত রাখতেই সব ভয় কর্পূরের মতো উবে গেলো। আমরা দুজন পা টিপে টিপে ছাদে উঠে এলাম। পুরোনো লোহার সিঁড়ি বেয়ে জোরে উঠতে গেলেই বিচিত্র সব শব্দ হয়।

ছাদের ওপর চন্দনের গুঁড়োর মতো মোলায়েম জ্যোৎস্না এখানে-সেখানে ছড়িয়ে ছিলো। চারপাশে কালো কালো পাহাড়ের সারি। মনে হয় সাদা কুয়াশার আকাশের নিচে জমাট বাঁধা উত্তাল কালো সমুদ্র। দূরের পাহাড়গুলো ঘন সাদা

কুয়াশার চাদরের আড়ালে ঢাকা পড়েছে। দুলালরা বললেন, 'কী চমৎকার রাত।'

এরকম চমৎকার রাত আমরা রোজই দেখি। তবে এমন উত্তেজনা আগে কখনো বোধ করি নি। পুলিস হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে এমন একজন বিপ্লবীকে আমরা আশ্রয় দিয়েছি, তাঁর ভালো-মন্দের ভার সবটুকু আমাদের ওপর—এর চেয়ে রোমাঞ্চকর আর কী হতে পারে। অথচ সাত ঘন্টা আগেও আমরা তিনজন ভাবছিলাম, উত্তেজনার অভাবে আমাদের জীবনটা কীরকম ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে।

দুলালদা চারপাশে ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন। রামু এসে বললো, 'কার্নিশের ধারে যাবেন না দুলালদা।'

দুলালদা একটু অবাক হয়ে বললেন, 'কেন রামু, পড়ে যাব নাকি!'

রামু হেসে বলল, 'তা কেন! কার্নিশের ধারে আপনার মতো লম্বা কেউ হাঁটলে, দোতালার বারান্দা থেকে দেখা যাবে যে।'

রামুর কথা শুনে দুলালদা হেসে ফেললেন— 'তাই বলো। ঠিক আছে রামু, আমি ছাদের মাঝখানেই থাকবো।' এই বলে দুলালদা কী যেন ভাবলেন, আপনমনে মৃদু হাসলেন—যেন একটা মজার কথা মনে পড়েছে। তারপর বললেন, 'আমাদের বাড়িতে এরকম বিশাল এক ছাদ ছিলো। এরকম বিশাল এক ছাদ ছিলো। ছোটবেলায় ছাদে উঠে ঘুড়ি ওড়াতাম, আর মা সবসময় বলতেন, কার্নিশের ধারে যাসনে দুলাল! তোমার কথা শুনে সেই ঘুড়ি ওড়ানোর দিনগুলোর কাছে ফিরে গিয়েছিলাম।'

কিছুক্ষণ পর আস্তে আস্তে আমি বললাম, 'ঘরে চলুন দুলালদা, কুয়াশা পড়ছে।'

দুলালদা চিলেকোঠার ঘরে ঢুকে বললেন, 'সত্যিই তোমাদের এখানে শীতটা বেশি।'

আমাদের চিলেকোঠার ঘরটা খুব ছোট না হলেও নানারকম অকেজো জিনিসপত্রে সবসময় বোঝাই থাকে। এইসব অকেজো জিনিসের কিছু বাড়ির আর বেশিরভাগই আমাদের নিজস্ব সম্পত্তি। ঘরের চারভাগের একভাগ জায়গা দখল করে রেখেছে, দাদু আর দিদার বিয়ের সময়কার প্রকাণ্ড মেহগিনি কাঠের পালঙ্কটা। আমাদের মতো পাঁচজন শুতে পারে সেখানে। বাকি জায়গাটুকুর পাঁচভাগের একভাগ জায়গা দখল করেছে দিদার মায়ের দেয়া বর্মীসেগুন কাঠের একটা সিন্দুক। সিন্দুকের পায়ে আঙুরলতার নকশা-কাটা রয়েছে। সিন্দুকের ভেতরের জিনিসপত্র অবশ্য সবই আমাদের তিনজনের। এ ছাড়া দুটো ছোট্ট টেবিল আর একটা রঙচটা ডিভানে ঘরের প্রায় পুরোটাই ভরে আছে।

দেয়ালে ক্যালেন্ডার-কাটা ছবি, ময়ূরের পালক, হরিণের শিং, রঙচঙে ঢাউস ঘুড়ি, রঙিন পেন্সিল দিয়ে বিজুর আঁকা অভিনব প্রাকৃতিক দৃশ্য—সবকিছু দেখে

দুলালদা বললেন, 'বাহ্ চমৎকার ঘর তো তোমাদের! ছোটবেলায় দেয়ালে ছবি সাঁটার জন্যে কতদিন যে বাবার বকুনি খেয়েছি আমি। তোমরা বারবার আমাকে ছোটবেলার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছো।'

আমাদের ঘরটা সবসময় ভীষণ নোংরা থাকে। ভাগ্যিস রামু আর বিজু আগে এসে বুদ্ধি করে ঘরটা পরিষ্কার করে রেখেছিলো। নইলে ভারি লজ্জা পেতাম। বিজু এসে বললো, 'তোরা খেতে যাবি না? মা বলছে কতক্ষণ তোদের জন্য বসে থাকবে?'

রামু বললো, 'তুই খেয়ে নিয়েছিস তো?'

বিজু জামার হাতায় মুখ মুছে ঘাড় কাত করে সায় জানালো। আমি বললাম , 'তুই তাহলে দুলালদার কাছে থাক। আমি আর রামু এক্ষুনি আসছি।'

আমরা সবসময় রান্নাঘরে বসে খাই। খাবারঘর বড়দের জন্যে। দু'বছর ধরে ছোড়দা খাবারঘরে যাচ্ছে। নইলে আগে পাটি পেতে বসে আমাদের সঙ্গেই খেত। রান্নাঘরে খেতে অবশ্য কোনো অসুবিধে হয় না। পচার মা দুবেলা ঘষেমেজে সবকিছু তকতকে করে রাখে। ও নাকি নোংরা একটুও সহ্য করতে পারে না। পচা যখন ছোট ছিল তখন ওকে কোলে নিতো না, পাছে ও কাপড় নোংরা করে দেয় সেই ভয়ে। মা বলেন, 'এটা এক ধরনের বাতিক।'

আমরা রান্নাঘরে ঢুকতেই সেজ কাকিমা বললেন, 'তোদের হল কী বল্ তো, কখন থেকে তোদের ডাকছি, এদিকে জ্বরে আমার গা পুড়ে যাচ্ছে। তা কতক্ষণ বসে থাকি বল।!'

রামু বললো, 'সেকি কাকিমা, ছোড়দা তোমাকে ওষুধ এনে দেয় নি?'

'আর দিয়েছে!' সেজ কাকিমা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আমার ওষুধ আনতে গেলে ষাঁড়ের মতো চেঁচিয়ে পাড়া মাত করে নাটকের মহড়া দেবে কে! ওদের চ্যাঁচানিতে আমার মাথা ধরা আরো বেড়ে গেছে।'

ছোড়দা আর ঝন্টুদার গলার প্রশংসা না করে পারা যায় না। রান্নাঘরর থেকেও ওদের—'বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার মহান অধিপতি, আমি তোমায় ভুলি নি জনাব' ইত্যাদি শোনা যাচ্ছিল। ছোড়দারা সামাজিক নাটক করেন না। বলেন, ওসব নাটকে নাকি গলা খুলে সংলাপ বলা যায় না। তাই তাঁরা সবসময় সিরাজউদ্দৌলা, টিপু সুলতান, শাহজাহান্, মেবার পতন-এসব নাটক করবেন।

রামু সমবেদনার সুরে সেজ কাকিমাকে বললো 'তুমি গিয়ে শুয়ে থাকো গে কাকিমা। খাবার আমরা আমাদের ঘরে নিয়ে যাচ্ছি। খেয়ে উঠেই তোমার ওষুধ এনে দেবো।'

সেজ কাকিমা রেহাই পেয়ে খুশি হয়ে বললেন, 'তোদের সব বেড়ে রেখেছি। দরকার হলে জালের আলমারি থেকে নিস। মা পায়েস না খেয়ে তোদের জন্যে রেখে দিয়েছেন।'

আমরা মাঝে মাঝে আমাদের খাবার ঘরে নিয়ে গিয়ে খাই। সেজ কাকিমা চলে যাওয়ার পর আমরা এলমুনিয়ামের গামলায় আরো কিছু ভাত বেড়ে নিলাম। বাটিতে যতটুকু তরকারি ছিলো তাতে তিনজন অনায়াসে খেতে পারবো। তরকারি বাড়ার সময় দিদা নির্ঘাত সামনে ছিলেন না।

রামু প্লেট আর তরকারির বাটি দুটো নিলো। আমি ভাতের গামলা, পানির জগ আর দুটো গ্লাস নিয়ে বেশ কসরত করেই সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছিলাম। দোতালায় উঠতেই বড় জেঠুর সামনে পড়ে গেলাম। বড় জেঠু আমাদের দেখে চোখ পিটপিট করে বললেন, 'বাড়িতে কেউ এসেছে নাকি। খাবার নিচ্ছিস কার জন্যে?'

আমার বুকের ভেতর ধুপধাপ শব্দ আরম্ভ হলো। তাকিয়ে দেখি রামুর মুখটা কাগজের মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। আমি ঢোক গিলে বললাম, 'সেজ কাকিমার ভীষণ জ্বর এসেছে। আমাদের দেরি হবে শুনে কাকিমা বললেন খাবার ওপরে নিয়ে যেতে।'

বড় জেঠু ভুরু কুঁচকে বললেন, 'খেতে দেরি হবে কেন, বিকেলে বুঝি বাজারে গিয়ে তেলেভাজা খেয়েছিস?'

রামু বলল, 'কে বলেছে আমরা তেরেভাজা খেয়েছি! আবুর খিদে পায় নি বলেই তো কাকিমা বললেন। আমার সেই কখন ক্ষিদে পেয়েছে।'

বড় জেঠুকে দেখে কেউ ভয় পাচ্ছে এটা বুঝতে পারলে তিনি খুব খুশি হন। আমাদের ভাবখানা ছিল ভয়ে যেন আত্মাপাখি খাঁচা-ছাড়া হয়ে গেছে। হঠাৎ জেঠুর খেয়াল হলো সেজ কাকিমার অসুখ। তিনি চেঁচিয়ে বললেন, 'সেজ বৌয়ের অসুখ, হাঁদা ওষুধ এনে দেয় নি।?'

আমি বললাম, ' খেয়ে উঠে রামু আর আমি যাবো।'

বড় জেঠুর মেজাজ তক্ষুনি সপ্তমে চড়ে গেল। 'তোরা কী ওষুধ আনবি? হাঁদা বুঝি এখনো উঠোনে বসে চ্যাঁচাচ্ছে? দাঁড়া, ওর পিঠে আমি আস্ত খড়ম ভাঙবো। পরীক্ষায় ফেল করে ওর চর্বি বেড়েছে।' এই বলে বড় জেটু খড়ম পায়ে খটাশ খটাশ শব্দ তুলে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেলেন। আমরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

দুলালদাকে খাওয়াতে গিয়ে বড়দার কথা মনে পড়ে গেলো। দিদা মাঝে মাঝে আপনমনে বলেন, ছোঁড়াটা না-খেয়ে না-দেয়ে বনে-বাদাড়ে কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে কে জানে। বড়দার কথা ভাবলে দিদার মন খারাপ হয়ে যায়। বড়দার সঙ্গে কখনো যদি দেখা হয় তখন দুলালদার কথা তাঁকে বলবো! বড়দা যে তখন আমাদের আনন্দে বুকে জড়িয়ে ধরবেন এ কথা হলপ করে বলতে পারি। আবার ভাবলাম, আহা বড়দা যদি এসময়ে বাড়িতে থাকতেন! সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লো বড়দা এখন ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের ছোট্ট একটা সেলে বন্দি হয়ে আছেন। কথাটা ভাবতেই বুকের ভেতরটা ফাঁকা ফাঁকা মনে হলো।

খাবার দেখে দুলালদার মুখটা খুশিতে চকচক করে উঠলো। বুঝলাম সারাদিন পেটে কিছু পড়েনি। ছাদে গিয়ে দুলালদা জগের পানিতে মুখহাত ধুয়ে নিলেন। তারপর আমাদের ময়লা তোয়ালেতে মুখ মুছে খেতে বসলেন। বলেন, 'কতদিন পর যে ভাত খাচ্ছি মনে নেই।'

রামু দুলালদাকে খাবার বেড়ে দিচ্ছিলো। আর দুলালদা—' এত সুন্দর ভাত আমি জীবনেও খাই নি; কী চমৎকার রান্না।' এসব কথা বলছিলেন ।

আমি খেতে খেতে দুলালদাকে বললাম, 'আজ রাতে ঘুমোনো চলবে না। আমরা আপনার গল্প শুনবো।'

উত্তেজনা, উদ্বেগ আর আনন্দে আমার খিদে বহু আগেই উবে গিয়েছিলো। শুধু ভদ্রতা করার জন্যেই বসা। দুলালদা অবশ্য খেতে বসে মেয়েদের মতো লজ্জা করেন নি।

বিজুর মতো সারাক্ষণ খাইখাই স্বভাব অবশ্য আমার নয়। তবে খেতে বসে কেন লজ্জা করবো এটা আমি কখনো বুঝে উঠতে পারি নি। বড়দা আর দুলালদাদের কথা অবশ্য আলাদা। ওঁদের না-খেয়ে থাকার অভ্যেস করতে হয়।

একজন বিপ্লবীর গল্প

খেয়ে উঠে হাত ধুয়ে আবার নোংরা তোয়ালেতে মুখ মুছে দুলালদা একটা চার্মিনার সিগারেট ধরালেন। বাইরে তখন হু হু করে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। মনে হচ্ছে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেই বুঝি বরফ-ঢাকা হিমালয় দেখা যাবে। একটু জোরে বাতাস বইলে ঝাউবনে শনশন শব্দ হয়। কত রাতে লেপের তলায় শুয়ে সেই শব্দ শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে গেছি। কদিন পরে হাড় কাঁপিয়ে যে শীত নামবে, শুধু লেপ গায়ে দিয়ে সেই শীত তাড়ানো যাবে না। তখন পচার মা মাটির আঙটায় করে ঘরে আগুন রেখে যায়। শীতের সময় ভোর রাতের দিকে মনে হয়, আমাদের লেপের ওপর বুঝি কেউ ঠাণ্ডা পানি ঢেলে দিয়েছে। গরম মুজোর ভেতর হাত-পা সব ঠাণ্ডা হয়ে যায়। কোনো রাতে যদি মুখে গ্লিসারিন মাখতে ভুলে যাই, পরদিন মুখ ধোবার সময় ঠোঁট দুটো ভীষণ জ্বলতে থাকে।

ঠাণ্ডা শুকনো বাতাসে ঠোঁট-মুখ ফেটে গিয়ে চড়চড় করে।

জানালা দিয়ে একঝলক ঠাণ্ডা ভেজা-বাতাস হুড়মুড় করে ঘরের ভেতর ঢুকে গেলো। রামু উঠে বন্ধ করে দিলো জানালাটা। আমরা তিনজন লেপ মুড়ি দিয়ে খাটের ওপর বসেছিলাম। দুলালদা কিছুতেই খাটে শুতে চাইলেন না। বললেন, 'ডিভানের ওপর চমৎকার রাত কাটিয়ে দেয়া যাবে। কতক্ষণই বা ঘুমোব!'

বিজু ওর লেপটা দুলালকে দিয়ে নিজে এসে রামুর লেপের তলায় ঢুকেছে। দুলালদার সিগারেটটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। বার কয়েক জোরে টেনে এক বুক ধোঁয়া ছেড়ে ডিভানের ওপর লেপ মুড়ি দিয়ে বসে বললেন, 'বলো কী শুনতে চাও। আমার ছোটবেলার গল্প, না এখন কী করি সে-সব গল্প।'

বিজু বললো, 'ছোটবেলার গল্প।'

আমি বললাম, 'এখনকার গল্প।'

দুলালদা মৃদু হেসে বললেন, 'একসঙ্গে দুটো কী করে বলি!'

রামু বললো, 'আগে ছোটবেলার গল্প বলুন। তারপর এখনকার গল্প।'

দুলালদা হেসে ফেললেন, 'তুমি খুব হিসেবি ছেলে রামু। অঙ্কে কত পেয়েছো?'

রামু নির্লিপ্ত গলায় বললো, 'একশো। বিজু সিঁড়ির দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিস তো?'

বিজু ঘাড় নেড়ে সায় জানালো, আমরা তিনজন গভীর আগ্রহ নিয়ে দুলালদার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমি মনে মনে ভাবছিলাম, দুলালদার মতো আমার যদি একটা বন্ধু থাকতো, যার কাছ থেকে দারুণ রোমাঞ্চকর সব গল্প শোনা যেত আর তার উত্তেজনাময় অভিযানের সঙ্গী হওয়া যেতো, তাহলে বেশ হতো।

আমাদের আগ্রহভরা তিনটি মুখের দিকে তাকিয়ে দুলালদা মৃদু হাসলেন। তারপর বললেন, 'আমি কিন্তু ভালো বলতে পারি না। আর বলার মতো সে-রকম সাংঘাতিক কিছু নেইও। ছোটবেলাটা তোমাদের মতোই ক্লাস করে, ঘুড়ি উড়িয়ে, দল বেঁধে আড্ডা দিয়ে কাটিয়েছি। বাবা-মার একমাত্র ছেলে ছিলাম আমি। আমার বাবা এককালে কমিউনিষ্ট পার্টি করতেন। পরে পার্টি ছেড়ে বিরাট ইঞ্জিনিয়ার হয়েছেন। কোলকাতার আলীপুরে আমাদের নিজেদের বাড়ি ছিলো।'

বিজু বললো, 'ছিলো বলছেন কেন, এখন নেই?'

দুলালদা বললেন, 'হয়তো এখনো আছে। আমি জানি না। ছ'বছর ধরে বাড়ির সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ নেই।'

বিজু আবার বললো, 'আপনার বাবা-মা নিশ্চয়ই এখনো সেই বাড়িতে থাকেন?'

দুলালদা ম্লান হেসে বললেন, 'আমি যখন তোমার মতো ছোট ছিলাম তখন

আমার মা মারা যান। বাবাকে ছ'বছর আগে বাড়িতে দেখে এসেছি। হয়তো তিনি এখনো বেঁচে আছেন। হয়তো-বা নেই। ছ'বছর আগে, বাড়ি-ঘর বাবা-মা সব কিছু ছেড়েই পার্টিতে যোগ দিয়েছিলাম।'

বিজু বললো, 'প্রথম থেকে বলুন দুলালদা। আপনার মায়ের কথা বলুন।'

দুলালদা কিছুক্ষণ চুপ থেকে কী যেন ভাবলেন। তারপর ম্লান হাসলেন— 'ছোটবেলার কথা আজকাল একেবারেই মনে করতে পারি না। আমার মাও রাজনীতি করতেন। বাবার চেয়ে মা অনেক বেশি সচেতন ছিলেন। খুব সাদামাটা থাকতেন। আলীপুরের বাড়িটা বাবা নিজের পছন্দমতো সাজিয়েছিলেন। মা বিলাসিতা ভালোবাসতেন না। আলীপুরের সেই ঝকঝকে বাড়িতে মাকে মনে হত অন্য বাড়ির কেউ। মা আমাকে বলতেন সৎপথে থেকে কেউ ধনী হতে পারে না। বড়লোক হতে গেলেই গরিব আর ভালো লোকদের ঠকাতে হয়। মা বাবাকে বলতেন, তুমি আমার বিশ্বাস, আমার আদর্শ সবকিছু ভেঙে দিয়েছো। তোমার সঙ্গে থাকাও অন্যায়। বাবা মার কথা শুনে শুধু হাসতেন। কখনো মাকে বলতেন, দুলালকে আমি আমার চেয়ে বড় ইঞ্জিনিয়ার বানাবো। মা বলতেন, তুমি না একসময় কমিউনিষ্ট পার্টি করতে! আমার ছেলেকে আমি নষ্ট হতে দেব না। কমিউনিষ্ট সম্পর্কে আমার একটা ধারণা ছোটবেলা থেকেই ছিলো। তখন আমি মাকে মনে করতাম কমিউনিস্ট। মা আমাকে বলতেন, তোর বাবা নিজেকে তো নষ্ট করেছে, আমার জীবনটাও নষ্ট করে দিয়েছে। দুলাল তুই বড় হয়ে গ্রামে চলে যাবি। গ্রামে গিয়ে মানুষের দুঃখ দূর করার জন্যে কাজ করবি। একদিন স্কুলে থেকে বাড়ি ফিরে শুনি মা নাকি হার্টফেল করে মারা গেছেন। বাড়িতে অনেক লোক। সবাই বাবাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। আমি মাকে একবার দেখেই ছুটে ছাদে চলে গিয়েছিলাম। বহুক্ষণ ছাদে বসে কেঁদেছিলাম। তারপর এক মহিলা এসে আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, দুলাল তোর মা হার্টফেল করে মারা যান নি। তিনি আত্মহত্যা করেছেন।'

এইটুকু বলে দুলালদা থামলেন। তারপর যেন আপন মনে বললেন, 'আমার মার নাম ছিল রুনু।'

কিছুক্ষণের জন্যে দুলালদা অতীতের এক দুঃখময় সময়ের গভীরে হারিয়ে গেলেন। তাঁর হাতে-ধরা চারমিনার সিগারেটের মাথায় ছাই জমতে লাগলো। ঘরের ভেতরটা তের বছর বয়সের একটি মা-হারা ছেলের দুঃখে ভারী হয়ে গেলো। আমার বুকের ভেতর আমাদের বয়সী একজন দুলালের দুঃখ কান্নার ঢেউ তুললো। বিজু আস্তে আস্তে বললো, 'তারপর কী হল দুলালদা?'

দুলালদা হাতের শেষ হয়ে যাওয়া সিগারেটে আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে ম্লান হেসে বললেন, 'মা মারা যাবার পর থেকে বাবাকে আমি কখনো পছন্দ করতে পারি নি। অথচ আমার যাতে এতটুকু অযত্ন না হয় সেদিকে বাবা কড়া নজর

রাখতেন। একদিন বাবাকে আমি প্রশ্ন করেছিলাম, বাবা মা কেন মরে গেলেন? বাবা হেসে বললেন, তোর মা আসলে খুব বোকা ছিলো। জীবন সম্পর্কে আজকাল কেউ তোর মার মতো ওভাবে ভাবে না। বাবার কথাগুলো আমার একটুও ভালো লাগে নি। তখনই ঠিক করলাম, আর কেউ মার মতো না ভাবুক, আমি ভাববো। মার আলমারিতে অনেক বই ছিলো। বাবা ওসব বই দেখে হাসতেন। মা বলতেন, দুলাল বড় হয়ে পড়বে। আমি সেসব বই পড়া শুরু করলাম। লেখাপড়ায় আমি তোমাদের মতোই ছিলাম। ক্লাশে সবসময় ফার্স্ট-সেকেন্ড হতাম। ম্যাট্রিকে প্লেসও ছিল। কলেজে যাবার আগেই আমি মার আলমারির সব বই পড়ে ফেলেছিলাম। প্রায় সবই ছিল রাজনীতি, অর্থনীতি আর ইতিহাসের বই। গোর্কির মাদার, ফুরমানভের চাপায়েভ, অস্ত্রয়ভস্কির হাউ দা স্টিল ওয়াজ টেম্পার্ড-এর মতো বিপ্লবী সাহিত্যও মার আলমারিতে কম ছিলো না। তোমরা নিশ্চয়ই সেসব বই এখনো পড়ো নি?'

বিজু আর রামু একসঙ্গে আমার দিকে তাকালো। লজ্জায় আধখানা হয়ে বললাম, 'আমি শুধু গোর্কির মা পড়েছি। অন্যগুলোর নামও শুনি নি।'

দুলালদা বললেন, 'কলেজে আমার বন্ধু ছিল দীপা। আমরা পড়তাম প্রেসিডেন্সী কলেজে। দীপার সঙ্গে মাঝে মাঝে রাজনীতির বিষয় নিয়ে আলোচনা করতাম। কলেজে প্রথম দু'বছর কোনো পার্টিতে যোগ দিই নি। তখন আমাদের ওখানে সিপিএম-এর দোর্দণ্ড প্রতাপ। অথচ ওদের কাজ পুরোপুরি সমর্থন করতে পারতাম না। ওরা এম-এলদের বলত প্রতিক্রিয়াশীল। এটাও আমি বুঝতাম না— গ্রামে গিয়ে যারা বিপ্লবের জন্য কাজ করছে তাদের কেন প্রতিক্রিয়াশীল বলা হবে।'

বিজু বললো, 'প্রতিক্রিয়াশীল মানে কী দুলালদা?'

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, 'খুব বাজে লোককে বলে প্রতিক্রিয়াশীল।'

দুলালদা মৃদু হেসে বললেন, 'যারা প্রগতির শত্রু, যারা মানুষের ভালো চায় না তারাই প্রতিক্রিয়াশীল। আমি ভাবলাম ভুল করে কোথায় গিয়ে ঢুকবো, আর সবাই বলবে প্রতিক্রিয়াশীল এটা তো হতে পারে না। তবে ভোট দিয়ে আর পার্লামেন্টের কথা বলে যে আমাদের দেশে বিপ্লব হবে না এটা তখন আমি ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলাম। আমি তখন বিএসসিতে ভর্তি হয়েছি, একদিন দীপা এসে আমাকে কিছু লিফলেট আর পত্রিকা এনে দিলো। চারু মজুমদারের লেখা আমি তখনই প্রথম পড়লাম। পড়তে পড়তে দারুণ উত্তেজিত হয়ে গেলাম। পরদিন দীপাকে এসে বললাম, এটাই আমাদের পথ দীপা। আমি সব ঠিক করে ফেলেছি। দীপা শুধু বললো, আমি জানতাম তোমাকে আমরা পাবো।

'তারপর একদিন কলেজ ছাড়ার ডাক এল। সবকিছু ছেড়ে সেদিন ঠিকই বেরিয়ে এসেছিলাম। দীপা ছিলো আমার সঙ্গে। তখন আমার মনে হয়েছিলো

কিছুই আমার সাধ্যের বাইরে নয়। দু'বছরের মধ্যেই দেশকে মুক্ত করে ফেলবো। বিভিন্ন জায়গায় তখন আমাদের জোর লড়াই চলছে। আমি নিজেও বহু এ্যাকশনে গিয়েছি। কখনো পুলিসের সঙ্গে লড়াই করেছি। কখনো গ্রামের জোতদার মেরেছি। এরকম এক এ্যাকশানে গিয়ে একদিন দীপাকে হারালাম। চারু মজুমদার তখন আমাকে একটা চিঠি লিখেছিলেন। বলেছিলেন, এটা আত্মত্যাগের যুগ, আত্মরক্ষার নয়। জীবন দেয়ার অগ্রাধিকার পেয়েছি বলেই তো আমরা কমিউনিষ্ট।'

রামু বলল, 'চারু মজুমদারকে আপনি কখনো দেখেছেন দুলালদা?'

দুলালদা মাথা নাড়লেন, 'না দেখি নি। তবে তিনি আমাকে চিনতেন। আমরা সবসময় তাঁর সই করা সার্কুলার পেতাম। দীপা মারা যাবার পর তাঁর চিঠি পেয়ে আমি আরো বেশি সক্রিয় হয়ে উঠলাম। প্রত্যেকটা খতম-এ্যাকশনে আমি নিজে যেতাম। তখন আমাদের বলা হয়েছিলো, শ্রেণীশত্রুর রক্তে হাত না রাঙাতে পারলে কমিউনিস্ট হওয়া যায় না। নিজ হাতে কম করে হলেও তিরিশটা শ্রেণীশত্রু আমি খতম করেছি। পরে অবশ্য তদন্ত করে দেখা গেছে সবগুলো খতম সঠিক ছিলো না।

'এরপর শুরু হলো বিপর্যয়। প্রথমে কীভাবে বিপর্যয় শুরু হলো টেরও পাইনি। টের পেলাম তখন, যখন আমরা সিআরপি আর মিলিটারির তাড়া খেয়ে গ্রাম থেকে গ্রামে পালিয়ে বেড়াচ্ছি, কোথাও এতটুকু আশ্রয় পাচ্ছি না। এমনকি যে কৃষকদের মুক্তির জন্যে আমরা লড়াই করেছিলাম তারাও ভয়ে আমাদের আশ্রয় দিতে চাইলো না। আমাদের নিজেদের মুক্ত এলাকাগুলো একের পর এক হাতছাড়া হয়ে গেলো। খবর পেলাম কোলকাতায় আমাদের কমরেডদের পাড়া ঘেরাও করে ধরে এনে, মাথা কেটে নিয়ে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিচ্ছে। সনাক্ত করার জন্য শুধু মাথাটি রেখে দিতো। একাত্তর সালে কোলকাতায় একরাতে ওরা আমাদের সত্তুরজন কমরেডকে এভাবে হত্যা করেছিলো। আমরা একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়লাম। নেতাদের কারো সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পেরে আমি আর দুজন কমরেড জব্বলপুরে পালিয়ে গেলাম। সেখানে পাহাড়ে লুকিয়েছিলাম কিছুদিন। আমাদের দেশটা খুবই বড়। অনেক মানুষও সেখানে। তবু লুকিয়ে থাকার মতো যথেষ্ট জায়গা কিন্তু সেখানে নেই। আমি বাঙালি; উত্তর, দক্ষিণ, পশ্চিম যেদিকেই যাই মানুষের চোখে ধুলো দিতে পারি না। আমাদের উদ্দেশ্যহীন পথ চলাটাকে অনেকে সন্দেহের চোখে দেখতো, কাজ করতে চাইতাম, কাজ পেতাম না। জব্বলপুরে কতদিন শুধু ঝর্নার পানি খেয়ে কাটিয়েছি। এ-সময়ে শুধু একটা কাজই ঠিকমতো করেছি, সেটা হচ্ছে পড়াশোনা। পার্টিতে ঢোকার পর যে-কাজটি একেবারেই হতো না। তবে নিজেদের কাজের সঙ্গে তত্ত্বকে মেলাতে না পেরে তখন আরো হতাশ হচ্ছিলাম।

নিজেদের পুরো কাজের তদন্ত করে দেখলাম এতদিন আমরা শুধু একটার পর একটা ভুলই করে এসেছি। ভুল যখন করেছি তার মাশুল তো দিতেই হবে। যখন খবর পেতাম আমার দীর্ঘদিনের সহকর্মী বন্ধুকে ওরা বর্বরের মতো হত্যা করেছে তখন নিজেজেই শেষ করে ফেলার ইচ্ছে হতো। কখনো ভাবতাম একটা পিস্তল নিয়ে বেরিয়ে পড়বো, যে বাধা দেবে তাকেই গুলি করবো। আমার রক্তের ভেতর তখন হত্যা করার এক দারুণ নেশা সারাক্ষণ তাড়া করে ফিরতো। আসলে তখন আমি পুরোপুরি একটা পশুতে পরিণত হয়েছিলাম।'

কথা বলতে বলতে দুলালদার মুখে যন্ত্রণায় নীল ছায়া ঘনিয়ে এলো। আমি বুঝলাম এসব কথা বলতে দুলালদার খুব কষ্ট হচ্ছে। রামু আর বিজু অসহায়ের মতো দুলালদার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলো। আমি বললাম, 'এখন থাক দুলালদা। পরে কখনো শুনবো।'

দুলালদা ম্লান হেসে মাথা নাড়লেন, 'এখন আর আমার কষ্ট হয় না। তখন হতো। এমন অনেক কথা আছে যা তোমাদের বলা যাবে না, অথচ কী ভয়ংকর যন্ত্রণায় স্মৃতি! আমাকে সারাক্ষণ রক্তাক্ত করতো। একজন মানুষের যন্ত্রণা কতখানি চরমে যেতে পারে সেই অভিজ্ঞতা আমার আছে।'

রামু বললো, 'এখন আপনাদের অবস্থা কী রকম দুলালদা?'

দুলালদা একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, 'এখনো পালিয়ে বেড়াচ্ছি। আমার ছবি আছে পুলিশের কাছে। কলেজে থাকতে আমার দাড়ি ছিলো। এখন দাড়ি কেটে ফেললেও বেশিক্ষণ নিজেকে এক জায়গায় লুকিয়ে রাখা যায় না। চেরাপুঞ্জি ছিলাম দিন দশেক। পুলিশ টের পেয়ে গেলো। আজ রাতেই আমাকে ধরবার প্ল্যান করেছিল। তাই ভোর না হতেই সেখান থেকে পালিয়েছি। পার্টির যারা এখনো বেঁচে আছে তাদের অবস্থাও ঠিক আমার মতো। কোনও যোগাযোগ নেই। পার্টি ভেঙে কয়েকটা গ্রুপ হয়েছে। সবাই পথ খুঁজে বেড়াচ্ছি। লেনিনের একটা কথা এতদিনে উপলব্ধি করছি— 'বিপ্লবী তত্ত্ব ছাড়া বিপ্লব হয় না।'

বিজু বলল, 'আচ্ছা দুলালদা, পুলিস কি আপনাকে ধরার জন্যে এখানে আসতে পারে?'

দুলালদা মৃদু হেসে বললেন, 'পারে। তবে ওখানকার পুলিস নয়। এখানকার পুলিস পেলেও আমাকে হাজতে পুরে দেবে। আমাদের পুলিস যদি সন্দেহ করে আমি এদিকে এসেছি তাহলে সঙ্গে সঙ্গে এখানকার পুলিসকে খবর দেবে। আমাদের পুলিসের চেয়ে তোমাদের পুলিসরা বিপ্লবীদের জন্য এতটুকু ভালো নয়, এ খবর আমার জানা আছে।'

আমি ভাবছিলাম চেরাপুঞ্জির কথা। পুলিস এতক্ষণে নিশ্চয়ই তন্নতন্ন করে দুলালকে খুঁজেছে। দুলালদা যদি টের না পেতেন তাহলে ঠিকই তিনি ধরা পড়ে যেতেন। ধরার পর দুলালদাকে নিশ্চয়ই সঙ্গে সঙ্গে মেরে ফেলতো। আজ রাতে

আমরা ওঁকে আমাদের ঘরে না আনলেও ধরা পড়তে পারতেন। আজকাল মাঝেমাঝে রক্ষীবাহিনী আর বিডিআরেরা জাফলং ঘুরে যায়। তা ছাড়া পাহারাদার তো আছেই। ক'দিন আগে ওরা এক স্মাগলারকে ধরেছিলো। দুলালদাকে ওরা স্মাগলার সন্দেহ করেই ধরতো।

বাইরে মাঝে মাঝে দমকা বাতাস বইছিলো। পুরোপুরি শীত নামার আগে এখানে ঝড় হয়। ঝাউবনে বাতাসের শনশন শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। ঝড় আসার আগে এরকম এলোমেলো দমকা বাতাস বয়। জয়ন্তিয়া পাহাড় থেকে মাঝে মাঝে বুনো কুকুরের করুণ ডাক ভেসে আসছিলো। শীতের ঠিক আগে পাহাড়ি কুকুর দল বেঁধে করুণ গলায় ডাকতে থাকে। পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তোলে সেই ডাক। বহু দূর পর্যন্ত শোনা যায়। কখনো ফেউয়ের ডাকও শোনা যায়। আমাদের খাসিয়া মালি দারুভূই বলে জয়ন্তিয়া পাহাড়ে নাকি বাঘও আছে।

রামু বলল, 'দুলালদা আপনি আমাদের এখানে থেকে যান। আমরা আপনাকে লুকিয়ে রাখবো।'

বুঝলাম আমার মতো রামুর মনটাও দুলালদার জন্যে খুব নরম হয়ে পড়েছে। ঠিক এই কথাটা আমিও বলতে চেয়েছিলাম।

দুলালদা হেসে বললেন, 'তাই কি কখনো হয়! আমাকে কাজ করতে হবে না?'

আমি বললাম, 'আপনি কোথায় কাজ করবেন?'

দুলালদা একটু ভেবে বললেন, 'আমি খাসিয়াদের ভেতর কাজ করতে চাই। পাঁচ বছর আগে আমি খাসিয়াদের গ্রামে কিছুদিন কাজ করেছিলাম।'

রামু বললো, 'তাহলে তো আপনাকে এখানে থাকতেই হচ্ছে। খাসিয়াদের ভেতর কাজ করার জন্যে এটাই সবচেয়ে ভালো জায়গা।'

দুলালদা বললেন, 'কাজ শুরু হলে আমি গ্রামে গিয়েই থাকবো। তবে গ্রামে যাবার আগে হয়তো আরো দু'একরাত এখানে থাকতে পারি; যদি তোমরা আমাকে আশ্রয় দাও।'

রামু খুশিতে উত্তেজিত হয়ে বললো, 'দু-তিনরাত কেন, দু-তিনমাস থাকুন না! আমরাও আপনার সঙ্গে কাজ করবো।'

দুলালদা হেসে বললেন, 'এখানে থেকে কাজ করলে তোমাদের সহযোগিতা আমার সব সময় দরকার হবে। এবার তোমরা শুয়ে পড়ো। রাত অনেক হলো। আমি ভোর হবার আগেই উঠতে চাই।'

শোবার কথা শুনে বিজু হাই তুললো। এত রাত অব্দি জেগে থাকার অভ্যেস নেই ওর। রামু শুতে শুতে বললো, 'আপনার ঘুম ভাঙলে আমাকেও উঠিয়ে দেবেন।

লাইট নিভিয়ে আমরা শুয়ে পড়লাম। আমি অনেক রাত অব্দি টের

পেয়েছিলাম, দুলালদা ডিভানে বসে সিগারেট খাচ্ছেন। আমি ভাবছিলাম কী অদ্ভুত মানুষ এই দুলালদা। তাঁর সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়েছে মাত্র সাতঘন্টা আগে। এরই ভেতর তিনি আমাদের চিন্তাভাবনা সবকিছু এলোমেলো করে দিয়েছেন। আমার মনে হলো, হারিয়ে যাওয়ার ঠিকানা আমাদের দুলালদাই দিতে পারবেন।

দিদা আর পচার মার আবিষ্কার

দুলালদা যখন রামুকে ডাকলেন, তখন আমারও ঘুম ভেঙে গেলো। তাকিয়ে দেখি দুলালদা যাওয়ার জন্যে তৈরি, আর রামু খাটে বসে চোখ কচলাচ্ছে। আমাকে দেখে দুলালদা বললেন, 'তুমিও উঠে গেছো নাকি! অনেক দেরি হয়ে গেলো। আমি ভেবেছিলাম রাত থাকতে বেরিয়ে পড়ব।'

দুলালদা জানালা খুলে দিয়েছেন। বাইরে তখন ভোর হয়ে গেছে। ঘন কুয়াশায় সবকিছু ঢাকা পড়েছে। আমি বললাম, 'এই কুয়াশায় কেউ রাস্তায় বেরোয় না দুলালদা। আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন।'

রামু বললো, 'বিজু ঘুমোক। আবু, তুই আমাদের সঙ্গে চল্। ফেরার পথে আমি একা আসবো নাকি!'

আমি গরম মুজো পরতে পরতে বললাম, 'তুই না বললেও আমি যেতাম।'

দুলালদা বললেন, 'আমার ব্যাগটা তাহলে এখানে থাক। রাতে যখন ফিরবো তখন সঙ্গে বয়ে কী লাভ।'

তিনজন পা টিপে টিপে পেছনের ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামলাম। নোংরা আবর্জনা মাড়িয়ে নাকে রুমাল-চাপা দিয়ে রাস্তায় এসে উঠলাম। কোথাও কোনো লোকজন নেই। শীতে আমাদের দাঁতে দাঁত লেগে ঠকঠক শব্দ হচ্ছিলো। রাতে দেখেছি দুলালদার গায়ের নীল জ্যাকেটটার নিচে শুধু একটা শার্ট রয়েছে। পোড়খাওয়া শরীর একেই বলে। আমরা জামা, সোয়েটার, চাদর গায়ে দিয়েও রীতিমতো কাঁপছিলাম।

সোনিয়াদের বাড়ির চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। বুঝলাম ওদের নেপালি চাকরটার ঘুম ভেঙেছে। সোনিয়াদের বাঙলোটা কোনো এক সাদা চামড়ার

সায়েব বানিয়েছিলেন। ভদ্রলোকের দুটো চা-বাগান ছিলো। গরমের সময় এখানে থাকতেন। সোনিয়ার বাবা জয়ন্তিয়াপুরের এক বিশাল চা-বাগানের ম্যানেজার। সেজ কাকিমা সোনিয়াদের বাসায় মাঝেমাঝে বেড়াতে যান। সোনিয়ার মা হাসি খালার সঙ্গে তাঁর ভারি ভাব। একদিন সেজ কাকিমাকে বলতে শুনেছি, সোনিয়ার বাবা নাকি মেম বিয়ে করেছেন, নতুন বৌ নিয়ে তিনি বাগানে থাকেন। মাঝে মাঝে এসে সোনিয়াদের দেখে যান। আমাদের এক রত্তি শহরে হাসি খালা সবসময় এই কারণটির জন্যেই নিজেকে গুটিয়ে রাখেন। সেজ কাকিমারা পাড়ার মহিলাদের সঙ্গে এ-নিয়ে হাসাহাসিও করেন।

সোনিয়ার কথা দুলালদাকে কালই বলেছিলাম। ওদের বাড়িটা তাঁকে দেখিয়ে বললাম, 'এখানেই সোনিয়া থাকে ওর মায়ের সঙ্গে।'

সোনিয়াদের বাড়ি পেরিয়ে আমরা কমলা বাগানে ঢুকলাম। রামু হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে দুলালদাকে বলল, 'জানেন দুলালদা, এই কমলা বাগানটা পুরোটাই আমাদের। ক'দিন পরে আপনাকে চমৎকার কমলা খাওয়াতে পারবো।'

দুলালদা বললেন, 'ততদিন যদি থাকি নিশ্চয়ই খাবো।'

গাছের কমলাগুলো এখনো সবুজ। কিছুদিন পর রঙ ধরবে। তখন সারা বাগান আলো হয়ে যাবে। গাছ থেকে কমলা পাড়াটা তো রীতিমতো উৎসবের ব্যাপার। অনেক দূরে থেকে কমলার পাইকাররা আসে। দাদু বাগান বিক্রি করেন না।

বাগানের এক কোণে পাহারাদাররা আগুন পোহাচ্ছিলো। বুড়ো বনমালী চেঁচিয়ে বললো, 'কে যায়?'

রামুও চেঁচিয়ে জবাব দিলো 'আমরা।'

দুলালদা মৃদু হেসে বললেন, 'এটা কি কোনো জবাব হলো! আমরা তো সবাই বলতে পারে।'

রামু বলল, 'বনমালী, আমাদের চেনে।'

আমি বললাম, 'এখন আহ্লাদ দেখাবার জন্যে ও ছুটে না এলেই বাঁচি।'

বনমালী বলল, 'বেড়াতে বেরিয়েছো বুঝি। ভালো করেছো। ভোরবেলার বাতাস খুব তাজা থাকে।'

আমরা গতকাল যে জায়গাটায় বসেছিলাম সেখানে এসে দুলালদা বললেন, 'তোমাদের আর আসতে হবে না। বনমালীর হাত থেকে বেঁচে গেছি। একা এলে কী যে বিপদ হত!'

আমি হেসে বললাম, 'ওকে ধমক লাগালেই গুটিয়ে যেতো। তাছাড়া কখনো দেখা হলে আমাদের কথা বলবেন। ও আমাদের খুব ভালোবাসে।'

দুলালদা আমাদের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে বললেন, 'চলি তাহলে। রাতে দেখা হবে।'

আমরা শুধু হাসলাম। দুলালদা লম্বা লম্বা পা ফেলে, কিছুক্ষণের মধ্যেই সামনের ঘন কুয়াশার সমুদ্রে ডুবে গেলেন। আমরা আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বাড়ির পথে পা বাড়ালাম।

সোনিয়ার বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় তাকিয়ে দেখি সোনিয়া আর হাসি খালা জানালার ধারে বসে আছেন। হাসি খালা অন্যদিকে তাকিয়ে কী যেন করছিলেন।

সোনিয়া আমাদের দেখতে পেয়ে হেতে হাত নাড়লো। রামু অবাক হয়ে একবার সোনিয়ার দিকে, আরেকবার আমার দিকে তাকালো। খুশিতে আটখানা হয়ে আমিও হাত নাড়লাম।

রামু দারুণ উত্তেজিত হয়ে বললো, 'ও কি তো-তোকে হাত দেখালো?'

আমি মুখ টিপে হেসে নিস্পৃহ গলায় বললাম, নয়তো কি তোকে?'

রামু বললো, 'আমি কি তাই বলেছি! তুই লুকিয়ে ওর সঙ্গে ভাব জমিয়েছিস একথা তো আমাকে বলিস নি?'

আমি বললাম, 'তুই ওদের বাসায় গিয়েছিলি সে-কথাও তো আমাকে বলিস নি।'

রামু গোমড়া মুখে বললো, 'বারে আমাকে তো মেজ কাকিমা পাঠিয়েছিল হাসি খালার কাছে। আমি ওর সঙ্গে কথা বলেছি নাকি!'

আমি হেসে ওর কাঁধে হাত রেখে বললাম, 'তুই অত মুখ কালো করছিস কেন? তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো।'

রামু মনে মনে খুশি হলেও মুখে বললো, 'থাক আমার জন্যে কাউকে বলতে হবে না। আমি নিজেই আলাপ করতে পারি।'

আমি বললাম, 'বেশ তাই করিস।'

রামু তক্ষুণি আমাকে জড়িয়ে ধরে বললো, 'সত্যি বলছিস, আমার সঙ্গে ওর আলাপ করিয়ে দিবি?'

আমি হেসে বললাম, 'তাহলে আর বলছি কী! এখন ছাড় আমাকে। সুড়সুড়ি লাগছে।'

রামু আর কোনো কথা বললো না। ও বোধহয় এখন থেকেই ভাবতে শুরু করেছে, সোনিয়াকে কী বলবে। অচেনা মেয়ের সঙ্গে কথা বলার সময় রামুর কান-টান লাল হয়ে এমন এক অবস্থা হয় যে, সে দেখার মতো।

পাঁচিলের পাশ দিয়ে আমরা যখন খিড়কি দরজার দিকে যাচ্ছি তখন ঝপাৎ করে আমাদের গায়ে কী যেন পড়লো। চমকে উঠে তাকিয়ে দেখি একগাদা শুকনো পাতা, ছেঁড়া কাগজ আর তরকারির খোসা। বুঝলাম পচার মার কান্ড। দুজন একসঙ্গে পাঁচিলের ওপাশে পচার মাকে ধমক দিতে গিয়ে সামলে নিলাম। ময়লা ঝেড়ে দৌড়ে উপরে উঠে হেসে বিছানায় গড়িয়ে পড়লাম।

আমাদের ওরকম হাসতে দেখে বিজু আবক হয়ে বললো, 'কী হলো তোদের? এরকম হাসছিস কেন?'

হাসতে হাসতে রামু পচার মার শুকনো রসিকতার কথা বিজুকে বললো। আমি বললাম, 'কীরকম চোরের মতো অবস্থা আমাদের দেখ। একফোঁটা চ্যাঁচানোর জো নেই। পাতার বদলে ও তো এক গামলা ঠাণ্ডা পানিও ঢেলে দিতে পারতো!'

আমরা যখন পচার মাকে নিয়ে হাসাহাসি করছি, ও তখন নিচে এক তুলকালাম কাণ্ড শুরু করে দিয়েছে। মুখ ধোয়ার জন্যে আমরা নিচে এসে শুনি কাল রাতে নাকি বাড়িতে চোর এসেছিলো। ভোর রাতে ও পাঁচিলের পাশে চোরের শব্দ শুনেছে। রাত থাকতে ও নাকি উঠোন ঝাড় দিয়েছে। ময়লা ফেলতে গিয়ে মনে হলো কারা যেন ধুপধাপ করে পালিয়ে যাচ্ছে। ও বাইরে এসে দেখে খিড়কি দরজা হা করে খোলা। পচার মার বানানো গল্প শুনে আমাদের মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে গেলো। ও যে এভাবে আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে আমরা ভাবতেই পারি নি। এতদিন যে পচাকে এতকিছু খাইয়েছি সবই বিফলে গেলো!

পচার মা হাত-পা নেড়ে গল্প করছিলো। জেঠিমা, মা, সেজ কাকিমা, ছোট কাকিমা সবশেষে দিদা প্রত্যেককে আলাদাভাবে গল্প শোনালো। প্রত্যেকবারই গল্পের সঙ্গে নতুন কিছু যোগ করলো। দিদাকে বলার সময় বললো, 'চোর নয় মা, ডাকাত। যে রকম ধুপধাপ পায়ের শব্দ শুনলাম মনে হল দল বেঁধে এসেছে। চোর কি কখনো দল বেঁধে আসে ? আমি বেরুতে না বেরুতে আমার চোখের সামনে দিয়ে সব কটা কর্পূরের মতো উবে গেলো। মা তো জানেনই, রাতে আমি চোখে ভালো ঠাহর করতে পারি না। নইলে ঠিকই পিছু নিতাম।'

যে পচার মা আরশোলা দেখলে হুলস্থুল কাণ্ড ঘটায় সে ডাকাতের পিছু নেবে, এরকম একটা হাসির কথা শুনেও জেঠিমা, মা, কাকিমার কেউ হাসলেন না। হাসবেন কি, তাঁরা যে পচার মার সব কথা অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস করে বসে আছেন! ওঁদের সবার গুরুগম্ভীর মুখ দেখে আমরাও হাসতে পারছিলাম না। বুকের ভেতর ঢিবঢিব করা সত্ত্বেও হাসিতে আমাদের পেট ফুলে ঢাক হয়ে গিয়েছিলো।

দিদা বললেন, 'তুই রাতকানা বলেই তো তোকে সন্দেহ হচ্ছে পচার মা। রাতের বেলা কুকুর না ভাম দেখেছিস, তাই নিয়ে গোটা বাড়ি মাথার তুলেছিস। যা বাছা, চুলোয় আগুন ধরাগে।'

পচার মার ওঠার নাম নেই। হাত নেড়ে বললো, 'সে কি মা, রাত কোথায়! তখন যে ফরসা হয়ে গেছে। আমি নিজ কানে পায়ের শব্দ শনেছি। কুকুর কি খিড়কি দরজা খুলতে পারে?'

দিদা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'মুরুব্বিদের সামনে হাত নেড়ে কথা বলতে তোকে বারণ করি নি? খিড়কি দরজা বন্ধ ছিলো এ-কথাই বা তোকে কে বললো? কবে কে ছিটকিনি লাগাতে ভুলে গেছে, এদ্দিন চোখে পড়ে নি।' এই

কথা বলে দিদা আড়চোখে আমাদের দিকে তাকালেন।

আমি ঢোক গিলে রামুর দিকে তাকালাম। ও দেখি একবারে সাদা হয়ে গেছে।

দিদা মুখ টিপে হেসে বললেন, 'তোকেও বলি পচার মা, বানিয়ে গপ্পো বলার সময় তোর কোনো হুঁশ থাকে না। আমাকে একবার বললি তখন ঘুটঘুটে অন্ধকার, আবার এখন বলছিস ফরসা হয়ে গেছে। এত উল্টো-পাল্টা বলে কি গপ্পো বানানো যায়। নে ওঠ, অনেক হয়েছে।'

বাড়িতে ডাকাত পড়ার দারুণ উত্তেজনাময় গরম গল্পটির ওপর দিদা যেভাবে ঠান্ডা পানি ঢেলে দিলেন, পচার মা তাতে চুপসে গিয়ে ভেজা বেড়ালটির মতো রান্নাঘরে ঢুকলো। ওর এরকম চুপসে যাওয়াটা জেঠিমারা পছন্দ করেন নি। রামুর ওপর চোখ পড়তে আমাদেরকে নিয়ে পড়লেন— 'তোরা ছাড়া আর কে খিড়কি দরজা খুলতে যাবে হতচ্ছাড়ার দল। চোর আসে নি, আসতে কতক্ষণ, এরকম দরজা খোলা দেখলে চুরি করার জন্যে সবার হাতই চুলবুল করবে।'

দিদা বললেন, 'মুখ না ধুয়ে তোরা বুঝি মুরুব্বিদের কথা গিলছিস? শিগগির পালা সামনে থেকে।'

বুঝলাম দিদা এবারও আমাদের জেঠিমার বকুনির হাত থেকে বাঁচিয়ে দিলেন। দিদার জন্যে ঠিক এজন্যই আমাদের মন সারাক্ষণ কৃতজ্ঞতায় ভরে থাকে। গরম পানির জন্যে অপেক্ষা না করে ঠাণ্ডা পানিতে মুখ ধুয়ে হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে আমরা উপরে চলে গেলাম। পচার মা এমন এক অভাবনীয় আবিষ্কারের উত্তেজনায় আমাদের মুখ ধোয়ার পানি গরম করতেও ভুলে গিয়েছিলো। ঘরে ঢুকে তিনজন আবার দম ফাটানো হাসিতে বিছানায় গড়িয়ে পড়লাম।

সকালে আমরা যখন নাস্তা খাওয়ার জন্যে নিচে নামলাম তখন দেখি পচার মা সেজ কাকিমাকে রান্নাঘরে একা পেয়ে তাঁকে বোঝানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছে।' কাকিমাও পরম নিশ্চিন্তে খোলাজাই পিঠে বানাতে বানাতে পচার মার আজগুবি গল্প গোগ্রাসে গিলছিলেন। খেতে বসে আমি বললাম, 'দিদা তো পচার মার কথা হেসেই উড়িয়ে দিলো। ডাকাত না আসুক চোর আসাটা তো অসম্ভব কিছু নয়। কিছু নেয় নি বলেই যে ধরে নিতে হবে চোর আসে নি এটা তো হতে পারে না। চোর সাধারণত শেষ রাতেই আসে। পচার মা টের পেয়েছিলো বলেই চুরির করতে পারে নি।'

আমার কথা শুনে রামু মুখ টিপে হাসলো। বিজু হাসি চাপতে গিয়ে খুক করে কাশলো। পচার মা আহ্লাদে আটখানা হয়ে পান-খাওয়া কালো দাঁত সব কটা বের করে বললো, 'তবেই দেখ। সাধেই কি তোমরা পরীক্ষায় ফাস সেকেন হও! [illegible]াদের মাথা কী পরিষ্কার! অথচ মা বলেন কিনা সব আমার বানানো গপ্পো। তোম.

অ সেজদিদিমণি, ছেলেরা শুধু চিনি দিয়ে পিঠে খাচ্ছে যে, ওদের একটু নারকোল কুরে দেব?'

সেজ কাকিমা হাসি চেপে বললেন, 'দাও! তখন যে বললে নারকোল কোরাতে পারবে না, তোমার কুনুই ব্যথা করছে?'

পচার মা একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললো, 'আহা তাই বলে বাড়িসুদ্ধ সবার জন্যে নারকোল কোরাতে বসলে তো কুনুইয়ে ব্যথা করবেই। তুমি হুকুম করো তো ব্যথা নিয়েই কুরে দেই।'

সেজ কাকিমা বললেন, 'বাবা আর বড়দার খাওয়া হয়ে গেছে। এখন আর সবাইকে দিয়ে কাজ নেই। তুমি বরং এদেরই দাও।'

দিদা এসে আমাদের নারকেল খেতে দেখে একগাল হেসে বললেন, 'তোদের নারকোল দিল কে রে? আমিই তো বলতে এসেছিলাম।'

পচার মা সঙ্গে সঙ্গে বললো, 'আপনিই তো বলেন মা, উঠতি বয়সের ছেলেদের একটু ভালো খেতে দিতে হয়। তাই আমি সেজদিদিমণিকে বলতেই তিনি কুরে দিতে বললেন।'

দিদা হেসে বললেন, 'ভালো করেছিস। যা তোকে মিথ্যে গপ্পো বলার জন্যে মাপ করে দিলাম। বৌমা, তোমার শ্বশুরকে আদা দিয়ে চা দিও। ওঁর ঠাণ্ডা লেগেছে।'

খেয়ে উঠে বিছানায় গড়ানো ছাড়া আমাদের কোনো কাজ ছিলো না। দুলালদাকে কীভাবে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এ-সম্পর্কে বিজু রামুর কাছ থেকে সব জেনে নিলো। আমি বললাম, 'দুলালদা এতক্ষণে খাসিয়াদের গ্রামে পৌঁছে গেছেন।'

রামু হঠাৎ জিভ কামড়ে বললো, 'কী রকম এক ভুল করে বসেছি দেখেছিস?'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কী ভুল?'

'দুলালদা সকালে নাস্তা করবে কী দিয়ে? তাঁকে কিছু খাবার সঙ্গে দেয়া উচিত ছিলো। জয়ন্তিয়া পাহাড়ে নিশ্চয়ই ওঁর জন্যে কেউ রেস্টুরেন্ট খোলে নি।'

আমি হেসে বললাম, 'তাতে কী? জয়ন্তিয়া পাহাড়ে তো খাসিয়ারা আছে। দারুভূই বলেছে ওদের গ্রামে কোনো অতিথি গেলে নাকি ওরা খুব যত্ন করে। দুলালদার কোনো অসুবিধা হবে না।'

এমন সময়— 'কার অসুবিধা হবে না বললি?' বলে দিদা ঘরে ঢুকলেন। ঘরের ভিতরে যেন বাজ পড়লো। আমরা তিনজন দারুণ রকম চমকে উঠে ভয়ে কাঠ হয়ে গেলাম। দিদা নিঘাত আমাদের সব কথা শুনে ফেলেছেন।

আমাদের বিছানায় এককোণে বসে পান চিবোতে চিবোতে দিদা মুচকি হেসে বললেন, 'হ্যাঁরে আবু, রামু! সাতসকালে তোরা খিড়কি দরজা দিয়ে কাকে নিয়ে বেরিয়ে গেলি?'

রামু একবার আমার দিকে তাকালো। আমি রামুর দিকে তাকালাম। দিদা বললেন, 'তোরা আমার কাছে কিছু লুকোবি না। দুপুরে হাঁড়ি-কাবাব খেতে চাইলে এক্ষুণি সব বলে ফেল্। আমি দোতলার জানালা দিয়ে সব দেখেছি।'

দিদা এমনভাবে কথাগুলো বললেন যে তাঁর কাছ কিছু লুকোতে মোটেই ইচ্ছে হলো না। গত সন্ধ্যের পর থেকে যা যা ঘটেছে সব তাঁকে খুলে বললাম। দুলালদার মা মারা যাওয়ার কথা শুনে দিদার চোখ দুটো ছলছল করে উঠলো। বললেন, 'অত ফেনিয়ে বলছিস কেন? তাড়াতাড়ি শেষ কর। তারপর আমি একটু কাঁদব। তোরা আমাকে কুটুর কথা মনে করিয়ে দিলি। হারামজাদাকে আমি কোলেপিঠে করে মানুষ করেছি।'

কুটু মানে আমাদের বড়দা। তাঁর জন্যে যে দিদা সবচেয়ে বেশি ভাবেন এটা বাড়ির কারো অজানা নয়। তবে দিদার মতো দারুণ রাগী একজন, যাঁকে বাড়ির সবাই সমীহ করে, তিনি একজন অচেনা ছেলের জন্যে কাঁদছেন—আমরা ছাড়া তাঁর এই ফুলের মতো নরম মনটির কথা কেউ জানবে না।

দিদা সব শুনে বললেন, 'ভালো করেছিস। আমি জানি এ বাড়িতে শুধু তোরাই আমার মতো হয়েছিস। আর সব কটা হচ্ছে চামার, পয়সা ছাড়া কিছুই চেনে না। তবে যাই বলিস বাছা, তোরা আগুন নিয়ে খেলছিস। একটু অসাবধান হলে সবাইকে মারবি। ওই ছোঁড়া যদি আজ রাতে আসে আমাকে খবর দিস। ওর চেহারা দেখেই আমার কুটুর কথা মনে হয়েছে। যেজন্যে পচার মাকে হাঙ্গামা করতে দেই নি। তোদের দাদুর কানে গেলে তিনি থানা-পুলিশ করে একাকার করতেন।'

দিদা উঠে যাওয়ার সময় মুচকি হেসে বলে গেলেন, 'তবে তোদের জন্যেও আমার কপালে দুঃখ আছে, এ কথা তোরা লিখে রাখতে পারিস।'

আমাদের মস্ত বড় পরিবারে যেখানে দাদু, জেঠু, কাকা সবার সঙ্গে আমরা একত্রে থাকি সেখানে কেউ কারো দিকে সেরকম মনোযোগ দিতে পারে না। একমাত্র দিদাই সবার ভালোমন্দের খোঁজ নেন। সবাইকে ধমক দেন। আবার সবার জন্যে ভাবেনও। দিদা শুধু এবাড়ির লোকদের জন্যেই ভাবেন না। জাফলং-এর সবার সঙ্গেই দিদা ভাব জমিয়ে ফেলেছেন। কারো কোনো অসুবিধা হলে দিদার পরামর্শ নিতেই হবে। শুধু হাসি খালার সঙ্গে কেন জানি না দিদা এখনো আলাপ করেন নি। দিদা যদি ওঁকে এড়িয়ে না চলতেন তাহলে সোনিয়ার সঙ্গে অনেক আগেই ভাব জমাতে পারতাম। আমরা জানি এ নিয়ে দিদাকে কোনো প্রশ্ন করলে তিনি বিরক্ত হবেন। তাঁর পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারে কারো নাক গলানো তিনি মোটেই ভালোবাসেন না।

বাবা, সেজকা আর মেজদা তাদের কাজের জন্যে বাইরে থাকেন। বাবা কাজ করেন ছাতকের সিমেন্ট ফ্যাক্টরিতে, সেজকা সুনামগঞ্জের এক কলেজে পড়ান।

আর মেজদা ঢাকায় বসে ছবি বানান। সিনেমা হলে মেজদার ছবি এলে আমরা সিলেটে গিয়ে দেখি। আমাদের জেঠিমা, মা আর কাকিমারা সারাদিন সংসারের কাজে এত ব্যস্ত থাকেন যে তাদের সঙ্গে বহুদিন কথাও হয় না। দিদা না থাকলে নয়নতারা কুটিরটা আমাদের কাছে মরুভূমি হতে যেতো।

সোনিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব

বিকেল পর্যন্ত আমরা চিলেকোঠার ঘরে দুলালদাকে নিয়ে গল্প করে কাটিয়ে দিলাম। মাঝখানে শুধু হাঁড়ি-কাবাব খাবার জন্য একবার নিচে নেমেছিলাম। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম দুলালদা একদিনে আমাদের বয়স আর অভিজ্ঞতা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছেন। মনে হলো আমরা আর ছোট্টটি নেই, যাদের যখন তখন কান টানা যায়, চোখ পাকিয়ে ধমক দেওয়া যায় কিংবা চুলের ঝুঁটি ধরা যায়। বিজু পর্যন্ত এমন সব কথা বলেছিলো যা আগে কখনো ওর মুখে শুনি নি। তেরো-চৌদ্দ বছর বয়সে হঠাৎ কেন সবাই বড় হয়ে যায় কথাটা এদ্দিনে আমার বোধগম্য হলো। যে কথা রামু বিজুকে আগে কখনো বলি নি, অকপটে সব বলে ফেললাম। রামু এমন অনেক কথা বললো, যা শুনে কখনো রোমাঞ্চিত হলাম কখনো বা বিস্মিত হলাম।

বিকালে কমলালেবুর বাগানে বসে আমরা অনর্গল কথা বলছিলাম। এত কথা আমাদের বুকের ভিতর জমেছিলো যে ভেবে রীতিমতো অবাক হলাম। সব কথা বলার পর নিজেদের খুব পবিত্র মনে হলো। আমি চিৎ হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে শুয়েছিলাম। আমরা চাদর না এনে শুধু সুয়েটার পরেছি। দুলালদা একটা জ্যাকেট পরে যদি শীত কাটাতে পারেন, আমরা কেন এতগুলো পরব ভেবে পেলাম না। দুলালদা আমাদের সাহস অনেক বাড়িয়ে দিয়েছেন।

বিজু বললো, 'কাল এতক্ষণে এখানে বসে হারিয়ে যাওয়ার জন্যে কী দুঃখটাই না করছিলাম!'

রামু বললো, 'ওসব কথা ভাবতেও আমার হাসি পাচ্ছে। দুলালদার সঙ্গে কী কাজ করা যায় আবু কিছু ভেবেছিস?

আমি বললাম, 'ভাববার কী আছে। দুলালদা আমাদের যা বলবেন তাই করবো।'

বিজু একটু পরে বললো, 'আমার মনে হচ্ছে আমি দারুণ একটা কিছু করে ফেলতে পারবো।'

রামু বললো, 'ওরকম ইচ্ছে সবারই হয়। এ আর নতুন কী!'

রামুর কথা শুনে আমি একটুও অবাক হলাম না। অথচ কাল যদি ওর মুখে এ ধরনের কথা শুনতাম তাহলে আমি নির্ঘাত হেসে খুন হতাম।

কিছুক্ষণ পর বিজু বললো, রামু তুই বড় হলে কী হবি?'

রামু শান্ত গলায় বললো, 'বড়দা আর দুলালদার মতো হবো।'

বিজু আস্তেআস্তে বললো, 'আমিও তাই ভাবছিলাম।'

আমি ওদের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললাম। বললাম, 'অত ভাববার কিছুই নেই। আমরা তিনজনই বিপ্লবী হবো।'

এমন সময় 'এই যে ত্রিরত্ন' — বলে সোনিয়া এসে আমাদের সামনে দাঁড়ালো। 'ঠিক যা ভেবেছিলাম তাই।'

আমি হেসে বললাম, 'কী ভেবেছিলি?'

'তোদের তিনজনকেই এখানে পাবো। আমার ধারণা অবশ্য ভুলও হতে পারত।'

আমি হেসে বললাম, 'তুই তাহলে বসে পড়।'

রামু আর বিজু অবাক হয়ে একবার সোনিয়া আরেকবার আমাকে দেখছিলো। বিজু আমতা আমতা করে জিজ্ঞেস করলো, 'তুই কি ওকে তুই বলিস নাকি!'

সোনিয়া হেসে গুঁড়ো হয়ে গেলো। বললো, 'তবে কি আপনি বলবো! বিজুকে অবশ্য দেখতে যেরকম বাচ্চা মনে হয় তাতে ও যদি আমাকে আপনি বলে আমি কিছু মনে করবো না। অবশ্য এখানে ইশকুলে ভর্তি হলে আমাকে ওর এক ক্লাশে ওপরে পড়তে হত।'

সোনিয়ার কথাগুলো পাহাড়ি ঝর্নার মতো সুন্দর আর মিষ্টি। আমি সারাজীবন কান পেতে ওর কথা শুনতে রাজি আছি। সোনিয়া আমার পাশে ঘাসের ওপর বসে পড়লো— 'মা বলেছে আজ বিকেলে তোমাদের তিনজনকে আমাদের বাড়িতে চা খেতে। অবশ্য এর মধ্যে যদি চা খাওয়া না হয়ে থাকে।'

আমি আগেও লক্ষ্য করেছি সোনিয়া বলার মাঝখানে একটা 'অবশ্য' জুড়ে দেবে। যে জন্যে ওর বাক্যগুলো একটু লম্বা হয়ে যায়। ঝর্নার মিষ্টি শব্দ শোনার জন্য আমি তো চাই ও কথা বলার সময় আরো লম্বা বাক্য ব্যবহার করুক। সোনিয়াকে বললাম, 'নেমন্তন্ন করতে এলি যখন একটু বসে যা। এখানে আর তোকে কী খেতে দেব বল্! কমলা পাকলে না হয় কটা পেড়ে দিতাম।'

সোনিয়া বললো, 'সত্যি বলছিস্! আমি কতদিন ভেবেছি কমলায় রঙ ধরলে তোদের বাগানে আসবো। অবশ্য তোদের যদি আপত্তি না থাকে।'

রামু বললো, 'আপত্তি থাকবে কেন। তুই যদি রোজ এখানে বেড়াতে আসিস, তাহলে আমরা আরো খুশি হবো।'

সোনিয়া হেসে বললো, 'যাক, শেষ পর্যন্ত আমার সঙ্গে রামু কথা বললো। তো ডাঁট দেখে তো ভেবেছিলাম আমার সঙ্গে বুঝি কথাই বলবি না। অবশ্য ফার্স্ট হলে সবাই একটু ডাঁট দেখায়।'

'মোটেই না।' রামু তড়বড় করে বললো, 'তুই আবুকে জিজ্ঞেস কর। আমি কক্ষনো ডাঁট দেখাই না।'

আমি বললাম, 'ও ঠিকই বলেছে সোনিয়া। রামু ধরেই নিয়েছে ও বরাবর ফার্স্ট হবে, যেহেতু আমি সেকেন্ড হবো। সেজন্যে ফার্স্ট হওয়াটাকে খুবই মামুলি কিছু মনে করে।'

সোনিয়া বললো, 'ওটা তো আরো বেশি অহংকারের কথা হলো। ইশকুলে অবশ্য আমিও ফার্স্ট হতাম। তবে রামুর মতো সবসময় ফার্স্ট প্লেসটাকে আঁকড়ে ধরে বসে থাকতাম না। মাঝে মাঝে সেকেন্ডও হতাম।'

রামু বললো, 'তোদের ওখানে নিশ্চয়ই কম্পিটিশন ছিলো। আমি কী কবর বল্। আবু যে কখনো ফার্স্ট হতে চাইবে না।'

আমি রামুকে বললাম, 'স্বীকার করছিস তাহলে আমারই জন্যে তুই ফার্স্ট হচ্ছিস। যাক, তুই ফার্স্ট হলেই আমি খুশি। আমি চাই না খালেদ কিংবা পরেশ তোর জায়গাটা দখল করুক।'

সোনিয়া হেসে বললো, 'তোরা তিনজন আছিস বেশ। দেখলেও হিংসে হয়। আগে আমরা যেখানে থাকতাম সেখানে অবশ্য আমার অনেক বন্ধু ছিলো।'

আমি বললাম, 'এখানে আমরাই তোর বন্ধু! অন্য কারো সঙ্গে তোর বন্ধুত্ব হলে এক হাত দেখে নেবো।'

সোনিয়া চোখ কপালে তুলে বললো, 'ইংরেজি ছবির মতো ডুয়েল লড়বি নাকি! তাহলে অবশ্য তোদের একটা পুরোনো দিনের পিস্তল থাকতে হবে।'

আমি ভুরু কুঁচকে বললাম, 'দরকার হলে পুরোনো দিনের একটা পিস্তল খুঁজে বের করা কঠিন হবে না।'

সোনিয়া পাহাড়ি ঝর্নার মতো হাসলো। তারপর প্রসঙ্গ পাল্টে বললো, 'চল্ দেরি হয়ে যাচ্ছে। মা চা নিয়ে বসে আছেন। মা অবশ্য তোদের সঙ্গে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলাপ করবেন। না না, আমার কাছে জানতে চাসনে। মার কাছ থেকেই শুনিস।'

আমরা তিনজনই একটু অবাক হলাম। আমাদের সঙ্গে হাসি খালার কী গুরুত্বপূর্ণ কথা থাকতে পারে ভেবে পেলাম না। কথাটার গুরুত্ব কমে যাবে বলে

সোনিয়াকেও এ-প্রসঙ্গে আর কোনো প্রশ্ন করলাম না। সোনিয়াদের বাড়ি যাওয়ার পথে কেউ কোনো কথা না বলে সবাই চুপচাপ হাঁটলাম।

হাসি খালা বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন। গেট দিয়ে আমাদের ঢুকতে দেখে নেমে এলেন। ঘাসের কার্পেটে ঢাকা সবুজ লনে সাদা রং-করা বেতের চেয়ার টেবিল পাতা ছিলো। হাসি খালা বললেন, 'তোমাদের এত দেরি হলো যে? চলো লনে বসি।'

রামু একবার সোনিয়ার দিকে তাকিয়ে হেসে বললো, 'আমরা বাগানে বসে গল্প করছিলাম।'

হাসি খালাকে আমাদের মা, কাকিমা, জেঠিমা কারো সঙ্গে মেলানো যাবে না। তাঁকে বাড়ির কোনো কাজ করতে হয় না। সবসময় সাদা সুতোর কাজ করা ধবধবে সাদা শাড়ি পরে থাকেন। চোখে তারের মতো সরু কালো ফ্রেমের চশমা। কাচ দুটো বেশ ভারি। মেজ জেঠিমার চেয়েও তাঁর বয়স বেশি হবে। তাঁর চেহারায় সারাক্ষণ একটা কোমল দুঃখের ছায়া ভেসে বেড়ায়। চুলে রুপোলি রঙের ছোঁয়া লাগলেও হাসি খালাকে এখনো অপরূপ সুন্দরী মনে হয়। সোনিয়া ওঁর মতো অতটা ফর্সা নয়। স্বভাব পেয়েছে মার একেবারে উল্টোটি। সোনিয়া যেমন বেশি কথা বলে, হাসি খালা কথাই বলেন না।

হাসি খালা ড্রাগনের নকশাকাটা চায়ের পেয়ালার সবুজ চা ঢাললেন। মিষ্টি গন্ধে যেন সারা লন ভরে গেল। রামু চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বললো, 'এত সুন্দর চা আমি জীবনেও খাই নি।'

হাসি খালা মৃদু হেসে বললেন, 'আমাদের বাগানের চা।'

সোনিয়া বললো, 'তোদের আমি কিছু সবুজ চায়ের পাতা উপহার দিতে পারি। অবশ্য নিতে যদি তোদের আপত্তি না থাকে।'

আমি বললাম, 'কমলার বদলে নাকি!'

সোনিয়া লজ্জা পেয়ে বললো, 'বারে তা কেন—'

লজ্জা পেলে কাউকে যে সুন্দর দেখায়—এতদিন কথাটা শুধু বাংলা উপন্যাসেই পড়েছি। সোনিয়া এত লজ্জা পেলো যে, কথা বলা শেষ করতে পারলো না।

নরম ঘাসের সবুজ কার্পেটে তখন কমলা রঙের হালকা রোদ এখানে-সেখানে ছড়িয়েছিলো। সরল ইউক্যালিপ্টাস গাছের ধূসর ছায়া সবুজের ভেতর নকশার মতো শুয়ে আছে। শীতের শেষ বিকেলের রোদের চেয়ে মিষ্টি আর কিছু হয় না। সারা শরীর দিয়ে রোদের কোমল তাপ শুষে নিতে ইচ্ছে করে। সোনিয়ার মতো মেয়ে যদি পাশে থাকে তাহলে তো ইচ্ছে হয় মনের সুখে মরেই যাই!

হাসি খালা সোয়েটার বুনছিলেন। তাঁর কোলের ওপর জলপাই রঙের উলের বল আর একটুখানি বোনা সোয়েটার আলতোভাবে পড়েছিলো। হাসি খালা উল বুনতে বুনতে উদাস হয়ে যাচ্ছিলেন। উলের কাঁটা ধরা তার হাতের সুন্দর

আঙুলগুলো নাচের মুদ্রায় কখনো থেমে যাচ্ছিলো। হাসি খালা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'আজ সকালে তুমি আর রামু এদিক দিয়ে কাকে নিয়ে যাচ্ছিলে?'

আমি চমকে উঠলাম। হাসি খালা কী করে টের পেলেন? আমার চোখে প্রশ্ন দেখে হাসি খালা মৃদু হেসে বললেন, 'সকালে তোমাদের আমি যেতে দেখেছি। তোমরা হয়তো ঘরের ভেতর আমাকে দেখতে পাও নি।'

রামু বললো, 'ওঁর কথা কাউকে বলতে তিনি বারণ করে গেছেন।'

রামুর কথা শুনে হাসি খালা দুঃখ পেলেন। চশমার ভারি কাচের ভেতর তাঁর চোখ দুটো ছলছল করে উঠলো। আস্তে আস্তে বললেন, 'ওকে দেখে আমার ছেলে অয়নের কথা মনে পড়ে গিয়েছিলো।' একটু থেমে হাসি খালা আবার বললেন, 'অয়নের শেষ চিঠি পেয়েছি তিনমাস আগে।'

আমি বললাম, 'হাসি খালা, আপনাকে কথা দিতে হবে দুলালদার কথা আপনি কাউকে বলবেন না।'

হাসি খালা মৃদু হেসে বললেন, 'আমাকে কি সেরকম ছেলেমানুষ মনে হয়!'

'ঠিক তা নয় হাসি খালা। কথাটা আমরা মা, কাকিমা, জেঠিমা কাউকেই বলি নি।'

আমি বললাম, 'দুলালদার সঙ্গে গতকাল ঠিক এরকম সময়ে আমাদের দেখা হয়েছিলো।'

আমার কেন যেন মনে হয়েছিলো, দুলালদার কথা শুনতে পেলে হাসি খালা কিছুটা হালকা বোধ করবেন। রাজনীতির তত্ত্বকথায় বেশি না গিয়ে দুলালদার সব কথা তাঁকে খুলে বললাম।

হাসি খালাকে কাঁদতে দেখে আমি একটুও অবাক হই নি। দুলালদার মতো হাসি খালার একটি ছেলে আছে, যে অনেক দূরে থাকে। দুলালদা মাকে ভালোবাসতেন বলেই দেশের জন্যে সব কিছু ত্যাগ করতে পেরেছেন। সব শোনার পর হাসি খালা না কাঁদলেই বরং আমি কিছুটা অবাক হতাম। দুলালদার বাবা তাঁর মাকে কষ্ট দিয়েছেন। আমি জানি সোনিয়ার বাবার জন্যে হাসি খালার দুঃখ এতটুকু কম নয়।

আমরা কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম। হাসি খালা চশমা খুলে হাল্কা সাদা রুমাল দিয়ে চোখ মুছলেন। সোনিয়াও খুব গম্ভীর হয়ে বসেছিলো। হাসি খালা আবার উল বোনা শুরু করলেন। অনেকক্ষণ পরে বললেন, 'দুলাল যদি কিছু মনে না করে তাহলে ওকে আমার এখানে থাকতে বলতে পারো।'

আমি বললাম, 'ঠিক আছে হাসি খালা, দুলালদা এলে বলবো খন।'

হাসি খালা যে দুলালদার কথা কাউকে বলবেন না এ বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। একবার মনে হল দুলালদার কথা সোনিয়ার সামনে বলা উচিত হয় নি।

ও ছেলেমানুষ, কখন কার সঙ্গে গল্প করতে গিয়ে বলে ফেলবে, তখন আমাদের বারোটা বাজবে। হাসি খালাকে বললাম, 'সোনিয়া আবার এসব কথা কাউকে বলে দেবে না তো!'

কথাটা শুনে সোনিয়া আমার দিকে এমনভাবে তাকালো— দেখে মনে হল এক্ষুণি বুঝি ও কেঁদে ফেলবে। হাসি খালা মৃদু হেসে সোনিয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সোনিয়া আমার মেয়ে।'

সোনিয়াদের সবুজ লনে ধীরে ধীরে অন্ধকার নামলো। পশ্চিমের আকাশে তখন গোলাপি, কমলা আর বেগুনি রঙের মেঘ বিশাল প্রজাপতি হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাখিদের এলোমেলো ডাক শুনে মনে হলো কোথায় যেন জলতরঙ্গ বাজছে।

হাসি খালা বললেন, 'তোমরা আমাদের বাসায় আসো না কেন? মাঝে মাঝে শুধু বিজুর মা আসেন বেড়াতে।'

রামু বললো, 'এবার আর আসতে ভুল হবে না। রোজ বিকেলে আপনার কাছে এসে সবুজ চা খেয়ে যাবো।'

মৃদু হেসে হাসি খালা বললেন, 'তোমরা এলে আমার ভালো লাগবে। সোনিয়া বেচারী সারাদিন একা সময় কাটায়।'

আমি মনে মনে বললাম, 'আপনি কিছু মনে না করলে সোনিয়ার সঙ্গে সারাদিন কাটাতে আমার একটুও আপত্তি হবে না।'

বিজু বলল, 'বাসায় যাবি না? সন্ধ্যে হয়ে গেছে।'

আমি হাসি খালাকে বললাম, 'আজ তাহলে উঠি। কাল আবার আসবো।'

হাসি খালা বললেন, 'এসো।'

সোনিয়া আমাদের সঙ্গে গেট পর্যন্ত এলো। রামু আর বিজু একটু সামনে হাঁটছিলো। সোনিয়া আমার কানের কাছে মুখ এনে বললো, 'তুই কেন মাকে এরকম কথা বললি? আমাকে কি তুই বিশ্বাস করিস না? আমার তখন কী যে কান্না পাচ্ছিলো!'

সোনিয়ার কথা বলার সময় আমার মুখে ওর রেশমের মতো নরোম চুলের ছোঁয়া লেগেছিলো। মনে হল আমি যেন গোলাপের পাপড়িতে পা ডুবিয়ে হাঁটছি। ফিস্‌ফিস্ করে বললাম, 'তুই আমাকে বিশ্বাস করিস তো সোনিয়া? তাহলে আর কখনো খারাপ লাগবে না।'

গোলাপের মিষ্টি গন্ধে আমার বুকটা ভরে গেলো।

বিপ্লবীদের জন্য দিদার সহানুভূতি

বাড়ি ফেরার পথে বিজু আর রামু হাসি খালাকে নিয়ে গল্প করছিলো। বিজু বললো, 'হাসি খালা কী চমৎকার ফ্রুট পুডিং বানিয়েছে দেখেছিস! এখনো আমার জিভে স্বাদ লেগে আছে।'

রামু বলল, 'হাসি খালা এখনো দেখতে কী সুন্দর! দেখে মনে হয়, ছোট কাকিমার বয়সী।'

আমি চুপচাপ হাঁটতে হাঁটতে সোনিয়ার কথা ভাবছিলাম। ওর রেশমের মতো নরম চুলের ছোঁয়া, গোলাপের মতো মিষ্টি গন্ধ, কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে কথা বলা, সবকিছু মিলিয়ে আমি যেন রূপকথার কোনো জগতে চলে গিয়েছিলাম।

রামু আমার কাছে এসে বললো, 'সোনিয়া কিন্তু তোকেই পছন্দ করেছে। আমি দেখেছি বারবার ও আড়চোখে তোকে দেখছিলো।'

আমার জামাটা বুকের কাছে যেন ছোট হয়ে গেলো। আহ্লাদে গলে গিয়ে রামুকে বললাম, 'এখনো কিছু বলা যায় না। তুই যে আমার চেয়ে হ্যান্ডসাম এটা সবাই জানে।'

রামু সরলভাবে বলল, 'কিন্তু আমি যে কথা বলতে পারি না।'

'এখন না পারলে পরে পারবি। অনেকে বেশি কথা বলা পছন্দ করে না।'

'সোনিয়া কিন্তু বেশি কথা বলে।'

'আমার কাছে ওর বেশি কথা বলা ভালো লাগে।'

রামু হেসে বললো, 'তোর কাছে তো ওর সবই ভালো লাগবে।'

বিজু বললো, 'দুলালদা নিশ্চয়ই হাসি খালার কথা শুনে অবাক হয়ে যাবেন।'

দুলালদার কথা শুনে আমি স্বপ্ন থেকে বাস্তবে ফিরে এলাম। বললাম, 'দুলালদার ফিরতে নটা-দশটা বাজতে পারে। কালকের মতো খাবার ওপরে নিয়ে যেতে হবে।'

রামু বললো, 'পচার মা ভালো করে খিড়কি দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।'

আমি বললাম, 'তাতে কী? লোহার সিঁড়ি দিয়ে নেমে খুলে রাখলেই হবে।'

বাড়িতে ফিরতেই দিদা বললেন, 'এতক্ষণ কোথায় ছিলি? পল্টুর চিঠি এসেছে।

ঘরদোর সব গোছাতে হবে। অথচ তোরা সেই দুপুরের পর থেকে বাতাসে মিলিয়ে গেছিস।'

আমি বললাম, 'হাসি খালার ওখানে আমাদের চায়ের নেমন্তন্ন ছিলো। মেজদা কী লিখেছে চিঠিতে? ঘর গোছাতে হবে কেন?'

দিদা একগাল হেসে বললেন, 'পল্টু আসছে যে! কবে চিঠি লিখেছে। সেই চিঠি পেলাম আজ দুপুরে। ও দলবল নিয়ে আসছে। এখানে নাকি ছবির সুটিং করবে।'

আমরা জীবনে কখনো ছবির সুটিং দেখি নি। আমি অবশ্য কয়েকবার ঢাকা গিয়েছিলাম, কিন্তু তখন মেজদার কোনো ছবির স্যুটিং ছিলো না। জাফলং-এর কেউ কখনো স্যুটিং দেখেছে বলে মনে হয় না। আনন্দে আমরা তিনজন আত্মহারা হয়ে গেলাম। বিজু তো— 'কী মজা' বলে দিদাকে জড়িয়ে ধরলো।

দিদা হাসতে হাসতে বললেন, 'মন্টু হাঁদার নাটক করা শিকেয় উঠেছে। সেই বিকেল থেকে তোদের বড় জেঠু ওদেরকে খাটিয়ে মারছে। একতলায় দুটো ঘর আর দোতালার একটা ঘর খালি করাতে হচ্ছে। হাঁদা চেয়েছিলো তোদের ঘরে থাকতে। ওর ঘরটাও খালি করতে হচ্ছে কিনা। আমি ভালোমতো বকে দিয়েছি।' বলে দিদা চোখ মটকালেন।

এবার দিদাকে আমি আর রামু মিলে জড়িয়ে ধরলাম— 'তোমার মতো ভালো দিদা পৃথিবীতে আর দুটো নেই।'

'থাক অত সোহাগ দেখাতে হবে না। তোমাদের খাবার জালের আলমারিতে তোলা আছে। ওগুলো নিয়ে ওপরে চলে যাও।' একগাল হেসে দিদা বললেন, 'বিজুর মাকে নারকোলের বরফি বানানোর জন্যে বসিয়ে দিয়েছি। আজ তো আর ওর মাথা ধরে নি যে তোমরা ওপরে গিয়ে খাবে। যাও কুয়োতলায় গিয়ে মুখহাত ধুয়ে নাও গে।'

আমরা তিনজন নাচতে নাচতে কুয়োতলায় গেলাম। বিজু শ্যাওলায় পা পিছলে আছাড় খেয়েও হাসলো! পচার মা থালা বাসন ধুতে এসে বললো, 'মেজদা আসবেন বলে বুঝি খুব আনন্দ হচ্ছে! মা বলেছেন আজ তোমাদের রান্নাঘরে খাওয়া হবে না। ওখানে আমরা নারকোলের চিঁড়ে বরফি বানাবো।'

বিজু বললো, 'তোমরা সারা রাত চিঁড়ে বরফি বানাও না, কে বারণ করেছে!'

আমাদের জন্যে ভাত-তরকারি সবই অন্যদিনের চেয়ে অনেক বেশি ছিলো। দিদা দুপুরে হাঁড়ি কাবাব রান্না করেছিলেন। সেই অপূর্ব খাদ্যটিও আলমারিতে একবাটি আমাদের জন্যে রাখা হয়েছে। এসবই যে দিদার কাণ্ড বুঝতে আমাদের

এতটুকু কষ্ট হলো না।

সবকিছু গুছিয়ে ঘরে রেখে খিড়কির দরজাটা খুলে দেয়া হলো। রামু বললো, 'আজ একটু দেরি করেই খাই, কী বলিস বিজু?'

বিজু রান্নাঘর থেকে আসার সময় পকেটে করে দুখানা নারকেলের বরফি এনেছিলো। তাই রামুর কথায় আপত্তি করলো না। আমার তো আজ রাতে কিছু না খেলেও চলবে।

সবকিছু কেমন যেন পরিপূর্ণ মনে হচ্ছিলো। আমরা তিনজন ছাদের কার্নিশের ধারে বসেছিলাম। চাঁদের আলোয় সারা পৃথিবীটা ভেসে যাচ্ছে। ঝাউবন আর জয়ন্তিয়া পাহাড়ের গা বেয়ে চাঁদের আলো হালকা কুয়াশার সঙ্গে মিশে গিয়ে শব্দহীন স্নিগ্ধ এক ঝর্নার মতো গড়িয়ে পড়ছে। বিজু বলল, 'আবু চেরাপুঞ্জি যেতে চেয়েছিলি না? আমার কিন্তু এখন কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না।'

আমি বললাম, 'চেরাপুঞ্জিই যে আমাদের কাছে এসে গেছে। দুলালদা যখন বললেন, আমি চেরাপুঞ্জি থেকে আসছি, তখন মনে হয়েছিলো আমি নিজেই যেন চেরাপুঞ্জি চলে গেছি।'

রামু বললো, 'আমরা হারিয়ে যাওয়ার ঠিকানা খুঁজছিলাম। এখন আমার মনে হচ্ছে আমি নিজের ভেতর হারিয়ে যাই।'

রামুর মুখে এ ধরনের কথা শুনে আমি একটুও চমকে উঠি নি। কাল দুলালদা, আজ সোনিয়া আমাদের বয়স অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। এখন থেকে আমরা অভিজ্ঞতার সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে উঠে যাবো আমাদের অনেকদিনের অচেনা জগতে। দুলালদা আর সোনিয়া যেন অন্তহীন সেই সিঁড়ি, যে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলে আকাশে ছোঁয়া যায়।

সাধু নিকোলাসের গির্জার ঘড়িতে নটার ঘন্টা বাজলো। আমাদের বাড়ির আলো তখন প্রায় সবই নিভে গেছে। শুধু রান্নাঘরে আলো জ্বেলে সেজ কাকিমা মেজদার জন্যে নারকেলের মিষ্টি তৈরি করছিলেন। মেজদা এসব খাবার ভারি পছন্দ করেন। আমাদের নেড়ি কুত্তো টেমিটা কয়েকবার ঘেউঘেউ করে ডাকলো। তার একটু পরেই এলেন দুলালদা।

বিজু বলল, 'টেমি কি আপনাকে দেখে ডাকলো নাকি দুলালদা?'

দুলালদা হেসে বললেন, 'ওটা কি তোমাদের কুকুর? আমি আস্তে একটা ধমক দিতেই পালিয়ে গেলো।'

বিজু বললো, 'টেমি এমনই। কাউকে ভয় পেতে দেখলেই শুধু ওর সাহস বাড়ে।'

দুলালদা বললেন, 'নিচের দরজাটা আমি বন্ধ করে দিয়ে এসেছি।'

আমি বললাম, 'ভালো করেছেন। আজ দরজা খোলা দিয়ে বাড়িতে রীতিমতো নাটক হয়ে গেছে।'

দুলালদা ভুরু কুঁচকে বললেন, 'ট্র্যাজেডি না কমেডি?'

আমরা তিনজন একসঙ্গে হেসে বললাম, 'কমেডি।'

'যাক বাঁচালে!' দুলালদা হাঁফ ছেড়ে বললেন, 'তাহলে পরেই শুনবো। তোমাদের খাওয়া-দাওয়ার পর্ব কি মিটে গেছে?'

রামু বললো, 'বারে, আমরা তো আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি।'

দুলালদা ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'বলো কী! তোমরা খেয়ে আমার জন্যে কিছু রেখে দিলেই তো পারতে! এসব ছেলেমানুষির কোনো মানে হয়?'

আমি হেসে বললাম, 'আহ্ দুলালদা। আপনি আমাদের গেষ্ট। আপনাকে বাদ দিয়ে কি খাওয়া যায়!'

দুলালদা হেসে ফেললেন— 'গেস্ট নয় বরং ঘোস্ট বলতে পারো। ভূতের মতো এসে তোমাদের কাঁধে চেপেছি।'

বিজু মুখ টিপে হেসে বললো, 'সত্যি বলছি দুলালদা। আপনি যদি সত্যিকারের ভূত হতেন তাহলে আমি ভারি খুশি হতাম। ভূত দেখার ভারি সখ আমার।'

দুলালদা বললেন, 'তাহলে তোমার উচিত ছিলো আজ আমার সঙ্গে যাওয়া। আমি খাসিয়াদের ভূত-পূজো দেখে এসেছি। ভূতকে খুশি করার জন্য যে ছাগলটি বলি দেয়া হয়েছিলো, তার মাংসও খানিকটা চেখে দেখেছি।'

বিজু চোখ কপালে তুলে বললো, 'বলেন কী দুলালদা! দারুভুই যে আমাদের কখনো বলে নি ওরা ভূত-পূজো করে?'

দুলালদা বললেন, 'শুধু ভূত নয়, ওরা দেবতার পূজোও করে। ওদের ঈশ্বরকে ওরা বলে উ ব্লাউ নাংথাউ। একজন দেবতার নাম উ ব্লাই উমতুং, আর একজনের নাম উ ব্লাই সংসপহ। এরকম অনেক দেবতা আছে ওদের। চলো, আগে খেয়ে নিই। পরে তোমাদের খাসিয়াদের গল্প বলবো। যাই বলো ওদের মতো ভালো, নিরীহ মানুষ আর হয় না। ভালো হওয়ার জন্য ওদের দুঃখও অনেক।'

রামু বলল, 'আপনি মুখহাত ধুয়ে নিন। কাল ইচ্ছে করলে আপনি শাওয়ারে গোসল করতে পারবেন।'

দুলালদা হেসে বললেন, 'একদিনে অনেক কিছু ঘটে গেছে দেখছি।'

আমি বললাম, 'আরো দেখবেন। সারাদিন যে কত নাটক হয়েছে!'

দুলালদা আগের মতো হেসে আবার বললেন, 'ট্রাজেডি না কমেডি?'

আমরা তিনজন এক সঙ্গে জবাব দিলাম, 'কমেডি।'

খেয়ে উঠে একটা সিগারেট ধরিয়ে দুলালদা সবেমাত্র খাসিয়াদের ভূতপূজোর গল্প শুরু করেছেন তখনই দরজার বাইরে কয়েকটা টোকা পড়লো। আমরা সবাই ভীষণরকম চমকে উঠলাম। দরজা-জানালা সব বন্ধ করে দিয়েছিলাম। দুলালদা সিগারেটটা সঙ্গে সঙ্গে নিভিয়ে ফেললেন। বিজু বললো, 'দুলালদা এক্ষুণি আপনি

খাটের তলায় লুকিয়ে পড়ুন।'

দরজায় আবার টোকা পড়লো। সেই সঙ্গে দিদার গলা শুনলাম, 'আমাকে কতক্ষণ বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখবি?'

দুলালদা বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। দিদার গলা শুনে আমি মৃদু হেসে বললাম, 'ভয় নেই দুলালদা। দিদাকে আপনার কথা বলেছি।'

রামু দরজা খুলে দিতেই দিদা ভেতরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। দিদার হাতে তাঁর মস্ত বড় পানের বাটা। দুলালদাকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখে, একগাল হেসে বললেন, 'তুমিই তো দুলাল! ছোঁড়রা তোমার যে-রকম বর্ণনা দিয়েছে তাতে হাজার লোকের ভিড়ের ভেতরও তোমাকে খুঁজে বের করে ফেলতাম।'

দুলালদা মৃদু হেসে বললেন, 'আপনি বসুন!'

দিদা আমাদের খাটের উপর বসে আস্ত একটা পান মুখে দিয়ে বললেন, 'বসবো বলেই তো এসেছি। তুমিও বোসো। তোমাকে সকালেই দেখেছিলাম আমি। আমার এই নাতিগুলো এমনই ভালো যে হাঁড়ি-কাবাবের লোভ দেখাতেই তোমার কথা সব বলে ফেললো। তুমি দেখছি ওদের সবই বলে দিয়েছো।'

আমি বললাম, 'কাবাবের লোভ না দেখালেও দুলালদার কথা তোমাকে বলতাম দিদা। তোমার কাছে কোনো কথা আমরা লুকোই না।'

দিদা চোখ পিটপিট করে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তাহলে একটু আগে দুলালকে খাটের তলায় লুকোতে বলেছিলো কে?'

বিজু লজ্জায় লাল হয়ে বললো, 'আমি তো ভাবলাম ছোড়দা বুঝি এলো, তুমি না বললে ছোড়দা আমাদের সঙ্গে থাকতে চেয়েছে?'

দিদা বললেন, 'চেয়েছিলো। তারপর ওকে এমন বকে দিয়েছি যে, কক্ষনো তোদের ঘরে শুতে চাইবে না! যাকগে ওসব, যে-জন্যে এসেছি সেটা আগে শেষ করি। তুমি বাছা সঙের মতো দাঁড়িয়ে থাকবে নাকি? খাটের ওপর পা তুলে আরাম করে বোসো। শরীরের ওপর দিয়ে তো কম ধকল যায় নি।'

দুলালদা লাজুক হেসে খাটে উঠে বসলেন। দিদা পান চিবুতে চিবুতে বললেন, 'কিছু মনে কোরো না বাপু। তোমার কথা শোনা অব্দি সারাক্ষণ তোমাকে নিয়ে ভেবেছি। আমার কুটুও এসব করে জেলে গিয়ে পচছে। তোমরা মানুষের অবস্থা ভালো করতে চাও, দেশের মঙ্গল চাও, কুটু আমাকে সবই বলেছে। এখন তোমার কথা বলো। তুমি কী করবে ঠিক করেছো? তোমাকে পুলিস তাড়া করছে, আর তুমিও এখানে-সেখানে পালিয়ে বেড়াচ্ছো-এটা বাপু ভালো কথা নয়। আজকাল শুনি তোমাদের মতো ছেলেদের ধরলে আর জেল পর্যন্ত নেয়ার দরকার মনে করে না ওরা। পথেই নিকেশ করে দেয়। কে মেরেছে কে জানে! ওরা বলে, একদল আরেক দলকে মারছে। এটা বাছা মোটেই ভালো

লক্ষণ নয়। আমি বলি কী, তুমি আমাদের বাসায় থেকে যাও। আবুদের মাস্টার হয়েই না হয় থাকলে। এই এলাকায় যখন কাজ করতে চাও, এখানে থাকলে ক্ষতি কী! আমার বাড়িতে থাকলে বিশ্বাস দারোগা তোমার কেশাগ্রটিও স্পর্শ করতে পারবে না।'

দিদার কথা শেষ হওয়ার পর দুলালদা কিছুক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলেন না। দিদা যে দুলালদাকে এভাবে থাকতে বলবেন এটা আমাদের কল্পনার বাইরে ছিল। দিদার জন্যে গর্বে বুকটা ভরে গেল।

দুলালদা একটু পরে আস্তে আস্তে বললেন, 'দিদা আপনার স্নেহের কথা আমি চিরকাল মনে রাখব। মা মারা যাবার পর কেউ আমার ভালোর জন্যে আপনার মতো বলে নি। কাজ আমি এখানেই করবো। আরো কয়েকদিন হয়তো আপনাদের বাসায় থাকতে পারি। তবে আপনি যেভাবে থাকতে বলছেন দিদা, সেভাবে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়! আমি গ্রামেই থাকবো। গ্রামের মানুষদের সঙ্গে আমি মিশে যেতে চাই। আজ সারাদিন ওদের সঙ্গে ছিলাম! ওদের দুঃখ-দুর্দশা যে কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে চোখে না দেখলে কল্পনাও করা যাবে না। আপনাদের বাসায় থেকে কাজ করাটা হয়তে অনেক নিরাপদের হবে। কিন্তু এখানে থেকে ওদের সঙ্গে আমি একাত্ম হতে পারবো না।' একটু থেমে দুলালদা আবার বললেন, 'বিপদের সবরকম ঝুঁকি নিয়েই তো এত বছর ধরে কাজ করে যাচ্ছি। এতদিন পরে কি বিপদের ভয়ে দায়িত্বে অবহেলা করব দিদা?'

দিদা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। তারপর ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন— 'তুই একেবারে কুটুর মতো কথা বলছিস দুলাল। আমি জানি তোদের বিপদের কথা বলে বেঁধে রাখা যাবে না। কুটু যাবার সময় বলে গিয়েছিলো, একজন কুটু মরলে তার বদলে হাজারটা কুটু জন্মাবে। ওরা কতজনকে মারবে? মরণকে হুকুমের চাকর শুধু তোরাই বানাতে পারিস। আমরা অকেজোরা কেবল মরণের ভয়ে আগে থাকতেই আধমরা হয়ে থাকি।'

দুলালদা এবার আর কোনো কথা বললেন না। দিদার কান্না দেখে আমার বুকের ভেতরটা কেমন যেন করতে লাগলো। দিদা চোখ মুছে বললেন, 'যখন যেখানে থাকিস এই বাড়িটাকে তোর নিজের বাড়ি মনে করবি। যখন যা দরকার হবে এই বুড়িকে বলবি। আমি বেঁচে না থাকলেও ওরা থাকবে। তুই যে বললি তোর কথা কেউ ভাবে না—কথাটা সত্যি নয়রে দুলাল! তুই যাদের জন্যে কাজ করিস তারা সবাই তোর কথা ভাববে। তোর কিছু হলে ওদের কী হবে সেটাও একবার ভাবিস। আমরা যারা তোদের মতো কিছু করতে পারি না অথচ দেশের গরিব মানুষের কথা ভাবি, আমরা তোদের কথা ভুলে থাকবো তা কি হয়। কুটু আর ওর বন্ধুদের কথা ভেবে রাতে আমার ঘুম হয় না। আমি জানি এখন তোদের সময় খুব ভালো যাচ্ছে না। ঝোঁকের মাথায় কোনো কাজ করতে যাসনে। এটা

তো তোকে মনে রাখতে হবে, আজকের এই অবস্থায় আসতে তোর ছ'বছর সময় লেগেছে। একবার তোরা কী এক সর্বনেশে খুনের নেশায় মেতে গিয়ে হাজার হাজার ছেলেকে হারালি। শুধু ভুল স্বীকার করাটাই বড় কথা নয়। সামনে যাতে ভুল না হয় সেজন্যে ভেবেচিন্তে কাজ করা উচিত।'

দুলালদা মৃদু হেসে বললেন, 'আপনি এত কথা জানলেন কী করে দিদা?'

দিদা বললেন, 'আমার বয়সটা কি তোর চোখে পড়ছে না? এই বয়সে কম জিনিস তো আর দেখি নি! নিজের হাতে একসময় বোমার মশলাও বানিয়েছি। যাকগে ওসব কথা। তোকে খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছে। ঘুমিয়ে পড়। কাল সকালে উঠেই তো আবার চোরের মতো পালাবি।' দিদা পানের বাটার ভেতর থেকে একটা কাগজের ঠোঙা বের করলেন। আমাকে বললেন, 'এর ভেতর নারকোলের বরফি আছে। দুলালকে সকালে খেতে দিস!'

আমরা তিনজন দিদার কাণ্ড দেখে শুধু অবাকই হচ্ছিলাম। দিদা খাট থেকে নেমে দুলালদার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন, 'আজ রাতে আর ওকে গল্প শোনাবার জন্যে জ্বালাস নে।'

একটি অপরূপ সকাল

পরদিন মোরগের ডাকে ঘুম ভাঙল। ঘরের ভেতর তখনো অন্ধকার। উঠে জানালা খুলে দিলাম। আকাশের কালো রঙটা সবেমাত্র ফিকে হয়ে এসেছে। কুয়াশায় একহাত দূরের জিনিসও ভালো দেখা যাচ্ছে না।

দুলালদাকে রাতে আমরা স্প্রিং বের-করা নোংরা ডিভানে শুতে দিই নি। দুলালদা এখনো ঘুমোচ্ছেন। বিজুর লেপ গায়ে দিয়েছেন তিনি। গত বছর এরকম শীতের সময় নাকি তিনি জব্বলপুরের মার্বেল পাহাড়ে ছিলেন। ওখানকার শীতের কথা শুধু বইয়েই পড়েছিলাম। দুলালদার কাছে সেই শীতের গল্প শুনে আমরা হিম হয়ে গিয়েছি। কী অদ্ভুত জীবন দুলালদার! প্রতিটি মুহূর্তেই নতুন কিছু ঘটছে, বৈচিত্র্যে সবটুকু সময় ভরপুর হয়ে আছে। দুলালদা ঘুমের ভেতর

হাসছেন! স্বপ্ন দেখছেন হয়তো। দুলালদার মতো পবিত্র চেহারার মানুষ আমি শুধু বইয়ে আঁকা ছবিতেই দেখেছি। কী রকম নিষ্পাপ হাসেন দুলালদা!

সোনিয়া একদিন আমাকে বলেছিলো, মন পবিত্র না হলে কেউ নিষ্পাপ হাসতে পারে না। সোনিয়ার হাসি যে নিষ্পাপ একথা আমি ওকে বলি নি। আমার কিছু আবিষ্কার, আমি চাই একান্তভাবে আমারই থাকুক। যেমন সোনিয়াকে আমার ভালো লাগে একথা কাউকেই বলা যাবে না। এমনকি সোনিয়াকেও নয়।

কুয়াশা না থাকলে জয়ন্তিয়া পাহাড়ের সূর্যোদয় ভারী সুন্দর লাগে। এখানো সূর্য ওঠে নি। উলের চাদরটা গায়ে দিয়ে বাইরে এলাম। সঙ্গে সঙ্গে ঘন কুয়াশার ভেতর ডুবে গেলাম। মনে হলো পৃথিবীতে আমি ছাড়া আর কেউ নেই। ছাদের ওপর একা একা হাঁটতে ভালো লাগছিলো। দিদা বলেন, সূর্য ওঠার আগে ঘুম থেকে উঠে বাইরে ঘুরলে মন পবিত্র হয়। কথাটা তিনি মিথ্যে বলেন নি। সোনিয়ার কথা ভাবতে ভাবতে সেদিন ভোরে, কুয়াশার সমুদ্রে ভেসে আমি স্বর্গে চলে গিয়েছিলাম। এমনতে স্বর্গ-নরক না থাকুক, আমাদের সবার মনের ভেতর স্বর্গের অস্তিত্ব ঠিকই আছে।

দুলালদা কখন এসে যে আমার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন টের পাইনি। মৃদু হেসে তিনি আস্তে আস্তে বললেন, 'তুমি ঘুম থেকে উঠে আমাকে তুলে দাও নি কেন আবু? তোমার সঙ্গে তাহলে অনেকক্ষণ কুয়াশায় ডুবে থাকা যেতো।'

আমি বললাম, 'আপনি স্বপ্ন দেখছিলেন দুলালদা। তাই ঘুম ভাঙাই নি। শেষ রাতের স্বপ্নগুলো সুন্দর হয়।'

'তুমি কী করে জানলে আমি স্বপ্ন দেখছিলাম?'

'ঘুমের ভেতর আপনি হাসছিলেন যে! আপনার ঠোঁটও নড়ছিলো।'

দুলালদা বললেন, 'বহুদিন পরে মা আর দীপাকে স্বপ্নে দেখলাম। স্বপ্নের ভেতর মনে হচ্ছিলো মা বারবার দীপা হয়ে যাচ্ছেন। আর দীপাকে মনে হচ্ছিলো মার মতো।'

দুলালদা মৃদু হাসছিলেন। ভোরের নরম আকাশের মতো প্রশান্ত আর পবিত্র মনে হলো তাঁকে।

আমি দুলালদাকে হাসি খালা আর সোনিয়ার কথা বললাম। 'আপনার জন্যে কাঁদবার অনেক মানুষ আছে।' এই বলে কথা শেষ করলাম।

দুলালদা কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে বললেন 'হাসি খালা আর সোনিয়া সত্যিই খুব ভালো। হাসি খালাকে বোলো ওঁর কথা আমার মনে থাকবে। কয়েকদিন পরে আমি ওঁর সঙ্গে দেখা করবো।'

আমি মাথা নেড়ে সায় জানালাম। দুলালদা বললেন, 'আমি এখন যাবো। তুমি কি আমাকে একটু এগিয়ে দেবে?'

আমি বললাম, 'নিশ্চয়ই দেবো। নইলে এত ভোরে আমি কখনো উঠতাম না।'

দুলালদা বললেন, 'খুব কষ্ট হয়েছে তাই না! শীতের ভোরে সহজে লেপের তলা থেকে বেরুতে ইচ্ছে করে না।'

আমি হেসে বললাম, 'একবার বেরিয়ে পড়লে আর লেপের তলায় ফিরে যেতেও ইচ্ছে হয় না।'

দুলালদা মৃদু হেসে বললেন, 'আমাদের মতো বুঝি? একবার বেরিয়ে পড়তে পারলেই হয়ে গেলো!'

আমি বললাম, 'ঠিক আপনাদের মতো নয়। আপনি কি ইচ্ছে করলেই বাড়ি ফিরে যেতে পারবেন?'

'আমার কখনো সে রকম ইচ্ছে হয় না আবু।'

'আপনার কথা আলাদা। কিন্তু অনেকের তো ফিরে যেতে ইচ্ছে করে। তখন তো ফেরার পথ বন্ধ হয়ে যায়।'

'ওদের প্রথমেই ভাবা উচিত। অনেকের জন্য আবার এভাবে বেরিয়ে আসাটা ঠিকও নয়। আমি একটা ঘর ছেড়ে হাজারটা ঘর পেয়েছি। এটাই আমার আনন্দ। আমি কেন নিউ আলীপুরের নিষ্প্রাণ দমবন্ধ করা সেই বাড়িতে, আমার শত্রুদের দুর্গে ফিরে যাবো?'

'সবাই কি আপনার মতো হতে পারে?' কথাটা আমি এত আস্তে বলেছিলাম যে দুলালদা বোধহয় শুনতে পান নি।

ঘরে ঢুকে দেখি রামু আর বিজু অঘোরে ঘুমোচ্ছে। আমি দিদার দেয়া নারকেলের বরফি আর চিঁড়েগুলো দুলালদাকে দিলাম। ওগুলো রুমালে বেঁধে নিয়ে দুলালদা বললেন, 'আমি এখন যাদের বাড়িতে যাবো, ওদের বাচ্চারা এগুলো পেলে ভারি খুশি হবে। মানাতিনরা খুবই গরিব; কাল পুজো ছিল বলে ওরা চাট্টি খেতে পেয়েছিলো। নইলে অনকেদিন শুধু পাহাড়ি ঘাসের বীজ পুড়িয়ে আর সেদ্ধ করে খায়।'

আমি কয়েক মুহূর্ত দুলালদার মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'এক মিনিট দাঁড়ান দুলালদা। আমি আসছি।'

এক ছুটে আমি নিচে চলে গেলাম। রান্নাঘরে যাওয়ার সময় দিদার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। দিদা তসবি জপছিলেন। আমার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকালেন।

আমি বললাম, 'আরো কিছু বরফি নেবো দিদা।'

দিদা ঘাড় নেড়ে সায় জানিয়ে ওঁর ঘরের দিকে চলে গেলেন। একটা কাগজের ঠোঙায় করে কয়েক মুঠো চিঁড়ে আর বরফি নিলাম। সেজ কাকিমা মেজদার জন্যে এত বেশি তৈরি করেছেন যে, আরো কিছু নিলেও টের পেতেন না। বরফিগুলো এনে দুলালদাকে দিতেই তিনি হেসে বললেন, 'সেজ কাকিমা জানলে রাগ করবেন না?'

আমি বললাম, 'দিদা জেনেছেন। সবকিছু সামলানোর ভার এখন দিদার ওপর।'

'ওঁকে বুঝি বলেছো, আমার জন্যে বরফি নিচ্ছো? আমাকে কী পেটুকই না ভাববেন তিনি!'

'না আপনার কথা বলি নি। দিদা নামাজ পড়ে উঠে তসবি গুনছেন। এসময় তিনি কারো সঙ্গে কথা বলেন না। আমি শুধু বলেছি বরফি নিচ্ছি।'

রামু-বিজুর ঘুম সহজে ভাঙবে বলে মনে হয় না। আমি বললাম, 'চলুন দুলালদা, ওদের আর তুলবো না। যদিও ফিরে এলে ওদের বকুনি শুনতে হবে, তবে আপাতত মনে হচ্ছে ঘুমোনোটাই ওরা বেশি পছন্দ করছে।'

দুলালদা মৃদু হেসে বললেন, 'বেশ তো চলো। ফেরার পথে তুমি যে একা হয়ে যাবে!'

দুলালদাকে আর বলা হলো না যে, আমি ইচ্ছে করেই একা যেতে চাই। পথে সোনিয়ার সঙ্গে যদি দেখা হয়! সেই সময়টুকু শুধু আমারই জন্যে থাকুক।

আগের মতো আমরা দুজন লোহার সিঁড়ি বেয়ে নেমে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম। দুলালদাকে পচার মার আবর্জনা ফেলা আর ডাকাত দেখার কথা বললাম। দিদা কীভাবে ওকে বকুনি দিয়েছেন সে কথা শুনে দুলালদা হাসতে হাসতে বললেন, 'দিদার কোনো তুলনা হয় না।'

আকাশে ভোরের আলো আরেকটু স্বচ্ছ হলেও কুয়াশার ঘোর তখনো এতটুকু কাটে নি। নুড়ি-বিছানো পথে আমরা দুজন চুপচাপ হাঁটছিলাম। দুলালদা আমার কাঁধে হাত রেখেছেন। মনে হল আমি অনেক বড় হয়ে গেছি।

সোনিয়াদের বাড়ির কাচের জানালাগুলো সব বন্ধ। একটা ঘরে টেবিল ল্যাম্পের মৃদু আলো জ্বলছে। ওটা হাসি খালার ঘর। দুলালদা বললেন, 'এটা সোনিয়াদের বাড়ি না?'

আমি বললাম, 'আপনার মনে আছে তাহলে! কাল ভোরে ফেরার পথে সোনিয়া আর হাসি খালাকে জানালার কাছে বসে থাকতে দেখেছিলাম। সোনিয়া আমাদের দেখেই হাত নেড়েছিলো।'

দুলালদা বললেন, 'হাসি খালা কি লেখাপড়া জানেন?'

আমি বললাম, 'ঢাকায় থাকতে তিনি ওখানকার এক কলেজে পড়াতেন। অনেক বই আছে ওঁর। আমাদের দিদাও বেথুনে পড়েছিলেন। অবশ্য বি এ পাশ করার আগেই দাদুর সঙ্গে বিয়ে হয়ে গিয়েছিলো।'

দুলালদা হেসে বললেন, 'আমাদের দেশের মেয়েরা কি পরীক্ষায় পাশ করার জন্যে বি এ, এম এ, পড়ে? দিদাদের সময়ে অবশ্য রান্না আর সেলাই জানলেই চলতো। গান জানলে ভালো হতো।'

আমি হেসে বললাম, 'সেই সঙ্গে গায়ের রঙটা ঘসে দেখা হতো, দাঁতগুলো ঠুকে দেখা হতো, চুলগুলো মেপে দেখা হতো।'

দুলালদা শব্দ করে হাসলেন— 'তুমি এত কথা জানলে কোত্থেকে?'

'দিদা বলেছেন। বেথুনে পড়া দিদাকেও এসব পরীক্ষায় পাশ করতে হয়েছিলো।'

দুলালদা একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন— 'আমাদের দেশের মেয়েরা এত অসহায় যে বলার নয়। ভেবে দেখো, দিদার মতো মেয়েকেও এসব মেনে নিতে হয়েছিলো। মেয়েদের শক্তি যে ছেলেদের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়, এটা উপলব্ধি করতে আরো অনেক সময় লাগবে। কী অদ্ভুত নিয়ম! সোনিয়ার বাবা আরেকটা বিয়ে করলেও সোনিয়ার মাকে সব কিছু মেনে নিতে হবে!'

আমি বললাম, 'তার চেয়েও বিচ্ছিরি ব্যাপার হচ্ছে সোনিয়ার বাবার জন্যে হাসি খালাকেই দায়ী করা হয়। অথচ হাসি খালার মতো পবিত্র মানুষ আমি খুব কম দেখেছি।'

দুলালদা কিছুক্ষণ চুপ থেকে আপন মনে বললেন, 'আমার মাকেও কম দুঃখ সইতে হয় নি।'

আমি ভাবছিলাম দুলালদার কথা। তাঁর দুঃখ কি কম! যে পার্টির জন্য তিনি সব কিছু ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন, এতদিন পরে দেখেলেন সেই পার্টি ভুল কাজ করেছে। কতদিনের বন্ধুরা চোখের সামনে মরে গেছে। দুলালদা দীপার কথা বলতে গিয়ে একবার বলেছিলেন, কাজের ভেতর দিয়ে যে বন্ধুত্ব হয় সেটাই হচ্ছে আসল। আমি আর সোনিয়া যদি কখনো বিপ্লবী হয়ে যাই, যখন আমার সঙ্গে সোনিয়া ছাড়া আর কেউ থাকবে না, তখন যদি সোনিয়া মরে যায় তাহলে আমিও যে ওর সঙ্গে মরে যাবো! দুলালদা আরো অনেক কিছু সহ্য করেছেন। নেতাদের স্বার্থপরতা, পার্টি টুকরো-টুকরো হয়ে যাওয়া, নিরাপদ আশ্রয়ের জন্যে অবিরাম ছুটে চলা—এতকিছুর পরও দুলালদা হাসছেন, কাজ করেছেন, বিপ্লবের স্বপ্ন দেখছেন। একেই তো বলে সত্যিকার অর্থে বেঁচে থাকা। দিদা ঠিকই বলেন, আমরা অকেজোরা মরার ভয়ে মারা যাবার আগেই মরে থাকি।

কমলালেবুর বাগানের শেষ প্রান্তে এসে দুলালদা বললেন, 'ঠিক আছে আবু, এবার আমি যেতে পারবো।'

আমি বললাম, 'দুলালদা আপনাকে আমি ঝর্না পর্যন্ত এগিয়ে দেবো।'

দুলালদা মৃদু হেসে বললেন, 'কাল বলবে, ঝর্নার ওপারে পৌঁছে দেবো। আর পরশু বলবে জয়ন্তিয়া পাহাড়ে পৌঁছে দেবো।'

আমি হেসে বললাম, 'ঠিক ধরেছেন দুলালদা। একদিন এভাবেই আপনার সঙ্গে বেরিয়ে পড়বো।'

দুলালদা আমার কথার কোনো প্রতিবাদ না করে চুপচাপ হাঁটতে লাগলেন। নুড়ি-বিছানো পাহাড়ের ঢালু পথে নামতে দুলালদার এখনো বেশ অসুবিধে হয়। অথচ আমরা তরতর করে নেমে যাই। দুলালদাকে বললাম, 'আমার হাত ধরুন দুলালদা। নইলে পিছলে যাবেন।'

দুলালদা আমার হাত ধরে হেসে বললেন, 'কাল সন্ধ্যেয় পাহাড় থেকে নামার সময় পিছলে গিয়েছিলাম। তখন মনে হয়েছে পিছলে পড়াটা খুব একটা খারাপ কিছু নয়। মজাই লাগে।'

আমি বললাম, 'আমরা এটাকে বলি গড়িয়ে যাওয়া খেলা। এখনো মাঝে মাঝে খেলি। ছুটে এসে পাহাড়ের ঢালুতে পা ছেড়ে দেই। বেশ মজার খেলা।'

দুলালদা বললেন, 'মজা, তবে বেশি খেললে প্যান্ট ছিঁড়ে যাবার ভয় আছে।'

আমি আর দুলালদা একসঙ্গে হেসে উঠলাম। কুয়াশার পর্দা স্বচ্ছ হয়ে চোখের সামনে ঝর্নাটা যেন লাফিয়ে উঠলো। কলকল শব্দ তুলে আয়নার মতো স্বচ্ছ ঝর্নাধারাটি অবিরাম বয়ে চলেছে। বড় বড় সব পাথর ঝর্নার পানিতে মাথা উঁচু করে পড়ে আছে। নিচে রঙিন নুড়ি ছড়ানো। ঝর্নার ওপর কে যেন কুয়াশার একটুকরো ফিনফিনে চাদর বিছিয়ে রেখেছে।

দুলালদা প্যান্ট গুটিয়ে স্যান্ডেল হাতে নিয়ে বললেন, 'এবার কেটে পড়া আবু। পানিতে তোমার পা জমে যাবে। পানিটা এমন ঠাণ্ডা যে মনে হয় ধারালো ছুরির ওপর দিয়ে হাঁটছি।'

আমি বললাম, 'কদিন পরে ছুরির ওপর দিয়ে হাঁটা ঠিকই অভ্যেস করে ফেলবো দুলালদা।'

দুলালদা আমার কাঁধ চাপড়ে ঝর্নার পানিতে নেমে গেলেন। ঠাণ্ডার কথা ভেবে আমি নিজেই শীতে কাঁপতে লাগলাম। কুয়াশার ভেতর দুলালদা পুরোপুরি হারিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দূরে একটা বনমোরগ কাঁপাকাঁপা গলায় ডেকে উঠলো। মনে হলো, খাসিয়াদের গ্রামগুলো দুলালদাকে ডাকছে।

ওপরে তাকিয়ে দেখি আকাশ থেকে সাদা কুয়াশার পর্দা ঝুলছে। তার ভেতর ফ্যাকাশে সূর্যটা ভাসছে। আমাদের কমলা বাগানের চিহ্নটি কোথাও নেই। নিজেকে হঠাৎ ভীষণ একা মনে হলো। দুলালদা চলে গেলেন খাসিয়াদের গ্রামে। রামু-বিজু ঘরে লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে। আমার চারপাশে কোনো লোকজন নেই। ঝর্নার একটানা মৃদু শব্দ ছাড়া কোথাও এতটুকু শব্দ নেই। উত্তরের পাহাড় থেকে হু হু করে একঝলক হিমেল বাতাস চোখেমুখে আঁচড় কেটে বয়ে গেলো। আর তখনই মনে পড়লো সোনিয়ার কথা। শীত তাড়াবার জন্যে আমি সটান দৌড় দিলাম।

সোনিয়াদের বাসার কাছে এসে দেখি ও কাঠের ছোট্ট গেটটার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখে মিষ্টি হেসে বললো, 'দুলালদাকে পৌঁছে দিতে গিয়েছিলি বুঝি?'

আমি হেসে বললাম, 'তুই জানলি কী করে?'

সোনিয়া বললো, 'আমি জানালার পাশে ছিলাম যে! দুলালদা জানালার দিকে তাকিয়েছিলেন। অবশ্য তিনি আমাকে দেখতে পান নি। আলোয় থাকলে

অন্ধকারের কিছু দেখা যায় না।'

আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'কী চমৎকার কথা বললি সোনিয়া! অথচ অন্ধকারে থাকলে আমরা ঠিক আলো দেখতে পাই।'

সোনিয়ার মুখে গোলাপের ছায়া পড়লো। কয়েক মুহূর্ত কোনো কথা না বলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। চারপাশে কুয়াশার সাদা দেয়াল তখন রোদের আলোয় দ্রুত গলে যাচ্ছে। একটা দুটো নাম-না-জানা পাখি ডাকতে শুরু করেছে। সোনিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হলো ও যদি দীপার মতো হতো তাহলে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে কাউকে পরোয়া করতাম না। আস্তে আস্তে সোনিয়াকে বললাম, 'একদিন তোকে দীপার গল্প বলবো। দুলালদার সবচেয়ে কাছের বন্ধু ছিলো দীপা।'

সোনিয়া বড় বড় চোখে আমার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বললো, 'দাঁড়া, আমি এক্ষুনি আসছি।'

সোনিয়া ছুটে গিয়ে লনের উপর জমে-থাকা কুয়াশায় হারিয়ে গেলো। একটু পরে আবার কুয়াশার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো। ওর হাতে মস্ত বড় একটা লাল গোলাপ। কোনো কথা না বলে সোনিয়া গোলাপটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিলো। গোলাপের মখমলের মতো নরম পাপড়িতে মুক্তোর দানার মতো শিশির লেগেছিলো। ওর হাত থেকে গোলাপটা নিয়ে বুক ভরে গন্ধ নিলাম। কাল সন্ধ্যায় এরকম এক মিষ্টি গন্ধে আমার বুকটা ভরেছিলো।

সোনিয়ার মোমের মতো গালে তখনো গোলাপের ছায়া জড়িয়ে আছে। ঠোঁট দুটো গোলাপের সদ্য ফোটা কলির মতো। আমি মৃদু হেসে বললাম, 'এটা কিসের জন্যে সোনিয়া?'

সোনিয়া বলল, 'তুই যে এরকম দারুণ বিচ্ছিরি এক শীতের ভোরে দুলালদাকে পৌঁছে দিতে গেছিস, সেজন্য এটা তোর পাওনা ছিলো।'

আমি ফিসফিস করে বললাম, 'সোনিয়া, এরকম সুন্দর সকাল আমার জীবনে কখনো আসে নি।'

সোনিয়া মৃদু হেসে বললো, 'বিকেলে তোরা আসবি তো?'

আমি বললাম, 'নিশ্চয়ই।'

মেজদা ও তাঁর সঙ্গীরা

ঘরে ফিরতেই রামু আর বিজু মহা হইচই আরম্ভ করে দিলো। 'কী স্বার্থপর তুই। আমাদের ফেলে একা চলে গেলি! তোর সাহস তো কম নয়! পথে কিছু ঘটলে একা সামলাতে পারতি?'

এরকম অনেকগুলো কথা ওদের দুজনের মুখ দিয়ে ফোয়ারার মতো বেরুতে লাগলো। আমার মনটা তখন এত বেশি প্রসন্ন ছিলো যে, ওদের কথার বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ করি নি। গোলাপ ফুলটা আমি ছোট্ট একটা ডিম্পলের শিশিতে রেখে দিলাম। ডিম্পলের শিশিটা আমাকে অনেক আগে মেজদা দিয়েছিলেন। ওতে আমি তুঁত-মেশানো রঙিন পানি রাখতাম। মাঝে মাঝে সরকারদের বাসা থেকে ফুল চুরি করেও শিশিটায় রেখে দিতাম। সোনিয়ার দেয়া বড় গোলাপটা শিশিতে করে টেবিলের মাঝখানে রাখার পর মনে হল সারা ঘর আলো হয়ে গেছে। রামু, বিজু ওটা দেখে কিছু বললো না। ওরা হয়তো ভেবেছে আমি চুরি করে এনেছি। ভাবুকগে। আজ সকালে সোনিয়ার সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা আমি কাউকে বলবো না।

কুয়াশা কেটে গিয়ে যখন নীল আকাশ, ঘন সবুজ ঝাউবন দূরের ধূসর পাহাড় হলুদ রোদে ঝলমল করে উঠলো তখন মেজদা এলেন তাঁর দলবল নিয়ে। দুটো বড় জিপে মালপত্র বোঝাই করে এনেছেন তিনি। মেজদার গাড়ি দেখার জন্যে আমরা তিনজন ছাদে বসেছিলাম। দুদ্দাড় করে সিঁড়ি ভেঙে, 'মেজদা এসেছে'— বলে একছুটে একেবারে সদর দরজায় চলে গেলাম।

আমাদের দেখে মেজদা হেসে বললেন, 'এই যে থ্রি মাস্কেটিয়ার্স। তোমরা সবাই ভালো আছো তো? চেহারা দেখে তো মনে হচ্ছে খুবই ভালো আছো।'

আমরা তিনজন শুধু হাসলাম। মেজদা জিপ থেকে নামলেন। তাঁর পাশে বসা ছিলো দারুণ সাজগোজ করা এক মহিলা। চেহারাটা চেনা-চেনা মনে হলো। তিনিও মেজদার পেছন-পেছন নামলেন। বিজু আমার কানে কানে বলল, 'মেজদার হবু বউ নাকি রে!'

আমি ততক্ষণে সেই মহিলাকে চিনতে পেরেছি। চাপা গলায় বিজুকে ধমক দিলাম—'কী যা তা বলছিস্! ইনিই তো মেজদার ছবির নায়িকা উর্মিলা। কাগজে ছবি দেখিস নি?'

আমার কথা শুনে বিজুর চোখ কপালে উঠে গেলো। আসলে ছবির নায়িকা উর্মিলাকে এই অবস্থায় দেখবো আমি ভাবতেই পারি নি। ছবিতে উর্মিলা গরিবের মেয়ের ভূমিকায় অভিনয় করেন, কথায় কথায় কেঁদে বুক ভাসিয়ে দেন। সারাক্ষণ চেহারায় একটা দুঃখের ভাব ঝুলিয়ে রাখেন। সিনেমায় তাঁকে দেখলে মেয়েরা সব সময় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। মনে হয় উর্মিলার চেয়ে দুঃখী মেয়ে সারা পৃথিবীতে দুটো নেই। অথচ আমরা এখন যে উর্মিলাকে দেখছি তিনি চুমকির নকশায় বোঝাই একখানা বেগুনি রঙের জর্জেটের শাড়ি পরেছেন। গলায় নেকলেসটা নির্ঘাত আসল হিরে দিয়ে বানানো। তাঁর মুখটা ভীষণ চকচক করছিলো। চোখের পাতায় হালকা বেগুনি রঙ, তার উপর রূপোলি গুঁড়ো, গালে আপেলের রঙ, ঠোঁটে মুক্তোর রঙের লিপস্টিক মাথা, নখে বেগুনি রঙের নেলপালিশ, আঙুলে কবুতরের ডিমের মতো বড় বেগুনি রঙের পাথর বসানো আঙটি—সবকিছু মিলিয়ে রীতিমতো চোখ-ধাঁধানো ব্যাপার।

পেছনে ছিলেন বাংলা ছবির নায়কসম্রাট আব্বাস। সিনেমার এই শরৎচন্দ্রীয় নায়কটি পরেছেন সেইন্ট-এর ছাপঅলা টকটকে লাল গেঞ্জি আর ঘন নীল প্যান্ট। নায়িকা উর্মিলা আর নায়ক আব্বাস দুজনকেই দারুণ স্মার্ট দেখাচ্ছিলো। তবে মেজদা যদি আমাদের দুলালদাকে দেখতেন তবে সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁকে আগামী সব কটা ছবির নায়ক বানিয়ে ফেলতেন।

কমেডিয়ান আলতামাসকে দেখে আমাদের হাসি চাপা দায় হলো। গোপাল ভাঁড়ের মতো দেখতে বেঁটেখাটো, মস্ত বড় ভুঁড়ি, মাথা জুড়ে বিশাল টাক; চোখে এমন একটা নিরীহ ভাব যে, এই ভদ্রলোককে ছবিতে দেখে ছেলেবুড়ো সবাই হেসে গড়াগড়ি যায়। তার সঙ্গে আরো দুজন মহিলা রয়েছেন। ওঁরা বোধ হয় নায়িকার বান্ধবী-টান্ধবী হবেন।

ছোটকা ছোড়দা ঝন্টুদা সবাই এসে চেঁচিয়ে চাকর-মালি সবাইকে ডেকে হুলুস্থুল কাণ্ড বাঁধিয়ে তুলেছেন। ছোড়দা এমনই চ্যাঁচাচ্ছিলেন যে মেজদা শেষ পর্যন্ত হেসে বললেন, 'নাটক করে করে গলাটা কী বানিয়েছিস হাঁদু? তোর চিৎকারে আমার কানের ভিতর প্রজাপতি ওড়া শুরু করেছে।'

আমাদের সদর দরজার কাছে তখন রীতিমতো ভিড় জমে গেছে। ছোটকা বললেন, 'পল্টু, এঁদের নিয়ে ভেতরে যা। জিনিসপত্র সব আমরা নামাচ্ছি।'

'তোমাদের কিছু করতে হবে না ছোটকা। প্রোডাকশনের ছেলেরা আছে। ওরাই সব করবে।' এই বলে মেজদা আমাদের দিকে তাকালেন— 'রামু, আবু, বিজু সবাই ওপরে চলো। তোমাদের জন্যে কিছু সুন্দর উপহার এনেছি। পরীক্ষায়

নিশ্চয়ই তোমাদের আগের প্লেসগুলো বহাল রয়েছে?'

আমরা হেসে মাথা নাড়লাম। নায়িকা উর্মিলা, নায়ক আব্বাস, কমেডিয়ান আলতামাস আর সঙ্গে অচেনা একজন ভদ্রলোককে নিয়ে মেজদা ওপরে গেলেন। গলায় ভিউ ফাইন্ডার ঝোলানো দেখে, তাঁকে প্রথম থেকেই ভেবেছিলাম ছবির ক্যামেরাম্যান।

মেজদা আমাদের জন্যে এনেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঁধানো রচনাবলীর বারোটি খন্ড। রামুর জন্যে এনেছেন রিডার্স ডাইজেস্ট-এর মস্তবড় একটা এ্যাটলাস আর তিনখন্ড এনসাইক্লোপিডিয়া। বিজুর জন্যে এনেছেন হেমেন্দ্রকুমার রায়ের সমগ্র রচনাবলী। মেজদা কী করে যে আমাদের মনের কথা টের পান বুঝি না। মা আমার বই দেখে বললেন, 'ওর কি এসব বই পড়া উচিত হবে?'

মেজদা হেসে বললেন, 'ও যে আমার আলমারির বঙ্কিম আর শরৎ রচনাবলী পড়ে শেষ করেছে সে খবর নিশ্চয়ই আপনার কানে যায় নি কাকিমা! মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সব লেখা ও অবশ্য এখন বুঝবে না। তবু ওর পড়া দরকার। এগুলো খারাপ কিছু নয়।'

মাকে বললাম, 'আমি কবে পদ্মা নদীর মাঝি পড়েছি! ওতে না বোঝার কী আছে!'

সব মায়েরাই নিজের ছেলেদের ভাবেন কম বোঝে।

রামু মেজদাকে বলেছিলো এ্যাটলাসের কথা। মেজদা যে এত সুন্দর আর দামী এ্যাটলাস আনবেন ও ভাবতেই পারেনি। ওর চেহারা দেখে মনে হল কেঁদে ফেলবে। শেষ পর্যন্ত রামু তাই করলো। বই নিয়ে চিলেকোঠার ঘরে গিয়ে কেঁদেই ফেললো। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই চোখ মুছে ফেলেছিলো। আমি জানি খুব খুশি হলে বা দুঃখ পেলে রামুর মেজ জেঠুর কথা মনে পড়ে যায়। মেজ জেঠু যখন মারা যান তখন ও আর আমি ক্লাস ফোরে পড়তাম। রামুর কাছে গিয়ে ওর পিঠে হাত রেখে বললাম, 'তুইই কিন্তু জিতেছিস রামু। মেজদা তোকে বেশি ভালোবাসেন।'

রামু হেসে বলল, 'বারে, আমি যে ফার্স্ট হয়েছি। গতবার মেজদা আমাকে কী সুন্দর একটা শার্ট পাঠিয়েছিলেন।'

সেবার মেজদা আমাকে আর বিজুকে কিছু পাঠান নি। তবে রামুর জন্যে ড্রাগনের ছবি-আঁকা যে জামাটা পাঠিয়েছিলেন ওটা আমিও কদিন পরেছি। এমনভাবে পরেছি যাতে বাইরের লোকেরা ভাবে মেজদা আমাদের জন্যে দুটো এক রকম জামা পাঠিয়েছেন।

বিজু হঠাৎ খুশিতে চেঁচিয়ে উঠে বললো, 'দেখ দেখ, এখানে হিমালয়ের ভয়ংকরটা আছে।'

রামু বলল, 'সমগ্র রচনাবলী মানে কী রে বোকা! ওতে হেমেন্দ্রকুমারের সব লেখাই পাবি।'

বিজু গম্ভীর হয়ে বলল, 'দাঁড়া, এখনো মানুষ পিশাচটা খুঁজে পাচ্ছি না।'

আমার এখন আর হেমেন্দ্রকুমার ভালো লাগে না। রামু এসব বই কখনো পড়ে না। ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনো লেখা পড়েছে বলে আমার মনে হয় না। তবে এটা ঠিক যে এনসাইক্লোপিডিয়াগুলো শেষ করতে রামুর বেশিদিন লাগবে না। ও সবসময় অন্য ধরনের বই পড়ে। গল্প, উপন্যাস ছাড়া মনে হয় ওর সবই ভালো লাগে।

রামু বললো, হ্যাঁরে আবু, সোনিয়াকে মেজদার স্যুটিং দেখতে বলবি না?'

আমি বললাম, 'মেজদা যদি কাছাকাছি কোথাও স্যুটিং করেন তবে বলবো।'

'আজ বিকেলে কি ওদের বাসায় যাবি?'

নিশ্চয়ই যাবো।'

'যদি মেজদার স্যুটিং থাকে?'

'তাহলে তোরাই স্যুটিং দেখিস। আমি ওদের বাসায় যাবো বলে কথা দিয়েছি।'

রামু এরপর আর কোনো কথা বললো না। রামুর জন্যে আমার মনটা নরম হয়ে গেল। রামু বুঝতে পেরেছে কিনা জানি না, তবে আমার মনে হলো সোনিয়া আজ সকালে আমার মনে এত কাছাকাছি চলে এসেছে যে, এতদিন রামু-বিজু ছাড়া অন্য কেউ সেখানে আসতে পারে নি। একবার মনে হলো রামু সোনিয়াকে হিংসে করছে। সে যাই ভাবুক, সোনিয়া হলো সোনিয়াই। ওর জায়গাতে ও আসবেই। ও যদি আমার জন্যে ভাবে, আমি কেন ওর জন্যে ভাববো না? সোনিয়াকে রামুর হিংসে করা উচিত নয়।

একটু পরে মেজদা নারকেলের চিঁড়ে চিবুতে চিবুতে আমাদের ঘরে এলেন।' বললেন, 'আজ দুপুরের পর কমলালেবুর বাগানে স্যুটিং করবো। তোমরা থেকো।'

মেজদা ছাদে গিয়ে ঘুরে ঘুরে চারপাশটা দেখলেন। বললেন, 'একদিন পিয়াইন নদীতে যাবো স্যুটিং করতে। আমার নায়িকাটি সেই নদীতে ডুবে মরবে।'

বিজুর চোখ দুটো আলুর মতো হয়ে গেলো। রামু বললো, 'অমন করে তাকাচ্ছিস কেন বিজু? চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে যাবে যে! ও কি সত্যি সত্যি মরবে!'

বিজু বলল, 'আমি বুঝি তাই বলেছি! আমি ভাবছি অত উঁচু থেকে নদীতে লাফ দেবে কী করে?'

মেজদা বললেন, 'আসলে কি আর লাফ দেবে! লাফ দেয়ার মুহূর্তে আমি ওকে কাটবো। কেটেই ক্যামেরায় নদীর স্রোত ধরবো। আমার ক্যামেরামান অবশ্য বলেছিলো ডামি দিয়ে পড়ার শটটা নিতে। আমি রাজি হই নি। আমি ওখানে

একটা মন্টাজ এফেক্ট রাখবো। এখন কি আর ছবিতে সব কিছু রিয়ালিষ্টিক দেখায়!'

মেজদার কথা শোনার সময় বিজু হা করে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিলো। আমি আর রামু না বুঝেও গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়ছিলাম। মেজদার ধারণা ওঁর ভাই বলে মন্টাজ ফন্টাজ সবই যেন আমরা বুঝি।

পাহাড়ি ঝর্নার দিকে তাকিয়ে মেজদা বললেন, 'কী চমৎকার জায়গা! আমাদের দেশের যে এরকম স্যুটিং স্পষ্ট আছে কেউ ভাবতেও পারবে না। পাহাড় আর ঝর্নায় আমার নায়ক ভিলেনের চেযিংটা ভালো জমবে। আমাদের ফাইট ডিরেক্টর অবশ্য দুদিন পরে আসবে। বেচারা এক আনাড়ি এক্সট্রাকে সোর্ড ফাইট শেখাতে গিয়েছিলো। তারপর নিজেই কাঠের তলোয়ারের খোঁচা খেয়ে জখম হয়ে হাসপাতালে পড়ে আছে।'

আমি বললাম, 'আপনার ভিলেনকে তো দেখলাম না মেজদা।'

মেজদা বললেন, 'আমাদের প্রোডাকশনের বাবুর্চিটা ভিলেনের পার্ট করবে। ওর ডায়ালগ বেশি নেই। সবই প্রায় এ্যাকশন। সবাই কাজ দেখে বলছে, ওর কপাল খুলে গেছে। ওকে আর বাবুর্চিগিরি করতে হবে না। নামকরা স্টার হয়ে যাবে। তবে আলাদিন আমাকে বলেছে, ওর ইচ্ছে নাকি ডিরেক্টর হওয়া।'

আমি হেসে বললাম, 'ডিরেক্টর হওয়া বুঝি খুব সোজা ব্যাপার মেজদা?'

মেজদা বললেন, 'আমাদের দেশে এ আর এমন কঠিন কী! আমার বন্ধু স্যালকে মনে আছে তোদের? ও তো দুটো সিরিয়াস ছবি করতে গিয়ে মার খেয়ে পথে বসেছে। আর ওর ইউনিটের টি-বয় ছিল আক্কাস আলী। সে এখন দুটো রূপকথা বানিয়ে দারুণ হিট ডিরেক্টর। শুনছি ওর ছবি নাকি বিদেশেও যাচ্ছে। ছবি বানানো আমাদের দেশে এত সোজা কাজ যে কোনোদিন যদি শুনি আমাদের বনমালী সুপার হিট ডিরেক্টর হয়ে গেছে, তখন আমি এতটুকু অবাক হবো না।'

আমাদের বুড়ো বনমালী—যে এখনো বলে পৃথিবীটা একটা মস্তবড় গরুর শিঙের ওপর রাখা আছে, গরু শিং বদল করার সময় পৃথিবীতে ভূমিকম্প হয়; যার ধারণা আমাদের বাড়িটার চেয়ে বড় বাড়ি পৃথিবীতে আর নেই—ও হবে ফিল্ম ডিরেক্টর! আমরা তিনজন হেসে গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে গেলাম। মেজদা দারুণ মজার কথা বলতে পারেন! আমাদের হাসি দেখে মেজদা ভুরু কুঁচকে বললেন, 'হাসছিস কেন, ঢাকায় গেলে তোদের দেখিয়ে দেবো ওখানে এখন কারা ছবি বানাচ্ছে। জাহাঙ্গীরদের গাড়ির ড্রাইভারটাও যে দুটো ছবি বানিয়েছে সে খবর রাখিস? সেই ছবির নায়কও ছিলো ও নিজে। ছবি দুটো অবশ্য ভালো চলে নি। কালো টাকার দাপটে গোটা দেশটা একেবারে রসাতলে গেছে।'

মেজদা একসময় দু-তিনটা ভালো ছবি বানিয়ে দারুণ নাম করেছিলেন। তবে সে ছবি বানাবার জন্যে আমাদের বাড়িটি বন্ধক রাখতে হয়েছিলো। আজকাল

মেজদাও ধুম-ধাড়াক্কার জবরদস্ত ফাইটিং ছবি বানাচ্ছেন। এখন যেটার স্যুটিং করছেন সেটার নাম রাজকন্যা কঙ্কাবতী। কাহিনীটি অবশ্য রূপকথার। তবে সোর্ড ফাইটের সঙ্গে জুডো, কারাত, গান-ফাইট সবই নাকি আছে। মেজদার গত ছবিটা ছিলো এক ডাকাতের জীবনী নিয়ে। দিদা ওই ছবি দেখে হাসতে হাসতে খুন হয়ে গেছেন। যদিও ছবিটা আগাগোড়া ছিল করুণ রসে ভরপুর। নায়িকা উর্মিলার করুণ অভিনয় দেখে কত মহিলা যে হলে বসে হাউমাউ করে কেঁদেছেন তার ইয়ত্তা নেই। দিদা ছবি দেখে বলেছেন, 'পল্টুর বুদ্ধি-সুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে নাকি! লোক হাসানোর জন্য এসব বানাবার কোনো মানে হয়!' তবে ছোট কাকিমা আড়ালে বলেছেন, 'মার সবটাতেই বাড়াবাড়ি। আমার কাছে তো ছবিটা ভালোই লেগেছে।'

দুপুরে খাওয়ার পর মেজদা দলবল নিয়ে কমলাবাগানে চলে গেলেন। বললেন, 'যতক্ষণ রোদ থাকবে ততক্ষণ স্যুটিং করব। দেখি নায়ক-নায়িকার ডুয়েট গানটা পুরো পিকচারাইজ করা যায় কিনা।'

রামু আর বিজু মেজদার সঙ্গে গেলো। আমি চলে গেলাম সোজা সোনিয়াদের বাড়িতে। সোনিয়াকে গিয়ে বললাম, 'মেজদা স্যুটিং করবেন কমলালেবুর বাগানে। যাবি স্যুটিং দেখতে?'

হাসি খালা বললেন, 'পল্টু কবে এসেছে আবু?'

আমি বললাম, 'আজ সকালে। সোনিয়াকে নিয়ে স্যুটিং দেখতে যাবো হাসি খালা?'

হাসি খালা উল বুনতে বুনতে বললেন, 'যাও। তবে বিকেলে এখানে চা খেতে ভুলে যেও না।'

নুড়ি-বিছানো পথে আমি আর সোনিয়া হাত ধরাধরি করে হাঁটছিলাম। শীতের শেষ দুপুরের নরম রোদের ভেতর মনে হলো, আমরা যেন দুটো রঙিন প্রজাপতি হয়ে স্বর্গের বাগানে উড়ছি।

কমলালেবুর বাগানে মেজদা একটা গানের দৃশ্য ক্যামেরায় তুলছিলেন। গানের কথাগুলো ভারি করুণ। পেছনে টেপরেকর্ডারে গানটা গাইছিলেন দুজন গায়ক-গায়িকা। নায়ক আব্বাস আর নায়িকা উর্মিলা চোখে গ্লিসারিন দিয়ে কাপড় আলুথালু করে অত্যন্ত হাস্যকর কথাঅলা সেই গানের সঙ্গে ঠোঁট মেলাচ্ছিলেন। এমন দুঃখের দিনেও নায়িকা সবুজ বেনারসি শাড়ি পরেছেন। গায়ের সব অলঙ্কার ওজন করলে সের খানেকের কম হবে না। নায়কের গায়ে জরির কাজ-করা সিল্কের পাঞ্জাবি-পায়জামা আর প্ল্যাটফর্ম হিল স্যান্ডেল। স্যান্ডেলের হিল কম করে হলেও চার ইঞ্চি উঁচু। আমি একজন অল্পবয়সী এ্যাসিস্টেন্টকে বললাম, 'রূপকথার রাজারা কি প্ল্যাটফর্ম হিল স্যান্ডেল পরতো?'

প্রায় আমাদের বয়সী এ্যাসিস্টেন্টটি বলল, 'নায়ক একটু বেঁটে বলে সব সময়

ওকে প্ল্যাটফর্ম হিল পরতে হয়। রূপকথার ছবিতে ওঁর ফুলশট কখনো নেয়া হয় না। এমনিতে উনি ম্যাডামের চেয়ে একটু বেঁটে।'

ছবির এ্যাসিস্টেন্ট বা প্রোডাকশনের লোকেরা নায়িকা উর্মিলাকে ডাকে ম্যাডাম। মেজদা শুধু উর্মিলা ডাকেন। মেজদার পুঁচকে এ্যাসিস্টেন্টটি আমাকে চোখ মটকে ফিস ফিস করে বললো, 'পল্টু ভাইর সঙ্গে ম্যাডামের বিয়ে হচ্ছে খুব শিগগিরই।'

আমি ভীষণ অবাক হলাম। কথাটা সোনিয়াকে না বলে পারলাম না। সোনিয়া শুধু বলল, 'ভালোই তো। তোদের চমৎকার সুন্দর একটা ভাবী হবে।'

স্যুটিং-এর সময় একবার দারুণ এক মজার ব্যাপার ঘটে গেলো। নায়ক আব্বাস করুণ সুরে গানটি গেয়ে নায়িকার পেছন-পেছন দৌড়োচ্ছেন ঠিক তখনই তিনি পা মচকে পড়ে গেলেন। দুঃখের গান থামিয়ে 'বাবারে' বলে নায়কসম্রাট আব্বাস পা চেপে ধরে ঘাসের উপর বসে রইলেন। ইউনিটের সবাই দারুণ ব্যস্ত হয়ে শুকনো মুখে সেদিকে ছুটে গেলো। সোনিয়া আর আমি তখন হাসি চাপতে গিয়ে বারবার কেঁপে উঠছিলাম। পরে থাকতে না পেরে আমরা দুজন বাগানের বাইরে এসে হাসতে হাসতে খুন হয়ে গেলাম। আমার মনে হয় স্যুটিং-এর সময় বা ঘটে সেসব কথা নিয়ে যদি একটা ছবি বানানো যায়, তাহলে সেটা পৃথিবীর সেরা হাসির ছবি হবে। সোনিয়াকে বললাম, 'রাজকন্যা কঙ্কাবতী একটা দারুণ হাসির ছবি হবে।'

সোনিয়া হাসতে হাসতে বললো, 'হাসির নয় বরং হাস্যকর ছবি। উহ্, দুঃখের দিনেও নায়িকা টকটকে লিপস্টিক আর নেলপলিশ লাগাতে ভোলে নি। সারামুখে কত রকমের রঙই না মেখেছে। অবশ্য রাজকন্যাদের ব্যাপার-স্যাপারই অন্যরকম।'

আমি বললাম, 'মেজদার পুঁচকে এ্যাসিস্টেন্টটা বলেছে এ তো আর সাধারণ মানুষের দুঃখ নয়। রাজকন্যার রাজকীয় দুঃখ। রাজকন্যারা সবসময় বেনারসি পরেন যে।'

সোনিয়া বললো, 'কেন শহুরে মেয়েরা পরে না? সেদিন একটা বাংলা ছবি দেখেছি। ওতে শহুরে নায়িকাটির শাড়ি আর গয়নাপত্তর এই রাজকন্যার চেয়ে কম ছিলো না।'

'আহা বুঝিস না কেন? বেচারাদের যে একসেট গয়নাই আছে। চাষীর মেয়ের পার্ট করলেও ওটাই পরতে হয়।'

আমার কথা বলার ধরন দেখে সোনিয়া হেসে গড়িয়ে পড়লো।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত

সোনিয়ার হাত ধরে যখন ওদের বাসায় গেলাম, হাসি খালা তখনো লনে বসে উল বুনছিলেন। আমাদের দুজনকে দেখে বললেন, 'আর দুজন কোথায়?"

আমি বললাম, 'ওরা স্যুটিং শেষ না করে আসবে না।'

স্যুটিং-এর সময় রামু-বিজু সোনিয়াকে আমার সঙ্গে দেখে একটা কথাও বলে নি। এমনভাবে ওরা স্যুটিং দেখছিলো যে আমাদের দেখতেই পায় নি। আমি শুধু আসার আগে বলে এসেছি, 'বাড়ি ফেরার পথে হাসি খালাদের বাসা হয়ে যাস।'

হাসি খালা বললেন, 'ঠিক আছে। ততক্ষণে আমরা এক কাপ চা খেতে পারি।'

সোনিয়া চায়ের কথা বলার জন্যে ভেতরে চলে গেলো। আমি বললাম, 'দুলালদাকে আপনার কথা বলেছি হাসি খালা। শুনে তিনি খুব খুশি হয়েছেন। বলেছেন, আপনার কথা সবসময় ওঁর মনে থাকবে। কয়েকদিন পরে তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।'

হাসি খালা উল বুনতে বুনতে বললেন, 'ওদের কোনো কাজে লাগতে পারলে আমি খুবই খুশি হবো। অয়নকে ওর বাবা জোর করে কানাডা পাঠিয়ে দিয়েছে। আমি চেয়েছিলাম অয়ন দেশে থাকুক।'

হাসি খালা দুলালদাকে নিয়ে তাঁর ছেলের দুঃখ ভুলতে চাইছেন। হাসি খালা হয়তো জানেন না দুলালদারা অন্যরকম ছেলে। দিদা তো দুলালদাকেই বলেছেন, তোদের বেঁধে রাখা যায় না। আমার কেন যেন মনে হলো দুলালদার জন্যেও হাসি খালা দুঃখ পাবেন। অনেক মানুষ আছে যাদে গোটা জীবনটাই দুঃখে ভরা থাকে। হাসি খালা ঠিক সেরকম একজন।

সোনিয়া চা নিয়ে এলো। হাসি খালা সোনিয়া আর আমি চুপচাপ বসে চা খেলাম। হাসি খালার উল বোনার ভঙ্গিটি ভারি সুন্দর। তাঁর আঙুলগুলো দেখে মনে হল একটা সোনালি প্রজাপতি বুঝি এক ছন্দের গতি নিয়ে সবুজ ঝোপের ভেতর উড়ে বেড়াচ্ছে।

লনের উপর থেকে শেষ বিকেলের মিষ্টি রোদ সরে গিয়ে ইউক্যালিপটাসের পাতা জড়িয়ে কিছুক্ষণ পড়ে রইল। আমি ইউক্যালিপটাসের পাতায় রোদের খেলা দেখছিলাম। আরো কিছুক্ষণ পর রামু আর বিজু এলো। দুজনের মুখে চাপা উত্তেজনা আর আনন্দ। বিজুর চোখ দুটো রীতিমতো জ্বলজ্বল করছে। হাসি খালা ওদের দেখে মৃদু হেসে বললেন, 'স্যুটিং দেখাটা ভারি মজার তাই না?'

বিজু বলল, 'দারুণ মজার! হাসি খালা, কাল যাবেন দেখতে?'

হাসি খালা মৃদু হেসে মাথা নাড়লেন— 'আমাদের মতো বুড়োরা কি স্যুটিং দেখে!'

রামু আমার কানে ফিসফিস করে বললো, 'উর্মিলা আমাদের সঙ্গে কথা বলেছে। দু'প্যাকেট চুইংগাম দিয়েছে।'

রামুর চুইংগামের ব্যাপারে আমি বিন্দুমাত্র উৎসাহ দেখালাম না। ওরা যখন উর্মিলার সঙ্গে কথা বলছে তখন আমি সোনিয়ার সঙ্গে বসেছিলাম। উর্মিলা যে ওঁদের সঙ্গে কী কথা বলতে পারেন সেটা আমার জানা আছে। কোন্ ক্লাশে পড়, বড় হলে কী করবে কিংবা মেজদার ছবি দেখ কিনা—এসব কথা ছাড়া উর্মিলার সঙ্গে ওদের অন্য কোনো কথা হতে পারে না।

সন্ধ্যের পর আমরা বাড়ি ফিরে গেলাম। কমেডিয়ান আলতামাস, ছোড়দাদের নাটকের সংলাপ শিখিয়ে দিচ্ছিলেন। মেয়েদের সংলাপ বলার সময় আলতামাস গলাটাকে একেবারে মেয়েদের মতো করে ফেলছিলেন। আবার লুৎফার গলা একরকম, আলেয়ার গলা আরেকরকম। আমরা তিনজন কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে সেই অভূতপূর্ব সংলাপ শুনলাম। নবাব সিরাজউদ্দৌলা, আলেয়া আর লুৎফার ভূমিকায় আলতামাসকে একসঙ্গে কল্পনা করে আমরা হাসতে হাসতে বিছানায় গড়াগড়ি খেলাম।

সন্ধ্যের পর থেকেই আকাশে মেঘ জমছিলো। দুলালদার ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে বিজু খেয়েদের ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি আর রামু ছাদে পায়চারি করছিলাম। এলোমেলো ঝড়ো বাতাসে ঝাউবনের ভেতর থেকে শনশন শব্দ ভেসে আসছিলো। দুলালদা এলেন অনেক রাতে। বললেন, 'বাড়িতে সবাই আজ জেগে রয়েছে দেখছি।'

রামু বললো, 'মেজদা এসেছেন যে। কত কী মজা করলাম আমরা!'

আমি বললাম, 'চলুন দুলালদা আগে খেয়ে নি। পরে গল্প করা যাবে।'

দুলালদা বললেন, 'তাই ভালো। তোমাদের সঙ্গে আমার কিছু জরুরি কথা আছে।'

খাবারের আয়োজন দেখে দুলালদা ভারি খুশি। বললেন, 'দুপুরে শুধু পোড়া শুটকি মাছ আর একটু মদ খেয়েছি।'

রামু বললো, আপনি মদ খান দুলালদা?'

দুলালদা হাসলেন—'সখ করে খাই না। মদ খাসিয়াদের কাছে খুবই পবিত্র এবং প্রিয় পানীয়। একেবারে যে গরিব, যার একবেলা ভাত জোটে না, তার ঘরেও যবের তৈরি মদ থাকে। একবার সাঁওতালদের এলাকায় মদ খেতে রাজি হই নি বলে ওরা খুব বিরক্ত হয়েছিলো।'

আমি বললাম, 'কী মজা দুলালদা তাই না? আমি কোথায় যেন পড়েছি সাঁওতালরা মহুয়ার রস দিয়ে যে মদ বানায় ওটা খেতে নাকি দারুণ লাগে।'

দুলালদা বললেন, 'কোনো মাতাল লিখেছে হয়তো। মদ খেলে দুর্গন্ধে আমার বমি আসতে চায়।'

খেয়ে উঠে সিগারেট ধরিয়ে দুলালদা বললেন, 'তোমাদের মেজদা আবার এদিকে ঢু মারবেন না তো?'

রামু হেলে বললো, 'দিদা আছেন কী করতে।'

দুলালদা বললেন, 'তোমাদের তো দুমাস বন্ধ আছে। পড়াশোনার চাপও নেই। আমি একটা কাজ দিতে চাই তোমাদের।'

রামু ব্যস্ত গলায় বললো, 'কী কাজ দুলালদা?'

দুলালদা বললেন, 'আমি ভাবছি পিয়াইন নদীর তীরে খাসিয়াদের যে গ্রামগুলো আছে, সেখানে তোমরা একটা স্কুলে চালাবে। আগে খ্রিস্টান মিশানারিরা ওদের কিছু লেখাপড়া শিখিয়েছিলো। আমি কথা বলে দেখেছি, শেখার জন্যে ওদের আগ্রহও আছে। ছেলেবুড়ো সবাই তোমাদের ছাত্র হবে। আসলে ব্যাপারটা কী জানো, লেখাপড়া না জানার জন্যে ওদের ওপর অত্যাচার করাটা এত সহজ হয়ে দাঁড়িয়েছে যে কল্পনাও করতে পারবে না। ধরো, ওরা মহাজনের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিলো কিংবা একটা কিছু বন্ধক রাখলো। মহাজন এমন একখানা অঙ্কের হিসেব ওদের বুঝিয়ে দিয়ে ঘরবাড়ি-জমি-জিনিসপত্র সব কিছু নিজে পরম নিশ্চিন্তে হজম করে ফেলে যে, এরা কিছুই বুঝতে পারে না। শুধু বোঝে এরকম হওয়া ঠিক নয়। গত বন্যার সময় বহু কৃষক পরিবার সর্বস্বান্ত হয়েছে, অনেকে না খেয়ে মরেছে। একবার ওরা মহাজনের ধানের গোলা লুট করতে গিয়েছিলো বলে মহাজনটি এখন আর গোলায় ধান রাখে না। বর্ডারের ওপারে পাচার করে দেয়। ওখানে তোমাদের স্কুল থাকলে আমাদের কাজের সুবিধে হবে।'

রামু বললো, 'স্কুলে না হয় আমরা পড়াতে পারবো। কিন্তু জিনিসপত্র কোথায় পাবো? শহীদ মামা আমাদের স্মাগলিং-এর কথা বলেছেন। আমি ভাবছি—'

এমন সময় দিদা একটা প্লেট হাতে করে ঘরে ঢুকলেন। দুলালদাকে দেখে হেসে বললেন, 'পল্টুর জন্যে পুডিং রেঁধেছিলাম। দেখ্ তো কেমন হয়েছে? ছাতক থেকে আবুর বাপ কমলা পাঠিয়েছে। অনেকদিন কমলার পুডিং করি না।'

আমি হেসে বললাম, 'সবগুলো পুডিং দুলালদা একা খাবে নাকি দিদা?

আমাদের খেতে বলবে না?'

'তোদের না বললেও খাবি।' এই বলে দিদা টেবিলের ওপর প্লেটটি নামিয়ে খাটের ওপর উঠে বসলেন। বাইরে দমকা বাতাসের শব্দ শুনে তিনি বললেন, 'আজ রাতে ঝড় আসতে পারে। সাবধানে থাকিস।'

আমরা সবাই পুডিং শেষ করে এসে দিদাকে ঘিরে বসলাম। দুলালদা বললেন, 'খাসিয়াদের গ্রামে একটা স্কুল খোলার কথা ওদের বলছিলাম। ওরা যদি ছুটির এই দু'মাস সন্ধ্যেবেলা দু'তিন ঘন্টা করে পড়াতো, তাহলে গ্রামের মানুষগুলোর খুব উপকার হতো।'

দিদা মুখ টিপে হেসে বললেন, 'গলা কাটা বাদ দিয়ে এখন বুঝি মিশনারি ফাদার হয়েছো দুলাল? কদিন আগেও মিশনারিরা খাসিয়াদের গ্রামে গিয়ে বলতো, আইস ভ্রান্ত মেষশাবকের দল। যিশুকে ভজনা কর, পরিত্রাণ মিলিবে। খাসিয়া বেচারারা ওদের কথাবার্তা কিছু বুঝতো না, শুধু হা করে থাকতো।'

দুলালদা হেসে বললেন, 'আমি একজন রাজনৈতিক কর্মী দিদা। আমি গ্রামের এসব স্থানীয় অত্যাচারের বিরুদ্ধে গরিব কৃষকদের একজোট করতে চাই। আমি চাই ওদের সমস্যা ওরা নিজেরা বোঝার চেষ্টা করুক। সমাধানের পথও নিজেরা খুঁজে বের করুক। আমি শুধু ওদের সঙ্গে থাকবো। ওদের কাছ থেকে শিখবো। ওদের ভুলভ্রান্তি হলে দেখিয়ে দেবো। আমাদের দেশের শতকরা আশিভাগ মানুষের অক্ষরজ্ঞান নেই। যে-জন্যে ইচ্ছেমতো ওদেরকে শোষণ করা যায়। আজ যদি এরা সবাই একসঙ্গে জোট বেঁধে সরকারের টাউট-নেতা আর ওপার থেকে আসা মাড়োয়ারিদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতো, তাহলে একদানা চালও ইন্ডিয়া যেতে পারতো না, আর এদেশের মানুষ এভাবে না খেয়ে মরতো না। সময় অনেক বদলে গেছে দিদা। আমরা যাদের সর্বাহারা শ্রেণী বলি, যাদের জন্যে আমরা লড়ছি; তাদের চেতনার স্তর যদি বাড়াতে না পারি যত গাল ভরা তত্ত্ব কথাই ওদের বলি না কেন, কোনো লাভ হবে না।'

দিদা গম্ভীর হয়ে বললেন, 'কথাটা আমিও বহুবার ভেবেছি দুলাল। একবার কুটুকে বলেছিলাম, তোদের কর্মীরা গ্রামে কাজ করে। কী করে তোরাই জানিস। তবে আমার মনে হয় গ্রামের মানুষদের কিছু লেখাপড়া শেখালে ওদের উপকার হতো। তোরা তো একটা গ্রামে চিরকাল পড়ে থাকিস না। শুনে কুটুই বললো, দিদা তুমি কি আমাদের মিশানারি ভেবেছো নাকি? আমি বিপ্লবকে করে নিই। তারপর একবছরেই দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করে ফেলব। এখন ভাবি কোথায় গেলো কুটু আর কোথায় গেলো ওদের বিপ্লব! দেশের মানুষ এখনো সেই অন্ধকারেই পড়ে আছে।'

দুলালদা বললেন, 'একেবারেই যে অন্ধকারে পড়ে আছে তা কিন্তু নয় দিদা। একবার যেখানে আমরা কাজ করেছি সেখানে কৃষকরা কিছুটা হলেও সচেতন

হয়েছে। তবে আমরা খুব কম কৃষক-শ্রমিককেই সচেতন করতে পেরেছি। স্কুল খোলার ব্যাপারে আপনি কিছু পরামর্শ দিন দিদা। স্কুলে শুধু ক খ শেখানো হবে না। ওটা হবে আমাদের স্কুল।'

দিদা বললেন, 'আমি আর কী বলবো! কিছু টাকা-পয়সার ব্যবস্থা করে দিতে পারি। শীত এসে গেছে। ওদের জন্যে কিছু কাপড়চোপড়ও ঘুরেফিরে জোগাড় করতে পারবো। সেদিন আমাদের মালি দারুভূই বলছিল শীতে ওরা সবচেয়ে বেশি কষ্ট পায়। আগুন জ্বেলে আর কতক্ষণ শীত তাড়ানো যায়! গেল বছরও শীতে আর অনাহারে খাসিয়াদের গ্রামে আশিজন মানুষ মরেছে।'

দুলালদা গম্ভীর গলায় বললেন, 'আপনি একজন সত্যিকারের বিপ্লবী হতে পারবেন দিদা।'

আমাদের বুড়ো দিদা লজ্জায় লাল হয়ে বললেন, 'থাক থাক, এ-বয়েসে আমাকে বিপ্লবী বানিয়ে কোনো কাজ হবে না। আমি বাছা বন্দুক-টন্দুক চালাতে জানি না। বরং ইশকুলের হেডমাস্টারনি বানাতে পারো আমাকে। আমি ভালো চালাতে পারবো।'

আমরা সবাই দিদার কথা শুনে হেসে ফেললাম। রামু বলল, 'দিদাকে আমরা আমাদের নেতা বানাবো?'

দিদাও বললেন, 'বাজে বকিসনে ছোঁড়া!'

দুলালদা মৃদু হেসে বললেন, 'আমরা তো এখন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্যে লড়ছি না। আমরা লড়ছি জাতীয় মুক্তি আর গণতন্ত্রের জন্যে। শুধু কমিউনিস্টরা কখনো এই বিপ্লব করতে পারে না। দেশকে যারা ভালোবাসেন, যাঁরা মানুষের ভালো চান, স্বাধীনতা চান, তাঁদের সবাইকে নিয়ে এই বিপ্লব করতে হবে। আপনি আপাতত স্কুল নিয়েই থাকুন। তারপর লড়াই যখন শুরু হবে তখন ঠিকই আপনি লড়াই করবেন। তবে এখানে আপনারা অনায়াসে মহিলা সমিতি জাতীয় কিছু করতে পারেন। আপনি জাফলং-এর মানুষদের জন্যে যা করছেন, সেটা সবাইকে নিয়ে একটা সাংগঠনিক কাঠামোর ভেতর দিয়ে করলে, কাজ অনেক ভালোভাবে করা যায়।'

দিদা একগাল হেসে বললেন, 'ওটা আমি যে-কোনো সময় শুরু করতে পারবো। মহিলা সমিতি করলে তোমাদেরও কাজের সুবিধে হবে। আমাদের ইশকুলটাও ভালোমতো চালানো যাবে। আমার ছেলেরা যখন আমার নাতিদের বয়সী ছিলো তখন আমি মহিলা সমিতি করেছি।'

সেই রাতে আমরা দিদাকে নিয়ে বহুক্ষণ স্কুল আর মহিলা সমিতির বিষয় নিয়ে কথা বলেছিলাম। স্কুলের পড়ানোর কথা শুনে আমি আর রামু যে কী পরিমাণ উত্তেজিত হয়েছিলাম সে কথা আর বলার নয়। মহিলা সমিতি সম্পর্কেও আমাদের উৎসাহ কম ছিলো না, কারণ সেখানে হাসি খালাও

থাকবেন। সোনিয়া তো থাকবেই।

দুলালদা আর দিদা কথা বলছিলেন। আমরা তিনজন লেপ মুড়ি দিয়ে চুপচাপ শুনছিলাম। বাইরে তখন ঝড়ো বাতাস ঝাউবনে অবিরাম হুইসেলের শব্দ তুলে বয়ে যাচ্ছিলো।

বিস্ময়ের চরম সীমানায়

সারারাত প্রচণ্ড ঝড় আর বৃষ্টিতে আমরা বহুক্ষণ ঘুমোতে পারিনি। দিদা চলে যাওয়ার পরও আমরা অনেক রাত অব্দি জেগেছিলাম। দুলালদা খাসিয়াদের গ্রামে কাজ করার অভিজ্ঞতার কথা বলছিলেন। তিনি এখন গ্রামের কৃষকদের অবস্থা তদন্ত করছেন। ওদের গত দশ বছরের পুরো অবস্থাটা জেনে নিচ্ছেন। খাসিয়ারা দুলালদাকে খুব আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করেছে। কৃষক সমিতি সম্পর্কে ওরা দারুণ উৎসাহী। দুলালদা আগে ওদের ভেতর কাজ করেছিলেন। তখন তিনিও খাসিয়াদের ভাষাও শিখেছিলেন। দুলালদার মতে, কারো সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে গেলে, বিশেষ করে তারা যদি শিক্ষা-সংস্কৃতির দিক দিয়ে পিছিয়ে থাকে, তাহলে তাদের ভাষা অবশ্যই জানতে হবে। দুলালদা সাঁওতাল আর ওঁরাওদের ভাষায় চমৎকার কথা বলতে পারেন।

ভোরে আমার আর দুলালদার ঘুম একসঙ্গেই ভাঙলো। আমি উঠে রামুকেও ঘুম থেকে তুলে দিলাম। দুলালদা জানালা খুলে দিলেন। বাইরে ঘন কুয়াশা। সারা আকাশ মেঘে ঢাকা। হু হু করে গায়ে সূঁচ-ফোটানো ঠাণ্ডা ঝড়ো বাতাস বইছে। আমি বললাম, 'যাবেন কীভাবে দুলালদা?'

দুলালদা হেসে বললেন, 'না গেলে চলবে কী করে?'

চাদর মুড়ি দিয়ে আমরা তিনজন বেরিয়ে পড়লাম। বিজুর চাদরটা জোর করেই দুলালদার গায়ে জড়িয়ে দিলাম। বললাম, 'আজ বিজুকে ঘর থেকে বার করা যাবে না। মেজদা ওর জন্যে হেমেন্দ্রকুমারের রচনাবলী এনেছেন।'

দুলালদা মৃদু হেসে বললেন, 'তোমরা দুজন তাড়াতাড়ি বড় হয়ে গেছো। বিজু তোমাদের তুলনায় একটু পিছিয়ে আছে।'

আমি আর রামু কাঁধে হাত রেখে হাঁটছিলাম। দুলালদার কথা শুনে আমরা দুজন মুখ টিপে হাসলাম। বিজু কোনো-কোনো ব্যাপারে আমাদের চেয়েও বেশি বখে গেছে, এটা শুধু আমি আর রামুই জানি। আমরা সবাই শীতে কাঁপছিলাম।

কমলালেবুর বাগানের শেষপ্রান্তে এসে ঝর্নার দিকে তাকাতেই সবার মাথা ঘুরে গেলো। আমাদের পরিচিত ঝিরঝিরে ঝর্নাটির চেহারা একরাতেই একেবারে অন্যরকম হয়ে গেছে। গত বন্যার সময় শুধু ঝর্নার এরকম চেহারা দেখেছিলাম। তখন তো বর্ষা ছিলো-বন্যার আগে থেকেই নদীর মতো হয়ে গিয়েছিলো। এখন ঝর্নাটি উত্তাল নদীর মতো ফুলেফেঁপে প্রচণ্ড শব্দ করে বয়ে চলেছে। পাহাড় থেকে বড়বড় পাথর স্রোতের টানে গড়িয়ে আসছে। একটানা চাপা গর্জন শোনা যাচ্ছে। ঝর্নার এরকম শব্দ আমি আগে কখনো শুনিনি।

দুলালদা শুকনো মুখে বললেন, 'যাবো কী করে? একেবারেই যে যাচ্ছেতাই অবস্থা হয়ে গেছে।'

আমি বললাম, 'আপনি খেপেছেন দুলালদা। পানিতে নামার সঙ্গে সঙ্গে আপনি ছাতু হয়ে যাবেন।'

রামু বলল, 'দুলালদা ফিরে চলুন।'

দুলালদা কাষ্ঠ হেসে বললেন, 'দিনের বেলায় তোমাদের ওখানে থাকি কী করে! মেজদা এসেছেন। অন্য কেউ কোনো দরকারে ছাদে উঠতে পারে। বিজুর কথামতো সারাক্ষণ খাটের নিচে লুকিয়ে থাকা যায় নাকি!'

আমি হেসে বললাম, 'থাকার জন্যে আপনি মোটেই ভাববেন না দুলালদা। আপনি হাসি খালাদের বাসায় থাকবেন। তিনি আপনাকে দেখলে দারুণ খুশি হবেন।'

দুলালদাকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে আমরা দুজন তাঁর দু'হাত ধরে সোনিয়াদের বাসায় নিয়ে এলাম। কালকের মতো সোনিয়া ছোট্ট কাঠের গেটটার পাশে ঘুমঘুম চোখে দাঁড়িয়েছিলো। ওর হাতে দুটো লাল গোলাপ। আমাদের সঙ্গে দুলালদাকে দেখে সোনিয়া ভারি অবাক হলো।

রামু বললো, 'দেখ সোনিয়া কাকে এনেছি। দুলালদা আজ তোদের বাসায় থাকবেন।'

'সত্যি বলছিস রামু?' বলে সোনিয়া হাসি খালাকে ডাকতে ডাকতে দৌড়ে ঘরের দিকে গেলো।

আমরা ভেতরে ঢুকলাম। হাসি খালার লনে সবুজ ঘাসের ডগায় রূপোলি শিশিরকণা জমে আছে। দুলালদা বললেন, 'ভারি সুন্দর লন। হাসি খালা নিশ্চয় বাগান খুব ভালোবাসেন।'

হাসি খালা বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন। দুলালদার কথা শুনে মৃদু হাসলেন। বললেন, 'এসো ভেতরে এসো।'

আমাদের তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে হাসি খালা খাবার ঘরে গিয়ে বসলেন। টেবিলে সাদা মোরগের মতো দেখতে একটা টিকোজির পাশে ধবধবে সাদা টি-পট। সাদা বোধ হয় হাসি খালার প্রিয় রঙ। দেয়াল থেকে শুরু করে টেবিলক্লথ, চেয়ারের কুশন, চায়ের কাপ সবই সাদা। হাসি খালার পরনে আগের মতোই সাদা শাড়ি। কলেজের মেয়েদের মতো ধবধবে সাদা কার্ডিগান পরেছেন। হাসি খালার ঘরে ঢুকলে মনটা অদ্ভুত সুন্দর এক প্রশান্তিতে ভরে যায়।

ঝর্নার কথা শুনে হাসি খালা বললেন, 'রাতে বৃষ্টির জন্যে এরকম হয়েছে। পাহাড়ের পানি নেমে গেলেই আবার আগের মতো হয়ে যাবে।'

দুলালদা বললেন, 'রাতে ঝড়ও কম হয়নি। আমি ভাবছি গ্রামের ওরা কী অবস্থায় আছে! ঘরটর সব হয়তো উড়ে গেছে।'

হাসি খালা বললেন, 'কাল সকালেই যেতে পারবে, এখন তো আর বর্ষাকাল নয়।'

সোনিয়া বললো, 'অবশ্য আজ যদি বৃষ্টি না হয়।'

দুলালদা মৃদু হেসে বললেন, 'বৃষ্টির কথা আর মুখে এনো না সোনিয়া। শীতকালের বৃষ্টির মতো বিরক্তিকর আর কিছু হয় না।'

সোনিয়াদের বেঁটেখাটো নেপালি বাবুর্চি রামথাপা চায়ের পটে করে গরম পানি আনলো। হাসি খালা বড়বড় চায়ের পাতা ভিজিয়ে কিছুক্ষণ টিকোজি দিয়ে ঢেকে রাখলেন। মৃদু হেসে বললেন, 'সকালে আমার কয়েক কাপ চা খাওয়া হয়।'

রামু বললো, 'এরকম চা পেলে আমি সারাদিন খেতাম।'

হাসি খালা বললেন, 'এবার বাগান থেকে এলেই পাঠিয়ে দেবো।'

চা খেয়ে আমরা দুজন উঠে পড়লাম। ওদিকে হয়তো মেজ জেঠিমা আমাদের মুণ্ডুপাত করছেন। দুলালদাকে বললাম, 'বিকেলে চা খেতে আসব। তখন দেখা হবে।'

সোনিয়া আমাদের সঙ্গে গেট পর্যন্ত এলো। গোলাপ দুটো সোনিয়া ললিপপের মতো ধরে রেখেছিলো। আমি বললাম, 'আজ যে দুটো গোলাপ সোনিয়া?'

সোনিয়া বললো, 'আজ তোরা দুজনেই ভালো কাজ করেছিস। অবশ্য ঝর্নাকেও একটা দেয়া উচিত।'

সোনিয়া আমাদের দুজনকে গোলাপ দুটো দিলো। সারা পথ গোলাপের গন্ধে বিভোর হয়ে বাড়ি ফিরলাম।

ঘরে ঢুকতেই বিজু বললো, 'নিচে যাও, মেজ জেঠিমা মর্নিংওয়াক করার মজা দেখাবেন।'

বিজু বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে 'হিমালয়ের ভয়ংকর' পড়ছিলো। রামু বললো, 'মা খুব রেগে আছেন নাকি বিজু?'

বিজু হেসে বললো, 'রেগেছিলেন বৈকি। দিদা রাগের গোড়ায় পানি ঢেলে দিয়েছেন। বলেছেন, সকালে মর্নিংওয়াক করলে শরীর ভালো হয়।' জেঠিমা পরে বলেছেন, 'এই কাজটি তো ছাদেও করা যায়। এই শীতের ভেতর বাইরে যেতে হবে কেন!'

আমি হেসে বললাম, 'দিদা যতদিন আছেন ততদিন আমাদের কোনো ভাবনাই নেই।'

রোদ নেই বলে সেদিন মেজদার স্যুটিং হলো না। দুপুর পর্যন্ত আমরা মেজদার ঘরে বসে গল্প করলাম। মেজদা একসময় বললেন, 'এসব যাচ্ছেতাই ছবি বানাতে আর ভাল্লাগছে না। আমি ঠিক করেছি একটা মনের মতো ছবি বানিয়ে আবার লেখার জগতে ফিরে যাবো।'

উর্মিলাদি গম্ভীরমুখে মাথা নেড়ে সায় জানালেন। ছবির নায়িকা উর্মিলাকে মেজদা বলেছেন উর্মিলাদি ডাকতে। তিনিও আমাদের সঙ্গে বসে গল্প করছিলেন। সাজগোজ না করলে উর্মিলাদিকে খুবই সুন্দর দেখায়। রঙটা যদিও ফর্শা নয়— তবে ফর্শা হলে তাঁকে এতটা ভালো লাগতো না।

দুপুরে আমাদের খাওয়ার জন্যে ডাকতে এসে দিদা মেজদাকে বললেন, 'এই যে পল্টু। তোকে একটা কথা বলব ভেবেছিলাম। পচা-পচা ছবি বানিয়ে টাকা পয়সা তো কম রাজগার করিসনি। অনেক আজেবাজে লোকের বিস্তর কালো টাকা সাদা করে দিয়েছিস। এখন সৎপথে কিছু টাকা ব্যয় কর।'

মেজদা হেসে বললেন, 'অত ভূমিকা না করে বললেই পারো তোমার কিছু টাকার দরকার।'

দিদা বিরক্ত হওয়ার ভান করে বললেন, 'আহ পল্টু, সবকিছু এত সংক্ষেপে বুঝতে যাওয়া ভালো নয়। টাকা আমার জন্যে নয়। আমি ভাবছি বুড়ো বয়েসে কিছু সমাজসেবা করবো। গ্রামে একটা ইশকুল করার ইচ্ছে আছে আমার।'

আমি আর রামু কোনরকমে হাসি চাপলাম।

মেজদা আগের মতো হেসে বললেন, 'ঠিক আছে দিদা। কিছু টাকা নিশ্চয়ই দেবো। কত দিতে পারবো তোমাকে পরে জানাচ্ছি। তবে এরজন্যে আমার টাকাকে গালি দিচ্ছো কেন? অসৎ পথে টাকা রোজগার করতে হলে, এদ্দিনে ছবি না বানিয়ে মন্ত্রী হতাম।'

'তোর মুরোদ আমার জানা আছে।' বলে দিদা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মেজদা উর্মিলাদিকে বললেন, 'দিদার মতো মানুষ আজকাল খুব কমই দেখা যায়। আমি জানি দিদা একবার যখন বলেছেন, স্কুল না বানিয়ে ছাড়বেন না।'

বিকেলে আমরা যখন বেরুতে যাবো তখনই ঝরঝর করে বৃষ্টি নামলো। সন্ধ্যে অবধি এমনই অঝোর ধারায় বৃষ্টি ঝরতে লাগলো, মনে হল চেরাপুঞ্জির সব মেঘ বুঝি পথ ভুল করে আমাদের জাফলং-এ চলে এসেছে।

সন্ধের পর বৃষ্টিটা একটু ধরে এলো। আমরা সবাই সোনিয়াদের বাসায় যাওয়ার জন্যে এতক্ষণ বৃষ্টির মুণ্ডুপাত করছিলাম। বৃষ্টি কমতেই রামু বলল, 'চল্, সোনিয়াদের বাসা থেকে এক্ষুনি একবার ঘুরে আসি। দুলালদা—'

রামুর মুখের কথা মুখে রইলো। রামুর পেছনে চোখ পড়তেই আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। বড়দা এসে দাঁড়িয়েছেন আমাদের দরজায়। আমি শুধু বললাম, 'একী বড়দা আপনি!'

রামু সঙ্গে সঙ্গে পেছনে তাকালো। বিজু বই ফেলে খচমচ করে উঠে বসলো। আমাদের তিনজনের মুখ হা হয়ে গেলো। বড়দার জামাকাপড় সব ভেজা। চুলের ডগায় পানির ফোঁটা জমে আছে। বড়দা কাঁপতে কাঁপতে মৃদু হাসলেন। বললেন, 'চ্যাঁচাবি না, জেল থেকে পালিয়ে এসেছি। জলদি শুকনো কাপড় বের করে দে। শীতে একেবারে জমে গেছি। আবু, নিচে গিয়ে দিদার কানে কানে শুধু বলবি, আমি এসেছি।'

আমি এক ছুটে নিচে নেমে গেলাম। দিদা রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছিলেন। কথাটা বলতেই তাঁর হাত থেকে চায়ের কাপটি পড়ে ভেঙে গেলো।'

পচার মা ছুটে এসে বললো, 'ও কি মা, কাপ ভাঙলো কী করে?'

দিদা ওকে ধমক দিয়ে বললেন, 'তুই নিজের চরকায় তেল দে পচার মা। বাড়িতে তুই ছাড়া আর কেউ বুঝি কাপ ভাঙতে পারবে না?'

'আমি কি তাই বলেছি?' বলে এতটুকু জিব কেটে পচার মা বেরিয়ে গেলো।

আমি আর দিদা চিলেকোঠার ঘরে ঢুকে দেখি বড়দা লেপ মুড়ি দিয়ে বিছানার ওপর বসে আছেন। দিদাকে দেখে বললেন, 'ভালো আছো তো দিদা! তোমাকে দেখার জন্যে জেল থেকে পালিয়ে চলে এলাম।'

দিদা কাছে গিয়ে বড়দার কপালে চুমু খেয়ে বললেন, 'আমি জানতাম তুই আসবি। কবে বেরিয়েছিস জেল থেকে? পথে কোনো বিপদ হয়নি আসতে?' তারপর দিদা বিজুকে বললেন, 'দৌড়ে রান্নাঘরে যা বিজু। কেতলিতে চা বানানো আছে। এখনি বানিয়েছি। এককাপ চা আর কখানা বিস্কুট নিয়ে আয়।'

বিজু দৌড়ে নিচে চলে গেলো। বড়দা মৃদু হেসে বললেন, 'এখনো তুমি সবদিকে নজর রাখতে পারো দিদা। আমি জেল থেকে বেরুইনি। ঢাকা থেকে কুমিল্লা নেয়ার পথে ট্রেন থেকে পালিয়েছি। আজ নিয়ে মোট ঊনিশ দিন হলো; এতদিন টঙ্গীর এক পুরোনো এলাকায় লুকিয়েছিলাম।'

রামু বললো, 'ট্রেন থেকে কী করে পালালেন বড়দা, সে কথা আগে বলুন।'

দিদা কটমট করে রামুর দিকে তাকালেন। বড়দা হেসে বললেন, 'যাচ্ছিলাম ট্রেনে করে। সঙ্গে গার্ড ছিল দু'জন, আর একজন পুলিসের সাব-ইন্সপেক্টর! খুব ভদ্র আর নিরীহ কয়েদি ছিলাম বলে হাতকড়া লাগায়নি। ট্রেনে লোকজনও খুব বেশি ছিলো না। একটা খোলা পুল পার হবার সময়ই দরজা দিয়ে বাইরে লাফ

দিয়েছিলাম। পানিতে ভেসে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই শুনি গুলির শব্দ। ট্রেন থামতে থামতে সাঁতরে আমি অনেক দূরে চলে গিয়েছিলাম! তবে আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে একট পচা লাশ। কয়েকদিন গ্রামে লুকিয়েছিলাম। সেখানে থাকতে খবর পেলাম, পুলের কাছে একটা গুলি-খাওয়া লাশ পাওয়া গেছে। চেহারাটা চেনা যায়নি। একেবারেই ডিকম্পোজড হয়ে গেছে। পুলিস রিপোর্ট পাঠিয়েছে লাশটা যে আমার এ-ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই!'

দিদা বললেন, 'পুলিশ তো আমাদের কিছুই জানায় নি!'

বিজুর আনা চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বড়দা বললেন, 'এত ব্যস্ত হচ্ছো কেন, ওদেরকে কাগজপত্তোর তৈরি করার সময় দেবে না?'

'তুই এখন এলি কোত্থেকে?'

'ছাতকে মেজকার ওখানে ছিলাম গত দুদিন। মেজকা তো ওখানকার শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নের ভেতর আমাদের লাইন নিয়ে দারুণ কাজ করছেন। মেজকা আমাকে বললেন, তুই নেই বলে কাজ কি থেমে থাকবে! একটা কিছু তো করতে হবে। তাই ট্রেড ইউনিয়নের মজুরদের রাজনীতির তালিম দিচ্ছি। আমি বলেছি, মেজকা আপনি এমন এক জায়গায় কাজ করছেন, আর এমন এক সময়ে বাস করছেন যখন চুপচাপ বসে থাকতে চাইলেই থাকা যায় না। কদিন পরে দেখলাম ওখানে থাকা নিরাপদ নয়। পুলিস আর আইবির লোক সারাক্ষণ ঘুরঘুর করছে। ভাবলাম এলাকায় যাওয়ার আগে তোমাকে দেখে যাই। মেজকা সঙ্গে আসতে চাইছিলেন। আমি বারণ করেছি। আমি চাই না আমার পালিয়ে আসার কথা কাকিমাদের কানে যাক। ওঁরা দুদিনেই তাহলে সবখানে জানিয়ে দেবেন।' এই বলে বড়দা আমাদের দিকে তাকালেন— 'বড়দাকে যদি ভালোবাসিস তাহলে এসব কথা কাউকেই বলতে পারবি না।'

বিজু বললো, 'দুলালদাকেও না?'

বড়দা ভুরু কুঁচকে বললেন, 'দুলালদা কে?'

আমরা দিদার দিকে তাকালাম। দিদা আস্তে আস্তে বললেন, 'তোর মতোই একজন ইন্ডিয়া থেকে এসেছে।' তারপর দুলালদার সব কথা বড়দাকে খুলে বললেন, এমনকি ইশকুলের কথাও। বড়দা সব কথা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'ও এখন কোথায়?'

আমি বললাম, 'হাসি খালাদের বাড়িতে। আজ ঝর্নার ঢল নেমেছে বলে গ্রামে যেতে পারেন নি।'

বড়দা দিদাকে বললেন, 'খুবই বুদ্ধিমান ছেলে মনে হচ্ছে দিদা। ওর সঙ্গে আমি কথা বলবো।'

দিদা বললেন, 'তুইও তাহলে হাসিদের বাসায় চলে যা। আমাদের এখানে এখন অনেক লোকজন। পল্টু এসেছে, স্যুটিং করবে বলে। তাছাড়া তোর বাপ

টের পেলে হৈচৈ বাঁধাবে।'

বড়দা একটু বিব্রত হয়ে বললেন, 'হাসি খালার সঙ্গে যে আমার ভালো আলাপ নেই। কবে একবার কথা হয়েছিলো। তাছাড়া তাঁর ওখানে যাওয়া কি ঠিক হবে?'

বড়দাকে বাধা দিয়ে রামু বলল, 'হাসি খালার মতো ভালো মানুষ আর হয় না বড়দা। দুলালদার সঙ্গে কি আলাপ ছিলো নাকি! আসলে তিনি বিপ্লবীদের ভালোবাসেন।'

আমি বললাম, 'ওখানে আপনার কোনো অসুবিধে হবে না বড়দা। চলুন, দুলালদার সঙ্গেও দেখা হবে।'

বড়দা মৃদু হেসে বললেন, 'তোরা দেখছি অনেক বড় হয়ে গেছিস। এবার তোদের কাজে লাগাতে হবে।'

বিজু সঙ্গে সঙ্গে বললো, 'দুলালদা আমাদের ইশকুলের কাজ দিয়েছেন।'

দিদা বললেন, 'গেলে তোরা এখনই বেরিয়ে পড়। কুটু, কাল রাতে অবশ্যই দেখা করবি। একবেলা তোকে নিজ হাতে রেঁধে না খাওয়ালে মনে শান্তি পাবো না।'

বড়দা উঠে গিয়ে দিদার পাশে দাঁড়ালেন। নিচু হয়ে দিদার কপালে চুমু খেয়ে বললেন, 'তুমি একটুও বদলাও নি দিদা।'

দিদাকে চুমু খেতে বড়দা ছাড়া অন্য কাউকে কখনো দেখিনি। আমি, রামু, বিজু, তিনজন একসঙ্গে হেসে ফেললাম। আমি বললাম, 'দিদার সব আদর শুধু বড়দার জন্যে।'

দিদা হেসে বললেন, 'চুপ কর নেমকহারাম। হাসিদের বাসায় গিয়ে আবার সোনিয়ার সঙ্গে জমে যাস নে।'

বড়দাকে নিয়ে হাসি খালাদের বাসায় গিয়ে দেখি দুলালদা, হাসি খালা আর সোনিয়া ড্রইংরুমে বসে আছে। দুলালদার গায়ে জলপাই রঙের নতুন সুয়েটার, যেটা হাসি খালাকে দেখেছি বুনতে। হাসি খালা বড়দাকে দেখে অবাক হয়ে বললেন, 'কুটু কবে এলে?'

বড়দা মৃদু হেসে বললেন, 'আজই এসেছি। আপনার রান্নার অনেক প্রশংসা শুনেছি সেজ কাকিমার কাছে। তাই আজ এসে আর লোভ সামলাতে পারলাম না।'

হাসি খালা লজ্জায় লাল হলেন। বড়দা দুলালদাকে বললেন, 'আপনি নিশ্চয়ই দুলাল!'

দুলালদা হেসে বললেন, 'আর আপনি তো বড়দা! তারপর দুলালদা হাত মেলানোর জন্যে উঠে এলেন, বড়দা তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, 'আপনার কথা দিদার কাছে শুনেছি।'

হাসি খালা গভীর মমতাময় চোখে বড়দা আর দুলালদাকে দেখছিলেন। চশমার কাচের ভেতর তাঁর চোখ দুটো তখন ছলছল করছিল।

বড়দা আর দুলোলদা পাশপাশি একটা সোফায় বসলেন। দুলালদা বললেন, 'আবু রামু দাঁড়িয়ে কেন, বোসো।'

বড়দা বললেন, 'আজ ওরা বাড়ি চলে যাক দুলাল। কাল আমরা সাবই মিলে গল্প করবো।'

হাসি খালা মিষ্টি হেসে বললেন, 'সকালে তোমরা তাহলে এখানেই খেও।'

হারিয়ে যাওয়ার ঠিকানা

পরদিন সকালে আমরা মেজ জেঠিমাকে বলে হাসি খালাদের বাসায় চলে এলাম। আনন্দ আর উত্তজনার অথৈ সমুদ্রে ভাসছিলাম আমরা। বিজু ঘুম থেকে উঠে বলছিলো, 'আমার ইচ্ছা করছে, কিছুক্ষণ কোথাও বসে মনের সুখে কাঁদি।'

হাসি খালারা খাবারঘরে বসে কথা বলছিলেন। আমি গিয়ে সোনিয়ার পাশের চেয়ারটিতে বসলাম। রামু আর বিজু বসলো আমাদের মুখোমুখি, বড়দার দুপাশে। হাসি খালা সবাইকে সবুজ চা ঢেলে দিলেন।

বড়দা দুলালদাকে বললেন, 'তুমি কৃষকদের অবস্থা তদন্ত করা সম্পর্কে যে কথা বললে দুলাল, এখন সবার আগে এ-কাজটিই করতে হবে। কৃষক-শ্রমিকদের জানতে হবে! আক্ষরিক অর্থে নয়, পুরোপুরি একাত্ম হতে হবে ওদের সঙ্গে। পেটি বুর্জোয়া নেতৃত্বে আমার বিন্দুমাত্র আস্থা নেই। আমাদের এখানে যে এতগুলো কমিউনিস্ট পার্টি, এর প্রধান কারণ হচ্ছে পেটি বুর্জোয়াদের নেতৃত্ব। পেটি বুর্জোয়া চিন্তা থেকে পার্টিতে আমলাতান্ত্রিকতা আসে। ব্যাপকভাবে কৃষক-শ্রমিক ক্যাডার পার্টিতে না থাকলে এবং তাদের রাজনীতি-সচেতন না করলে, এইসব পেটি বুর্জোয়া নেতৃত্ব আর উপদলীয় কোন্দল থামানো যাবে না। আমরা শুধু মুখেই বলি কমিউনিস্ট পার্টি হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি অথচ শ্রমিকদের সত্যিকারের অবস্থা আমরা কিছুই জানি না। অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। পরিবর্তনের প্রতিটি ধাপ আমাদের জানা না

থাকলে আমরা সবসময় পেছনে পড়ে থাকবো।'

বড়দার অনেক কথা ঠিকমতো সবাই বুঝতে না পারলেও আমরা অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে ওঁর কথা শুনছিলাম। বড়দার কথাগুলোর সঙ্গে গভীর আন্তরিকতা মিশেছিলো, যে জন্যে প্রতিটি কথা আমাদের মনকে স্পর্শ করতে পেরেছিলো। বড়দা বললেন, 'আমি চিরকাল গ্রামে থেকে কাজ করেছি। সেদিন তিন বছর পর আবার গ্রামে গেলাম। তিন বছরের পরিবর্তন দেখে বিস্ময়ে আমি হতবাক হয়ে গেছি। আমাদের কৃষকরা হাল, গরু, জমি, ভিটেমাটি সব বিক্রি করে শহরের ফুটপাতে বসে বসে না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে। এর চেয়ে দুঃসময়ের কথা কি ভাবা যায় দুলাল? আমাদের দ্বন্দ্বগুলো এত পরিষ্কার, তবু আমরা বিপ্লবীরা একটি সঠিক নেতৃত্ব আর তত্ত্বে সজ্জিত কমিউনিস্ট পার্টিতে একত্রিত হতে পারছি না। ভবিষ্যতের মানুষ আমাদের এই অক্ষমতাকে কখনো ক্ষমা করবে না।'

দুলালদা বললেন, 'বড়দা আমি আর তত্ত্বের জটিলতায় ফিরে যেতে চাই না। আমি এখানেই থাকবো। এখানেই কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করবো, কৃষক সমিতি করবো, গোপনে পার্টি সংগঠন দাঁড় করাবো। বাংলাদেশের মানুষ কেন না-খেয়ে মরছে এই দুদিনে গ্রামের কৃষকদের সঙ্গে কাজ করে আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি। কীভাবে ধান-চাল এখান থেকে ইন্ডিয়ায় পাচার হচ্ছে, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। কারা এগুলো করছে তাও আমরা জানি। আমার কাছে বাংলাদেশে আর ভারতে কোনো পার্থক্য নেই। দুটো দেশেই আমাদের কমন এনিমির বিরুদ্ধে লড়তে হবে। জনগণের শত্রু দুটো দেশেই এক।'

বড়দা বললেন, 'তোমার সঙ্গে থেকে যেতে ভারি লোভ হচ্ছে দুলাল। তুমি সঠিক পথেই এগুচ্ছো। আমি কদিন থাকবো তোমার এখানে। তারপর আমাদের এলাকায় ফিরে যাব। তুমি বলছ তোমাদের পার্টি ভেঙে গেছে, নেতারা কেউ বাইরে নেই। আমাদের অবস্থা ঠিক একইরকম। তাতে কি আমরা কাজ থেকে পালিয়ে গিয়ে দূরে বসে-বসে হতাশ হবো?

দুলালদা আর বড়দা তাঁদের কাজের বিষয় নিয়ে বহুক্ষণ আলোচনা করলেন। কমিউনিষ্ট পার্টির কাজ সম্পর্কে আমার কোনো সঠিক ধারণা ছিলো না। তবু মনে হলো আমি যেন বড়দাদের দলেরই একজন। শুধু আমি নই, টেবিলে আমরা যারা বসেছিলাম, তখন আমরা সবাই ভাবছিলাম দেশে একটা পরিবর্তন আসুক, যাতে দেশের কোনো মানুষকে না-খেয়ে মরতে না হয়, আমাদের মতো ছেলেরা সবাই যেন স্কুলে যেতে পারে আর দারুভূইর মতো মানুষদের যেন বুড়ো বয়সে এভাবে কারো চাকরি করতে না হয়।

বড়দা আর দুলালদা মানুষের অবস্থা ভালো করার জন্যেই কাজ করছেন। তাঁদের জন্যে ছোট্ট সোনিয়া ভাবে, আমাদের বুড়ো দিদাও ভাবেন— আমরা সবাই ভাবি। তাঁদের জন্যে কিছু করতে পারলেই মনে হয় জীবনটা সার্থক হবে।

আমরা হারিয়ে যাওয়া ঠিকানা খুঁজছিলাম। আমি ভাবছি দুলালদা আর বড়দার মতো কি কখনো আমরা এভাবে দেশের অগণিত খেটে-খাওয়া মানুষের ভেতর হারিয়ে যেতে পারবো?

সেদিন থেকে দিদা মানুষের বাড়ি বাড়ি ঘুরে পুরোনো জামাকাপড় জোগাড় করা শুরু করলেন। বাড়িতে মেজদার স্যুটিং-এর লোকেরা দিদার কাণ্ড-কারখানা দেখে দারুণ অবাক হয়ে গেলো। স্কুলের জন্যে নায়ক আব্বাস, কমেডিয়ান আলতামাস, নায়িকা উর্মিলাদি থেকে শুরু করে মেজদার পুঁচকে এ্যাসিস্টেন্টটিও টাকা দিলো। আমরা তিন জন আমাদের স্কলারশিপের পুরো টাকাটাই দিদাকে দিয়ে দিলাম— হারিয়ে যাওয়ার সময় সঙ্গে নেয়ার জন্যে এতদিন ধরে যে টাকা যখের ধনের মতো আগলে রেখেছিলাম। আমাদের মা-কাকিমারা অবশ্য বললেন, দিদা নাকি সব কাজেই বাড়াবাড়ি করেন। আমাদের মনে হলো এতবড় একটা কাজে হাত দিয়েছি আমরা, বাড়াবাড়ি তো হবেই। এটা তো আর কাকিমাদের রুমালে ফুলতোলার মতো সাধারণ কাজ নয়। এ কথাটা দুলালদা আমাদের বলেছিলেন।

একদিনেই দিদা প্রায় তিনশ জামাকাপড় জোগাড় করলেন। দিদা ছোটদের কাপড় বেশি করে চেয়ে নিচ্ছিলেন। রাতে সব কাপড় হাসি খালাদের বাড়িতে জড়ো করা হলো। ঠিক হলো পরদিন সকালেই বড়দা দুলালদা, রামু বিজু, দারুভূই আর আমি যাবো খাসিয়াদের গ্রামে। দারুভূই বলছিলো, ঝড়ে নাকি ওদের ঘরবাড়ি সব ভেঙে গেছে।

ভোরে আমরা ছ'জন পিঠে কাপড়ের বোঝা নিয়ে খাসিয়াদের গ্রামে গেলাম। পাহাড়ের ওপর মাচার মতো ঘর বেঁধে থাকে ওরা। আমরা গ্রামে যেতেই সবাই দুলালদাকে ঘিরে ধরলো। দারুভূই আর দুলালদা ওদের সঙ্গে কথা বললেন। আমরা কিছুই বুঝলাম না। বড়দা ঘুরে ঘুরে সব দেখছিলেন।

কাপড় পেয়ে ওরা ভারি খুশি। বাচ্চারা খালি গায়ে আগুনের ধারে বসেছিলো। চীনা পুতুলের মতো নিষ্পাপ বাচ্চাদের কষ্ট দেখে আমার প্রায় কান্না এসে গিয়েছিলো। রামু-বিজুর অবস্থাও দেখলাম একইরকম। আমাদের ইচ্ছে হলো দুলালদার মতো ওদের সঙ্গে থেকে যাই। দুলালদা বললেন, 'ওদের জন্যে খুব কষ্ট হচ্ছে, তাই না আবু? অথচ ওরা জানে না ওরাও আমাদের মতো ভালো থাকতে পারে। ভালো খাবার, ভালো কাপড়—সবই পেতে পারে। এরা কষ্ট করছে বলেই কিছু মানুষ বিলাসিতা করতে পারছে। এরা সংখ্যায় অনেক বেশি, তবু কষ্ট করে, কারণ ওরা জানে না কিছু লোক কীভাবে ওদের বঞ্চিত করছে।'

সেদিন আমরা সন্ধ্যে পর্যন্ত খাসিয়াদের গ্রামে ছিলাম। গ্রামের যে ঘরগুলো পড়ে গিয়েছিলো, সেগুলো তোলার কাজে ওদের সাহায্য করলাম। দুলালদা বললেন, 'ওদের ঘরগুলো তোলা শেষ হলে কাল-পরশু আমরা ইশকুলের জন্য ঘর তুলবো।'

ঘর তুলতে গিয়ে সেদিনই একটা গণ্ডগোল হয়ে গেলো। আমাদের গ্রামে আসার আগে কয়েকজন গরিব চাষী মহাজনের কাছে গিয়েছিলো, বনে বাঁশ কাটার অনুমতি নেয়ার জন্যে। মহাজন লামা সিনতেং বলেছে বিনে পয়সায় কাউকে বাঁশ দেবে না। দুলালদা শুনে বললেন, 'বন কি মহাজনের নাকি! বন তৈরি করেছেন উব্লাউ নাংথাউ অর্থাৎ ঈশ্বর। লামার সিনতেং কি নিজেকে ঈশ্বর মনে করে?' একজন বললো, 'এতদিন বনে কাঠ কাটতে গেলে লামার অনুমতি লাগতো।' দুলালদা বললেন, 'লামা তোমাদের ঠকাতো। ও যে একটা পাজির হদ্দ, এ কথা তো তোমরা সবাই জানো। দেবতার বনকে ও নিজের বন বলতে পারে না।' শুনে কয়েকজন বললো, 'তাইতো, ঈশ্বরের পৃথিবীতে সবাই সমান। ঈশ্বরের বনে কারো অধিকার নেই। আমরা কাঠ কেটে উ ব্লাউ নাংথাউর পুজো দেবো, তাতেই ঈশ্বর খুশি হবেন।

দারুভূই ওদের সবকথা আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছিলো। 'ঈশ্বরের জয় হোক', বলে সবাই ধারালো কুড়োল আর দা হাতে বাঁশ কাটতে বনে চলে গেল। দুলালদাও ওদের সঙ্গে গেলেন। আমরা ঘর বাঁধার কাজ করছিলাম। দারুভূই অবশ্য আমাদের প্রথম বাধা দিয়েছিল। ওকে অনেক বুঝিয়ে শান্ত করেছি।

দুলালদারা দুপুরের দিকে বাঁশ কেটে ফিরলেন। দুলালদার সঙ্গীরা দেখলাম দারুণ উত্তেজিত গলায় কী যেন বলাবলি করছে। দুলালদা দারুভূইকে বললেন, 'মহাজনের লোকেরা বাধা দিতে এসেছিলো। প্রথমে আমরা ওদের শান্তভাবে বুঝিয়েছি। পরে যখন বেশি হম্বিতম্বি করতে শুরু করলো, তখন কয়েকজন দা হাতে করে ওদের দিকে তেড়ে গেলো। ব্যস, তখনি সব কটা চোখের পলকে হাওয়া।'

বড়দা হেসে বললেন, 'শ্রেণীসংগ্রাম তাহলে শুরু হয়ে গেছে দুলাল।'

দুলালদা বললেন, 'ওদের ভেতর কয়েকটা ছেলে পেয়েছি বড়দা, একেবারে হিরের টুকরো। খুব শিগগিরই ওদের হাতে গোটা এলাকার কাজ ছেড়ে দিতে পারব।'

সন্ধ্যে পর্যন্ত প্রায় সব কটা ঘর বানানো শেষ হয়ে গেলো। আমরা কচি ছাগলের ঝলসানো মাংস দিয়ে যবের রুটি খেয়েছিলাম। এদের এখানে ধান, যব, ভূট্টা, সবই হয়। পাহাড়ের গায়ে সিঁড়ির মতো থাক কেটে ভূট্টা আর যবের চাষ করে। এখনো এদের অর্ধেক ফসল লামা সিনতেং-এর গোলায় দিয়ে আসতে হয়। কারণ এসব জমির মালিক নাকি সে। দুলালদা বললেন, 'সামনের বার ফসল নিতে লামা বেচারার একটু কষ্ট হবে। এরা বলছে লামাকে ওরা তিনভাগের একভাগ ফসল দেবে, তাও যদি ফসল ভালো হয়।'

সূর্য যখন দূরের খাসিয়া পাহাড়ের আড়ালে ডুবে গেলো তখন বড়দা বললেন, 'রামু , আবু, বিজু— তোমরা এবার দারুভূইকে নিয়ে বাড়ি ফিরে যাও। আমি

আর দুলাল এখানে থাকবো। এরা বলছে রাতে লামা সিনতেং গণ্ডগোল করতে পারে।'

দারুভূই বললো, 'গণ্ডগোল আর কি, হয়তো চোরের মতো এসে কারো ঘরে আগুন ধরিয়ে দেবে।'

আমি বললাম, 'হাসি খালা যদি আপনাদের কথা জিজ্ঞেস করেন তাহলে কী বলবো?'

দুলালদা বললেন, 'ওঁকে বলো দু'তিনদিন আমাদের এখানে থাকতে হবে। দিদা যদি আরো কিছু কাপড় যোগাড় করেন তাহলে দারুভূইকে নিয়ে তোমরা কাল সকালে চলে এসো। আমি চাই ইশকুল ঘরটা তোমরাই বানাবে।'

উত্তরদিক থেকে তখন হু হু করে শীতল বাতাস বইছে। মাঠের মাঝখানে আগুন জ্বালিয়ে গ্রামের সবাই তার চারপাশে বসে গল্প করছে আর মদ খাচ্ছে। বড়দা আর দুলালদাও ওদের সঙ্গে বসে পড়েছেন। ওদের সকলের মুখে আগুনের লাল ছায়া কাঁপছে। দুলালদা বলছিলেন, 'একটা স্ফুলিঙ্গই দাবানল সৃষ্টি করতে পারে। গ্রামের বারুদের মতো মানুষগুলো যেভাবে উত্তপ্ত হচ্ছে, সারাদেশে দাবানল জ্বলে উঠতে আর বেশি দেরি নেই।'

পিয়াইন নদী পার হয়ে পেছনে তাকিয়ে দেখলাম, দূরে পাহাড়ের বুকে একটুকরো স্ফুলিঙ্গ ধিকিধিকি জ্বলছে। মনে মনে ভাবলাম লামা সিনতেংরা কখনো এই আগুন নেভাতে পারবে না।

আমরা তিনজন বাড়ি ফেরার পথে হাসি খালাদের বাসায় গেলাম। দেখি দিদা বসে হাসি খালার সঙ্গে গল্প করছেন। এতদিন আমাদের ধারণা ছিলো দিদা হাসি খালাকে পছন্দ করেন না। অথচ ওঁরা দুজন একটা সোফায় পাশাপাশি বসে অন্তরঙ্গভাবে কথা বলছিলেন। দিদার সঙ্গে হাসি খালার এই অন্তরঙ্গতার যোগসূত্র যে দুলালদা একথা অনুমান করতে এতটুকু কষ্ট হলো না। রামু বলল, 'হাসি খালা, দুলালদা আর বড়দা দু'তিনদিন গ্রামে থাকবেন।'

হাসি খালা দিদাকে বললেন, 'আপনাকে বলিনি, দুলাল আজ ফিরবে না! কুটুকে পেয়ে ও এখন সব কিছু ভুলে যাবে।'

বিজু বলল, 'আজ কি কোনো কাপড় পেয়েছো দিদা?'

'অনেক!' দিদা বললেন, 'তোরা দুদিনেও নিতে পারবি না।'

রামু বললো, 'তার মানে আমরা কালও গ্রামে যাচ্ছি।'

সোনিয়া বললো, 'মা, কাল আমি আবুদের সঙ্গে যেতে চাই, অবশ্য তোমার যদি আপত্তি না থাকে।'

হাসি খালা হেসে বললেন, 'বেশ তো যেও।'

সোনিয়া গভীর কৃতজ্ঞতার চোখে হাসি খালা আর আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো। আমি মৃদু হাসলাম। ওর দিকে তাকিয়ে মনে মনে বললাম, সোনিয়া

আমি জানতাম, একদিন তুই ঠিকই দুলালদার বন্ধু দীপার মতো আমাদের সঙ্গে মিশে যাবি।

দিদা বললেন, 'যাই হাসি। অনেক গল্প করলাম। কাল আবার আসবো। তুমি বাছা নিজেকে এভাবে গুটিয়ে রেখো না। তোমার ঘাড়েই সমিতির সব কাজ চাপাবো।'

সোনিয়া আমাদের সঙ্গে গেট পর্যন্ত এসে প্রত্যেকের হাতে একটা করে তাজা গোলাপ গুঁজে দিলো। দিদা মিষ্টি হেসে বললেন, 'পাগল মেয়ে! কাল তোর জন্যে নারকোলের চিঁড়ে আনব।'

মেঘ কেটে গিয়ে আকাশে তখন রূপোর মতো চাঁদ উঠেছে। সারা আকাশ চাঁদের আলোয় ঝকঝক করছে। অল্প অল্প কুয়াশায় আমি, রামু আর বিজু-দিদাকে ঘিরে হাঁটছিলাম। আমাদের সবার মন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। আমি ভাবছিলাম, আমাদের একরত্তি শহর জাফলং-এ এসে দুলালদা এই তিনদিনে কী অঘটনই না ঘটিয়েছেন। বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো কতগুলো নিঃসঙ্গ মানুষের জীবনধারা তিনি উল্টোখাতে বইয়ে দিয়েছেন। হাসি খালা এখন দিদার সঙ্গে পাশাপাশি বসে হেসে গল্প করেন। আমি জানি সোনিয়া এখন আমার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু। আসলে একটি মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা সবাই একই লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছি। আমি গর্ব বোধ করলাম শেষ পর্যন্ত বাবাও আমাদের মিছিলের একজন হয়ে গেলেন। বাবাকে এখন মোটেই দূরের কেউ মনে হচ্ছে না। বড়দা আর দুলালদাদের মতো মানুষরা আছেন বলেই অনেক দুঃখ আর যন্ত্রণার ভেতর নতুন ভাবে বাঁচার স্বপ্ন দেখা যায়। স্কুলে যখন রচনা লিখতে হতো, বড় হলে তুমি কী হতে চাও— এতদিন কি আবোল-তাবোল কথাই না লিখতাম!

রামু একসময় বললো, 'মাত্র তিনদিনে কত কিছু ঘটে গেলো।'

আমি বললাম, 'হারিয়ে যাওয়ার ঠিকানা খুঁজে পেয়েছিস রামু?'

রামু মৃদু হেসে বললো, 'আমি চিরদিনের জন্যে হারিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছি আবু। আমি জানি তুইও তাই ভাবছিস।'

আমি রামুর কাঁধে হাত রাখলাম। জয়ন্তিয়া পাহাড়ে দুলালদা আর তাঁর বিপ্লবী সঙ্গীদের কথা ভাবলাম। এখন ওঁরা আগুনের চারপাশে বসে পুরোনো সমাজটাকে ভেঙে নতুন সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখছেন, আর আগামী দিনের কাজের পরিকল্পনা করছেন। দুলালদা হয়তো দীপার কথা ভাবছেন। সোনিয়া কি এখন আমার কথা ভাবছে?

আমি বুক ভরে সোনিয়ার দেয়া শিশির-ভেজা লাল গোলাপের গন্ধ নিলাম।

বহুরূপী

অলংকরণ : রফিকুন নবী

শিংটোলার ছআনি দশআনি

শিংটোলার জমিদারদের নিকুঞ্জ-কুটিরের মতো বড় আর পুরোনো বাড়ি গোটা তল্লাটে দ্বিতীয়টি নেই। সেই কোম্পানির আমলের বানানো। বংশের আদিপুরুষ নিকুঞ্জ নারায়ণ রায়ের নামে এ-বাড়ি বানিয়েছিলেন তাঁর অধস্তন চতুর্থ পুরুষ কালী নারায়ণ রায়। জয়পুর থেকে মার্বেল আনানো হয়েছিলো, কড়ি-বরগা আর দরজা-জানালার কাঠ এসেছিলো বার্মা থেকে, ঝাড়লণ্ঠন এসেছিলো ভেনিস থেকে— সে এক ধুন্ধুমার কাণ্ড।

পাড়ার লোকেরা অবশ্য অনেক আজেবাজে কথা বলতো। নাকি নিকুঞ্জ নারায়ণ রায়ের বংশে ফাঁসুড়ের রক্ত আছে। যদিও কালী নারায়ণ বলতেন ইদ্রাকপুরে তাঁদের জমিদারি কেনা হয়েছিলো স্বপ্নে পাওয়া গুপ্তধনের টাকায়, অনেকে সেসব কথা বিশ্বাসও করতো, তবে অবিশ্বাসী মানুষের সংখ্যা কোনোকালেই কম ছিলো না।

অত জাঁকজমক করে বাড়ি বানানো, লক্ষ্ণৌ থেকে বাইজি আর গানের ওস্তাদ আনিয়ে নবাবদের সঙ্গে টক্কর দেয়া— সবকিছু তিন পুরুষেই কর্পুরের মতো উবে গেলো। কালী নারায়ণের চতুর্থ পুরুষে এসে শরিকদের ভেতর সম্পত্তি ভাগ হলো। দেনার দায়ে বসতবাড়ি ছাড়া বাকি সবই নিলামে উঠলো। নিকুঞ্জ কুটিরের দশাও একরকম না থাকার মতোই। কোথায় গেলো ভেনিসের ঝাড়বাতি, দরজা-জানালার বর্মী-নক্সা আর দেয়ালের চকমিলান কারুকাজ! সিংহদরজার থামের ওপর বসানো সিংহ দুটোর দশাও তেমনি। একটার লেজ উড়ে গেলো কবে কেউ টেরও পেলো না, আরেকটার সামনের এক ঠ্যাং ভাঙা— দুটোরই আস্তর খসে ভেতরের সুরকি বেরিয়ে গেছে।

ইংরেজদের রাজত্ব শেষ হওয়ার পর ইতুর বড়দাদু ঠিক করলেন কলকাতা থেকে ঢাকা চলে আসবেন। ওঁদের ওয়েলেসলি স্ট্রিটের বাড়িটা প্রথমে বিক্রি করার জন্য দালাল ধরলেন। সে-সময় বাড়ি কেনার গরজ নেই কারো। উল্টোপাল্টা দাম বলার জন্য তিন তিনটে দালাল ইতুর বড়দাদুর লাঠিপেটা খেয়ে

পালালো। ওঁর সঙ্গে স্কুলে পড়তেন ঢাকার নিকুঞ্জ কুটিরের ছআনি শরিকদের এক ছেলে। পরে বাপ মরার পর নিজেই মালিক হয়েছেন, তবে ঢাকার বাড়ির খোঁজখবর সামান্যই রাখতেন। এক বিটকেল নায়েব ছিলো, বাড়িতে সে ভাড়াটে বসিয়েছিলো। বছরে একবার এসে কিছু টাকা দিয়ে যেতো, বারো মাসের ভাড়া যা হওয়ার কথা তার অর্ধেকেরও কম। বলে নিকুঞ্জ কুটির নাকি ভুতুড়ে বাড়ি, বেশিদিন কোনো ভাড়াটে থাকে না, ন্যায্য ভাড়াও পাওয়া যায় না।

বাড়ি বিক্রির খবর শুনে ছআনি শরিক একদিন নিজে এলেন ইতুর বড়দাদুর সঙ্গে দেখা করতে। ভূতের কথা গোপন করে বন্ধুকে বললেন, 'যখন ঢাকা যাবে ঠিক করেছো, তখন আমার বাড়িটা গিয়ে একদিন দেখে এসো। তোমার পছন্দ হলে আমি ওটার সঙ্গে তোমার এ বাড়ি বদল করতে পারি।'

কথাটা ইতুর বড়দাদুর মনে ধরলো। শিংটোলার নিকুঞ্জ কুটিরের ছআনি অংশ দেখে তাঁর পছন্দও হলো। বাড়ি অনেক পুরোনো বটে, তিরিশ-চল্লিশ বছরে কোনো মিস্তিরির হাত লাগে নি, রঙও কেউ করে নি, তবে জায়গা অনেকখানি। পেছনের জমিতে আম, কাঁঠাল, নারকেল আর লিচুর গাছ আছে বেশ কয়েকটা। দেরি করলে যদি হাতছাড়া হয়ে যায়— কলকাতায় এসেই কাগজপত্র সব পাকা করে ফেললেন। ছআনি শরিকও ভূতুড়ে বাড়ির হিল্লে করতে পেরে ভারি খুশি।

শিংটোলার বাড়িতে আসার অনেক পরে ইতুদের জন্ম হয়েছে। বড়দাদু এ-বাড়িতে এসেই রঙ মেরামত সব করেছিলেন, তবু পুরোনো চেহারাটা রয়েই গেছে। পাড়ার লোকদের কাছে নিকুঞ্জ নারায়ণের বংশের সব কীর্তি-কাহিনী ইতুরা জন্মের পর থেকেই শুনছে। ইতুর দিদা ভীষণ কড়া মানুষ। বলেন, 'ওদের বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছি তো, তাই এ-বাড়ি সম্পর্কে আজেবাজে কথা বলে। আসার পর থেকে বছরে কটা মিলাদ পড়াই হিসেব করেছিস? আমি তো চোখ বুজলেই দেখতে পাই সারা বাড়িতে ফেরেশতারা গিজগিজ করছে।'

ইতুরা চোখ বুঝে কখনো ফেরেশতা দেখে নি ঠিক, তবে খারাপ কিছুও দেখে নি। দিদার কথা শুনে একদিন মিতু বললো, 'বাড়িতে তো আমরাই গিজগিজ করি দিদা। তুমি আমাদের কথা বলছো?'

বড়রা সবাই দিদাকে আজরাইলের মতো ভয় পেলেও ছোটরা সবসময় ওঁর আহ্লাদ পেয়ে এসেছে। মিতুর কথায় দিদা এতটুকু রাগলেন না। মুখ টিপে হেসে বললেন, 'তোরা সব ইবলিশের ঝাড়। বাচ্চা থাকতে সবাই ফেরেশতা থাকে, তোরাও ছিলি একসময়— এখন সব আস্ত শয়তান হয়েছিস।'

ইতুর তিন দাদুর ছেলেমেয়ে— ওদের বাবা, কাকা, জ্যাঠা আর ফুপিরা মিলে আঠারো ভাইবোন। সবাই অবশ্য এ-বাড়িতে থাকে না। বড় দাদুর এক ছেলে রাঙা জেঠু অনেক আগে— সেই ইংরেজ আমলে ভূপালে গিয়ে আস্তানা গেড়েছেন, দেশে ফেরার কথা মুখেও আনেন না। বিয়ে করেছেন সেখানকার এক

নামী বংশে। রাঙা জেঠিমার কথা ইতুরা কেবল বড়দের মুখে শুনেছে, চোখে দেখে নি। ওঁদের ছেলে-মেয়েরা পড়ালেখা করতে গিয়েছিলো কেউ বিলেতে, কেউ আমেরিকায়। পড়ার পাট শেষ করে কেউ দেশে ফেরে নি। ভূপালে রাঙা জেঠু আর জেঠিমা বাড়িতে একগাদা কুকুর আর বেড়াল পুষ্যি নিয়ে দিব্বি আরামে দিন কাটাচ্ছেন। ইতুদের আরেক কাকা থাকেন রেঙ্গুনে। তিনিও সেখানে বর্মী বিয়ে করে থিতু হয়ে বসেছেন। এ-বাড়িতে ইতুরা কাকাতো, জ্যাঠাতো ভাইবোন মিলে ডজনখানেকের মতো। ক্লাস সিক্স-এ পড়া ইতুরই বয়সী এক গণ্ডা ভাই রয়েছে।

নিকুঞ্জ কুটিরের দশআনি শরিক ইংরেজ আমলেই কলকাতায় থাকতেন। তবে ছআনির মতো সুবিধের মক্কেল না পাওয়াতে তাঁর অংশটুকু বহুদিন খালি পড়েছিল। ইতুরা সেখানে লুকোচুরি খেলতো। বুড়ো পাহারাওয়ালা বনমালী ওদের কিছুই বলতো না। তবে গত একমাস ধরে ও-বাড়িতে ঘষামাজার কাজ শুরু হয়েছে। সেই থেকে ওদেরও সেদিকে যাওয়া বন্ধ। কারা নাকি কিনেছে ও বাড়ি।

রোববার সকালে ইতুদের বাড়ির বাসি কাপড় নিতে এসে গিরিবালা ধোপানি দিদাকে বললো, 'আইজকা একটু কম দিয়েন বড়মা। আইজ ম্যালা কাপড় ধোয়ন লাগবো।'

গিরিবালার কথা শুনে ভারি অবাক হলেন ইতুর দিদা। প্রতি রোববার কাপড় নিতে এসে সবসময় ও বলে, 'বড়বাড়ির কাপড় বেশি না ওইলে মাইনষে কি কয় বড়মা! আঠারো খানই দিলেন? কুড়ি পুরাইয়া দ্যান না গো বড় মা!' কাপড় যাই দেয়া হোক গিরিবালা সবসময় বেশি ধুতে চায়। নাকি তার পোষায় না।

ইতুর দিদা জানতে চাইলেন, 'আজ যে বড় কম নিতে চাইছিস গিরি! আর কোন রইসের কাপড় ধুচ্ছিস শুনি?'

দোক্তাওয়ালা বড় একখিলি পান মুখে দিয়ে বুড়ি গিরিবালা বললো, 'আপনেরা অখনও হোনেন নাই বড়মা? দশআনি বাড়িত নতুন ভাড়াইট্যা আইছে। ক্যামন মানুষ আইলো দ্যাখতে গেছিলাম কাইল রাইতে। পয়লা দিনই দশআনি গিন্নিমা পঞ্চাশখানা ধরায়া দিছে।'

'ওমা কখন এল, দেখি নি তো!' ইতুর মেজো জেঠিমা শুনে অবাক হলেন— 'কারা এসেছে গো গিরিবালা?'

দিদা গম্ভীর হয়ে মেজো জেঠিকে বললেন, 'আমার কথার মাঝখানে কথা বলো কেন? আফসারউদ্দিনের ওঠার সময় হয়ে গেছে। যাও, ওর চা দিয়ে এসো।'

মেজো জেঠিমা জিভ কামড়ে সরে গেলেন সামনে থেকে। দিদা বললেন, 'ওদের কর্তা কী করে শুনেছিস?'

গিরিবালা ঢক করে পানের পিক গিলে বললো, 'তা কইবার পারুম না। তয় গিন্নিমা যে কী সোন্দর দেখতে! এত বয়স হইছে— মুখখানা দুগ্গা পিতিমার মতোন। বাড়ির বউ-ঝিরাও পরির মতোন। পোলারাও কম সোন্দর না বড়মা।'

দিদার ভারি দুঃখ এ-বাড়িতে তাঁর মতো দুধে আলতায় গায়ের রঙ আর কারো নয়। মেয়েগুলো বেশিরভাগই শ্যামলা, বড় নাতনীটি যা কিছুটা ফর্শা। আর ছেলেগুলোকে কালোই বলতে হয়। দশআনির নতুন ভাড়াটেদের মেয়েরা পরির মতো শুনে তিনি খুশি হলেন না। তাঁর সাবালক নাতি রয়েছে গোটা চারেক, দুই নাতনীর বিয়ের বয়স হয়েছে। বড়টির জন্য ঘটকও লাগিয়েছেন। অপ্রসন্ন গলায় দিদা গিরিবালাকে বললেন, 'ও-বাড়ির কাপড় ধুয়ে যদি তোর সময় না থাকে তাহলে থাক, আমি হরিমতিকে খবর দিই। আজকাল তোর ধোয়াও ঠিক হয় না।'

গিরিবালা বললো, 'এইটা কেমুন কতা বড়মা! আপনেগো কাপড় ধুইবার পারুম না— এ-কতা কইলে আমার মুখে বিলাই মুতবো না! আপনে আমার কম উপ্কার করছেন বড়মা! দরকার ওইলে ওই বাড়ির কাপড় আর ধুমু না।'

গিরিবালা চলে যাওয়ার মিনিট কুড়ি পরে ছআনি শরিকের চিলেকোঠার ঘরে দেখা গেল এ-বাড়ির ইতু, মিতু, রন্টু, ঝন্টু আর ছোটনকে। পাড়ার সবাই ওদেরকে পঞ্চপাণ্ডব বলে। দিদার কাছে মহাভারতের গল্প শুনে নিজেরা সাইজমতো নাম মিলিয়ে নিয়েছে। সবার বড় মিটমিটে পাজি ছোটন হল যুধিষ্ঠির। গায়ে-গতরে বড়সড় মিতু হল ভীম, সবচেয়ে বুদ্ধিমান ইতু বলেছে সে নাকি অর্জুন আর সেজকাকার জমজ পাজি দুটো হল নকল সহদেব।

গিরিবালার অস্পষ্ট খবরের জন্য বসে থাকে নি পঞ্চ পাণ।ডব। মিতুকে নিয়ে নিজেদের কাঁচাপাকা কুল পাড়ার সুবাদে দশআনি শরিক থেকে সকালেই ঘুরে এসেছে ছোটন। ছআনির ঝাঁকড়া নারকেলি কুলগাছের অর্ধেক পড়েছে দশআনির বাগানে। পাড়তে হলে ওদিক থেকেই সুবিধে। পাঁচিলের উপর দাঁড়িয়ে মিতু তুমুল জোরে ডাল ঝাঁকাচ্ছিলো আর ছোটন টপাটপ করে ঝরেপড়া কুল কুড়োচ্ছিলো, তখনই দেখলো ওদের কাছাকাছি বয়সী ফ্রকপরা দুটি মেয়ে সদ্য চুনকাম করা দশআনি বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে। বয়সে অল্প ছোট মেয়েটা দুপাশে দুটো বেণী ঝোলানো, কাছে এসে রিনরিনে গলায় বললো, 'তোমরা আমাদের গাছের বরই পাড়ছ কেন? এক্ষুণি চলে যাও এখান থেকে।'

সাদা রিবন দিয়ে পনিটেল চুল বাঁধা মেয়েটা ওকে চাপা গলায় বলল, 'এই সিমকি কী অসভ্যতা হচ্ছে, ওটা আমাদের গাছ নাকি! ওদের গাছেরটা ওরা পাড়ছে, তুই চেঁচাচ্ছিস কেন?'

সিমকি অবাক হয়ে বলল, 'বারে ছোটপা, তুই-ই তো বললি ওদের সঙ্গে ভাব জমানোর জন্য এভাবে ধমক দিতে! এখন যে বড় অসভ্যতা বলছিস?'

সিমকি এসে যেভাবে ওকে ধমক দিয়ে কথা বলছিলো, ছোটন ভেবেছিলো শক্ত একটা জবাব দেবে। ওর পরের কথা শুনে হাসি চেপে আবার কুল কুড়োতে লাগলো। এক ফাঁকে আড়চোখে দেখলো সিমকির কথা শুনে পনিটেল-এর ফর্শা

মুখ লাল হয়ে গেছে। আরো চাপা গলায় ও সিমকিকে বললো, 'তুই একটা হদ্দ বোকা মেয়ে সিমকি, ওদের চলে যেতে বলছিস কেন?'

সিমকি বুঝে উঠতে পারলো না ও কী বলবে। অবাক হয়ে নিজের বোনকে দেখলো কিছুক্ষণ। তারপর কাছে এসে ছোটনকে বললো, 'এই তোমরা আমাদের সঙ্গে ভাব করবে?'

ছোটন হাসি চেপে গম্ভীর হওয়ার ভান করে বলল, 'তোমরা কারা?'

'বারে, দেখ নি বুঝি, আমরা যে কাল সন্ধ্যায় এলাম! এটা তো আমাদের বাড়ি। তোমার নাম কী?'

'আমাদের দুটো নাম আছে, কোন্‌টা বলবো?'

'তোমার যেটা খুশি বলো।'

'আমার নাম যুধিষ্ঠির আর ওর নাম ভীম।'

নাম শুনে দুই বোন হেসে গড়িয়ে পড়লো। হাসতে হাসতে পনিটেল বললো, 'আমাদের আগের বাড়িতে যে গোয়ালাটা দুধ দিতো ওর নাম ছিলো যুধিষ্ঠির আর ভীম আমাদের জুতো মেরামত করতো।'

মিতু রেগে গিয়ে বললো, 'মহাভারত পড়লে এমন অসভ্য কথা বলতে না। লোকে আমাদের পঞ্চপাণ্ডব বলে, সেজন্যে ওসব নাম বলা। আমার ডাক নাম মিতু, ওর নাম ছোটন।

সিমকি বললো, 'আমার নাম—'

'জানি, সিমকি।' বাধা দিয়ে মিতু বললো, 'তোমার ছোটপার নাম কী নিমকি?'

সিমকি হেসে বললো, 'না, ওর নাম রিমকি। আমার একটা ছোট ভাই আছে ওর নাম নিমকি!'

'খেতে কেমন?' গম্ভীর হয়ে প্রশ্ন করলো ছোটন।

'কাছে যেও।' হাসতে হাসতে রিমকি বললো, 'কামড়ে দাঁত বসিয়ে দেবে। নতুন চারটে দাঁত গজিয়েছে। যা পায় তাই কামড়ায়।'

মিতু বললো, 'ভাব করতে হলে আমাদের আরো তিনজন আছে। সবার সঙ্গে করতে হবে।'

'ঠিক আছে।' সিমকি বললো, 'আমাদেরও দুটো মামাতো ভাই আছে—রাঙা আর পিটু। তোমরা দল ভারি করতে চাইলে আমরাও করতে পারি। জানো না তো রাঙার গায়ে কী জোর! রোজ দুবেলা জিমনাসিয়ামে গিয়ে ব্যায়াম করে।'

মিতু কাষ্ঠ হেসে বললো, 'দেখা যাবে, পাঞ্জায় কে জেতে!'

ছোটন জানতে চাইলো, 'এখানে আসার আগে তোমরা কোথায় ছিলে?'

রিমকি বললো, নবরায় লেন-এ। এর চেয়ে বড় বাড়ি ছিল ওটা।'

সিমকি বললো, 'ওটা ভাড়া বাড়ি ছিলো। এটা আমাদের নিজেদের।'

রিমকি বললো ওরা কোন্ স্কুলে পড়ে, ছুটির দিনে কত মজা করে— এইসব। একটু পরে বাড়ির ভেতর থেকে ইতুদের কাজের ঝি দুখির মার মতো একজন কার মা এসে রিমকি-সিমকিকে ডেকে নিয়ে গেল।

ছোটন আর মিতু উত্তেজিত হয়ে ঘরে ফিরে সবাইকে কুল-পাড়া অভিযানের ঘটনা জানালো। ইতু সব শুনে গম্ভীর হয়ে বললো, 'গায়ে পড়ে ভাব জমাতে চাইছে— ভেবে দেখতে হবে অন্য কোনো মতলব আছে কিনা।'

রন্টু বললো, 'তুই সব কিছুতেই সন্দ করিস। দুটো মেয়ে ভাব জমাতে চেয়েছে, এতে মতলবের কী হল?'

ঝন্টু বললো, 'মেয়ে দুটো দেখতে কেমন রে!'

মিতু উচ্ছ্বসিত হয়ে বললো, 'একেবারে পরির মতো!'

'আহ্ আস্তে বল্!' চাপা গলায় ধমক দিল ছোটন। 'সিঁড়িতে শব্দ শুনছিস না? নির্ঘাত ছোড়দি আসছে।'

ক্লাস টেন-এ উঠেই ছোড়দি নিজেকে বড়দি-মেজদির মতো বড় ভাবতে শুরু করেছে। সুযোগ পেলেই ছোট ভাইগুলোর ওপর পণ্ডিতি ফলায়। ছোটন ঠিকই ভেবেছিলো। ছোড়দি এসে বললো, 'স্কুল ছুটি বলে লেখাপড়া সব শিকেয় তুলে এখানে বসে আড্ডা মারা হচ্ছে বুঝি!'

ছোটন বিরক্ত হয়ে বললো, 'তোর সামনে পরীক্ষা বলে এখনই আবোল-তাবোল বকা শুরু করেছিস! ফাইনাল পরীক্ষা হয়ে গেছে জানিস না বুঝি! নতুন ক্লাসে না-ওঠা পর্যন্ত কিসের পড়া শুনি?'

'গাছ থেকে পড়া হতে পারে।' বলল মিতু।

'না আকাশ থেকে পড়া। ছোড়দির কথা শুনে আমি আকাশ থেকে পড়েছি।' ফোড়ন কাটলো ইতু।

'রেজাল্ট বেরোবার পর পিঠে যখন বড় জেঠুর বেতের বাড়ি পড়বে তখন বুঝবে পড়া কাকে বলে। পাকামো না করে নিচে যাও। দিদা ছোটনকে বাজার করতে ডেকেছেন।'

বাজার করতে ছোটনের আপত্তি নেই। দুআনা চারআনা যা বাঁচে সেটা ওর। তবে চারআনার বেশি বাঁচলে দিদা পুরোটাই নিয়ে নেন। সেজন্যে যা-ই বাজার করুক ছোটন হুঁশিয়ার হয়ে গেছে। এখন ও চারআনার বেশি বাঁচায় না।

দিদা ক্লাস নাইনের ছোটনের হাতে বাজারের ফর্দ ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'চার আনা বাঁচাবার জন্য সেদিনের মতো আবার পচা বেগুন আনিস না!'

ছোড়দি ফোড়ন কাটলো, 'চারআনা না আটআনা বাঁচায় তুমি কি বাজারে গিয়ে দেখেছো দিদা!'

'বেআক্কেলে কথা বলবে না হোসেনেআরা। আমি কোন্ আহ্লাদে বাজারে গিয়ে দেখতে যাবো?'

বড়দের সবাইকে দিদা পোষাকি নামে ডাকেন। যখন থেকে তিনি কাউকে পোষাকি নামে ডাকা শুরু করবেন, তখন থেকে বুঝতে হবে তারা বড় হয়ে গেছে, কথা বলতে হবে হিসেব করে। অল্প ক'দিন ধরে ছোড়দিকে দিদা পোষাকি নামে ডাকা আরম্ভ করেছেন।

বাজারে যাওয়ার সময় ছোটন মিতুকে সঙ্গে নিয়ে যায় ব্যাগ বয়ে আনার জন্য। এর জন্য ওকে দু'পয়সার পেয়ারা নয়তো অন্যকিছু কিনে দিতে হয়। ছোটনরা বাজারে যাওয়ার পর ঝন্টু ইতুকে বললো, 'যাবি নাকি নারকেলি পাড়তে?'

ইতু ভুরু কুঁচকে বললো, 'ও-বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে ভাব জমানোর জন্য বুঝি তর সইছে না!'

'তোর সবকিছুতে বাড়াবাড়ি!' এই বলে নিরীহ রন্টুকে সঙ্গে নিয়ে ঝন্টু দশআনি বাড়িতে গেল কুল পাড়তে।

ইতু রহস্যলহরী সিরিজের নতুন বইটা নিয়ে চিলেকোঠার ঘরে পড়তে বসলো। ওদের ক্লাসের বিজনের কাছ থেকে এনেছে, অর্ধেকের বেশি পড়াও হয়ে গেছে; পরশু ফেরত দিতে হবে। কয়েক পাতা পড়ে ওর মনে হল ঝন্টুর সঙ্গে যাওয়া উচিত ছিলো। আরো দু'পাতা পর নায়ক যখন পাহাড়ের চূড়ায় ভিলেনের সঙ্গে লড়তে গিয়ে হঠাৎ ছিটকে পড়েছে কিনারে, কোনোরকমে একহাত দিয়ে পাথরের কার্নিশ ধরে ঝুলছে ছ'হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের চূড়া থেকে, তখন ইতুর মনে হলো ঝন্টুরা কী করছে দেখা দরকার। বই রেখে সে উঠে পড়লো।

ছাদের ওপর থেকে দশআনি বাড়ির বাগান পুরোটা দেখা যায়। ইতু তাকিয়ে দেখলো কুলগাছের পাশে ঘরের ওপর বসে মেয়ে দুটোর সঙ্গে জমিয়ে গল্প করছে ঝন্টুরা। হাঁদারাম রন্টুটা অসভ্যের মতো হাসছেও। রাগে ইতুর গা জ্বলে গেলো।

দশআনির ওপর দিদার রাগ

ছোটন আর মিতু বাজারে যাওয়ার জন্য সদর দরজা দিয়ে বেরোতেই সামনে পড়ল দশআনির রিমকিদের বড়ভাই। ছোটনদের মেজদার বয়সী হবে, চব্বিশ-পঁচিশের কাছাকাছি, দেখতে মেজদার চেয়ে অনেক সুন্দর, দেব সাহিত্য

কুটিরের বইয়ের ছবিতে যেমন দেখা যায়। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা থাকাতে একটু বেশি ভারিক্কি মনে হচ্ছিলো, পায়জামা-পাঞ্জাবিপরা, হাতে বাজারের থলে।

ছোটনদের দেখে অমায়িক হেসে মার্জিত গলায় যুবকটি বললো, 'তোমরা বুঝি এ-বাড়িতে থাকো! আমরা কাল এসেছি তোমাদের যমজ বাড়িতে।'

গম্ভীর হয়ে ছোটন বললো, 'জানি। সকালে রিমকিদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। আপনি তখন বারান্দায় বসে চা খাচ্ছিলেন।'

'তাই বুঝি! কই তখন তো আমার সঙ্গে পরিচয় করতে এলে না?'

মিতু ফিক করে হেসে বললো, 'পাড়ায় যারা নতুন আসে তারাই আগে এসে পুরোনোদের সঙ্গে পরিচয় করে!'

বাব্বা, এতোও জানো! ঠিক আছে, পরিচয় দিচ্ছি। আমার নাম সাইফ হায়দার চৌধুরী। দুবছর ধরে মেডিকেল কলেজে পড়াই। তিন ভাই চার বোনের ভেতর আমি সবার বড়!' এই বলে রিমকির ভাই ছোটনদের দিকে হাত বাড়ালো।

ছোটনরা ওর সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিজেদের পরিচয় দিলো। বললো, 'আপনাকে আমরা সাইফ ভাই বলবো।'

সাইফ মৃদু হেসে বললো, 'তোমাদের খুশি। বাজারে যাচ্ছ নিশ্চয়? চলো একসঙ্গে যাই।'

ছোটন বললো, 'আপনি কি সত্যি সত্যি ঢাকা মেডিকেল কলেজে পড়ান?'

'হ্যাঁ।'

'আমাদের বড়দি মেডিকেলে পড়ে।'

'তাই নাকি! কোন্ ইয়ারে?'

'ফাইনাল পরীক্ষা হয়ে গেছে। রেজাল্ট এখনো দেয় নি।'

'কী নাম বলতো?'

'জাহানারা তরফদার।'

'জাহানারা তোমাদের বড়দি? খুব ভালো করেই চিনি। ভারি লক্ষ্মী মেয়ে।'

সাইফের কথা শুনে ছোটন আর মিতু একে অপরের দিকে তাকালো। বাড়িতে বড়দির ধমকের ভয়ে ওরা পালিয়ে বাঁচে না, আর তাঁর টিচার বলছে লক্ষ্মী মেয়ে!

কথাটা বলেই ফেললো মিতু— 'বড়দি কিন্তু খুব রাগী।'

'তাই নাকি!' সাইফ হেসে বললো, 'জাহানারাকে কিন্তু কখনো আমার রাগী মনে হয় নি। লেখাপড়ার ব্যাপারে ও খুব সিরিয়াস।'

বড়দি রোজ ছ-সাত ঘণ্টা পড়ে। লেখাপড়ার ব্যাপারে সিরিয়াস— এটাও মিথ্যে নয়, তবে লক্ষ্মী মেয়ে কথাটা ওকে মানায় না।

সাইফ ওদের বাড়ির কথা আরো জানতে চাইলো। কে কী করে, আগে কোথায় ছিলো, বড় হয়ে ওরা কে কী হবে এসব মামুলি কথা। সাইফের সঙ্গে

বাজার করতে গিয়ে ছোটনদের ভালো-ভালো জিনিস কিনতে হলো। চারআনা বাঁচাবার কথা আর মনে থাকলো না। বাজারে চমৎকার ডাঁসা পেয়ারা উঠেছিলো। মিতু কেনার কথা বলতে ভুলে গেলো। সাইফের সঙ্গে কথা বলে ওরা দুজন অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে ওর মহাভক্ত হয়ে গেলো।

বাড়ি ফেরার পর বাজার দেখে দিদা ভারি খুশি। বললেন, 'বাজারে আজ এত ভালো তরকারি উঠেছে কেন রে ছোঁড়ারা? নিশ্চয় কোনো রহস্য আছে?'

মিতু বলল, 'আজ যে সাইফ ভাই আমাদের সঙ্গে বাজার করেছেন!'

'সাইফ ভাই আবার কে?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইলেন দিদা।

'দশআনিতে কাল যারা এসেছে। জানো দিদা, সাইফ ভাই বড়দিকে ভালো করে চেনে! বড়দিদের কলেজে পড়ায়।'

দিদা ধমক দিয়ে বললেন, 'কলেজে পড়ায় বলতে হয় না, পড়ান বলবে। আদব-কায়দা সব কি শিকেয় উঠেছে?'

ভালো বাজার করার পরও মিতুর জন্য দিদার ধমক খেয়ে ছোটনের মন খারাপ হয়ে গেলো। দিদারও রাগের কারণ ছিলো। সকালে গিরিবালা ধোপানি ও-বাড়ির লোকদের সম্পর্কে যে-সব কথা বলেছে, শোনার পর থেকে দিদার মন ভালো নয়।

ছোটন আর মিতু ওপরে ওদের চিলেকোঠার ঘরে এসে দেখে ইতু একা খাটে শুয়ে আছে। পাশে অযত্নে খোলা পড়ে আছে রহস্যলহরী সিরিজের বই। ছোটন জানতে চাইলো, 'রন্টু ঝন্টু কোথায় গেছে?'

ইতু মুখ ভার করে বললো, 'তোমাদের নতুন পাওয়া বান্ধবীদের সঙ্গে বসে গল্প করছে।'

'ওরা কি ডেকেছিলো?'

'ডাকলে তো কথা ছিলো না। বেহায়ার মতো নিজেরা গেছে কথা বলতে! মেয়ে দুটো ভাববে আমরা কী হ্যাংলা— গায়ে পড়ে আলাপ করতে চাচ্ছি।'

'তা কেন ভাববে?' মিতু বুঝিয়ে বললো, 'ওরা কখনো আমাদের হ্যাংলা ভাববে না। বন্ধুত্বের জন্য ওরা আমাদের সব শর্ত মেনে নিয়েছে। তুই যাস নি কেন?'

'গায়ে পড়ে কারো সঙ্গে কথা বলতে আমার ভালো লাগে না।'

'জানিস, বাজারে যাওয়ার পথে এক কাণ্ড হয়েছে।' এই বলে সাইফের সঙ্গে পরিচয়ের কথা ইতুকে সব জানালো ছোটন। বয়সে একবছরের ছোট হলেও ইতুর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় ও বুঝি স্কুল পেরিয়ে গেছে।

সাইফের কথা শুনে ইতু উঠে বসলো। বললো, 'বড়দিকে বলবি না?'

মিতু বললো, 'ধমক খাবে কে, তুই?'

'আমার মনে হয় না বড়দি ধমক দেবে।' বিজ্ঞের মতো বলল ইতু।

ছোটন বলল, 'চল্ তাহলে। আমার তো মনে হয় বড়দির ধমক থেকে বাঁচার একটা ব্যবস্থা আমরা করতে যাচ্ছি। বড়দি উল্টোপাল্টা কিছু বললে সাইফ ভাইকে বলে দেব না!'

ইতুদের বড়দি ওর ঘরে বসে পেল্লাই আকারের গ্রে'র এ্যানাটমির বই খুলে কী যেন দেখছিলো। ছোটন নিরীহ গলায় বললো, 'বড়দি তুমি সাইফ ভাইকে চেনো?'

ঘাড় বাঁকিয়ে বড়দি ওর দিকে তাকালো। ভুরু কুঁচকে রাগী গলায় বললো, 'সাইফ ভাই কে?'

'ডাঃ সাইফ হায়দার চৌধুরী। তোমাদের কলেজে নাকি পড়ান?'

বড়দির কোঁচকানো ভুরু স্বাভাবিক হলো। গলা থেকে সমস্ত রাগ কর্পূরের মতো উবে গেলো— 'চিনবো না কেন? সপ্তাহে আমাদের দুটো ক্লাস নিতেন তিনি। তোরা জানিস কীভাবে?'

পরিচয়ের বৃত্তান্ত শুনে বড়দির চেহারা কোমল হয়ে এলো। বলল, 'তিনি সত্যি সত্যি বলেছেন আমি লক্ষ্মী মেয়ে?'

'সত্যি বলছি বড়দি। তোমার অনেক প্রশংসা করেছেন।'

'আর কী বলেছে?' বড়দির কান লাল হলো।

'বলেছে, পড়াশোনার ব্যাপারে তুমি নাকি খুব সিরিয়াস।'

মৃদু হেসে বড়দি বললো, 'তিনি নিজেও লেখাপড়ার ব্যাপারে খুব সিরিয়াস।'

মিতু বললো, 'সাইফ ভাইর ছোটবোন দুটোও খুব ভালো। আজ সকালে নিজে থেকে ওরা আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চেয়েছে।'

'ভালোই তো।' নরম হেসে বড়দি বলল, 'সাইফ ভাইর বোন যখন নিশ্চয় খুব সুন্দর দেখতে!'

'একেবারে পরির মতো।' উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো মিতু।

বড়দির হাবভাব দেখে ইতু খুব অবাক হলো। অনেক চেষ্টা করেও ও মনে করতে পারলো না, বড়দি কারো সঙ্গে হেসে কথা বলেছে।

বিকেলে ওরা রোয়াকে বসে এ নিয়ে অনেকক্ষণ কথা বললো। সবশেষে ইতু উপসংহার টানলো, 'এ কথা স্বীকার করতেই হবে, সাইফ ভাইর নামের একটা আলাদা জাদু আছে।'

ছোটন বলল, 'জীবনেও আমি বড়দিকে হাসতে দেখি নি।'

ওদের ভেতর বুদ্ধিশুদ্ধি একটু কম হলো রন্টুর। বলল, 'বড়দির সঙ্গে সাইফ ভাইর বিয়ে হলে দারুণ মানাবে।'

ইতু ধমক দিয়ে বললো, 'অসভ্যের মতো কথা বলিস না রন্টু। দিদার কানে গেলে সবার পিঠের চামড়া তুলবেন।'

মুখ কালো করে রন্টু বললো, 'আমাদের নিজেদের সব কথা দিদাকে বলতে

হবে কেন? আমি— '

রন্টুর কথা শেষ হলো না। সিং দরজার দিকে মুখ করে বসেছিলো মিতু। বললো, 'আরে, রিমকিরা আসছে যে!'

সবাই ঘুরে তাকালো। রিমকি-সিমকির সঙ্গে দিদার বয়সী এক মহিলা। এত বয়স হয়েছে তবু কী সুন্দর দেখতে! রিমকি এগিয়ে এসে বললো, 'আমাদের নানি তোমাদের দিদার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছেন।'

সবার পেছনে ছিল রিমকিদের কাজের বুয়া বেদানার মা। হাতে মিষ্টির দুটো হাঁড়ি। ইতুরা উঠে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে বললো, 'স্লামালেকুম!'

রিমকির নানি মৃদু হেসে মাথা নাড়লেন। বেদানার মা একগাল হেসে বললো, 'ওয়ালাইকুম সালাম। কী লক্ষ্মী সব পোলাপাইন। তোমাগো দাদিআম্মা কই গো?'

ওরা রিমকিদের ভেতরে নিয়ে গেলো। যেতে যেতে রিমকি ইতুকে বললো, 'তুমি বুঝি অর্জুন?'

ইতু গম্ভীর হয়ে বলল, 'আমার নাম ইখতিয়ারউদ্দিন খান তরফদার।'

'জানি।' মুখ টিপে হেসে রিমকি বললো, 'সারাক্ষণ তুমি বই নিয়ে পড়ে থাকো, আর ক্লাসে সবসময় ফার্স্ট হও। তোমার সব কথা আমি শুনেছি।'

রিমকির কথা শুনে ইতুর মনটা নরম হলো। যতটা ভেবেছিলো এরা ততটা খারাপ নয়। খারাপ কেন— ভালোই বলতে হবে। এত মিষ্টি নিয়ে পাড়ার কেউ কখনো ওদের বাড়িতে দেখা করতে আসে নি। ইতুর ফার্স্ট হওয়ার খবরও জেনে গেছে। বললো, 'ফার্স্ট হওয়া এমন কী কঠিন কাজ!'

'তোমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কে ফার্স্ট হতে যাবে বলো। শোনার পর থেকে ভাবছি তোমার ইংরেজি নোটের খাতাটা দেখবো। ইংরেজিতে আমার নম্বর কখনো পঞ্চাশের ওপর ওঠে না।'

'ঠিক আছে, কাল এসো— দেখাব।'

দিদা ওঁর ঘরে ছিলেন। রিমকির নানি অমায়িক হেসে বললেন, 'আপনাদের নতুন প্রতিবেশী আমরা। পরিচয় করতে এলাম।'

রিমকি, সিমকি এসে দিদাকে সালাম করলো। মিষ্টির হাড়ি দুটো টেবিলের ওপর রেখে বেদানার মাও রিমকিদের মতো দিদার পা ধরে সালাম করলো। দিদা কাষ্ঠ হেসে একবার বললেন, 'থাক বাছা থাক।' আরেকবার বললেন, 'এত মিষ্টি আনবার কি দরকার ছিলো?'

নানি বললেন, 'মিষ্টি মুখে দিয়ে পরিচয় করলে সারা বছর মিষ্টি কথা শুনবো।'

নানিকে দিদার ঘরে রেখে ইতুরা রিমকিদের নিয়ে চিলেকোঠায় এল। বাড়ি ভাগের সময় উঁচু পাঁচিল দিয়ে ছাদও দু'ভাগ করা হয়েছে। ছাদে ওঠার সিঁড়ি আর চিলেকোঠা ইতুদের ভাগে পড়েছে। এত বড় ছাদ দেখে রিমকিরা বেজায় খুশি।

সিমকি তো ছাদে উঠেই প্রজাপতির মতো ডানায় ভর করে এক পাক উড়ে এলো। রিমকি বললো, 'আহা ছাদটা যদি আমাদের হত।'

ইতু বলল, 'রোজ এসে খেললেই হয়।'

রিমকি বললো, 'ছোটনদের সঙ্গে বড়দার আলাপ হয়েছে বুঝি! তোমাদের বড়দিকে দেখতে হবে একবার।'

ইতু বললো, 'বড়দি খুব রাগী মেয়ে।'

রিমকি মুখ টিপে হাসলো— 'আমাদের দেখলে তিনি মোটেই রাগবেন না।'

পৌষ মাস না আসতেই বেশ শীত পড়ে গেছে। ডিসেম্বর মাস পুরোটাই স্কুল বন্ধ। ছোটন রিমকিকে বললো, 'শীতে কি তোমরা পিকনিক করো?'

'নবরায় লেন-এর বাড়ির ভেতরে করতাম।' জবাব দিলো রিমকি।

'বাড়ির ভেতরে বুঝি পিকনিক করে?' মুখ টিপে হাসলো মিতু। 'শহরের বাইরে না গেলে কিসের পিকনিক?'

'আমাদের ওই বাড়ির পেছনে বড় একটা আমবাগান আছে। ওখানে নিজেরা রান্নাবাড়ি করতাম।'

'আমরা প্রত্যেক বছর পিকনিকে যাই।' ডাঁট দেখিয়ে বললো মিতু— 'তেজগাঁয়ে আমাদের একটা বাগানবাড়ি আছে। ঘোড়ার গাড়িতে যেতে দু'ঘণ্টা লাগে।'

'এ বছর যাও নি?'

'যাবো, এত তাড়া কিসের?' ছোটন বললো, 'শীতটা আরো পড়ুক।'

সিমকি বললো, 'আমাদের সঙ্গে নেবে? পিকনিকে আমরাও চাঁদা দেব।'

সিমকির কথা শুনে রিমকি আর ছোটনরা একটু বিব্রত বোধ করলো। রিমকি ভাবলো বাড়িতে কারো সঙ্গে কথা না বলে হুট করে এভাবে যেতে চাওয়া ঠিক হচ্ছে না। ছোটনরা ভাবলো, দিদাকে না জানিয়ে রাজি হলে শেষে যদি দিদা বেঁকে বসেন। আমতা আমতা করে ইতু বললো, 'একসঙ্গে পিকনিক করলে ভালোই হবে। তবে সবকিছু ঠিক করেন দিদা আর বড় জেঠু। ওঁদের আগে বলতে হবে।'

রিমকি কাষ্ঠ হেসে বললো, 'সিমকি এমনি বলেছে। নানি আমাদের যেতে দিলে তো!'

দুখির মা এসে বললো, 'ম্যামানগো দাদিআম্মায় মিষ্টি খাওনের লাইগা বোলায়! চলেন গো সোন্দর মাইনষের সোন্দর মাইয়ারা।'

রিমকি-সিমকি দুখির মার সঙ্গে চলে গেলো। রন্টু বললো, 'সবাই মিলে একসঙ্গে পিকনিকে গেলে কী মজাই না হবে!'

ঝন্টু বললো, 'মনে হয় না দিদা রাজি হবেন।'

ছোটন বললো, 'দিদাকে রাজি করানোর ব্যবস্থা করতে হবে।'

কীভাবে দিদাকে রাজি করানো যেতে পারে এ-নিয়ে ওরা অনেক

জল্পনা-কল্পনা করলো। শেষে ঠিক হলো সাইফ ভাইকে দিয়ে কথাটা প্রথম বড়দিকে বলতে হবে। বড়দি সেটা দিদার কাছে পাড়বে। বড়দের ভেতর লেখাপড়ায় ভালো বলে বড়দিকে দিদা একটু বেশি পছন্দ করেন। কিন্তু কখনো সেটা কাউকে বুঝতে দেন না। তবে ছোটরা অনেক কিছুই লক্ষ করে, যা বড়দের চোখে পড়ে না।

একটু পরে ছুটতে ছুটতে রিমকি-সিমকি এসে বললো, 'আমরা এখন যাচ্ছি। কাল সকালে বাগানে এসো।'

রিমকিরা চলে যাওয়ার পর ছোটনরাও নিচে নামলো। শুধু ইতু ওর শেষ না-করা বইটা নিয়ে বসলো।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় নামলে প্রথমে পড়ে ঢাকা-বারান্দা। বারান্দার পাশে আগে বসার ঘর, তার পর দিদার আর অন্যসব ঘর। ছোটনরা ভেবেছিলো দিদার ঘরের পাশ দিয়ে চুপিচুপি বেরিয়ে যাবে। সন্ধে হতে চলেছে, এ-সময় বাইরে যাওয়া বারণ। অথচ পিকনিকের কথাটা সাইফ ভাইকে না বললেই নয়। ছোটনদের স্কুল বন্ধ থাকলেও মেডিকেল কলেজে ক্লাস হচ্ছিলো। সাইফ ভাই কালই পিকনিকের কথাটা বড়দিকে বলতে পারে। বড়দিদের ক্লাস না থাকলেও ও রোজ কলেজে যায়। নাকি যে-কোনো দিন ফল বেরোবো।

দিদা কার সঙ্গে যেন কথা বলছিলেন। ওঁর একটা কথা ছোটনদের কানে যেতেই ওরা থমকে দাঁড়ালো। দিদা বলছিলেন, 'ওসব হচ্ছে বড়লোকি ঢং। নাকি কুমিল্লা থেকে রসমালাই এনেছেন! কে খাবে ওসব! দিও ওই ছোঁড়াগুলোকে, আহ্লাদ করে দোতালায় নিয়ে এসেছে। নিচের বসার ঘরে বসালেই হত!'

বড় ফুপি বললেন, 'আমার তো ভদ্রমহিলাকে ভালোই মনে হলো। বেথুন থেকে বি এ পাশ করেছেন, এতটুকু অহংকার নেই।'

'পড়ার নেই তো কী হয়েছে! রূপের অহংকার তো ষোলআনাই আছে। শুনলে না, হাসতে হাসতে দিব্যি বললো, আমাদের বংশে কালো কেউ নেই!

'না থাকলেও কি আছে বলবে আম্মা? দেখলেনই তো নানি-নাতনি সবাই কী সুন্দর!'

'তোমার কি আর কোনোকালেই বুদ্ধিসুদ্ধি হবে না আকিকুননেসা? নেই তো নেই, সেটা বড় গলায় বলাটা মোটেই ভালো শোনায় না। তোমাকে আরো বলি বাছা, কিটকিটে ফর্শা হলেই যে মানুষ সুন্দর হয়— যারা এমন মনে করে, তাদের সবাই বোকার হদ্দ বলে। যাক, এসব নিয়ে আলোচনা না করে রান্নাঘরে গিয়ে তোমার ছোট চাচার জন্য কখানা রুটি বানিয়ে দাও গে। ওর তো আবার তোমার রুটি ছাড়া মুখে রোচে না।'

বড়ফুপি ঘর থেকে বেরোবার আগেই ছোটনরা ঝুলবারান্দায় চলে গেলো। রিমকির নানির ওপর ভীষণ রেগে আছেন দিদা— এ-কথাটা ভাবতেই ওদের

পিকনিকে যাওয়ার উৎসাহ থিতিয়ে গেলো। বড় ফুপির সঙ্গে ওঁর কথা থেকে এটুকু শুধু পরিষ্কার হয়েছে ও-বাড়ির সবাই ফর্শা বলে দিদার যত রাগ। কারণ এ-বাড়িতে দিদা ছাড়া আর কেউ ও-বাড়ির ছেলেমেয়েদের মতো ফর্শা নয়।

বড় ফুপির পেছন-পেছন দিদাও যে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন ছোটনরা টের পায় নি। বারান্দায় ওদের দেখে দিদার মনে হলো এগুলোকে এখন থেকে সাবধান করে দিতে হবে। কাছে গিয়ে শান্ত গলায় বললেন, 'শুনলাম আজ সকালে নাকি তোমরা দশআনি বাড়িতে গিয়েছিলে? মতলব কী শুনি!'

ছোটদের যখন দিদা 'তুমি' বলেন তখন বুঝতে হবে তিনি রেগে আছেন। বেশি রেগে গেলে 'আপনি' বলেন। দিদার কথা শুনে কাষ্ঠ হেসে ছোটন বললো, 'কুল পাড়তে গিয়েছিলাম।'

'কুল পাড়তে গিয়ে ও-বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে অত গল্প কিসের বাছা! এই বেলা সাবধান করে দিচ্ছি— যখন-তখন ও-বাড়ি যাওয়া চলবে না।'

'কেন দিদা?' বোকার মতো প্রশ্ন করলো সাদাসিধে রন্টু।

'তোমরা এখন বড় হচ্ছো!' শান্ত গলায় দিদা বললেন, 'আমি চাই না তোমরা এমন কিছু করো, যাতে এ-বাড়ির লোকদের কারো কাছে ছোট হতে হয়!'

ছোটন বললো, 'ওরা চাইলে তখন কথা না-বলাটাও তো অভদ্রতা হবে।'

'সেটা তোমরা জানো। আমি এসব পছন্দ করি না, শুধু এইটুকু মনে রাখলেই চলবে।' এই বলে দিদা নিচে নেমে গেলেন।

ভূপালী জেঠিমার আগমন

রিমকি সিমকিদের সঙ্গে মেশা যাবে না— দিদার এই ভয়ঙ্কর কথা শুনে ছোটনদের পৃথিবীটা মরুভূমি হয়ে গেলো। লুকিয়ে নিশ্চয় দেখা করা যায় কিন্তু দিদার সঙ্গে ওরা কেউ মিথ্যে কথা বলে না। ধরা পড়লে কী জবাব দেবে! পরদিন সকালে ছোটনরা চিলেকোঠার ঘরে বসে এ নিয়ে অনেক কথা বলেও দিদাকে নরম করার কোনো পথ খুঁজে পেলো না। পাওয়া সম্ভবও ছিলো না, দুদিন পর হঠাৎ করে যদি ভূপালী জেঠিমা ওদের বাড়িতে বেড়াতে না আসতেন।

ওদের এক জ্যাঠা সেই কোন্‌কালে বিএ পরীক্ষায় ফেল করে বাড়ি থেকে পালিয়ে ভূপালে গিয়ে কিসের যেন ব্যবসা করে বড়লোক হয়ে গিয়েছিলেন। বিয়েও করেছিলেন জাঁদরেল এক পীর বংশে। ছোটনদের বাবা-কাকারা গিয়েছিলেন সেই বিয়েতে। ফিরে এসে ভূপালী জেঠিমার রূপের আর গুণের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কলকাতায় থাকতে এই রূপসী বউটি ওদের বাড়িতে বার-দুই এসেছিলেন, ঢাকা আসার পর একবারও আসেন নি। ছোটরা শুধু ওঁর নামই শুনেছে, চোখে দেখে নি।

সকালে দিদার হাঁকডাক শুনে বাবা, কাকা, জ্যাঠারা যেভাবে ছুটোছুটি করছিলেন, ইতুরা বুঝে ফেলল গুরুত্বপূর্ণ কেউ বাড়িতে আসছেন। দিদাকে জিজ্ঞেস করতেই বললেন, 'তোদের ভূপালী জেঠিমা আসবে বিকেলের ফ্লাইটে। ভীষণ বড়লোক ওরা। ঘরবাড়ি নোংরা করবি না, ভাববে সহবৎ শিখিস নি।'

দোতালায় ঝুলবারান্দার পাশে সবচেয়ে সুন্দর ঘরটা নতুন করে সাজানো হয়েছে ভূপালী জেঠিমার জন্য। দাদুর বিয়ের সময়কার আঙ্গুরলতার নকশাকাটা জমকালো পালঙ্কে নতুন জাজিম আর চাদর বিছানো হয়েছে। জানালায় ধবধবে সাদা পর্দা ঝোলানো হয়েছে, যেগুলো মাড় দিয়ে শক্ত করে ধুয়ে ভাঁজে ভাঁজে কড়া ইস্তিরি করেছে গিরিবালা ধোপানির বড় ছেলে। বড় একটা কাঠের আলমারি এ-ঘরে আগে থাকতেই ছিলো। একটা আয়না-বসানো টেবিল আর খানতিনেক চেয়ার আনা হয়েছে। সবকিছু বার বার মুছে আয়নার মতো চকচকে করে ফেলেছে দুখির মা।

ছোটন বললো, 'ভূপালী জেঠিমা আসছেন, কী মজা, তাই না রে!'

ইতু ভুরু কুঁচকে বললো, 'জানি না, শুনি না—কোনোদিন চোখেও দেখি নি। মজা কিসের শুনি!'

'জেঠিমা যে কদিন থাকবেন দিদার হাবভাব দেখে মনে হয় ওঁকে নিয়েই ব্যস্ত থাকবেন। কে কোথায় যাচ্ছে সে-সব খবর রাখার সময় নিশ্চয় তাঁর হবে না।' বলতে গিয়ে ছোটনের গলায় আনন্দ উপচে পড়লো।

ইতু বললো, 'আমার তো মনে হচ্ছে বাবা-জ্যাঠাদের সঙ্গে দিদা আমাদেরও ফুট-ফরমাশ খাটিয়ে মারবেন। দিনের ভেতর পঞ্চাশবার বাজারে পাঠাবেন, নইলে পাঠাবেন কাউকে ডাকতে। ওসব বড়লোকদের মেজাজও বড়লোকি হয়!'

ঝন্টু ঝাঁঝাল গলায় বললো, 'তুই সবসময় খারাপটাই আগে দেখিস।'

ভূপালী জেঠিমাকে আনতে তেজগাঁ এয়ারপোর্ট গিয়েছিলেন বাবা, কাকা, জ্যাঠা সবাই। ছোটকার অফিসের একটা হুডখোলা জিপ ছিলো। বন্ধুর কাছ থেকে এনেছেন মস্ত এক ফোর্ডগাড়ি। জেঠিমাকে নিয়ে ঘরে ফিরতে সন্ধে গড়িয়ে গেলো।

ঝলমলে ঘারারা কুর্তা পরনে, এক গা হীরেমুক্তোপান্নার গয়না নিয়ে গাড়ি থেকে নামলেন ভূপালী জেঠিমা। সদর দরজার দিকে তাকিয়ে ফিক করে

হাসলেন। বিশাল শরীর নিয়ে হাঁসফাঁস করে এগিয়ে গেলেন দিদার দিকে। পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে বললেন, 'আপনি কেমুন আছেন চাচিজান!' কত্তো বরস্ পর মোলাকাত হল! বহুবিটিয়ারা সব ভালো আছো তো?'

ভূপালী জেঠিমার কথায় উর্দু টান— ছোটনরা শুনে খুব মজা পেলো। ধবধবে ফর্শা গায়ের রঙ, পানখাওয়া ঠোঁট দুটো টুকটুকে লাল, গোলগাল হাসিহাসি নিষ্পাপ মুখ, দুচোখে স্নেহ-ভালোবাসার অথৈ সমুদ্র।

দিদাকে সালাম করে উঠতেই তিনি ওঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন— 'আমার হিসেব আছে ভূপালী বউ। তোর সঙ্গে আঠার বছর পর দেখা হলো।'

আগে থেকে দিদা বলে দিয়েছেন— মা, কাকী, জেঠিরা সবাই দিদার ভূপালী বউ-এর পা-ছুঁয়ে সালাম করলেন। সিংদরজার বাইরে রাস্তার লোকজন উঁকি দিচ্ছিলো নতুন অতিথির সাজের বহর দেখে।

মা কাকিমারা একবাক্যে স্বীকার করলেন, বয়স যদিও ষাটের কাছে— ভূপালী বুবুকে মনে হয় না পঞ্চাশ পেরিয়েছেন। আর কী টকটকে গায়ের রঙ, যেন গা দিয়ে আলো ঠিকরে বেরুচ্ছে! দিদা ভাবলেন, পাশের বাড়ির ওদের একবার এনে দেখাতে হবে রূপ কাকে বলে।

ভূপালী জেঠিমার সঙ্গে এসেছে মস্ত বড় দুটো ট্রাঙ্ক। ঘরে গিয়ে যখন খুললেন তখন সবার চোখ ছানাবড়া। সবার কথা মনে করে জিনিসপত্র এনেছেন তিনি। দিদা থেকে শুরু করে সবার ছোট রন্টু ঝন্টু কেউ বাদ পড়লো না। লম্বা একটা ফর্দ বের করে সবার নাম মিলিয়ে উপহার বিলি করলেন। কাজের বুয়া দুখির মার জন্য কিছু আনার কথা নয়— ওকে দিলেন এককৌটো সুগন্ধি জর্দা। দুখির মা বলে দুবেলা ওর ভাত না খেলেও চলে কিন্তু পান ছাড়া ওর একদণ্ডও চলে না। ইতুদের বাড়িতে আসার এক ঘণ্টার ভেতর ভূপালী জেঠিমা সবার মন জয় করে ফেললেন।

পরদিন সন্ধেবেলা সবাইকে নিয়ে টানা-বারান্দায় বসে গল্প করছিলেন তিনি। দিদা ছাড়া সবাই আসর জমিয়ে বসেছিলো। দিদা সকাল থেকে সেই যে রান্নাঘরে ঢুকেছেন। বেরোবার নাম নেই। ইতুরা রান্নাঘরে শতরঞ্জি পেতে খায়। খাওয়ার সময় একবার খালি দিদার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো। তারপর ওরা সারা বিকেল কাটিয়ে এসেছে রিমকি-সিমকিদের বাড়িতে। মা, কাকিমারা সবাই ভূপালী জেঠিমাকে নিয়ে ব্যস্ত। ছোটন আর ঝন্টু ঠিকই বলেছিলো, ভূপালী জেঠিমাকে নিয়ে বাড়ির সবাই যে-ভাবে মেতে আছে, ওরা কী করছে কোথায় যাচ্ছে সেদিকে কারো খেয়ালই নেই।

বারান্দায় বসে জেঠিমা ভূপালের গল্প করছিলেন। সামনে রাখা পানদান থেকে বড় দু'খিলি পান মুখে ফেলে তিনি বললেন, 'আমার দাদাজানের ছোটভাই ছিলেন মস্ত কামেল পীর। আমরা তিনাকে ডাকতাম ছোড়দাদু বলে। তোমাদের

ইয়াদ আছে তো— আমার দাদাজানের আব্বাহুজুর বাঙ্গাল মুলুক থেকে ভূপাল গিয়েছিলেন। তিনিও বহুৎ বড়া বুজুর্গ আদমি ছিলেন। তিনার ওফাতের সময় ছোড়দাদুকে গদ্দিনশিন করে যান। বেশুমার মুরিদ ছিলো তিনাদের। দিন নাই, রাত নাই— কাহাঁ কাহাঁ মুল্লুক থেকে যে ওরা আসত তার হদিস কেউ জানত না। ছোড়দাদুর কাছে শুনেছি, ওদের বেশিরভাগ ছিলো জিন। তিনি ছাড়া দুসরা কেউ বনিআদম আর জিনের ভিতর ফারাক করতে পারতো না। জানো তো, আল্লাপাক জিনদের বানিয়েছেন আগুন দিয়ে।'

গল্প বলার সময় ভূপালী জেঠিমা জানেন কখন একটু বিরতি দিতে হয়। রুপোর পিকদানিতে পিচিক করে পানের পিক ফেলে তাঁর দিকে তাকিয়ে-থাকা নানা বয়সী আগ্রহী মুখগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে বললেন, 'ছোড়দাদু একদিন খেতে বসে দেখেন পাতের কাছে ক্ষিরসাপাতি আম। ডিসেম্বর মাসে আমাদের ভূপালে কেন মালদাতেও তোমরা আম পাবে না। দাদুর ছিলো চার বিবি। বড় বিবি দাদুকে ডেকে বললেন, বড়িবি আম এল কোত্থেকে? বড় বিবিদাদু বললেন, বাদ মাগরেব আপনার দুজন নয়া মুরিদ এসে একঝুড়ি আম দিয়ে গেছে। শুনে দাদু আর কিছু বললেন না। যা বোঝার বুঝে নিয়ে গম্ভীরমুখে খানা খতম করে তাঁর খাস কামরায় গিয়ে এবাদতে বসলেন। আমি যখন খুব ছোট ছিলাম তখন বড় বিবিদাদুকে দেখেছি। বুড়ো হয়েছিলেন জরুর, লেকিন দেখতে ছিলেন হুরপরিদের মতো। দুধের মধ্যে জাফরান দিলে যে-রকম দেখায় সে-রকম ছিলো তিনার গায়ের রঙ। নাক, চোখ, ঠোঁট— সব ছবির মতো আঁকা। আমরা ভারি ভয় পেতাম। ছোড়দাদুর মঝলি বিবি বলতেন, বড়িবির কাছে কখনো যাস নে। ও মানুষ নয়, জিনের পয়দায়েশ। কখন কী বেআদবি করবি তার কি কোনো ঠিক আছে!'

দোক্তা নেয়ার জন্য ভূপালী জেঠিমা যখন থামলেন, ইতুদের মেজো ফুপি প্রশ্ন করলেন, 'আপনার মেজো দাদিআম্মা বুঝি খুব হিংসুটে ছিলেন?'

'ছিলেন হয়তো।' একগাদা দোক্তা মুখে ফেলে কাষ্ঠ হেসে ভূপালী জেঠিমা বললেন, 'তবে কথাটা যে তিনি ঝুট বলেন নি সেটা আমরা হরবখত টের পেতাম।'

'বলো কি গো রাঙা বউ!' চোখ কপালে তুলে বড় ফুপি বললেন, 'তোমরা যে জিনের বংশ তাতো জানতাম না?'

এ-কথা শুনে যারা ভূপালী জেঠিমার ঘাড়ের ওপর ঝুঁকে গল্প শুনছিলো তারা একটু সরে বসলো। ভেতরের বারান্দায় আলো থাকলেও ঝুলবারান্দার ওপরটা ছিলো অন্ধকার। ভেতর থেকে আসা আবছা আলোতে মোটাসোটা, টকটকে ফর্শা চুমকি বসানো জমকালো শাড়ি আর এক গা গয়না-পরা জেঠিমাকে একটু অন্যরকমই লাগছিলো। তার ওপর মাঝেমাঝে গা কাঁপিয়ে বয়ে যাচ্ছিলো ঠাণ্ডা

হিমভেজা উত্তুরে বাতাস।

রাঙা জেঠুর চেয়ে ফুপির বয়স বেশি বলে জেঠিমা তাঁর কথায় রাগতে পারলেন না বটে, তবে মনঃক্ষুণ্ন হলেন ঠিকই। শুকনো গলায় বললেন, 'বড়বু যে কী বলেন। আমাদের খানদান হল ভূপালের সবচে রইস খানদান। এক ডাকে সবাই চেনে, ইজ্জত করে। বড় বিবিদাদুর তো কোনো ছেলেমেয়েই ছিলো না, বংশ আসবে কোত্থেকে! তাছাড়া ছোট বাচ্চাদের তিনি নফরত করতেন কাপড় নোংরা করে দেয় বলে। সারাক্ষণ ওজু আর ইবাদতের মধ্যে থাকতেন। তুলোর মতো নরম তুলতুলে ছিল হাত-পা। গলার আওয়াজ ছিলো ভারি মিঠা। বাড়ির মেয়েদের তিনিই কোরান শরিফ পড়াতেন। অসময়ের আনার, আম, আনারস, আপেল, মোসাম্বি এনে দিতেন। বলে দিয়েছিলেন এ নিয়ে কেউ যেন কোনও কথা না বলে।'

একটু থেমে খানিকটা চুন মুখে দিয়ে ভূপালী জেঠিমা বললেন, 'শুধু কি এই! মেয়েদের অসুখবিসুখ হলে কোনোদিন ডাক্তার হেকিম ডাকা হয় নি। বড় বিবিদাদুর পানিপড়ার চেয়ে ভালো দাওয়াই আর কিছু ছিলো না। ছেলেরা খেতো ছোড়দাদুর পড়া পানি।'

'শুধু পানি খেয়ে সব অসুখ সেরে যেত?'

ভিড়ের ভেতর কে প্রশ্ন করলো ভূপালী জেঠিমা ঠাহর করতে পারলেন না। শক্ত গলায় বললেন, 'শুধু পানি নয়, দোয়াদরুদ পড়া পানি। আর হায়াত মউত সব আল্লাপাকের হাতে। তিনি যাঁকে উঠিয়ে নিতে চান কোন্ ডাগদারের ক্ষেমতা আছে তাকে ধরে রাখে!'

ইতুর মেজদি সদ্য ঢুকেছে মেডিক্যাল কলেজে। চাপা গলায় পাশে বসা মামাতো ভাই রবিকে বললো, 'তাহলে যে দেশ থেকে মেডিক্যাল কলেজ আর হাসপাতাল সব তুলে দিতে হয়!'

ভাগ্যিস ভূপালী জেঠিমা কানে একটু কম শোনেন। বললেন, 'ভূপালে আমাদের যে তিনমহলা বাড়ি— একমাসে সব কাজ শেষ হলো, দরজা-জানালার রং-চুনকাম কিছুই বাকি থাকলো না। লোকে শুনে এখনো অবাক হয়।

ইতু চাপা গলায় ফোড়ন কাটলো, 'মিস্ত্রিগুলো পানিপড়া খেয়ে সব সুপারম্যান হয়ে গেছিলো।'

একটু থেমে জেঠিমা আবার বললো, 'কারিগরদের ভেতর মানুষ আর কজনই বা ছিলো? বেশিরভাগ ছিলো জিন। ছোড়দাদুর কাজ বলে একপয়সা মজুরি নেয় নি। দরজা জানালায় কাঠের কাজ দেখলেই বোঝা যায় ওসব মানুষের মুরোদে কুলোবে না।'

এরপর তিনি শুরু করলেন বাড়ির জিনিসপত্রের গল্প— কার্পেট সব কাশ্মীর থেকে আনা। দরজা-জানালার পর্দা তখন থেকেই জয়পুর থেকে আনা হতো,

এখনো তাই। নইলে বংশের ইজ্জত থাকে না।

নিরীহ গলায় ছোড়দি জানতে চাইলো, 'এখানে কি জিনরা পর্দা, কার্পেট এনে দেয়?'

'তা কেন হবে?' ভূপালী জেঠিমা একটু বিরক্ত হলেন— 'ছোড়দাদুর আমলেই তো আরও তিনটে বাড়ি বানানো হয়েছে। জমি-টমিও কম কেনা হয় নি।' এই বলে একটু থেমে মুখ টিপে হাসলেন— 'ওঁরা যে একেবারেই আসেন না তাই বা বলি কেন! মাঝে মাঝে আসেন। ছোটদাদুর ওফাতের দিন যে ওরস হয়, বেশুমার মুরিদরা আসে। রান্নাবাড়া আর সব কাজকম্মো ওঁরাই সামলান। আমার দুই চাচেরা ভাই সেই যে দেশান্তরি হলেন তারপর বংশে বলতে গেলে একা আমিই আছি। ওঁদের মদদ না পেলে আমার পক্ষে এত কিছু করা কি সম্ভব?'

ভূপালী জেঠিমা কয়েকদিনের ভেতর পাড়ার মেয়েমহলে সবার মন জয় করে ফেললেন। বাড়ি বাড়ি তাঁর ট্রাঙ্কভরা শাড়ির গল্প, বনেদি প্যাটার্নের গয়নার গল্প— তাছাড়া বাড়ির লোকজনের বাইরে পাড়ার যে-সব মহিলা নিয়মিত গল্পের আসরে আসতেন, ওঁদের এটা-সেটা উপহার দিয়ে রীতিমতো ভক্ত বানিয়ে ফেললেন। সবাই খুব খুশি হলো যখন শুনল তিনি ঢাকাতে একমাসের জন্য বেড়াতে এসেছেন। দুখির মার বড় ছেলের জ্বর ছাড়ে না সাতদিন। ওষুধপত্রও খাইয়েছে চেয়েচিন্তে এনে, কিছুই হয় নি; সেই ছেলে ভূপালী জেঠিমার পানিপড়া খেয়ে দিব্যি ভালো হয়ে গেলো। দুখির মা পারলে সারাদিন ওঁর পায়ের ওপর পড়ে থাকে।

জেঠিমা অবশ্য পানিতে ফুঁ দেয়ার আগে অনেক মানা করেছিলেন— 'আমার পানিপড়া কাজে লাগবে কেন দুখির মা! আল্লার গুনাহ্গার বান্দি আমি। এসব করলে গুনাহ্র খাতা ভারি হবে।' দুখির মা সে-সব আধ্যাত্মিক কথা বুঝলো না। হাউমাউ করে কেঁদে বললো, 'গরিব দুখি মানুষ বইলা গিন্না কইরেন না গো। পোলাডা আমার মইরা যাইব গো। আপনের পানিপড়া কামে না লাগলে আর কারটা লাগব? কত বড় পীর বংশের ঝিয়ারি আপনে. . .।' দুখির মার বিলাপে বাধ্য হয়েই পানিতে ফুঁ দিতে হলো তাঁকে। বললেন, 'খাবিস এক জিনের নজর লেগেছে।'

ইতুর মেজদি বলতে গিয়েছিলো 'আমি যে দুটো এ্যাসপ্রো খাওয়ালাম!' — কথা শেষ করার আগেই মেজ ফুপির ধমক খেয়ে চুপ মেরে গেলো। দুখির মার ছেলে ভালো হয়েছে খবর পেয়ে ছুটতে ছুটতে এল গিরিবালা ধোপানি। সেদিন ছিলো বুধবার, ওর আসার তারিখ নয়। দিদা অবাক হয়ে বললেন, 'আজ কী মনে করে আসা হলো?'

গিরিবালা বললো, 'আমি পাপীতাপী মানুষ বড়মা। কুনদিন পুণ্যিবান মাইনষের পায়ের ধুলা লইতে পারি নাই। আপনেগো বাড়িতে গোপাল না

কোনপালের এক অতিথ আইছে। হ্যার এট্টু পায়ের ধুলা লমু গো বড়মা।'

দিদা মুখ টিপে হেসে বললেন, 'বুঝেছি তোর মতলব। এইবেলা তোকে সাবধান করে দিচ্ছি, এসব গল্প বাইরে করবি না। তোদের জ্বালায় না ভূপালী বউকে শেষে পালাতে হয়!'

গিরিবালার ছিলো কাপড়ের মোট বওয়ার একজোড়া গাধা। দুদিন ধরে ছেলে গাধাটা কোথায় চলে গেছে কেউ জানে না। আশেপাশের বাড়িঘর, সরকারি খোঁয়াড়— সবই খোঁজা হয়েছে, কোথাও পাজিটাকে পাওয়া যায় নি। ভূপালী জেঠিমাকে গিরিবালা বললো, 'পীরের দরগায় আমি পাঁচসিকার সিন্নি দিমু গো মা। আপনে আমার মুখপোড়া পাজিটার খবর কইয়া দেন।'

ভূপালী জেঠিমা বললেন, 'আমার অত ক্ষমতা আছে? আল্লাপাকের শানে কত গুনার কাজ করেছি। আমার মতো আল্লাহর গুনাহ্‌গার বান্দী আর কে আছে? আমাকে দিয়ে এসব কাজ কেন করাতে চাও তোমরা?'

গিরিবালাও দুখির মার কায়দায় চোখ মুছতে মুছতে বললো, 'আমি ছোট লোক বইলা আমারে এটু পানিপড়া দিবেন না গো বড় মাইনষের ঝিয়ারি?'

ভূপালী জেঠিমা তাড়াতাড়ি ওকে পানিপড়া দিয়ে বিদেয় করলেন। আর কী আশ্চর্য কাণ্ড, পরদিন সকালে ওর গাধা এসে হাজির!

ছোটনদের কাছে এসব খবর শুনে রিমকিদের মা, চাচি, নানি দু'হাড়ি মিষ্টি নিয়ে ভূপালী জেঠিমার সঙ্গে দেখা করে গেলেন। ইতুদের ভালো লাগলো দিদাকে হেসে হেসে রিমকির নানির সঙ্গে কথা বলতে দেখে। দিদা খুশি হবেন না কেন! ভেবেছিলেন দশআনি শরিকের অংশ কিনে ওরা বড়লোকী দেখাতে এসেছে। ওদের চেয়ে বড়লোক, আর ওদের চেয়ে ঢের বেশি সুন্দর দেখতে আত্মীয়স্বজন ওঁদের বাড়িতে আসে— এটা কম কথা নয়! সেদিন রিমকির নানিদের দিদা জোর করে রাতে ভাত খাইয়ে ছাড়লেন। রিমকির নানিদের ভক্তি দেখে ভূপালী জেঠিমাও কম খুশি হন নি।

চিলেকোঠার ঘরে বসে ইতুরা নিশ্চিন্তে রিমকি-সিমকির সঙ্গে জমিয়ে আড্ডা দিলো। ছোটন বললো, 'ভূপালী জেঠিমাকে আজই বলতে হবে আমরা দুবাড়ি একসঙ্গে পিকনিকে যাবো।'

রিমকি জানতে চাইলো, 'এবার তোমরা যাচ্ছো কোথায়?'

'গতবার গিয়েছিলাম তেজগাঁ।' জবাব দিলো ইতু— 'এবার যাবো জয়দেবপুরের রাজবাড়িতে। পরশু দেখেছি রাজবাড়ির ম্যানেজারের সঙ্গে ছোটকা বসে গল্প করছেন। আগেও একবার গিয়েছিলাম ওখানে।'

ছোটন বললো, 'ছোটকাকে জিজ্ঞেস করতে হবে তারিখ ঠিক করে ফেলেছে কিনা। সাইফ ভাইর সঙ্গে কথা বলতে হবে।'

রাতেই ওরা সবাই ভূপালী জেঠিমাকে গিয়ে ধরলো। রিমকি বললো,

'জেঠিমা আপনি দিদাকে বলুন আমরাও পিকনিকে যাবো।'

পিকনিকের কথা ভূপালী জেঠিমার কানে এসেছে। বললেন, 'এটা তো বহুত খুশির খবর বেটি, আমি চাচিজানকে জরুর বলবো।' জেঠিমাকে কী যেন বলতে এসেছিলেন দিদা, ছোটদের জটলা দেখে বললেন, 'তোরা বুঝি ভূপালী বউকে একদণ্ড বিশ্রাম নিতে দিবি না? আজ আর কোনো গল্প নয়।'

ভূপালী জেঠিমা একগাল হেসে বললেন, 'না চাচিজান, ওরা আমাকে বিরক্ত করছে না। আমি বলছিলাম, রুমকিদের সবাইকে বলুন না আমাদের সঙ্গে পিকনিকে যেতে। সদরুদ্দিনকে বলে দেবেন আমার নামে একশ টাকা চান্দা লিখে রাখতে।'

ছোটনদের পিকনিকে সবাইকে চাঁদা দিতে হয়। ছোটরা যারা স্কুলে যায় তাদের একটাকা, কলেজ পড়ুয়াদের দুটাকা, আর যারা কামাই করে তাদের গিন্নিদের দশটাকা করে। ছোটরা টিফিনের পয়সা থেকে পিকনিকের চাঁদা বাঁচিয়ে রাখতো। সব মিলিয়ে দেড়শ টাকার মতো চাঁদা ওঠে। তখনকার দিনে পোলাওর চালের সের ছিল একটাকা, দু'টাকায় ভালো মুরগি পাওয়া যেতো।

ভূপালী জেঠিমার চাঁদার কথা শুনে দিদা হেসে বললেন, 'তুমি মেহমান, তোমাকে চাঁদা দিতে হবে না।'

'না বললে আমি শুনব কেন চাচিজান। জাহানারাকে বলেছি পিকনিকে আমি কবুতরের রোস্ট খাওয়াবো সবাইকে একটা করে। আপনি রিমকিদের বাড়ির সবাইকে বলে দেবেন।'

দিদা বললেন, 'তুমি যখন একশ টাকা চাঁদা দিচ্ছ ওদের আর চাঁদার কথা বলবো না, বরং ওরাই আমাদের মেহমান হোক।'

আনন্দে আত্মহারা হয়ে ছোটন, ঝন্টু আর মিতু ছুটে এসে দিদাকে জড়িয়ে ধরলো। হইচই করে বললো, 'আমরা কবে যাব পিকনিকে?'

মৃদু হেসে দিদা বললেন, 'কেন সদরুদ্দিন বলে নি বুঝি? সামনের রোববারেই তো যাচ্ছি! এবার আহ্লাদ থামিয়ে নিচে খেতে আয়। অনেক কাজ পড়ে আছে।'

ভূপালী জেঠিমা কী যেন বলতে এসেছিলেন— মনে করতে না পেরে দিদা আবার নিচে নেমে গেলেন।

বাড়ি যেতে যেতে রিমকি বললো, 'রোববারে গেলে ভাইয়ার পিকনিকে যাওয়া হবে না।'

'কেন হবে না?' জানতে চাইলো ইতু।

'কাল চিটাগাং যাবেন জরুরি কী কাজে।'

সিমকি বললো, 'ভাইয়া না গেলে কী হবে, আমরা যাবো।'

রাতে ছোটনরা অনেক রাত পর্যন্ত ভূপালী জেঠিমার সাথে গল্প করছিলো।

ইতু বললো, 'এ-রকম মানুষ আর হয় না।'

ছোটন বললো, 'দিদার মতো রাগী মানুষকে কীরকম পটিয়ে ফেলেছেন দেখেছিস? ভূপালী জেঠিমা না এলে রিমকিদের সঙ্গে এ-জন্মে আর পিকনিক করতে হতো না।'

'পিকনিক দূরে থাক, মেশা পর্যন্ত বারণ হয়ে গিয়েছিলো— সেদিন শুনিস নি!'

ঘুমোতে যাওয়ার আগে সবাই মনে মনে ভূপালী জেঠিমাকে চিয়ার্স জানালো।

পিকনিকে ঝকমারি

পিকনিকের চাঁদা তোলার ভার থাকে ইতুদের বড় জেঠুর ওপর। সেজকার দায়িত্ব হচ্ছে গাড়ির ব্যবস্থা করা। ছোটকা আর বড়দার কাজ বাজার করা। ফর্দ মিলিয়ে বাজার বুঝে নেন বড় ফুপি আর মেজো জেঠিমা। ইতুরা চাঁদা তোলার ব্যাপারে বড় জেঠুকে সাহায্য করে। কাজটা যেহেতু ওদের নয়, বাজার করে পয়সা বাঁচলে বড় জেঠু এটা-সেটা কিনে দিয়ে ওদের পুষিয়ে দেন। গতবার ওদের পাঁচজনকে যেমন ঘুড়ি আর মাঞ্জা দেয়ার সুতো কিনে দিয়েছিলেন। আগেরবার বেশি পয়সা বাঁচে নি, ওদের সবার ভাগে পড়েছিলো একটা করে গাবের লাটিম। ইতুরা ফাও যা পায় তাতেই খুশি। তবে ছোটকা আর বড়দার সঙ্গে পিকনিকের সময় প্রত্যেকবার বড় জেঠুর একটা ঝগড়াঝাঁটি হবেই।

গণ্ডগোল হয় বাজার করা নিয়ে। মা, কাকী, জেঠিদের সঙ্গে পরামর্শ করে বড় জেঠু পিকনিকের মেনু ঠিক করে ছোটকার হাতে ফর্দ আর টাকা যখন ধরিয়ে দেন তখন থেকেই শুরু। ফর্দের ওপর চোখ বুলিয়ে আঁতকে ওঠেন ছোটকা— 'এটা একটা ফর্দ হলো বড়দা? টাকা দিয়েছ দেড়শ' 'ফর্দ দিলে তিনশ টাকার— বাকি টাকার জন্য কার পকেট কাটতে যাবো শুনি!'

ইজি চেয়ারে শুয়ে পা নাচাতে নাচাতে বড় জেঠু বলেন, 'পয়সা যদি একটু কম মারো— ওতেই সব হবে।'

'প্রত্যেকবার তুমি এক কথা বলো বড়দা। আমি টাকা মারলে মেজদাকে কেন দাও না? তুমি নিজে কেন যাও না? দরকার নেই আমার পিকনিক করে।'

আগের মতো শান্ত গলায় বড় জেঠু বলেন, 'তুই বেশি বাড়াবাড়ি করছিস ছোট। কাজটা তোর, তোকেই করতে হবে। ছোট মুখে বড় কথা মানায় না। মেজোর অনেক কাজ আছে, তোর মতো বেকার খাতায় চিরদিনের জন্য নাম লেখায় নি।'

বি এ পাশ করে পাঁচ বছর ধরে ঘরে বসে আছেন ছোটকা। এ নিয়ে কেউ কিছু বললে ওঁর মন খারাপ হয়ে যায়। বড় জেঠুর কথা শুনে গাঁইগুঁই করে করে বলেন, 'ঠিক আছে, বাজারে এই দামে যা পাবো তাই কিনবো। শেষে বলতে পারবে না আলু পচা কেন, মুরগির গায়ে মাংস নেই কেন— ওসব আমি শুনতে পারবো না।'

শেষপর্যন্ত ছোটকা জিনিস সবই আনেন, ভালো জিনিসই কেনেন, তবু বড় জেঠুর ধারণা ছোটকা আর বড়দা মিলে সিনেমা দেখার পয়সা নাকি ঠিকই বাঁচান।

এবার অবশ্য টাকার পরিমাণ বেশি দেখে ছোটকা তেমন কিছু বললেন না। শুধু মাথাপিছু একটি কবুতর শুনে সামান্য আপত্তি করলেন— 'ছোটদের আর মেয়েদের আধখানা করে দিলেই তো হয় বড়দা, পয়সা যদি না কুলোয়!'

ছোটনরা কাছেই ছিলো। খাওয়ার ব্যাপারে মিতু একটু পেটুক বলে বদনাম আছে। বললো, 'ভূপালী জেঠিমা হিসেব করে টাকা দিয়েছেন ছোটকা। অন্য কোনো ফন্দি যদি করো দিদা আর জেঠিমা দুজনকেই বলে দেবো।'

দিদাকে ভীষণ ভয় পান ছোটকা। পারতপক্ষে ওঁর সামনে যান না। ভালো করেই জানেন ছোটদের তিনি কীরকম আস্কারা দেন। শুকনো গলায় বললেন, 'ভারি বদ হয়েছিস তো ছোঁড়া! সবকথা মাকে কেন বলতে হবে শুনি!'

'আস্ত রোস্ট পেলে বলবো না' এই বলে ছোটনরা সরে গেল সামনে থেকে।

পিকনিকের মাত্র আর একদিন বাকি, সেজকা এসে এক দুঃসংবাদ দিলেন— রোববারের জন্য গাড়ি পাওয়া যাবে না।

প্রত্যেক বছর সেজকা তাঁর অফিস থেকে গাড়ি ম্যানেজ করেন। তেলের পয়সাটা শুধু দিতে হয়। ড্রাইভার দুজন পিকনিকের ভোজ পেলেই খুশি। দিদা অবশ্য দুজনকে দুটাকা করে বখশিসও দেন। এবার বলা হয়েছিলো তিনটে গাড়ি লাগবে। ভূপালী জেঠিমা আছেন, রিমকিদের বাড়ি থেকেও সাত-আটজন যাবে— বড় জেঠু পইপই করে বলে দিয়েছিলেন, 'তিনটে গাড়ির কমে হবে না সেজো। কথা বলে দেখ জোগাড় করতে পারবি কিনা, নইলে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।'

সেজকা একগাল হেসে বললেন, 'অন্য ব্যবস্থা মানে ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া

করে তেজগাঁর বাগানবাড়িতে যাওয়া! গতবারই তো গিয়েছিলাম। পিকনিকের আসল মজা কি ওতে হয়! তুমি কিছু ভেবো না বড়দা। গাড়ি আমি ঠিকই ম্যানেজ করবো।'

গাড়ির ব্যাপারে সবাই ষোলআনা নিশ্চিন্ত ছিল। সেজকার কথার কোনো নড়চড় হয় না। অথচ শুক্রবার সন্ধেবেলা তিনি শুকনো মুখে অফিস থেকে ফিরে বড় জেঠুকে বললেন, 'ঝামেলা হয়ে গেলো যে বড়দা! বিদেশ থেকে এক সার্ভে টিম এসেছে। কাল অফিসের তিনটে গাড়ি নিয়ে বড় সায়েব সিলেট যাচ্ছেন। আমাকে বললেন, তোমাদের তো ফ্যামিলি পিকনিক, একসপ্তাহ পিছিয়ে দাও।'

মা, কাকিমারা সবাই হইচই করে উঠলেন— 'সে কী, সবাইকে বলা হয়ে গেছে, কেনাকাটাও করা হয়েছে— সাতদিন পেছাবে বললেই হলো!'

বড় জেঠু কাষ্ঠ হেসে বললেন, 'এ-রোববারে যদি যেতে চাও কপালে ঘোড়ার গাড়িই আছে তেজগাঁ পর্যন্ত। কী আর করবে! পিচ্চিগুলোর একটু মন খারাপ হবে— এই যা!'

ভূপালী জেঠিমা শুনে বললেন, 'তোমরা কিছু ভেবো না। আমার এক চাচেরা ভাইর লাড়কা থাকে সেগুনবাগিচায়। ওরা বহুৎ পয়সাওয়ালা আদমি আছে। দাঁড়াও, ওকে বলি দুতিনখানা গাড়ি ব্যবস্থা করে দিতে।'

দিদা বললেন, 'থাক না রাঙাবউ, মিছেমিছি অচেনা মানুষকে বিরক্ত করবে কেন? এমন কোনো তাড়া তো নেই! পরের রোববারে গেলেই হয়।'

'না চাচিজান, আপনি বাধা দেবেন না। সবাই নিয়ত করে ফেলেছে এই রবিবারে— ছোটদের মন ভেঙে যাবে। মীর্জা এহতেশাম আমার চাচেরা ভাইর লাড়কা হলে কী হোবে, এ আমার আপনা আওলাদের চেয়েও বেশি। গত বছর ভূপাল গিয়ে আমাকে বলেছিলো, ঢাকা এলে ওকে স্রেফ একটা খবর পৌঁছাতে।'

ভূপালী জেঠিমার আগ্রহ দেখে দিদা আর কিছু বললেন না। ছোটনরা মহাখুশি, টেলিফোনেই ভূপালী জেঠিমা তিনখানা গাড়ি ম্যানেজ করে ফেললেন। সেজকার কথা শোনার পর থেকে ইতু ভেবে পাচ্ছিলো না রিমকিদের কী করে বলবে মাইক্রোবাসের বদলে ঘোড়ার গাড়িতে পিকনিকে যাবে! নিজেরা হলে কথা ছিলো না। রিমকিদের এত জাঁক করে বলেছে গাড়িতে করে জয়দেবপুর যাবে— ভূপালী জেঠিমা না থাকলে কী লজ্জার ব্যাপারই না হতো!

পরদিন দিদা ভূপালী জেঠিমার 'চাচেরা ভাই'র ছেলেকে নেমন্তন্ন করলেন দুপুরে খেতে। হোক না আত্মীয়, কোনোদিন তো জানতেন না! ভাবলেন একটা ধন্যবাদ দেয়া উচিত— সেজন্যে এই নেমন্তন্ন।

মস্ত লম্বা ধবধবে সাদা একটি ফোর্ড গাড়ি হাঁকিয়ে এক ভূপালী জেঠিমার 'চাচেরা ভাই'র ছেলে মীর্জা এহতেশাম। বয়স বেশি হলে বছর তিরিশেক হবে। একটু ভারি শরীর, গায়ের রঙ একেবারে বিলেতি সাহেবদের মতো। চোখের

রঙও কটা। দুই ঝুড়ি কমলা এনেছে, নাকি ওদের সিলেটের বাগানের। দিদাকে বললো, 'এটা আমার পিকনিকের চাঁদা। বহুত খায়েশ ছিলো যাওয়ার। জরুরী এক কাজ পড়ে গেছে। সামনের বছর জরুর যাব।'

ভূপালী জেঠিমার মতোই কথায় উর্দু টান, তবু ছোটনদের খুবই ভালো লাগলো এহতেশাম ভাইয়াকে। ভূপালী জেঠিমাই ওদের বলে দিয়েছেন এহতেশাম ভাইয়া ডাকতে। এত বড়লোক, অথচ এতটুকু অহঙ্কার নেই। ছোটনদের সঙ্গে বন্ধুর মতো অনেক কথা বললো। কার কী হবি, বড় হলে কে কী হবে— এসব জিজ্ঞেস করলো। ওদের একটা মস্ত বাগানবাড়ি আছে টঙ্গিতে। বলল, ওখানে একদিন গাড়িতে করে সবাইকে নিয়ে যাবে পিকনিকে। বিরাট এক পুকুর আছে— দশ-পনের সেরের রুই কাতলারা সারাক্ষণ লাফালাফি করে সেখানে। ওরা গেলে পুকুরের মাছ ধরে খাওয়া হবে। শীতকালে ওখানে সবরকম সবজির চাষ হয়। কয়েক ঘণ্টার ভেতর ছোটনদের সবাইকে ওর মহাভক্ত বানিয়ে ফেললো।

সন্ধেবেলা রিমকিদের বাগানে বসে ছোটনরা যখন পিকনিকের কথা আলোচনা করছিলো, তখন সবাই একবাক্যে স্বীকার করলো, এত মজার পিকনিক আগে কখনো হয় নি। মিতু বলল, 'আস্ত একটা কবুতরের রোস্ট সঙ্গে থাকবে খাসির বিরিয়ানি, মুরগির দোপেঁয়াজি আর সীতারাম মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের দই। ভাবতে পারিস কী দারুণ এক খাওয়া হবে!'

ঝন্টু বলল, 'এহতেশাম ভাইয়া যে দু ঝুড়ি বাগানের কমলা দিয়ে গেলো, সেটা বাদ দিচ্ছিস কেন?'

সিমকি জিজ্ঞেস করল, 'এহতেশাম ভাইয়া আবার কে?'

'ভূপালী জেঠিমার চাচেরা ভাই।' বলতে গিয়ে হেসে ফেললো মিতু— 'জেঠিমার মতো উর্দু মেশানো কথা বললে কী হবে, আমাদের বলেছে একদিন ওদের বাগানবাড়িতে নিয়ে যাবে।'

রিমকি বললো, 'ইশ, ভাইয়াটা যদি থাকতো, কী মজাই না হতো।'

পিকনিকে যাওয়ার আগে ইতুদের বাড়িতে আরেক খুশির খবর এলো। শনিবার সকালে কলেজে গিয়েছিল বড়দি। দুপুরে এসে লাজুক হেসে বড় জেঠুকে বলল, 'আজ আমাদের পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়েছে বাবা। আমি পাশ করেছি।'

'তাই নাকি!' বলে হইচই বাঁধালেন বড় জেঠু— 'ওরে কে আছিস, মিষ্টি আন এক মণ, পাড়ার সব বাড়িতে খবর দে। তা মা কেমন পাশ হল?'

বড়দি বলল, 'সেকেণ্ড ক্লাস থার্ড। ফার্স্ট ক্লাস এবার কেউ পায় নি।'

বড় জেঠুর হাঁকডাক শুনে বাড়ির সবাই ছুটে এলো। মেজো জেঠি বড়দিকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন— 'আহা, বড়বু যদি কটা মাস দেরি করে পরীক্ষার ফলটা জেনে যেতে পারতেন!' এই বলে ফোঁত ফোঁত করে খানিকটা কাঁদলেনও।

বড়দির পরীক্ষার এক মাস আগে বড় জেঠিমা মারা গিয়েছেন। সবাই ধরে

নিয়েছিলো বড়দি বুঝি এবার পাশ করতে পারবে না। ইতুর বাবা আর বড় জেঠুও বলেছিলেন এ বছর ড্রপ দেয়ার জন্য। বড়দি কারো কথা শোনে নি।

ভূপালী জেঠিমা বললেন, 'জাহানারার পাসের মিষ্টি আমি খাওয়াব। জেনানা হয়ে একবারে ডাগদারি ইমতেহান পাশ করে— এমুন কথা আমি শুনি নাই।'

পাড়ার বয়স্করা সবাই বড়দিকে দেখতে এলো। খবর পেয়ে এহতেশাম ভাইয়াও এলো মস্ত বড় দুই হাঁড়ি মিষ্টি হাতে নিয়ে। বললেন, 'পিকনিকের পরের দিন সবাইকে সিনেমা দেখাবেন।'

এত রাগী বড়দি— মীর্জা এহতেশামের প্রশংসা শুনে লজ্জায় লাল হয়ে বললো, 'মনে হচ্ছে এদেশে কোনো মেয়ে বুঝি আমার আগে ডাক্তারি পাশ করে নি।'

এহতেশাম ভাইয়া হা হা করে হেসে বললো, 'জরুর করেছে। লেকিন আমি হল্‌ফ করে বলতে পারি, ওরা কেউ আপনার মতো ভালো রেজাল্ট করে নি।'

বড়দি আর কী বলবে, চা আনার ছুতো করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

গণ্ডগোল বাঁধলো সন্ধ্যেবেলা। ঝুলবারান্দায় বসে রোজকার মতো গল্প করছেন ভূপালী জেঠিমা, হঠাৎ ওঁর মাথা চক্কর দিয়ে উঠলো। কথাটা বলে তিনি একগ্লাস পানি খেয়ে নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন।

বড়দি ওর ঘরেই ছিলো। খবর পেয়ে ছুটে এসে পাল্‌স দেখে, বুকে স্টেথস্‌কোপ লাগিয়ে বললো, 'প্রেসার বেড়েছে, একদম শুয়ে থাকবেন। আগে কখনো প্রেশার এরকম বেড়েছিলো?'

'কেমুন করে বলবো জাহানারা বিটিয়া! মাঝেমাঝে মাথা চক্কর দেয় জরুর, ভূপালে আমরা এখনো ডাগদারের কাছে যাই না। বংশের বদনাম হবে যে ওতে!'

রাতে বড়দি ওর পরিচিত এক ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে ভূপালী জেঠিমার জন্য ওষুধ আনিয়ে দিলো। বললো, 'দুদিন পুরো বিশ্রাম। কাল পিকনিক হবে না।'

জেঠিমা একটু বিরক্ত হলেন— 'এ কেমুন কথা বোলছ বিটিয়া? পিকনিক কি স্রেফ আমার জন্য! সবাই যাবে পিকনিকে, আমি বাড়ি পাহারা দেবো।'

দিদা শুনে চিন্তিত গলায় বললেন, 'বাড়ি পাহারা দেয়ার লোক আছে রাঙা বউ। পিকনিকের জন্য এত চাঁদা দিয়েছো তুমি— না গেলে সবারই খারাপ লাগবে।'

'না চাচিজান, পিকনিক হচ্ছে ছোটদের। আমাদের যাওয়া তো ছোটদের মজাক দেখার জন্য। আমি একদিন বাড়িতে ওদের নিয়ে পিকনিক করে মজাক দেখবো। আমাকে বারবার বলে শরমিন্দা করবেন না।'

ছোটদের জন্য ভূপালী জেঠিমার যাওয়াটা অবশ্য বেশি জরুরি ছিলো না। সবাই একটা করে কবুতরের রোস্ট বাড়তি পাবে, এতেই ওরা খুশি।

দিদা মুখে বারবার ভূপালী জেঠিমাকে যেতে বললেও মনে মনে কিছুটা স্বস্তি পাচ্ছিলেন এই ভেবে যে, বাড়িতে কেউ অন্তত থাকবে! প্রত্যেকবার পিকনিকে যাওয়ার সময় যদিও দশআনির পাহারাদার বনমালীকে বলে যান, তবু মনটা

খচখচ করে— চারদিকে চোর-ডাকাত গিজগিজ করছে, বনমালী যদি সামলাতে না পারে! এবার তো আরো চিন্তিত ছিলেন— ও-বাড়িতে রিমকিরা এসেছে, একা দু'বাড়ি কি পাহারা দিতে পারবে বনমালী? ভূপালী জেঠিমা বাড়িতে থাকবেন শুনে আশ্বস্ত হয়ে বললেন, 'তাহলে বৌমাদের কেউ থাকুক তোমার কাছে।'

জেঠিমা দিদার হাত ধরে বললেন, 'চাচিজান, আমার জন্য কেউ পিকনিকে যাবে না, এটা হতেই পারে না। মীর্জা এহতেশামকে বলব দুপুরের পর একবার আসতে। তাছাড়া বললেন না বনমালী না করমালী— সে এসে খোঁজখবর নিয়ে যাবে! আমার কুন অসুবিধা হবে না। আপনারা আমার জন্য পেরেশান না হয়ে ঘুরে আসুন।'

পরদিন খুব সকালে মীর্জা এহতেশাম দুটো মাইক্রোবাস আর একটা জিপ পাঠিয়ে দিলো। রুমকির মেজ ভাইয়া তার এক বন্ধুর বড় বুইক গাড়ি এনেছে। ওদের বাড়ি থেকে যাচ্ছে রিমকি, সিমকি, নিমকি, ওদের মেজ আর ছোট ভাইয়া, চাচি, মা আর নানি। রিমকির বাবা-চাচা যাচ্ছেন না, আর সাইফ ভাই যে চট্টগ্রাম গেছেন ফিরবেন আজ রাতে।

বুড়োরা বুইক গাড়িতে, ছোটরা জিপে আর অন্যরা সব মাইক্রোবাসে উঠলো। সঙ্গে হাঁড়িপাতিল আর জিনিসপত্র যা ছিল, মাইক্রোবাসের ছাদে ক্যারিয়ারে ভালোমতো বেঁধে দেয়া হয়েছে। রওনা দিয়েছিলো সাতটারও আগে, জয়দেবপুর পৌঁছতে লাগল পুরো দেড় ঘণ্টা। কথা বলতে বলতে সময় যে কীভাবে কাটলো কেউ টেরও পেলো না।

ইতুরা আগেও একবার এসেছিলো এখানে। জায়গাটা ওদের অচেনা নয়। ওরা জানে রান্নার আয়োজন কোথায় হবে। যে যা পারে হাতে নিয়ে ছুটলো সেদিকে। গোটা পিকনিকে এটুকুই ওদের কাজ। জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে রেখে পকেটে একটা করে কমলালেবু নিয়ে পঞ্চপাণ্ডব চুপচাপ কেটে পড়লো। এবার ওদের সঙ্গে রিমকিরাও আছে। বলাই বাহুল্য আনন্দের পাল্লা এতে আরো ভারি হয়েছে।

গতবার ওরা রাজাদের নায়েববাড়ির খিড়কির পুকুরধারে দেশী কুলের গাছ দেখেছিলো। লাল মরিচের গুঁড়ো আর নুন দিয়ে সেই টকমিষ্টি কষটে কুল খেতে দারুণ মজা। কাঁচাপাকা কুল বোঝাই সেই গাছটা খুঁজে পেতে ওদের দেরি হলো না। ডাল ঝাঁকিয়ে ইচ্ছেমতো কুল পাড়লো ছোটনরা, বারণ করার কেউ নেই। তারপর ওরা পকেট বোঝাই করে কুল নিয়ে পুরোনো শিরিষগাছের তলায় বসলো। কিছু কুল খেলো, বাকিটা ইতু আর রিমকি গিয়ে মেজদিকে দিয়ে এলো। বড়দিকে আশেপাশে কোথাও দেখলো না।

দুপুর পর্যন্ত ওরা শালবনের ভেতর লুকোচুরি খেললো। লুকোনোর মজা হচ্ছে নায়েববাড়িতে। বেশির ভাগ ঘরে কখনো সূর্যের আলো ঢোকে না। তার ওপর চারপাশে হেন ফল নেই— যার গাছ নেই। একবার রিমকিকে চোর বানিয়ে ওরা

গিয়ে উঠলো শিরিষ গাছে। রিমকির মাথায় অত বুদ্ধি নেই যে আগে থাকতে বলবে, গাছে উঠলে খেলা হবে না। সিমকি গাছে ওঠে নি। লুকিয়েছিলো পাশের ঝোপে। ইতুরা গাছের ওপর থেকে দিব্যি দেখছিলো রিমকি কীভাবে ওদের তন্নতন্ন করে খুঁজছে। হঠাৎ চাপা গলায় রন্টু বলল, 'আরে সাইফ ভাই এলো কখন?'

ওর কথায় দূরে ঝোপের পাশে সবাই তাকিয়ে দেখলো, সাইফ ভাই আর বড়দি পাশাপাশি বসে আছে। সাইফ ভাই কী যেন বোঝাচ্ছে বড়দিকে। মাথা নিচু করে বড়দি চুপচাপ শুনছে। মিতু বললো, 'আসার তো কথা ছিলো আজ রাতে!'

ইতু বললো, 'এতে অবাক হওয়ার কী আছে। রাতের বদলে সকালে এসেছে। আমরা রাজবাড়ি এসেছি শুনে বাস ধরে চলে এসেছে।'

বয়সে বড় ছোটনের মনে হলো এভাবে লুকিয়ে ওদের দেখা ঠিক হচ্ছে না। বললো, 'চল, আমরা নায়েব বাড়ির দিকে যাই।'

নিচে নামতেই দেখা হলো রিমকি-সিমকির সঙ্গে। মিতু বললো, 'সাইফ ভাই এসেছে। লুকিয়ে বড়দির সঙ্গে কথা বলছে।'

সিমকি লাফিয়ে উঠলো, 'কী মজা ছোটপা! চল, আমরা ভাইয়াকে নিয়ে স্টোলেন কুকিস গেমটা খেলি।'

ছোটন একটু শক্ত গলায় বললো, 'আমার মনে হয় ওরা কোনো জরুরী কথা বলছে। এখন ওদের ডিস্টার্ব করা ঠিক হবে না।'

মিতু বললো, 'আমার মনে হয় প্রাইভেট কথা বলছে।'

ইতু আর ছোটন ভুরু কুঁচকে মিতুর দিকে তাকালো। রিমকি মুখ টিপে হেসে বললো, 'ঠিক আছে, আমরা আগের জায়গায় খেলবো। এবার মিতু চোর হবে। ওকে আমি আগে দেখেছি।'

বড়দির বিয়ের প্রস্তাব

চট্টগ্রাম থেকে সাইফের ফেরার কথা ছিলো রাতে। কাজ শেষ হয়ে যাওয়ায় সকালেই ফিরে এসেছে। বাড়িতে আসতেই বাবা বললেন, 'আর একঘণ্টা আগে এলে সবার সঙ্গে পিকনিকে যেতে পারতি।'

'সবার সঙ্গে মানে?' পিকনিকে যাওয়ার কথা সাইফ কিছু জানতো না।

'ও বাড়ির সবাই ফি-বছর পিকনিকে যায়। এবার আমাদেরও নেমন্তন্ন করেছে।'

শুনে সাইফের মন খারাপ হলো। ওকে বাদ দিয়ে সবাই পিকনিকে গেছে, এটা ঠিক পছন্দ হচ্ছিলো না ওর।

বাবা বললেন, 'তোর ছাত্রীর রেজাল্ট শুনেছিস? জাহানারা সেকেন্ড ক্লাস থার্ড হয়েছে।'

বাবার কথা শুনে সাইফের চেহারা উজ্জ্বল হলো। জাহানারা পরীক্ষায় ভালো করবে জানতো। এতটা ভালো আশা করে নি।

বাবা আড়াচোখে সাইফকে দেখছিলেন। হাসি চেপে খবরের কাগজের আড়ালে মুখ ঢেকে বললেন, 'জয়দেবপুর এখান থেকে এমন কিছু দূর নয়। বাসে বড়জোর ঘণ্টা দুয়েক লাগবে। ট্রেনে আরো কম লাগে।'

সাইফ একটু অবাক হয়ে বললো, 'তুমি কি আমাকে এখন জয়দেবপুর যেতে বলছো বাবা?'

বাবা নির্লিপ্ত গলায় জবাব দিলেন— 'গেলে ক্ষতি কী! বাড়িতে থাকলে হোটেলে গিয়ে খেতে হবে। তোর মা শুধু দুজনের খাবার রেখে গেছে।'

মনে মনে খুশি হলেও সাইফ সেটা প্রকাশ করলো না। বললো, 'আমি সেলিমদের বাসায় যাচ্ছি। ওর গাড়ি পেলে যাবো। এতক্ষণ ট্রেন জার্নি করে এসেছি। আবার বাসের ধকল পোষাবে না।'

সেলিমদের বাড়ি এসে ওকে পেলো না। সাইফের তখন মনে হল বাসে দু'ঘণ্টার জার্নি— এমন আর কঠিন কী কাজ! গুলিস্তান থেকে উঠে বসলো জয়দেবপুরের বাসে।

সাইফের ভাগ্য ভালো বলতে হবে। বাস ওকে দেড়ঘণ্টায় জয়দেবপুর পৌঁছে দিলো। বাস থেকে নেমে রাজবাড়ির দিকে যেতেই ও জাহানারাকে দেখতে পেলো। পিকনিকের হইচই থেকে বেশ দূরে শালগাছের নিচে হাঁটছে। ছআনির লোকজনদের ভেতর জাহানারাই সাইফের বেশি পরিচিত। তাই সে ওদিকেই গেলো।

জাহানারা সাইফকে দেখে খুব অবাক হলো। বললো, 'সাইফ ভাই, আপনি?'

মৃদু হেসে সাইফ বললো, 'বাবার কাছে তোমার পাসের খবর পেলাম। ভাবলাম অভিনন্দন জানানো দরকার।'

লাজুক হেসে জাহানারা বললো, 'এর জন্য কষ্ট করে এতটা পথ এলেন!'

'তাছাড়া বাবা আরো একটা কথা বলেছেন। রাতে আসবো বলে মা বাড়িতে আমার খাবার রেখে যান নি। বাবা বললেন, হয় পিকনিকে যেতে হবে, নয় হোটেলে গিয়ে খেতে হবে। তুমি বোধহয় জানো না, হোটেলের খাবার আমি

পছন্দ করি না।'

জাহানারা বলল, 'ভালো করেছেন। চলুন ওদিকে যাই।'

'ওদিকে হইচই বেশি দেখে তুমিই তো এখানে চলে এসেছো। আমাকে আবার ওদিকে নিতে চাইছো কেন? ভূপালী জেঠিমার আজগুবি গপ্পো শোনার জন্য?'

জাহানারা হেসে বললো, 'জেঠিমার শরীর খারাপ, আসেন নি। আপনি ওঁর খবর পেলেন কোথায়?'

'জানো না বুঝি! তোমাদের বাড়িতে আমার কম করে হলেও গোটা পাঁচেক গুপ্তচর রয়েছে। ওদের কাছে সব খবর পাই।'

এরপর সাইফ আর জাহানারা শালবনে বসে ঘণ্টা-দুয়েক অনেক কথা বললো। ছোটনদের মতে সেগুলো জরুরি আর প্রাইভেট হলেও আসলে তেমন জরুরি বা প্রাইভেট কিছুই ছিলো না।

শেষ দুপুরে খাওয়ার সময় সাইফকে দেখে সবাই খুব খুশি। ইতু লক্ষ্য করলো বড়দির চেহারায় রাগী ভাবটা একেবারেই নেই। সবার সঙ্গে হেসে কথা বলছে। খেতে বসে ডাক্তারদের নিয়ে মজার মজার গল্প বলে সবাইকে হাসিয়ে মারলো বড়দি।

ফেরার পথে ছোটন ইতুরা সবাই স্বীকার করলো আগে কোনো পিকনিকে এত মজা হয় নি। রিমকি-সিমকিও বললো ওদের নবরায় লেনের বাড়ির পিকনিকে এর সিকিভাগ মজাও হতো না।

পরদিন মীর্জা এহতেশাম এলো দুপুরের ঠিক পরে। বেবি আইসক্রিম থেকে অর্ডার দিয়ে বানিয়েছে চমৎকার ফুলের নকশা-করা লালচেরি বসানো মস্ত বড় দুটো আইসক্রিম কেক। ছোটনরা জীবনেও এত মজার আইসক্রিম খায় নি। আইসক্রিম খেতে খেতে ওরা শুনলো এহতেশাম ভাইয়া ওদের সবাইকে নাজ-এ সিনেমা দেখাতে নিয়ে যাবে। জুলে ভার্নের 'এ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ইন এইট্টি ডেজ' বইটা ইতুর পড়া ছিলো। সেই বইয়ের ছবি শুনে ভীষণ রোমাঞ্চিত হলো ওরা।

মীর্জা এহতেশাম টিকেট কেটেই এনেছিলো। বড়দি থেকে শুরু করে রন্টু-ঝন্টু পর্যন্ত সব মিলিয়ে দশজন। বড়দা মেজদা বয়সে বড়দির চেয়ে বড় বলে ওরা ডাঁট দেখিয়ে গেলো না। বড়দা অবশ্য বললো, ছবিটা ওর দেখা। ওরা না যাওয়াতে ছোটন ইতুরা খুশিই হলো। আরো খুশি হতো ছোড়দিটাকে রেখে যেতে পারলে। অসভ্যের মতো ও যে-ভাবে হেসে হেসে এহতেশাম ভাইয়ার সঙ্গে কথা বলছিলো— মনে হচ্ছিলো ও বড়দি হয়ে গেছে। ওরা খুব ভালো করেই জানে বড়দির পাশের জন্য এহতেশাম ভাইয়া সবাইকে ছবি দেখাচ্ছে। অথচ বেচারাকে ছোড়দি এক মুহূর্তের জন্যেও বড়দির কাছে ঘেঁষতে দিচ্ছে না।

তবে বড়দি খুব সেজেছে। এহতেশাম ভাইয়া ওর জন্য গোলাপি রঙের যে

জামদানি শাড়িটা এনেছে— ওটাই পরেছে। মেজো জেঠিমা ওর কানে ছোট্ট দুটো সোনার ফুল আর গলায় এক চিলতে হার পরিয়ে দিয়েছেন। তাতেই বড়দিকে পরির মতো লাগছিলো। ছোড়দা ঠাট্টা করে বললো, 'বড়দি, তোকে নতুন বউয়ের মতো লাগছে।' অন্য সময় হলে বড়দি নিশ্চয় একটা কড়া ধমক লাগাতো, অথচ ইতু লক্ষ্য করলো, ছোড়দাকে কিছু না বলে বড়দি শুধু লাজুক হাসলো।

রহস্যটা বোঝা গেলো রাতে। ভূপালী জেঠিমা মাঝপথে ওঁর গল্প বলার আসর ভেঙে দিয়ে বললেন, 'ছোটরা এবার নিচে গিয়ে খেলা করুক। আমরা বড়রা কিছু জরুরী কথা বলব।'

সেদিন রিমকি-সিমকিরা আসে নি। ছোটনরা ভূপালী জেঠিমার ঘর থেকে বেরিয়ে আর নিচে গেলো না। বড়দের জরুরি কথাটা শোনা ওদের জন্যেও জরুরী হয়ে পড়েছিলো। মেজদি, ছোড়দি নিচে চলে যেতেই ওরা আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ভূপালী জেঠিমার দরজায় কান পাতলো। দিদাকে বলতে শুনলো, 'ছেলে তো খুবই ভালো রাঙাবউ।'

'ভালো বলে ভালো!' পান চিবোতে চিবোতে ভূপালী জেঠিমা বললেন, 'আমাদের খানদান তো আপনি ভালো করে জানেন চাচিজান। মীর্জা এহতেশাম চাচাজানের এক লওটা বেটা আছে। ব্যবসাপাতি সব ও পাবে। কত দিলদরাজ লাড়কা আপনারাতো দেখেছেন। ওর সঙ্গে বিয়ে হলে জাহানারা বিটিয়া বহুৎ সুখ পাবে।'

বড় ফুপি বললেন, 'জাহানারাকে একবার জিজ্ঞেস করলে ভালো হতো না?'

দিদা শক্ত গলায় বললেন, 'তোমার বিয়ের সময় কি আমরা তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করেছিলাম আকিকুননেসা?'

শুকনো গলায় বড় ফুপি বললেন, 'তখনকার কথা আলাদা! তাছাড়া জানু ডাক্তারি পাশ করেছে। বুদ্ধিসুদ্ধি আছে— ।'

'ওর থাকলেও তোমার বুদ্ধিসুদ্ধি একেবারেই লোপ পেয়েছে বলে মনে হচ্ছে বাছা। এ-বাড়ির সব বিয়ে মুরুব্বিরা ঠিক করেন।'

ভূপালী জেঠিমা বললেন, 'চাচিজান বেআদবি মাফ করবেন। জাহানারা বিটিয়াকে পুছ করতে ঝামেলা কোথায়? আমার তো মনে হয় ও এহতেশামকে পছন্দ করেন। আজ দেখলেন না সিনিমায় যাওয়ার সময় কীরকম সাজলো!'

'জিজ্ঞেস করতে হলে মেজো বউ করুক।' গম্ভীরমুখে দিদা বললেন, 'ওকে বলে দিও উত্তরটা যেন— হ্যাঁ হয়।'

যা বোঝার বুঝে নিয়ে আসর ভাঙার আগেই কেটে পড়লো ছোটনরা। ইতুর মা নিচে ওদের ভাত বেড়ে নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। ঝটপট খাওয়া সেরে ওরা চলে এলো ওদের চিলেকোঠার ঘরে।

মিতু বললো, 'শিগ্‌গিরই আমরা তাহলে একটা বিয়ে খেতে যাচ্ছি।'

ছোটন বললো, 'আমার মনে হয় বড়দি সাইফ ভাইকে পছন্দ করেন।'

ইতু মাথা নাড়লো— 'আমার মনে হয় না। সাইফ ভাই বড়দির টিচার। ওঁর সঙ্গে হেসে দুটো কথা বলা মানে ওঁকে পছন্দ করা নয়। বরং আজ সিনেমায় যাওয়ার আগে ছোড়দা যেভাবে এহতেশাম ভাইয়ার কথা বলে বড়দির সঙ্গে ঠাট্টা করছিল, বড়দি তো কিছুই বললো না।'

ঝন্টু বললো, 'তোর কি মনে হয় বড়দি সত্যি সত্যি এহতেশাম ভাইয়াকে পছন্দ করে?'

ইতু মাথা নেড়ে সায় জানালো। ছোটন তবু বললো, 'বড়দির সঙ্গে সাইফ ভাইর বিয়ে হলে ভালো হত।'

ও ভাবছিল রিমকিদের কথা। সাইফ ভাইয়ের সঙ্গে বড়দির বিয়ে হলে রিমকিদের সঙ্গে মেলামেশার জন্য কেউ ওদের বারণ করতে পারবে না। মিতুর পছন্দ মীর্জা এহতেশামকে। বলল, 'এহতেশাম ভাইয়ারা কী বড়লোক দেখেছিস? আমার তো মনে হয় বড়দির জন্য সাইফ ভাইর চেয়ে এহতেশাম ভাইয়াই বেশি ভালো হবে।'

'কেন, খাওয়ায় বলে?' ফোড়ন কাটলো ইতু।

খেতে একটু বেশি পছন্দ করে মিতু। কিন্তু এ নিয়ে কিছু বলাটা ও মোটেই পছন্দ করে না। ইতুর কথা শুনে বিরক্ত হলো— 'কেউ কাউকে খাওয়ালে বুঝি দোষ হয়ে যায়?'

'খাওয়ানোর ভেতর যদি মতলব থাকে, সেটা নিশ্চয় দোষের ব্যাপার!'

বড়দির সঙ্গে কার বিয়ে হলে ভালো হয় এ নিয়ে ওদের ভেতর অনেক কথা হলো। দল ভারি মীর্জা এহতেশামের সমর্থকের। সাইফের পক্ষে ছিল ছোটন আর ইতু। শেষে মিতু নিরপেক্ষ হয়ে গেলো। বললো, 'যার সঙ্গে হোক, বিয়েটা শিগ্‌গির হওয়া দরকার।'

ছোটন আর ইতু ভেবেছিলো মীর্জা এহতেশামের সঙ্গে বিয়ের ব্যাপারে বড়দি নিশ্চয় আপত্তি করবে। মেজো জেঠিমা যখন এ-ব্যাপারে বড়দির মত জানতে গেল,সুবোধ বালিকার মতো বড়দি বললো, 'কাকে বিয়ে করবো এ নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই। তোমরা যা ভালো মনে করো করবে। আমার ইচ্ছে ইন্টার্নিশিপটা শেষ করে বিয়ে করা।'

'তার মানে তো আরো দুবছর।'

'তাতে কী! দুবছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে। আমাকে নিশ্চয় তোমরা বোঝা ভাবছো না?'

'ছিঃ জানু! তোকে কেন বোঝা ভাবতে যাবো! বড়বু বেঁচে থাকলে— ' কথা শেষ না করে মেজো জেঠিমা চোখে আঁচল চাপা দিলেন।

বড়দি মেজো জেঠিমার বুকে মাথা রেখে বললো, 'তোমরা কি কোনো দিন টের পেতে দিয়েছো আমার যে মা নেই!'

এ-কথা শুনে ডুকরে কেঁদে উঠলেন মেজো জেঠিমা। আড়িপাতার দল সরে গেলো দরজার আড়াল থেকে।

মীর্জা এহতেশাম যখন শুনলো ওকে বিয়ের ব্যাপারে বড়দির আপত্তি নেই, তখন প্রায় প্রতিদিন আসতে লাগলো ইতুদের বাসায়। প্রথমদিকে বড়দা একটু দূরে সরে থাকছিলো বয়সে বড়দির বড় বলে। কদিন পর লুকিয়ে আলাদা করে বড়দা আর ছোটকাকে ছবি দেখিয়ে এহতেশাম ওদেরও পটিয়ে ফেললো। ছোটরা তো এমন সব উপহার পেতে লাগলো যেগুলো ছিল ওদের স্বপ্নের জগতে। স্ট্যাম্প এ্যালবামের সঙ্গে রাশি রাশি স্ট্যাম্প, কয়েন এ্যালবামের সঙ্গে নানাদেশের কয়েন, কয়েকরকম গেমস, ইতুর জন্য দেব সাহিত্য কুটিরের পূজোবার্ষিকী— সব মিলিয়ে সবাই ধরে নিলো মীর্জা এহতেশামের সঙ্গেই বড়দির বিয়েটা খুব সুখের হবে।

শুধু সাইফ ব্যাপারটা পছন্দ করলো না। ছুটির দিন বাজার করতে গেলে ছোটনের সঙ্গে প্রায়ই ওর দেখা হয়। পরের রোববার বাজারের পথে যেতে যেতে ছোটন বললো, 'শুনেছেন সাইফ ভাই, বড়দির সঙ্গে এহতেশাম ভাইয়ার বিয়ের কথা চলছে!'

'এহতেশাম ভাইয়া মানে?'

'ভূপালী জেঠিমার এক ভাই-এর ছেলে। বিরাট বড়লোক।'

'যার সঙ্গে তোমরা প্রায় বিকেলে বেড়াতে বেরোও?'

'হ্যাঁ, দেখেছেন ওকে?'

'একদিন মোড়ের ডিস্পেন্সারিতে দেখেছিলাম। কী নিয়ে মালিকের সঙ্গে তর্ক করছিলো। কথাবার্তা শুনে তো খুব কালচার্ড মনে হলো না।'

কাষ্ঠ হেসে ছোটন বললো, 'ওদের অনেক বড় বংশ। ভূপালে সবাই জেঠিমাদের পরিবারকে চেনে।'

'সে তো তোমাদের জেঠিমা বলেছেন। তোমরা নিশ্চয় যাচাই করতে যাও নি?'

'আমরা যাই নি। ওঁদের বিয়েতে দাদু, জেঠুরা গিয়েছিলেন। ওঁরা বলেছেন বনেদি পীর বংশ জেঠিমাদের।'

'তোমাদের বড়দির কি মত আছে এ বিয়েতে?'

'বড়দি আপত্তি করে নি। শুধু বলেছে ইন্টার্নিশিপটা শেষ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে।'

'বড়লোকের বউদের জন্য ইন্টার্নিশিপটা নিশ্চয় জরুরী নয়।'

শুকনো গলায় ছোটন বললো, 'বড়দির তাই ইচ্ছে।'

সাইফ কিছুক্ষণ কোনো কথা বললো না। দুজন চুপচাপ হাঁটতে লাগলো সূত্রাপুরের বাজারের দিকে। একসময় আপন মনে সাইফ বললো, 'জাহানারা সম্পর্কে আমার ধারণা অন্যরকম ছিলো।'

ছোটন একটু ইতস্তত করে জানতে চাইলো— 'বড়দিকে আপনি কী ভাবতেন?'

সাইফ ছোটদের মুখের দিকে তাকালো। ওকে কেমন যেন অপরাধী মনে হচ্ছিল। একটু হেসে ছোটনের কাঁধে হাত রেখে সাইফ বললো, 'যে মেয়ে এত চমৎকার রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়,জীবনানন্দ দাশ আর বিষ্ণু দের কবিতা পছন্দ করে, ভালো আবৃত্তি করে, সে কেন বিয়ের জন্য একটা হাফ-খোট্টাকে পছন্দ করবে?'

কথাটা বলা উচিত হবে কিনা কিছুক্ষণ ভাবলো ছোটন। তারপর বলেই ফেললো— 'আপনি কিছু মনে করবেন না সাইফ ভাই। সেদিন পিকনিকে আপনাকে আর বড়দিকে ঝোপের আড়ালে কথা বলতে দেখেছিলাম। ভেবেছিলাম আপনারা বুঝি একজন আরেকজনকে পছন্দ করেন। এহতেশাম ভাইয়ার সঙ্গে বড়দির বিয়ে হোক এটা ইতুর আর আমার ভালো লাগে নি। আমরা নিজেরা বলাবলি করছিলাম আপনার সঙ্গে বড়দির বিয়ে হলে ভালো হতো। কিন্তু বড়দি যখন বিয়ের কথা শুনে কিছু বললো না, তখন মনে হলো আমরা আপনাদের ভুল বুঝেছিলাম।'

ছোটনের কথা শুনে সাইফ অস্বস্তিতে পড়ে গেলো। বললো, 'সেদিন আমি জাহানারাকে অভিনন্দন জানাতে গিয়েছিলাম। তাছাড়া বাড়িতে বাবাও বললেন, 'পিকনিকে যেতে।'

ছোটন অভিযোগের গলায় বললো, 'আমাদের ধারণা যদি ঠিক না হয়, তাহলে বড়দির সঙ্গে হাফখোট্টা না ফুলখোট্টার বিয়ে হল— এ নিয়ে আপনি কেন ভাবছেন?'

ছোটনের কথার কী জবাব দেবে সাইফ ভেবে পেলো না। কিছুক্ষণ চুপ থেকে আস্তে আস্তে বললো, 'তুমি ঠিকই বলেছো ছোটন। তোমাদের বড়দি কাকে পছন্দ করবে, কাকে বিয়ে করবে— এ নিয়ে আমার কিছু উচিত হয় নি।'

ছোটনের মনে হলো সাইফ কিছু একটা বলতে চেয়েও ঠিক বলতে পারছে না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ও বললো, 'এহতেশাম ভাইয়া মানুষ হিসেবে খুবই ভালো। কিন্তু বড়দির সঙ্গে তাঁর বিয়ে হবে এটা আমি এখনো মানতে পারছি না।' একটু থেমে আবার বললো, 'আপনার সঙ্গে যদি পরিচয় না থাকত তাহলে হয়তো এ নিয়ে ভাবতাম না।'

সামান্য হেসে সাইফ বললো, 'কথাটা তোমার বড়দিকে বলো, আমাকে কেন বলছো?'

'বলছি— আপনাকে আমরা সবাই পছন্দ করি বলে।'

'তোমাদের বড়দি নিশ্চয় করে না।'

'জানি না। আগে একবার মনে হয়েছিলো করে।'

'সেটা মীর্জা এহতেশামের সঙ্গে পরিচয়ের আগে।'

'পিকনিকের দিনও বড়দি আপনার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলেছে।'

'তেমন কোনো কথা নয় ছোটন— যাতে মনে হতে পারে তোমাদের বড়দি আমাকে পছন্দ করে।'

'আপনিও কি বড়দিকে পছন্দ করেন না?'

'কেন করবো না? তোমাদের সঙ্গে পরিচয়ের প্রথম দিনই বলেছিলাম জাহানারা খুব ভালো মেয়ে।'

কথা বলতে বলতে বাজার এসে গেলো। বাড়ি ফেরার সময় ছোটন সাইফকে বললো, 'বড়দির সঙ্গে কথা বলে আপনাকে জানাবো।'

হীরের নেকলেস চুরি

ছোটনের কাছে সব কথা শুনে ইতু বললো, 'এখন আর বলে কী লাভ। এহতেশাম ভাইয়া তো জেনে গেছে বড়দির এ বিয়েতে অমত নেই।'

'বড়দি দুবছর অপেক্ষা করতে বলেছে, এটা ভুলে যাচ্ছিস কেন?' জবাব দিলো ছোটন।

'তাহলে কি তুই মনে করিস বড়দিকে সাইফ ভাইয়ের কথা বলা দরকার?'

'সাইফ ভাইকে আমি কথা দিয়েছি যে!'

বড়দিকে একা পাওয়া কঠিন কিছু নয়। বেশির ভাগ সময় বড়দি ওর নিজের ঘরে পড়াশোনা করে সময় কাটায়। ছোটন আর ইতু এসে যখন সাইফের সব কথা খুলে বললো, শুনে অনেকক্ষণ গম্ভীর মুখে চুপচাপ বসে রইল বড়দি। একবার ছোটনদের দিকে তাকালো। ওর মনে হলো এতদিন ওদের যতটা ছোট ভাবতো আসলে ওরা ততটা ছোট নয়। ভালো লাগলো মেজো ও সেজো কাকার ছোট ছেলে দুটো তাকে নিয়ে ভাবছে বলে। বললো, 'আমি সাইফ ভাইর সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই। কলেজে নয়, বাইরে কোথাও।'

'নৌকা ভাড়া করে বুড়িগঙ্গার ওপার থেকে ঘুরে এসো না, ভালো লাগবে।' এই বলে ছোটন একবার ইতুকে দেখলো। তারপর বললো, 'আমরা একদিন ঘণ্টা হিসেবে ভাড়া করে ঘুরে বেড়িয়েছিলাম। দারুণ মজার। মাত্র ছআনা ঘণ্টা।'

বড়দি মৃদু হেসে বললো, 'একটা চিঠি দেবো সাইফ ভাইকে। লুকিয়ে পৌঁছে দিতে পারবি? মিতু, রন্টু, ঝন্টু, রিমকি, সিমকি কেউ জানতে পারবে না।'

'তুমি ভেবো না বড়দি।' ইতু বলল, 'আমরা ঠিক পৌঁছে দেবো। কাকপক্ষিও টের পাবে না।'

বড়দি অল্পকথায় ছোট্ট একটা চিঠি লিখে খামে পুরে মুখ বন্ধ করে ইতুর হাতে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে ওটা প্যান্টের পকেটে লুকিয়ে ফেললো ইতু। তারপর ওরা দুজন ভালো মানুষের মতো মুখ করে বড়দির ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

ছোটন চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলো, 'এখনই যাবি?'

ইতু মাথা নেড়ে সায় জানালো— 'তুই ওপরে যা। দুজনকে একসঙ্গে বেরোতে দেখলে মিতু রন্টুরাও আসতে চাইবে। বলিস, সাইফ ভাইর কাছ থেকে আমি গল্পের বই আনতে যাচ্ছি।'

ছোটন মুখ টিপে হেসে চিলেকোঠার ঘরে চলে গেলো। ভেজা বেড়ালের মতো ইতুও ওদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো, কেউ লক্ষ্য করলো না।

চিঠি পড়ে সাইফ বললো, 'জাহানারা আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছে।'

ইতু বললো, 'জানি। আমি আর ছোটন বলেছি নৌকা ভাড়া করে বুড়িগঙ্গা থেকে বেড়িয়ে আসতে। মিলব্যারাক ঘাট থেকেই ভালো নৌকা পাবেন।'

'ভালো বুদ্ধি বের করেছো তো! তোমাকে একটা উপহার দেয়া উচিত।' এই বলে সাইফ ওর বইয়ের আলমারির ভেতর থেকে নতুন একখানা 'পথের পাঁচালী' বের করে ইতুকে দিলো— 'এ বই পড়েছো?'

'নাম শুনেছি, পড়ি নি। এটা কি বড়দের বই?'

'আমি ক্লাস সিক্সে থাকতে প্রথম পড়েছি। এখনো পড়ি। বলতে পারো সব বয়সের বই।'

ইতু ক্লাস এইটে পড়ে। ভয় ওর ছোড়দিকে নিয়ে। একদিন নীহাররঞ্জনের 'উল্কা' পড়তে দেখেছিলো ছোড়দি। বড়দাকে বলে বকুনি খাওয়ালো— ও নাকি আজে বাজে নভেল পড়া শুরু করেছে। বড়দাকে বলার অবশ্য কারণও ছিলো। ওর আগে ছোড়দি নিজে পড়তে চেয়েছিলো,— দেয় নি বলে যত রাগ! রঙচঙে মলাট দেখে একবার স্কুলের লাইব্রেরি থেকে এনেছিলো সঞ্জীবচন্দ্রের 'কণ্ঠহার' বইটা। লাইব্রেরিয়ান টিচার গম্ভীরমুখে বলেছিলেন— 'কার বই নিচ্ছ জানো তো!' ইতু মাথা নাড়তে তিনি বললেন, 'বঙ্কিমচন্দ্রের ভাই হচ্ছেন সঞ্জীবচন্দ্র।' লাইব্রেরিয়ান কিছু বললেন না, অথচ ছোড়দি দেখেই— 'এ মা, এসব অসভ্য নভেল পড়িস তুই!' বলে বইটা ওর হাত থেকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেলো। ও চেঁচামেচি করতে পারতো, বড়দার

বকুনির ভয়ে কিছু বললো না। শুধু লুকিয়ে ছোড়দির হোমওয়ার্ক-করা খাতার দু'পাতার মাঝখানটায় চিবোনো চুইংগাম সেঁটে দিয়েছিলো।

'পথের পাঁচালী' দেখে ছোড়দি আবার কী কাণ্ড বাঁধায়, এই ভেবে ওটাকে জামার ভেতর গুঁজে বাড়ি এলো ইতু। বাইরের বসার ঘর পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতে যাবে— একেবারে বড় জেঠুর মুখোমুখি। চোরের মতো ওকে ঘরে ঢুকতে দেখে বললেন, 'তোর পেটটা অমন ফুলে আছে কেন, ফেঁপেছে নাকি?'

শুকনো গলায় ইতু বললো, 'না জেঠুমণি।'

'তবে?'

'ও কিছু নয় এমনি।' বলে জেঠুর সামনে থেকে পালিয়ে বাঁচলো ইতু।

চিলেকোঠার ঘরে রিমকি-সিমকিরাও ছিলো। রিমকি, ছোটন, মিতু আর ঝন্টু লুডু খেলছিলো। সিমকি আর রন্টু খাতা নিয়ে বসে খেলছিলো কাটাকুটি।

রিমকিকে দেখে সাইফ ভাই আর বড়দির কথাটা বলার জন্য ইতুর বুকের ভেতরটা আঁকুপাঁকু করছিলো। এসব ক্ষেত্রে কথা না বলে থাকতে পারাটা দারুণ কঠিন ব্যাপার। ইতু ভাবলো বড়দি বিশ্বাস করে ওকে একটা কাজ দিয়েছে। বড়দির বিশ্বাসের দাম ওকে আর ছোটনকে দিতেই হবে। খাটে উঠে বালিশ টেনে আধশোয়া হয়ে ইতু 'পথের পাঁচালী' পড়তে বসলো।

বিকেলে ওকে একা পেয়ে ছোটন বললো, 'দিয়েছিলি ঠিকমতো?' ইতু মাথা নেড়ে সায় জানালো। ছোটন আবার বললো, 'বড়দিকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, নাকি কাল যাবে।'

'আমি ভাবছি বড়দি যদি মত পাল্টায়, এহতেশাম ভাইয়ার কী অবস্থা হবে!'

'তোর কি মনে হচ্ছে বড়দি মত পাল্টাবে?'

'তাই তো হওয়া উচিত। সাইফ ভাইর সঙ্গে এহতেশাম ভাইয়ার কোনো তুলনাই হতে পারে না।'

পরদিন বিকেলে বড়দি বান্ধবীর বাড়িতে যাবার নাম করে বেরিয়ে গেলো। ইতু আর ছোটন খেলা ফেলে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছিলো বড়দির ফেরার জন্য। রিমকিরা লুডু খেলতে বসে দুবার ডেকেছিলো ছোটনকে। মাথা ব্যথার কথা বলে ও এড়িয়ে গেলো। ইতু বসেছিলো 'পথের পাঁচালী' নিয়ে। কয়েক পাতা পড়ে একবার নিয়ে যায়, আবার ছাদে আসে— এই করে বিকেল কাটালো।

সন্ধে নাগাদ ছোটন আর ইতু বড়দিকে ঢুকতে দেখলো সিং দরজা দিয়ে। কাউকে কিছু না বলে দুজন চুপিচুপি বড়দির ঘরে এলো। ওদের দেখে বড়দি ম্লান হাসলো। ছোটন বললো, 'তুমি কী ঠিক করলে বড়দি?'

বড়দি শুকনো গলায় বললো, 'সবাইকে একবার মত জানিয়ে দিয়েছি। এখন অন্য কথা বললে রাঙা জেঠিমার কাছে কারো মুখ দেখাবার জো থাকবে না।'

'সাইফ ভাই কী বললেন?'

'বললেন, আমি যা ভালো মনে করি তাই করতে।'

ইতু ভেজা গলায় বললো, 'কী হয় বড়দি, এখন যদি মত পাল্টাও! আমরা সবাই দিদাকে বলবো।'

'না রে, তা আর হয় না। এ-বাড়িতে আমিই প্রথম মেয়ে, বিয়ের ব্যাপারে যার মত জানতে চাওয়া হয়েছে। একবার বলেছি এহতেশামকে বিয়ে করতে আমার আপত্তি নেই। আবার বলবো আরেকজনকে বিয়ে করতে চাই— বাবা শুনলে ভারি কষ্ট পাবেন।'

বড়দির কথা শুনে ইতু আর ছোটন কষ্ট পেলো। কাছে এসে দুজনের কাঁধে হাত রেখে বড়দি বললো, 'এসব কথা ভুলে যা। কোনোদিন ঘুণাক্ষরেও কেউ যেন জানতে না পারে। মনে থাকবে তো লক্ষ্মী ভাই?'

ওরা বুঝতে পারছিলো এসব কথা বলতে বড়দির খুব কষ্ট হচ্ছে। ইতু জানে ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেই বড়দি দরজায় খিল দিয়ে কাঁদতে বসবে। ওদেরও খুব কান্না পাচ্ছিলো। বড়দির কথায় সায় জানিয়ে ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

তখনো চিলেকোঠার ঘরে রিমকি-সিমকিরা মিতুদের সঙ্গে লুডু খেলছিলো। আজ ওদের নানিও এসেছেন। ভূপালী জেঠিমার সঙ্গে জমিয়ে গল্প করছেন। ইতু আর ছোটন বাইরে রোয়াকের ওপর গিয়ে বসে রইলো চুপচাপ।

কিছুক্ষণ পর ছোটন বিরক্ত হয়ে বললো, 'ধ্যাৎ! কিছুই ভালো লাগছে না।'

ইতু বললো, 'ভূপালী জেঠিমা না এলেই বরং ভালো ছিলো।'

ছোটন একটু পরে বললো, 'ভূপালী জেঠিমা না এলে ও-বাড়ির সঙ্গে মেলামেশা যে বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো— ভুলে গেছিস বুঝি।'

'আসল কালপ্রিট হচ্ছেন সেজকা। পিকনিকের গাড়ি ঠিকমতো জোগাড় হলে এহতেশাম ভাইয়া চান্স নিতে পারতো না।'

'আসতে চাইলে অনেক ছুতো করে আসা যায়।'

ইতু কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললো, 'এহতেশাম ভাইয়ারই বা কী দোষ! বড়দি মানা করলেই সব চুকে যেতো।'

ছোটন সায় জানালো, 'সাইফ ভাই ওকে যতটা খারাপ ভাবছেন এহতেশাম ভাইয়া কি ততটা খারাপ! ভালো বাংলা না জানলে কী হবে, ওর মনটা তো খুব বড়। যারা ভালো বাংলা জানে না, রবীন্দ্রসঙ্গীত তেমন শোনে নি, তাদের ভেতর কি ভালো মানুষ নেই?'

ঠিক তখনই লম্বা সাদা ফোর্ড গাড়ি নিয়ে এহতেশাম ভাইয়া এসে ঢুকলো। গাড়ি থেকে নামলো দুটো মস্ত বড় আইসক্রিম কেক-এর বাক্স নিয়ে। কাছে এসে হেসে বললো, 'বহুৎ পেরেশান মালুম হচ্ছে! কোনো ঝুটঝামেলা হয় নি তো!'

'না এহতেশাম ভাইয়া।' ইতু বললো, 'ভেতরে যান, বড়দি ঘরেই আছে।'

'কাল আমরা সবাই বাগদাদ কা চোর দেখবো। মনে আছে তো তোমাদের?'

ছোটন আর ইতু সামান্য হেসে মাথা নেড়ে সায় জানালো। তারপর মীর্জা এহতেশামের হাত থেকে আইসক্রিমের বাক্স নিয়ে সবাই দোতালায় গেলো।

এহতেশাম ভাইয়া এসেছে শুনে চিলেকোঠা থেকে মিতু, রন্টু, ঝন্টু আর রিমকি-সিমকিও নেমে এলো। ছোড়দি রোজকার মতো ফাজলামো শুরু করলো। বড়দাও নিচে নিজের ঘরে যেতে যেতে বললো, 'যাওয়ার সময় দেখা করে যেও।'

এহতেশাম মিষ্টি করে হেসে সায় জানালো। ইতুরা লক্ষ্য করেছে এহতেশাম ভাইয়া যখন আসে তখনই বাড়ির সবাই উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। প্রত্যেকবার পান খাওয়ার জন্য দু'টাকা বখশিস পেয়ে দুখির মারও আহ্লাদের সীমা নেই। রাতে দিদা জোর করে মীর্জা এহতেশামকে খাইয়ে দিলেন।

এহতেশাম চলে যাওয়ার পর বড়রা দিদার ঘরে আলোচনায় বসলো। বিয়ের ব্যাপারে নাকি ও দেরি করতে চাইছে না। বলেছে বিয়ের পর জাহানারা ইন্টার্নিশিপ করুক কিংবা বিলেতে গিয়ে আরো ডিগ্রি আনুক, ও কোনো কিছুতেই আপত্তি করবে না। একমাত্র ছেলের বউ দেখার জন্য ওর আব্বা নাকি অস্থির হয়ে পড়েছেন। দিদা বললেন, 'এ-মাসের শেষে একটা ভালো তারিখ আছে। এহতেশাম বলে গেছে সেদিন হলে ভালো হয়। ওর ইচ্ছে রাঙাবউ থাকতে থাকতে বিয়েটা হয়ে যাক।'

ভূপালী জেঠিমা এ আসরে ছিলেন না। বড় জেঠু বললেন, 'এহতেশামকে বিয়ে করতে জানুর যখন আপত্তি নেই তখন এ মাসের শেষে হতেই পারে। দিন-কুড়ি সময় হাতে আছে। জানুর মার গয়না তো কম নেই। পুরোনো দু'এক সেট ভেঙে নতুন করে গড়ে নিলেই হবে।'

দিদা বললেন, 'আমাদের হীরের নেকলেসটাও তো জানু পাবে।'

ইতুদের বাড়ির এই এক রেয়াজ। ওদের বংশের এক আদিপুরুষ মোঘল দরবারে কাজ করতেন। নাকি সম্রাট শাহজাহান একটা হীরের নেকলেস দিয়েছিলেন তাঁকে। সেই থেকে বংশে যার প্রথম বিয়ে হয় নেকলেসটা সে পায়। দিদার কাছ থেকে পেয়েছিলেন বড় জেঠিমা। তাঁর একমাত্র মেয়ে জাহানারা। স্বাভাবিকভাবেই নেকলেসটা তার ভাগ্যে রয়েছে। বড় ফুপি দিদার কথা শুনে ছোট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'এই প্রথম হীরের নেকলেস আমাদের বংশের বাইরে চলে যাচ্ছে!'

'ছাগলের মতো কথা বোলো না আকিকুন নেসা। ছেলে হলে বংশ, মেয়ে হলে বংশ নয়— এসব আদ্যিকেলে কথা আমাকে বলতে এসো না। বংশ না হলে তুমিই বা কেন জামাইর বাড়ি ফেলে এ-বাড়িতে থাকো? ভালো করেই জানো আমার কাছে ছেলেমেয়ে সব সমান।'

দিদার ধমক খেয়ে চুপসে গেলেন বড় ফুপি। মেজো জেঠু বললেন, 'সময় যখন বেশি নেই, কাজগুলো ভাগাভাগি করে নিলে ভালো হয়।'

'খাতা কলম নিয়ে বসো। আগে আত্মীয়-স্বজনদের লিস্টি করো।'

ছোটকা উঠে কাগজ-কলম নিয়ে লিখতে বসলো। বিরাট লিস্টি। রন্টু আর ঝন্টুর ঘুম পাচ্ছিলো। ইতুর মনে হলো এ-বৈঠক কয়েক ঘণ্টা চলবে। অন্যদের ইশারায় বললো ওপরে যেতে। সবাই ঘরে এসে লেপের তলায় ঢুকলো।

ঘরটা চিলেকোঠা হলে কী হবে, এমনিতে বেশ বড়। একটা বড় আর একটা মাঝারি খাট ফেলার পরও অনেক জায়গা রয়েছে। একদিকের দেয়াল ঘেঁষে ওদের পড়ার জায়গা। কাঠের একটা বড় বাক্স আছে— ওপরে এটা-সেটা রাখা যায়, ভেতরে ওদের যাবতীয় সম্পত্তি। পুরানো আমলের জিনিস, খুলতে দু-তিনজন লাগে।

মাঝারি খাটে শোয় ইতু আর ছোটন, বাকি তিনজন বড় খাটে। পৌষ মাস এখনো শুরু হয়নি, এরই ভেতর শীত নেমে গেছে। মিতু লেপের তলা থেকে কচ্ছপের মতো মাথা বের করে বললো, 'বড়দির বিয়েতে দারুণ মজা হবে। এহতেশাম ভাইয়ার কাছ থেকে বাজি পোড়ানোর পয়সা নিতে ভুলিস না।'

রাতে ঘুমের ভেতর ওরা সবাই বড়দির বিয়ে নিয়ে বিচিত্র সব স্বপ্ন দেখলো। মজার স্বপ্ন দেখছিলো ছোটন— এহতেশাম ভাইয়া এসেছে হাতির পিঠে চেপে। সাইফ ভাই কোত্থেকে এসে চামরের মতো বড় একটা পালক দিয়ে হাতির পায়ের তলায় সুড়সুড়ি দিলো। হ্যাঁক হ্যাঁক করে হেসে উঠল হাতিটা। সামনের দু'পা তুলে একপাক নাচলো। সেই সঙ্গে এহতেশাম ভাইয়া ধপাস করে নিচে পড়ে গিয়ে— 'পাগড়ি কাহাঁ, পাগড়ি কাহাঁ' বলে চেঁচাতে লাগলো। ভূপালী জেঠিমা চেঁচাচ্ছেন— 'সেহনাই বাজাও মেঠাও লাও' বলে। স্বপ্ন দেখতে দেখতে ঘুমের ভেতরই শব্দ করে হাসলো ছোটন।

পরদিন সকাল না হতেই দিদা সবাইকে কাজ গছালেন। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বড়দের কাউকে একদণ্ড বসতে দিলেন না। তবে বিকেলে ছোটরা সবাই হইচই করে এহতেশামের সঙ্গে মায়া সিনেমায় গিয়ে 'বাগদাদ কা চোর' দেখে এলো। রাতে খাবারের পর কাজের ভয়ে বড় আর মেজো জেঠু পালিয়েছিলেন ইতুদের চিলেকোঠায়। সিগারেট টানতে টানতে বড় জেঠু বললেন, 'নিচে গিয়ে কেউ পাহারা দে। মা যেন টের না পান আমরা এখানে।'

ষাটের কাছে বয়স হলো বড় জেঠুর। এখনো দিদার সামনে সিগারেট খান না। বেশি ইচ্ছে করলে ছাদে এসে নয়তো রাস্তায় গিয়ে মোড়ের চায়ের দোকানে বসে কয়েক টান মেরে আসেন।

সিঁড়ির গোড়ায় বসে পাহারা দিচ্ছিলো ইতু। হঠাৎ লক্ষ্য করল দিদা তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে কাউকে না দেখে নিচে চলে গেলেন। একটু পরে ব্যস্ত পায়ে আবার উঠে এলেন দোতালায়। ইতুকে দেখে চাপা উত্তেজিত গলায় বললেন, 'তোর জেঠুরা কোথায় দেখেছিস?'

'ছাদে বসে কথা বলছে।' ইতু বললো 'ডেকে দেব?'

'শিগগির আমার ঘরে আসতে বল্।' এই বলে দিদা নিজের ঘরে ঢুকলেন।

ইতু দৌড়ে এসে বড় আর মেজো জেঠুকে বললো, 'তোমাদের দুজনকে এক্ষুণি দিদা ওঁর ঘরে যেতে বলেছেন।'

'কেন, কিছু বলেন নি?' শুকনো গলায় জানতে চাইলেন জেঠু। যেন দিদা ওঁর সিগারেট খাওয়ার কথা জেনে গেছেন।

ইতু বললো, 'জানি না কেন! দিদাকে খুব পেরেশান মনে হলো।'

দুই ভাইয়ের হাতে সিগারেট— আধখানাও শেষ হয় নি, নিভিয়ে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে বড় জেঠু নেমে যাওয়ার পর ইতুরাও পা টিপে নিচে নামলো। দরজার ফাঁক দিয়ে দেখলো, ঘরের ভেতর মা, কাকি, জেঠি, ফুপি, বাবা, কাকা, জ্যাঠারা সবাই রয়েছেন। ভূপালী জেঠিমার শরীর ভালো নয় বলে তিনি সবার আগে খেয়ে ঘুমিয়ে গেছেন। দিদা বড় জেঠু আর বড় ফুপির নাম ধরে বললেন, 'শোন সদরুদ্দিন, আকিকুননেসা আর সবাই। বাড়িতে একটা ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটে গেছে।'

দিদার কথার ধরনে সবার মুখ শুকিয়ে গেলো। বড় জেঠু মিনমিনে গলায় জানতে চাইলেন— 'কী হয়েছে মা?'

'আমাদের হীরের নেকলেসটা পাওয়া যাচ্ছে না।'

'সে কী মা!' আঁতকে উঠলেন বড় ফুপি— 'কোথায় ছিল ওটা?'

'ছিল জায়গামতোই। আমার আলমারির গয়নার বাক্সে। অন্যসব গয়না ঠিক আছে, শুধু হীরের নেকলেসটা নেই।'

'চাবি কার কাছে ছিল মা?'

ইতুর বাবার কথায় বিরক্ত হলেন দিদা— 'নেকু নেকু কথা বোলো না কামরুদ্দিন। আমার আলমারির চাবি যে সবসময় আমার আঁচলে বাঁধা থাকে, এটা তোমাদের কারো অজানা থাকার কথা নয়।'

'টের পেলেন কখন ওটা যে নেই?' প্রশ্ন করলেন বড় ফুপি।

'একটু আগে। জাহানারার বিয়েতে ওর মার ক'খানা গয়না দেবো স্যাকরাকে নতুন করে গড়ে দেবার জন্য— বাক্স খুলে দেখি ওটা নেই।'

'শেষ কবে দেখেছিলে হীরের নেকলেসটা?' জানতে চাইলেন বড় জেঠু।

'দিন দশেক আগেও দেখেছিলাম, পষ্ট মনে আছে। রাঙাবউ ওর জড়োয়া সেটটা তুলে রাখতে দিলো, বাক্স খুলে ওগুলো রাখলাম। তখনো ওটা বাক্সে ছিলো।'

'এর মধ্যে চাবিটা একবারও হাতছাড়া করেন নি মা?'

মেজ ফুপির কথায় আবার বিরক্ত হলেন দিদা— 'চাবিটা যে আমি কখনো হাতছাড়া করি না এটা তোমার জানা নেই বলতে চাও জরিফুন নেসা?'

ছোটবেলার এমন এক ঘটনার ইঙ্গিত দিলেন দিদা— মেজো ফুপির মুখটা

শুকিয়ে গেলো, যদিও অন্যরা কিছুই টের পেলো না। মেজো ফুপির শুকনো মুখ দেখে দিদার মায়া হল। গলাটা একটু নরম করে বললেন, 'ঘুমানোর সময়ও চাবি আমার আঁচলে বাঁধা থাকে।'

'কে নিতে পারে হীরের নেকলেস?' আপন মনে প্রশ্ন করলেন মেজো জেঠু।

'তুমি কি কাউকে সন্দেহ করো মা?' জানতে চাইলেন বড় জেঠু।

'কাকে সন্দেহ করবো?' বলে দিদা বড় ফুপির দিকে তাকালেন— 'কারো কারো এটা পছন্দ নয় যে, এ-বংশের নেকলেসটা জাহানারার কাছে যাক।'

বড় ফুপি শুকনো গলায় বললেন, 'সেদিন আমি কথাটা বলেছিলাম বংশের ভবিষ্যতের কথা ভেবে। আব্বু সবসময় বলতেন, এ-নেকলেসটার জন্যই আমাদের বংশের কাউকে বড় রকমের কোনো বিপদে পড়তে হয় নি।'

বড় ফুপির চোখে চোখ রেখে দিদা খরখরে গলায় বললেন, 'বংশের মঙ্গলের কথা ভেবে তোমরা কেউ যদি নেকলেসটা লুকিয়ে রাখো এই বেলা বের করে দাও। আমার মন বলছে ওটা জাহানারাকে না দিলেই বংশের অমঙ্গল হবে।'

'ছি ছি, এসব আপনি কী বলছেন মা?' বিব্রত গলায় বললেন বড় ফুপি— 'আমরা কেন নেকলেস লুকোতে যাবো? জানু কি আমাদের মেয়ে নয়?'

দিদার কথায় দুঃখ পেয়ে চোখে আঁচল দিলেন বড় ফুপি। দীর্ঘশ্বাস ফেলে দিদা বললেন, 'যেভাবে হোক নেকলেসটা খুঁজে বের করতেই হবে।'

'পুলিসে খবর দিলে হয় না?' ভয়ে ভয়ে কথাটা বললেন মেজ জেঠু।

'পুলিস কবে চোরাই মাল উদ্ধার করেছে আমার জানা নেই বাপু।' দিদা শান্ত গলায় বললেন, 'নিজেরা ভালো করে খুঁজে দেখো। নিতান্তই যদি না পাওয়া যায়, পুলিসকে বলতে হবে বৈকি। তবে এও বলি, পুলিস এসে বাড়ির লোকজনদের উল্টোপাল্টা জেরা করবে— সে বড় লজ্জার কথা।'

মেজ জেঠু বললেন, 'সত্যি সত্যি যদি ওটা চুরি হয়, জানুর বিয়ের আগে পুলিস খুঁজে বের করতে পারবে বলে তো মনে হয় না।'

'দরকার হলে জাহানারার বিয়ের তারিখ একবছর পিছিয়ে দেবো। হীরের নেকলেস ছাড়া জাহানারার বিয়ে হবে না।'

'বিয়ের তারিখ পেছানোর দরকার কি মা?' বড় জেঠু বললেন, 'এত ভালো একটা ছেলে পাওয়া গেছে— ওরকম না হলেও জানুকে আমি হীরের একটা নেকলেস কিনে দিতে পারবো।'

'না সদরুদ্দিন, আমি ওটাই চাই। কীভাবে খুঁজে বের করবে তোমরা জানো। আমার শেষ কথা হলো, জাহানারা ওই নেকলেস পরেই বিয়ে করবে।'

কথা শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন দিদা। বাইরে ছোটরা যারা দরজার আড়াল থেকে ঘরের ভেতরের দমবন্ধ করা নাটকের সংলাপ শুনছিল, তারা সবাই পা টিপে গুটিগুটি চলে গেলো তাদের চিলেকোঠার ঘরে।

মুশকিল আসানের আগমন

এতবড় একটা ঘটনা জানার পর ইতুরা যে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকবে এ-কথা বলাই বাহুল্য। বড়দির বিয়েতে ওরা কত রকমের মজা করবে ভেবে-ভেবে হদ্দ হয়ে গেছে, সেই বিয়ে পিছিয়ে যাওয়ার দুঃখে মিতু আর রন্টু, ঝন্টুর মন খুবই খারাপ। ইতু আর ছোটন চেয়েছিলো সাইফ ভাইর সঙ্গে বড়দির বিয়ে হোক। সেজন্য বিয়ে পিছিয়ে যেতে পারে শুনে মনে-মনে খুশি হলেও দিদা যে বললেন হীরের নেকলেস না পাওয়া গেলে বংশের অমঙ্গল হবে, শুনে ওদের মনেও ভয় ধরে গেছে।

রন্টু কাঁদো কাঁদো গলায় বললো, 'কতদিন এ-বাড়িতে কোনো উৎসব হয় না। অন্যদের বাড়িতে বিয়ে হতে দেখে কতদিন মনে হয়েছে কবে আমাদের বাড়িতে বিয়ে হবে। শেষপর্যন্ত যা-ও হতে যাচ্ছিল— সবকিছু গুবলেট হয়ে গেলো।'

মিতু বললো, 'কী শয়তান চোর! অন্য কিছু নিলেই তো পারতো!'

ছোটন শুকনো গলায় বললো, 'নেকলেসটা যদি সত্যিসত্যি না পাওয়া যায়— কোত্থেকে কোন্ বিপদ আসে কে জানে!'

ঝন্টু বললো, 'এহতেশাম ভাইয়া শুনলে ভারি কষ্ট পাবে।'

মিতু বললো, 'এত বড়লোক যখন ওরকম একটা নেকলেস বড়দিকে কিনে দিলেই তো পারে!'

ছোটন বিরক্ত হয়ে বললো, 'বোকার মতো কথা বলিস না। শুনিস নি দিদা কী বলেছেন? বড়দির বিয়েতে ওই নেকলেসটাই লাগবে, নইলে বংশের অমঙ্গল হবে।'

ইতু বললো, 'বড়রা বড়দের মতো খুঁজুক। কাল থেকে চল্ আমরাও নেকলেসটার খোঁজে নেমে পড়ি।'

'কীভাবে?' বলে সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়লো ইতুর ওপর।

গলাটা এক ধাপ নামিয়ে ইতু ওর পরিকল্পনার কথা সবাইকে বললো। শুনে সবার চোখগুলো চকচক করে উঠলো। সারাক্ষণ ইতুর বই নিয়ে পড়ে থাকা

ছিলো ঝন্টুর দু'চোখের বিষ। সবার আগে ও-ই বললো, 'ডিটেকটিভ বই পড়ে তোর তো দারুণ বুদ্ধি হয়েছে রে ইতু।'

ইতু গম্ভীর হয়ে বললো, 'বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়। কাল ভোরে উঠতে হবে।'

দিদা ভেবেছিলেন বাড়ির বাইরে চলে যাচ্ছে বলে কেউ হয়তো নেকলেসটা লুকিয়ে রেখেছে, বিয়ের পর বের করে দেবে। রাতে সবাইকে ডেকে ওভাবে বলার উদ্দেশ্য ছিলো যেই নিয়ে থাকুক যেন ওটা ফেরত দিয়ে দেয়। সেজন্য তিনি ভূপালী জেঠিমাকে নেকলেস হারানোর কথাটা জানাতে চান নি। বিয়ে পিছিয়ে দেয়ার ব্যাপারটা নিশ্চয় তাঁর পছন্দ হবে না। ভোর না-হতেই ভূপালী জেঠিমা কথাটা জেনে ফেললেন। মোটা-সোটা বেতো শরীর নিয়ে ছুটে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে দিদাকে বললেন, 'হাঁ চাচিজান এসব কী শুনছি?'

দিদা ফজরের নামাজ সেরে জায়নামাজে বসে তসবি গুনছিলেন। শুকনো গলায় বললেন, 'ঠিকই শুনেছো।'

'ওটা তো বহুত কিমতি জেভর ছিলো চাচিজান। দিল্লির বাদশাহ শাহজাহান না দিয়েছিলেন?'

কোনো কথা না বলে দিদা মাথা নেড়ে সায় জানালেন।

'কঈ লাখ দু'লাখ থেকে কম না হবে!'

দিদা আগের মতো মাথা নেড়ে সায় জানালেন।

'আপনি কি বলেছেন চাচিজান, ওটা না পেলে জাহানারা বিটিয়ার শাদির তারিখ পিছিয়ে দিবেন?'

দিদা আবারও আগের মতো মাথা নাড়লেন।

'শাদির তারিখ পাক্কা হয়ে গেছে। এখন পিছানো কি ঠিক হবে চাচিজান?'

দিদা কোনো কথা না বলে তসবি গুনতে লাগলেন।

'আমি বলি কি চাচিজান— ' ইতস্তত করে ভূপালী জেঠিমা বললেন, 'আমার নওরতনের জাড়োয়াসেট জো আছে, ওটাও বহুৎ কিমতি আছে। জাহানারা বিটিয়ার শাদীতে আমি ওটা ওকে তোহ্ফা দিব। আপনি শাদির তারিখ পিছাবেন না।'

দরুদ পড়া শেষ করে দিদা তসবির ছড়ায় চুমু দিয়ে কপালে ছুঁইয়ে জায়নামাজের একপাশে রাখলেন। তারপর শান্ত গলায় বললেন, 'তোমার নওরতনের সেট তুমি জাহানারাকে দেবে কিনা সেটা তোমার ব্যাপার ভূপালী বউ। আমি চাই আমাদের হীরের নেকলেসটা বিয়ের রাতে জাহানারার গলায় থাকবে।'

দিদার কথা বলার ধরন দেখে ভূপালী জেঠিমা মুখ কালো করে চলে গেলেন বড় ফুপির কাছে। দিদার সঙ্গে তাঁর কী কথা হয়েছে শুনে বড় ফুপি চাপা গলায় বললেন, 'মার সবকিছুতেই বাড়াবাড়ি। কাল ভাইজান বললো, আরেকটা হীরের

নেকলেস কিনে দেবে, আজ তুমি বলছো নওরতনের সেট দেবে। এরপর কেন বিয়ের তারিখ পেছাতে হবে, আমি কিছুতে বুঝতে পারছি না রাঙাবউ। এহতেশাম কী বলেছে বিয়েতে হীরের ওই নেকলেসটাই দিতে হবে?'

'ছি ছি, আপনি এসব কী বলছেন!' বড় ফুপির কথায় দুঃখ পেলেন ভূপালী জেঠিমা— 'এহতেশাম ওরকম খানদানে পয়দা হয় নি যে জেভরের লালচে শাদি করবে! আপনারা একখানা জেভরও যদি না দেন তবু এহতেশাম শাদি করবে। জেভরাত তো ওই দিবে। ওর কি রুপিয়া দৌলতের কমি আছে?'

নিচে রান্নাঘরে যাওয়ার সময় দিদার চোখ পড়লো বড় ফুপির ওপর। ভূপালী জেঠিমার সঙ্গে ওঁর গুজগুজ করাটা মোটেই পছন্দ হলো না। বড় ফুপি সেটা টের পেয়ে উঠে পড়ে শুকনো মুখে সকালের নাশতার ব্যবস্থা করতে গেলেন।

দুপুর নাগাদ মীর্জা এহতেশামও জেনে গেলো নেকলেস চুরির কথা। প্রথমে পুলিসে খবর দেয়ার কথা বললেও দিদার যুক্তি ওর পছন্দ হলো। বললো, 'দাদিজান সহি বাত বলেছেন। পুলিসে খবর দিলে চোররা ভয় পেয়ে ওটাকে ভেঙে ফেলতে পারে।' একটু থেমে এহতেশাম কী যেন ভাবলো। তারপর বললো, 'পুলিস ছাড়াও দুসরা এক তরিকা আমার জানা আছে।'

'সেটা আবার কী?' জানতে চাইলো বড়দা।

'মিরপুর মাজার শরিফে এক মুশকিল আসান ফকির বাবা এসেছেন। বহুত কামেল ফকির। উনাকে খবর দিয়ে আনতে পারলে উনি জরুর বলতে পারবেন নেকলেস কোথায় আছে।'

দিদা বললেন, 'মুশকিল আসান যদি নেকলেস বের করে দিতে পারে আমি হাজার টাকা দেবো।'

'না দাদিজান, তিনি কোনো রুপিয়া নিবেন না। উনার সামনে রুপিয়ার কথা কভি বলবেন না। রুপিয়ার কথা শুনলে উনি বহুত গুস্‌সা হন।'

'তাহলে তো ভালোই মনে হচ্ছে। তুমি ওকে আজই নিয়ে এসো।'

দিদার কথা শুনে সবাই আশ্বস্ত হলো। বড় ফুপি তো ভয়ে ভয়ে ছিলেন— মুশকিল আসানের কথা শুনে দিদা না আবার রেগে যান।

বিকেলে মীর্জা এহতেশামের বিশাল ফোর্ড গাড়িতে চেপে লম্বা সাদা চুলদাড়িওলা মুশকিল আসান এলেন। গলায় সাত-আটখানা আকিক পাথরের মালা। দুহাতের বুড়ো আঙুল ছাড়া বাকি সব আঙুলে নানারকমের পাথরের আঙটি। খয়েরি রঙের আলখাল্লা গায়ে, হাতে সাত বাঁকা একখানা শক্ত লাঠি।

গাড়ি থেকে নেমে বারান্দায় উঠতেই মুশকিল আসানের কপালে কয়েকটা ভাঁজ পড়লো। দোতালার টানা-বারান্দার এক মাথায় জাজিম পেতে তাকিয়া বালিশ দিয়ে তাঁর বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাইরের বারান্দায় বড় বালতিতে তাঁর ওজু করার জন্য গোলাপের পাপড়ি ছিটানো পানি রাখা হয়েছে।

আগরবাতির সুগন্ধি ধোঁয়ার বারান্দার বাতাস ভারি হয়ে আছে। এতসব আয়োজন দেখেও মুশকিল আসান প্রসন্ন হলেন না। বেশকিছু সময় নিয়ে ওজু করে তিনি জাজিমে বসে দু'রাকাত নফল নামাজ পড়লেন। তারপর চোখ বন্ধ করে অনেকক্ষণ কী যেন ধ্যান করলেন। দিদা, জেঠি, ফুপি আর কাকিরা সব তাঁকে ঘিরে বসেছিলেন। তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে সবাই এরই ভেতর ভক্তিতে রীতিমতো গদগদ হয়ে পড়েছে।

মুশকিল আসান চোখ মেলে তাকালেন। সবার মুখের ওপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে ভূপালী জেঠিমার ওপর এসে থামলেন। ঠাণ্ডা মোলায়েম গলায় পরিষ্কার বাংলায় বললেন, 'তুমি তো মা ভূপালের নক্‌শ্‌বন্দি পীর ঘরানার মেয়ে।'

ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে ভূপালী জেঠিমা বললেন, 'হুজুর সহি বাত বলেছেন। আল্লাপাকের এই গুনাহগার বান্দিকে আপনি হুকুম করুন।'

ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুশকিল আসান বললেন, 'আমিও কম গুনাহগার বান্দা নই মা। আমি অবাক হচ্ছি— এ-বাড়ির ওপর এতবড় এক খাবিস জিনের নজর পড়েছে, অথচ তুমি কিছু টের পেলে না! আর কেউ না জানুক তোমার তো জানা উচিত ছিল মা!'

'আমি পহেলা দিনই বুঝছিলাম হুজুর। ভেবেছিলাম আমি এ-বাড়িতে যতদিন থাকব ততদিন ওরা কেউ ঝুটঝামেলা করবে না। এখন মালুম হচ্ছে বহুৎই নালায়েক আছে জিনটা। ভূপালে গিয়েই দরবারের পাক জনাবকে কথাটা জরুর বলব।'

মৃদু হেসে মুশকিল আসান দিদার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমাকে যে আজকের রাতটা সময় দিতে হবে মা সকল। আপনাদের জিনিস ঠিকই পাবেন, তবে এই কমিনা জিনটাকে শায়েস্তা করতে কিছু সময় লাগবে।'

বড় ফুপি বললেন, 'হীরের নেকলেস কি খবিস জিনটা চুরি করেছে?'

মেজো ফুপি বললেন, 'জিনরা কি নেকলেস পরে?'

ফুপিদের অর্বাচীন কথায় মুশকিল আসান অমায়িক হাসলেন— 'না মা, জিনরা নেকলেস কেন, কোনো গয়নাই পরে না। নিজের হাতে চুরিও করে না। তবে কারো ওপর যখন ভর করে তখন সে চুরিও করতে পারে, মানুষও খুন করতে পারে।'

মেজো জেঠিমা বললেন, 'এ-বাড়ির কারো ওপর ভর করলে তো আমরা টের পেতাম। নিশ্চয় বাইরের কেউ হবে।'

'না মা।' হাসিমুখে মাথা নাড়লেন মুশকিল আসান— 'জিন কারো ওপর ভর করলেই যে টের পাবে এমন কোনো কথা নেই। ওরা যদি জানাতে না চায় তোমরাও বুঝবে না ঠিক কার ওপর ভর করেছে।'

'সে কী!' বলে আঁতকে উঠলেন বড় ফুপি। সন্দেহ-ভরা চোখে ঘাড় ফিরিয়ে

সবাইকে দেখলেন। তারপর হতাশ হয়ে বললেন, 'বোঝার কি কোনোই উপায় নেই হুজুর?'

'না মা, তোমাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়।' এই বলে মুশকিল আসান ভূপালী জেঠিমার দিকে তাকালেন— 'সবাই না বুঝলেও আশা করি তোমার বুঝতে অসুবিধে হবে না।'

ভূপালী জেঠিমা লাজুক হেসে বললেন, 'এই গুনাহগার বান্দিকে শরমিন্দা করবেন না হুজুর। এখানে কারো ওপর খাবিসটার নজর লাগে নি।'

কথাটা শোনার পর ফুপি-জেঠি-কাকিরা সবাই হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। মুশকিল আসান কথা না-বাড়িয়ে আবার ধ্যানে বসলেন।

বড়রা যখন মুশকিল আসানকে নিয়ে ব্যস্ত পঞ্চপাণ্ডব তখন ওদের তদন্তের কাজে বিভোর। রিমকি-সিমকিকেও সঙ্গে জুটিয়েছে। বেশ কয়েকবার বাড়ির বাইরে গেছে ওরা। দুখির মা, বনমালী, গিরিবালা আর সব কাজের লোকদের সঙ্গেও কী সব কথা বলেছে। কাউকে কাউকে রীতিমতো জেরাও করেছে। বাড়িতে মুশকিল আসানের আগমন, খবিস জিনের নজর আর সেইসঙ্গে ছোটদের পুলিসি জেরায় কাজের লোকরা সবাই ভয় পেয়ে গেছে। জিনের ভয় সবচেয়ে বেশি দুখির মা আর গিরিবালার। একফাঁকে ওরা ভূপালী জেঠিমার কাছ থেকে পানিপড়া নিয়ে গেছে।

ইতু আবার কোন্ রহস্যের গন্ধ খুঁজে পেয়েছে গলির মোড়ের ওষুধের দোকানে সে-ই জানে। সন্ধের পর 'ওদিকটায় আমি নজর রাখবো, তোমরা সবাই কাজের লোকদের ওপর নজর রাখবে।' — বলে একা বেরিয়ে গেলো। রিমকি-সিমকির কাজ হচ্ছে বনমালী আর তোরাবালীর ওপর নজর রাখা। ওরা কখন বাইরে যায়, কোনদিকে যায়, কখন ফেরে, ওদের কাছে বাইরের কেউ আসে কি না, এ-বাড়ির কেউ ওদের সঙ্গে কথা বলে কি না— সব খাতায় লিখে রাখতে হবে। এমন এক রোমাঞ্চকর কাজ পেয়ে রিমকি-সিমকি দারুণ উত্তেজিত। খুশি চেপে রাখতে না-পেরে রিমকি একবার বলেই ফেললো, 'ইতুটা একটা জিন্ হয়েছে। ভাগ্যিস কথাটা ইতু শোনে নি।'

ইতুদের বাড়িতে মুশকিল আসান এসেছেন শুনে সন্ধ্যের পর রিমকিদের নানি এলেন দেখতে। বড় ফুপি খরখরে চোখে ওঁকে ভালো করে দেখলেন। তারপর তাকালেন ভূপালী জেঠিমার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে। ভূপালী জেঠিমা মাথা নেড়ে ইশারায় 'না' বললেন। আশ্বস্ত হয়ে বড় ফুপি বসতে বললেন রিমকির নানিকে।

মুশকিল আসান ধ্যানের মাঝখানে যেই না একবার চোখ মেলে তাকালেন, রিমকির নানি ব্যস্ত গলায় জানতে চাইলেন, 'হুজুর বাবা, খাবিস জিনের নজর কি আমাদের বাড়ির ওপরও পড়েছে? এটার একেবারে লাগোয়া বাড়ি যে ওটা!'

কয়েক মুহূর্ত রিমকির নানির চোখের দিকে তাকিয়ে মুশকিল আসান

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'এখনো পড়ে নি, তবে পড়তে বেশি বাকিও নেই। এশার নামাজের পর কেউ যেন বাড়ি থেকে না বেরোয়।'

কথাটা শুনে রিমকির নানি আর বসলেন না। মুশকিল আসান একই কথা দিদাকেও বললেন। দিদার অবশ্য ব্যস্ত হওয়ার কিছু ছিলো না। খুব জরুরি কাজ না হলে এ বাড়ির বড়রাও এশার পর কেউ বাড়ির বাইরে থাকে না।

ছোটন আর মিতু বাইরের রোয়াকের এককোণে বসে নজর রাখছিলো কাজের লোকদের ওপর। জায়গাটা অন্ধকার বলে কারো পক্ষে বোঝার উপায় নেই ওরা যে ওখানে বসে আছে। রিমকির নানি ব্যস্ত হয়ে চলে যাওয়ার একটু পরে ঝন্টু এসে বললো, 'দিদা বলে দিয়েছেন এশার নামাজের পর কেউ বাড়ির বাইরে যেতে পারবে না, মুশকিল আসানের হুকুম।'

মিতু বললো, 'ভালোই হল। এশার আজান পর্যন্ত পাহারা দিলেই চলবে। ইতুটা এর আগে ফিরলে হয়।'

মিতুর কথা শুনে ছোটন বিরক্ত হলো— 'তোর ভালো না লাগলেও ওপরে গিয়ে নাক ডেকে ঘুমোগে। ইতু বলেছে রাত বারোটা পর্যন্ত পাহারা দিতে। আমি তার আগে নড়ছি না।'

'তোর সবটাতেই বাড়াবাড়ি।' বলে হাঁড়িমুখ করে বসে রইলো মিতু। ঝন্টু কাঁধ নাচিয়ে চলে গেলো নিজেদের জায়গায়।

এশার আজান দিয়েছে সাড়ে সাতটা নাগাদ। চোর-ডাকাত ছাড়া মিতুর অন্য ভয়ও ছিলো। এশার নামাজের পর যদি জিনরা সত্যিসত্যি বেরোয়, ওদের দুজনকে হজমি গুলির মতো গিলে খেতে এক সেকেণ্ডও লাগবে না। ভাবতে গিয়ে আবার খটকাও লাগলো— জিনরা কি মানুষ খায়? কথাটা ছোটনকে জিজ্ঞেস করতে গিয়েও করলো না। নির্ঘাত ও কাল সকালে রিমকিদের বলে হাসাহাসি করবে। মিতু যখন একা-একা জিনের কথা ভেবে ভয় পেয়ে ডিসেম্বরের রাতে কুলকুল করে ঘামছিলো, তখনই নজরে পড়লো ছোটকা চোরের মতো পা টিপে টিপে বাইরের বৈঠকখানা থেকে বেরোলেন। মিতু বলতে যাচ্ছিলো— আজান হয়ে গেছে, এখন কারো বেরোনো চলবে না— ছোটন ইশারায় ওকে চুপ থাকতে বললো।

ছোটকা এদিক-ওদিক চেয়ে দেখলেন কেউ তাঁকে দেখতে পেলো কি না। হাতে ধরা ছোট পুঁটলিটা নিয়েই তাঁর ভয়। একবার ভাবলেন আলোয়ানটা গায়ে জড়িয়ে বেরোলেই ভালো হতো। বেরিয়ে যখন পড়েছেনই, আর কেউ যখন দেখে নি, ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না। টুক করে সিং দরজার ফোকর দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

ছোটকার বাঁ-হাতে ধরা কাপড়ের পুঁটলিটা ছোটনরা পরিষ্কার দেখতে পেয়েছে। মিতু ফিসফিস করে বললো, 'ছোটকা ওভাবে কোথায় যাচ্ছে?'

ছোটন মুহূর্তের ভেতর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো। মিতুকে বললো, 'আমি ছোটকাকে ফলো করতে যাচ্ছি। তুই ওপরে গিয়ে এদিকটায় নজর রাখবি।'

মিতু হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো— 'ফিরতে দেরি করিস না।' বলে ও ছাদে গেলো।

এক দৌড়ে সিং দরজা পেরিয়ে রাস্তায় এসে ছোটন দেখলো, ছোটকা অল্প দূরে দাঁড়িয়ে রিকশা ডাকছে।

বুড়ো রিকশাওয়ালা কাছে আসতেই ছোটকা দরদাম না করে উঠে বসলো। ছোটন হালকা পায়ে একরকম দৌড়ে চললো রিকশার পেছন পেছন।

রাত তখন আটটা বাজতে চলেছে। হেমেন্দ্র দাস রোডের সরু রাস্তায় রিকশা আর মানুষের আনাগোনা এতটুকু কমে নি। লোকজনের ভেতর দিয়ে দৌড়োতে সুবিধেই হল ছোটনের। রিকশার গতি বেশি ছিলো না। ছোটকাও দেখতে পেলো না।

বাংলাবাজার পেরিয়ে রিকশা পটুয়াটুলির রাস্তা ধরে এগিয়ে চললো। বুড়ো রিকশাওয়ালা ছোটকার তাড়া খেয়েও জোরে টানতে পারছিলো না। পটুয়াটুলির রাস্তা পেরিয়ে রিকশা ইসলামপুরে ঢুকতেই ছোটনের বুকের ভেতর ঢিবঢিব করতে লাগলো। ইসলামপুরের রাস্তার দুপাশে সব আলো ঝলমলে স্বর্ণকারের দোকান। ও যা সন্দেহ করছিলো তাই হলো। ছোটকা রিকশা থামালেন রাধাচরণ জুয়েলার্স-এর সামনে। রিকশাওয়ালাকে দাঁড়াতে বলে তিনি ভেতরে ঢুকলেন।

ছোটন রাস্তার ওপার থেকে রুদ্ধশ্বাসে দেখতে লাগলো ছোটকার কীর্তিখানা। তিন বছর ধরে চাকরি নেই, ঘরে বেকার বসে আছেন— তাই বলে বাড়ির গয়না চুরি করে এনে বিক্রি করতে হবে— ভাবতে গিয়ে ছোটনের দুঃখের আর সীমা থাকলো না। ছি ছি ছি! কাল রিমকি-সিমকিরা শুনলে কী ভাববে? রাগে অপমানে ছোটনের রীতিমতো কান্না পেলো। দোকানের একেবারে ভেতরে গিয়ে ছোটকা পুঁটলিটা এগিয়ে দিলেন ম্যানেজার গোছের এক লোককে। সে ওটা নিয়ে ভেতরের এক ঘরে গিয়ে মিনিট তিনেক পরে বেরিয়ে এলো। ছোটকাকে কী যেন বললো, বোঝা গেলো তাঁর পছন্দ হয় নি। পুঁটলিটা গিট বেঁধে ছোটকা দোকান থেকে বেরিয়ে আবার রিকশায় উঠলেন। ছোটন কিছুটা আশ্বস্ত হলো। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ছোটকার সঙ্গে ওদের দরে বনে নি। রিকশা আবার উল্টোদিকে ঘুরতে ছোটন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। ছোটকা তাহলে অন্য কোনো জুয়েলার্সে যাচ্ছে না। তার মানে গয়নাটা রাতের মতো বাড়িতে থাকছে। ছোটন ঠিক করলো বাড়ি গিয়ে সবার আগে কথাটা দিদাকে বলবে।

এশার নামাজ শেষ হয়ে গেছে, শিংটোলা মসজিদের মুসল্লিরা ঘরে ফিরছে, অথচ ইতু-ছোটন কারো পাত্তা নেই দেখে মিতু-ঝন্টু-রন্টুর মুখ শুকিয়ে গেলো। একটু পরে ওরা ছাদের ওপর থেকে ছোটকাকে দেখলো সিং দরজা দিয়ে চুপিচুপি বাড়িতে এসে ঢুকতে। মিতু বললো, 'ছোটকা বোধহয় ভেবেছে খাবিস জিন ওকে

ধরার জন্য ওঁৎ পেতে বসে আছে।' পরে ছোটনকে ঢুকতে দেখে ওরা আশ্বস্ত হলো। সবাই অপেক্ষা করতে লাগলো কখন ও ওপরে আসে। ছোটকাকে ফলো করার মতো কী হয়েছে— মিতু, রন্টু, ঝন্টু, কেউ কিছু বুঝতে পারছিলো না। ইতু বলেছে কাজের লোকদের ওপর নজর রাখতে। ছোটনের নির্ঘাত মাথা খারাপ হয়ে গেছে। নইলে কি আর ছোটকাকে কাজের লোক মনে করে!

দিদাকে ওঁর ঘরে একা ডেকে নিয়ে ছোটকার কীর্তির কথা ছোটন খুলে বললো। সব শুনে দিদা চাপা গলায় বললেন, 'চুপ চুপ, এ-কথা ঘুণাক্ষরেও কাউকে বলিস না। যা করার সব আমি করব। তুই মুখে কুলুপ এঁটে থাকবি।'

ছোটন মাথা নেড়ে সায় জানিয়ে গুটি গুটি পায়ে ছাদের দিকে গেলো। ভাবলো মুশকিল আসানের ভয়ে বেচারা ছোটকা রাতের বেলা এত দামি জিনিসটা বিক্রি করতে গিয়েছিলো। মুশকিল আসান যদি টের পেয়ে যান নেকলেসটা ছোটকার কাছে আছে— দিদা কীভাবে সামলাবেন ভাবতে গিয়ে ছোটন কোনো পথই খুঁজে পেলো না। দিদা যেভাবে মানা করেছেন, ইতুকেও কথাটা বলা যাবে না। তবে নেকলেসের সন্ধান যখন পাওয়া গেছে তখন রাত না জেগে আরামে ঘুমোনো যেতে পারে। এই ভেবে ছাদে এসে ছোটন দেখলো ইতু তখনো ফেরে নি। সবাই ওকে দেখে একসঙ্গে বললো, 'ছোটকাকে ফলো করতে গেলি কেন? ছোটকা কি চাকর?'

ছোটন কাষ্ঠ হেসে বললো, 'মস্ত এক বোকামি করে ফেলেছি। ছোটকা গেছে ওর বন্ধুর বাড়িতে। আমি ভেবেছিলাম অন্য কিছু— '

ঘড়িতে তখন রাত নটা। এশার নামাজের সময় মেজো জেঠিমা ছোটদের ডেকে খাইয়ে দিয়েছেন। ছোটনও এসে খেয়ে নিয়েছে। বাড়িতে মুশকিল আসানের উপস্থিতি আর রাতে খাবিস জিনের আগমনের সম্ভাবনায় বড়রা সবাই এত ব্যস্ত আর চিন্তিত ছিলো— ইতু যে খেতে আসে নি এ-কথা কারো মনেই হয় নি।

দূরে দমকল অফিসের পেটা ঘড়িতে যখন ঢং ঢং করে রাত নটার ঘণ্টা বাজলো তখন ছোটন বললো, 'তোরা শুয়ে পড়। আমি গলির মোড়ে গিয়ে দেখে আসি ইতু এতক্ষণ কী করছে।' অন্যদের চেয়ে ইতু আর ছোটনের সাহস বেশি। মিতু মনে মনে খুশি হলো ছোটন ওকে সঙ্গে যেতে বলে নি। বললো, 'রাত তো মোটে নটা বাজে। এখনই শোয়ার কী আছে! তুই ইতুকে নিয়ে আয়। ওর মাথায় নতুন কোনো প্ল্যান এসেছে কি না কে জানে।'

ছোটন পা টিপে নিচে নামলো। মুশকিল আসান বারান্দার আলো নিভিয়ে দিয়েছেন। ওঁর ডানপাশে ঝুলবারান্দায় শুধু একটা হারিকেন জ্বলছে। মুশকিল আসান তখনো ধ্যানে বসে আছেন। পাশে আরো কয়েকজন ছিলেন। লোবানের ধোঁয়ায় ঢাকা হারিকেনের আবছা আলোয় তাদের চেনা গেলো না। ছোটন যে

কোন্ ফাঁকে বেরিয়ে গেলো ওরা কেউ টেরও পেলো না।

রাস্তায় নেমে ছোটনের মনে হলো দিদাকে দেয়া কথাটা অন্তত ইতুর কাছে ভাঙতে হবে। নেকলেস চোরকে খুঁজে বের করার দায়িত্ব নিয়েছে ইতু। চোর যখন পাওয়া গেছে তখন ওদের দায়িত্ব শেষ। নজর রাখার বুদ্ধিটা ইতুর হলেও চোরের সন্ধান পাওয়ার কৃতিত্বটা ষোলআনাই ওর। নিজের সাফল্যে ছোটন উৎফুল্ল হলেও চোর যে আর কেউ নয়, ওদের ছোটকা— কথাটা ভাবতেই পৃথিবীটা ওর কাছে অসার মনে হলো।

ডিসেম্বর মাসের রাত নটা মানে অনেক রাত। ছোটন গলির মাথায় এসে দেখলো বুড়ো বাকের মিঞার পান-দোকান ছাড়া অন্য সব দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। বাকের মিঞা ওদের সবাইকে চেনে। ইতুরা ওকে চাচা ডাকে। কাছে গিয়ে ছোটন জিজ্ঞেস করলো, 'বাকের চাচা, আমাদের ইতুকে দেখেছো আজ সন্ধ্যার পর?'

বাকের মিঞা ভুরু কুঁচকে বলল, 'হ, দেখছিলাম তো মাগরেবের বাদে। বর্মণ বাবুর লোহার দোকানের ভিতরে বইয়া আছিলো। ক্যা, বাড়িত যায় নাই?'

'না বাকের চাচা।' শুকনো গলায় জবাব দিলো ছোটন।

'দোস্ত-উস্তের বাড়িত যাইবার পারে।' ছোটনের উদ্বেগকে পাত্তা না দিয়ে বাকের মিঞা বললো, 'তোমাগো বাড়িত বলে এক মুসকিল আসান হুজুর আইছে? চাচিজানরে কইও কাইল সেলাম করতে যামু।'

মাথা নেড়ে সায় জানালো ছোটন। বাড়িতে ফিরলো বিষণ্ন আর উদ্বিগ্ন এক চেহারা নিয়ে। চিলেকোঠায় এসে ঝন্টুদের বললো, 'ইতু হারিয়ে গেছে।'

দুখির মার রহস্যজনক আচরণ

ছোটনের কথায় যেন ওদের চিলেকোঠার ঘরে পাঁচশ পাউন্ডে বোমা ফাটলো। কিছুক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলো না রন্টু, ঝন্টু আর মিতু। বসে রইলো পাথরের মূর্তির মতো। ইতুকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে ছোটন। ইতুর মতো বুদ্ধিমান আর সাহসী ছেলে ও দ্বিতীয়টি দেখে নি। বাকের চাচার সঙ্গে কথা

বলার পর থেকে ওর বুকের ভেতর ঝড় বয়ে যাচ্ছিলো। 'ইতু কীভাবে হারিয়েছে?' ফিসফিস করে প্রথমে জানতে চাইলো ঝন্টু।

মিতু চাপা গলায় বললো, 'ও কোথাও যেতেও তো পারে।'

রন্টু বললো, 'কে জানে জাফরদের বাড়িতে গেছে হয়তো বই-টই আনতে।'

ছোটন আস্তে আস্তে বললো, 'ইতু যদি নিজের ইচ্ছায় কোথাও যায়, সবচেয়ে খুশি হবো আমি। বাড়িতে এতবড় একটা বিপদ, আমরা সবাই চোর ধরার জন্য রাত জেগে পাহারা দেবো, আর ও কারো বাড়িতে বসে এতক্ষণ ধরে আড্ডা মারবে— ইতু এরকম ছেলে নয়।'

মাথা নেড়ে সায় জানালো ঝন্টু— 'কিন্তু হারাবে কী করে?'

'আমার মনে হচ্ছে— ' চিন্তিত গলায় ছোটন বললো, 'সন্দেহজনক কাউকে ফলো করতে গিয়ে ও কোথাও আটকে গেছে।'

'হতে পারে কেউ ওকে আটকে রেখেছে।' ভয় পাওয়া গলায় বললো মিতু।

'তাও হতে পারে।' সায় জানালো ছোটন।

অনেক রাত পর্যন্ত ওরা কেউ ঘুমোতে পারলো না। বারবার ওদের মাথায় ঘুরতে লাগলো— ইতু কি নিজের ইচ্ছায় কোথায় গেছে, নাকি গুণ্ডাদের খপ্পরে পড়েছে!

দমকল অফিসের পেটা ঘড়িতে রাত তিনটার ঘণ্টা বাজলো। মিতু, রন্টু, ঝন্টু একটু আগে ঘুমিয়ে পড়েছে। বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করছিলো ছোটন। হঠাৎ ওর মনে হলো, গুণ্ডারা ইতুকে নিশ্চয় আদর করে শোয়ার জন্য বিছানা পেতে দেয় নি। নিশ্চয় ওকে ওদের ফলো করার জন্য খুব মেরেছে। ছেড়ে দিলে যদি বিপদ হয় সেজন্যে ইতুকে ওরা মেরেও ফেলতে পারে। এসব কথা মনে হতেই বালিশে মুখ গুঁজে অনেকক্ষণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলো ছোটন।

ভোরে দুখির মার ডাকে ওদের ঘুম ভাঙলো। ছোটন দেয়ালঘড়িতে দেখলো আটটা বাজে। দুখির মা বললো, 'ছোড মায় কইছে তুমাগো জলদি কইরা নাশতা কইরা লইতে। ঘরভর্তি ম্যামান আইছে মুশকিল আসান ফকিরের দোয়া লওনের লাইগা। কেতলিতে কুলান যায় না, ডেকচিতে চা বহাইছি।'

ইতুর নিখোঁজ হওয়ার সংবাদটা বাড়িতে কীভাবে জানাবে এ নিয়ে চিন্তিত ছিলো ছোটনরা। দুখির মার কথা শুনে মনে হলো ওরা কে কোথায় আছে এদিকে নজর দেয়ার কেউ নেই। ছোটন ভাবলো সময় নিয়ে চিন্তাভাবনা করে বলা যাবেখন।

নাশতা খেতে নিচে নেমে ছোটনরা দেখলো দুখির মা মিথ্যে বলে নি। বারান্দায় পাড়ার বয়স্ক মহিলারা মুশকিল আসানকে ঘিরে গোল হয়ে বসেছেন। নিচের ঘরে বড় জেঠু পাড়ার বুড়োদের সঙ্গে গল্প করছেন। মুশকিল আসান অতীতের অনেক কথা বলে আর সেই সঙ্গে দুটো চোর ধরে সবাইকে চমকে দিয়েছেন।

নাশতা করে ছোটনরা ওপরে গিয়ে ছাদের কোণে দেখলো রিমকি-সিমকি বসে আছে। ওদের দেখতে পেয়ে সিমকি ডেকে বলল, 'তোমরা শুনেছো, মুশকিল আসান বলেছেন তিনদিনের ভেতর খারাপ জিনটাকে দেশছাড়া করবেন!'

রিমকি বললো, 'তোমরা চারজন কেন, ইতু কোথায়?'

ছোটন এ-কদিনে বুঝতে পেরেছে লেখাপড়ায় ভালো বলে রিমকি ইতুকে বেশি পছন্দ করে। ওকে ছাদে দেখেই ও বুঝে ফেলেছিলো ইতুর হারিয়ে যাওয়ার কথা লুকিয়ে রাখা যাবে না। গম্ভীর হয়ে বললো, 'আমাদের ওপর ভীষণ বিপদ রিমকি!'

বিপদের কথা শুনে রিমকি-সিমকি দুজনই ঘাবড়ে গেলো। শুকনো গলায় রিমকি জানতে চাইলো— 'ইতুর কিছু হয় নি তো?'

মাথা নেড়ে সায় জানালো ছোটন। নেকলেস চুরি যাওয়া থেকে শুরু করে ইতুর নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা সব খুলে বললো। শুধু বললো না ছোটকার কথা।

সিমীক ঢোক গিলে বললো, 'নিশ্চয় খারাপ জিনটা ইতুকে কোথাও উড়িয়ে নিয়ে গেছে। ও জানতো না এশার নামাজের পর যে বাইরে যাওয়া বারণ ছিলো?'

'না, ইতু জানতো না।' জবাব দিলো ঝন্টু— 'ও বেরিয়ে যাওয়ার পর কথাটা বলেছিলেন দিদা।'

'তোমরা কী করবে ঠিক করেছো?' জানতে চাইল রিমকি।

'কিছুই ভেবে পাচ্ছি না কী করবো। বড় জেঠু যদি জানতে পারেন সবাই মিলে প্ল্যান করে ইতুকে গলির মাথায় পাঠিয়েছি— কাউকে আস্ত রাখবেন না।'

সিমকি বললো, 'মুশকিল আসান নিশ্চয় বলতে পারবেন ইতু কোথায় আছে।'

'ওঁকে বলা মানে সবার জেনে যাওয়া।'

রিমকি একটু ভেবে বললো, 'ভাইয়া বাসায় আছে। ওকে বললে হয়তো একটা বুদ্ধি দিতে পারবে।'

ঝন্টু ছোটনকে বললো, 'রিমকি ঠিক বলেছে। সাইফ ভাই নিশ্চয় আমাদের চেয়ে ভালো বুঝবে।'

কথা না-বাড়িয়ে ওরা সবাই রিমকিদের বাড়িতে গেলো। সাইফ নিজের ঘরে বসে বই পড়ছিলো। সবাইকে একসঙ্গে দেখে একটু অবাক হলো— 'কী ব্যাপার, সবার মুখ ভার কেন? কোনো ঝামেলা বাঁধাও নি তো!'

ছোটনের মুখে সব কথা শুনে সাইফের মুখ শুকিয়ে গেলো— 'এক্ষুনি থানায় জানানো দরকার। ইতুর কোনো ছবি আছে তোমাদের কাছে?'

ঝন্টু কাঁদোকাঁদো গলায় বললো, 'থানায় জানালে বাড়ির সবাই জেনে যাবে।

বড় জেঠু আমাদের মেরে ফেলবেন।'

সাইফ গম্ভীর গলায় বললো, 'তোমাদের গোয়েন্দাগিরির সংবাদ বড় জেঠুকে না দিলেও চলবে। ইতু সন্ধ্যেবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, আর ফিরে আসে নি। এর বেশি বাড়িতে বলার দরকার নেই।'

'থানা থেকে ওরা বাড়িতে আসবে না জেরা করতে?'

'আসতে পারে। তবে বেশি হইচই করতে মানা করে দেবো। এস পির ছোট ভাই আতিক আমার বন্ধু। ওকে নিয়ে আগে এস পির সঙ্গে কথা বলবো। চট করে কেউ গিয়ে ইতুর একটা ছবি নিয়ে এসো।'

ছোটন ছবি আনতে গেলো। সিমকি বললো, 'পুলিসে বলার কী দরকার! ওদের বাড়িতে যে মুশকিল আসান ফকির এসেছেন, ওঁকে বললেই তো হয়। ইতু কোথায় আছে ঠিক বলে দিতে পারবেন।'

সিমকির কথা শুনে সাইফ বিরক্ত হলো। বললো, 'পীর-ফকিররা যদি ছেলেধরা চোর-ডাকাত ধরতে পারতো আর পানিপড়া দিয়ে অসুখ ভালো করতো, তাহলে দেশে পুলিসের দরকার হতো না, ডাক্তারেরও দরকার হতো না।'

সাইফের কথা সিমকির পছন্দ হলো না। তবু কিছু বললো না, যদি ও রেগে যায় সেই ভয়ে। ও খেয়াল করেছে কদিন ধরে সাইফ অল্প কথাতেই চট করে রেগে যাচ্ছে। একটু পরে হাঁপাতে হাঁপাতে ছোটন এলো ছবি নিয়ে। বললো, 'ইতুর একা ছবি নেই। এটাতে ও আর আমি একসঙ্গে, স্টুডিওতে গিয়ে তুলেছিলাম।'

ছবি দেখে সাইফ বললো, 'চলবে। এবার চলো, তোমাদের বড় জেঠুকে কথাটা বলে আসি আতিকদের বাসায় যাবো।'

বাইরে বসার ঘরে আসর জমিয়ে গল্প করছিলেন বড় জেঠু। পাড়ায় ওর কাছাকাছি বয়সের যাঁরা ছিলেন তাদের প্রায় সবাই এসেছেন। সাইফ ওঁর কাছে গিয়ে বললো, 'আপনি একটু বাইরে আসুন। জরুরী কথা আছে।'

রাস্তুর দাদু তখন কন্দকাটা ভূতের এক ভয়ংকর গল্প বলছিলেন। এমন একটা রোমহর্ষক গল্পের মাঝখান থেকে উঠে আসাটা বড় জেঠুর পছন্দ হলো না। ডাক্তার ছোঁড়াটার গলা শুনে মনে হলো গুরুত্বপূর্ণ কোনো কথা বলতে চায়, তাই উঠে এলেন। বারান্দায় এসে ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে?'

'ইতু কাল সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, রাতে ফেরে নি।'

সাইফের কথা শুনে বড় জেঠুর কপালে কয়েকটা ভাঁজ পড়লো। ছোটনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বন্ধু-বান্ধবদের বাসায় খবর নিয়েছিস?'

ছোটন ভয়-পাওয়া গলায় বললো, 'ইতু কখনো অন্য কারো বাসায় রাতে থাকে না।'

'হুম।' চিন্তিত গলায় বড় জেঠু বললেন, 'হুজুরকে তাহলে কথাটা বলতে হয়।'

সাইফ বললো, 'আমি পুলিসে খবর দিতে যাচ্ছি। ছোটন আমার সঙ্গে যাবে।'

'ঠিক আছে যাও।' এই বলে ঝন্টুদের দিকে তাকালেন বড় জেঠু— 'আমাকে না বলে কেউ যদি বাড়ির বাইরে এক পা দিয়েছিস পিঠে আস্ত খড়ম ভাঙবো।'

ঝন্টুরা সবাই শুকনো মুখে ওপরে ওদের ঘরে গেলো। রিমকিদের নানি দুপুর পর্যন্ত এ বাড়িতে থাকবেন। ওরাও ঝন্টুদের সঙ্গী হলো।

ছোটনকে সঙ্গে নিয়ে সাইফ সোজা ওর বন্ধু আতিকের বাসায় গেল। হঠাৎ সাইফকে দেখে অবাক হলো ওর বন্ধু। বললো, 'এই অসময়ে কোত্থেকে এলি? আমি তো একটু পরেই বেরিয়ে যাচ্ছিলাম!'

'তোকে নিয়ে আমিন ভাইর কাছে যাবো। আমাদের পাশের বাড়ির একটা ছেলে হারিয়ে গেছে।'

কথা না-বাড়িয়ে আতিক বললো, 'দাঁড়া, আমি গাড়ি বের করছি।'

সাইফের এই বন্ধুটি ব্যবসা করে বেশ পয়সা বানিয়েছে। ওর গাড়িতে করে সাইফ আর ছোটন এসপির অফিসে এলো। সরাসরি এসপির ঘরে না গিয়ে আতিক ওঁর পিএ'র ঘরে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'ভেতরে যাওয়া যাবে শরীফ?'

কমবয়সী পি এ আতিকের চেনা। বললো, 'স্যার একাই আছেন, চলে যান আতিক ভাই।'

আতিকের সঙ্গে সাইফকে দেখে এস পি আমিন আহমেদ বললেন, 'এই যে ডাক্তার এসো এসো। হঠাৎ কী মনে করে?'

কোনোরকম ভূমিকা না করে সাইফ এস পি-কে ইতুর নিখোঁজ হওয়া আর ওদের হীরের নেকলেস চুরির কথা জানালো। ছোটনকে দেখিয়ে বললো, 'এ হচ্ছে ইতুর ভাই ছোটন।'

এস পি ছোটনকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের কেন মনে হলো রাত জেগে গলির মোড়ে পাহারা দিলে তোমরা নেকলেস চোর ধরতে পারবে?'

'মুশকিল আসান চোর ধরতে পারবে, ইতু আর আমি কখনো বিশ্বাস করতে পারি নি।' ছোটন বললো, 'আমরা ভেবেছি কাজের লোকদের কেউ চুরি করতে পারে। ওদের কারো চলাফেরায় সন্দেহ করার মতো কিছু চোখে পড়ে কিনা, অচেনা কেউ ওদের কাছে আসে কিনা, ওরা কোথাও যায় কিনা— সেসব দেখার জন্য আমরা ভেবেছিলাম রাত জেগে পাহারা দেবো।'

'তোমরা বুদ্ধিমান ছেলে।' এস পি বললেন, 'মনে হচ্ছে ইতু সন্দেহজনক কাউকে ফলো করতে গিয়ে আটকা পড়েছে, নয়তো ছেলেধরার পাল্লায় পড়েছে।'

ছেলেধরার কথা শুনে ছোটনের মুখ শুকিয়ে গেলো। কিছুদিন আগে গিরিবালা ধোপানি খবর দিয়েছে কোথায় এক পাহাড়ী নদীর ওপর পুল বানানো

হচ্ছে আর বারবার পুলটা ভেঙে যাচ্ছে। নাকি একশ' আটটা ছেলের কাটা মুণ্ডু পেলে সেই নদী শান্ত হবে। গিরিবালাদের এক আত্মীয়ের ছেলের মুণ্ডু-ছাড়া ধড় পাওয়া গেছে মাস দুয়েক আগে।

ছোটনকে ভয় পেতে দেখে এস পি বললেন, 'ইতু যেখানেই থাকুক, আমরা খুঁজে বের করবো। তোমরা বাড়ি যাও। বিকেলে আমি নিজেই আসবো। এবার বলো ইতুর খুব কাছের বন্ধু কারা আছে যাদের বাড়িতে ও সবসময় যাওয়া আসা করে।'

'ইতু যে দুই বন্ধুর বাড়িতে মাঝেমাঝে বই আনতে যায় সেখানে আমি ফোন করেছি, যায় নি। নিজের ইচ্ছায় কোথাও গেলে ও সঙ্গে সঙ্গে ফোন করতো।'

সাইফের কাছ থেকে ইতুর ছবিটা নিয়ে ভালো করে দেখলেন এস পি। আপন মনে বললেন, 'চোখ দেখে মনে হয় খুব শার্প ছেলে।'

আতিক ওর গাড়িতে করে শিংটোলা গলির মোড়ে সাইফ আর ছোটনকে নামিয়ে দিলো। ছোটন বললো, 'বর্মণদের লোহার দোকানে একটু খোঁজ করা দরকার, সাইফ ভাই। বাকের চাচা বলছিল ও নাকি এখানে বসেছিলো।'

সাইফ কোনো কথা না বলে ছোটনদের সঙ্গে এলো। বর্মণদের দোকানে ফুটফরমাশের কাজ করে নিতাই, ছোটনদের বয়সী, ভালো করেই চেনে ওদের। ছোটন ওকে দোকানের বাইরে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করল— 'কাল সন্ধ্যায় ইতু তোদের দোকানে বসে কী করছিলো রে?'

নিরীহ গলায় নিতাই বলল, 'কিছু তো করে নাই ছোটন দাদা। খালি বইয়া আছিল। দুকান বন্ধ করনের অল্প আগে আৎকা আমার সাইকল লইয়া বাইর ওইয়া গেলো। কইলো কাইল দিয়া যামু। মনে ওইলো চিনা কাউরে দেখতে বুঝি। ক্যান ইতু দাদা কী করছে?'

ছোটন গম্ভীর হয়ে বললো, 'ইতু রাতে বাড়ি ফেরে নি।'

'কও কী ছোটনদাদা!' ভয় পাওয়া গলায় নিতাই বললো, 'কই যাইবার পারে কুন হদিশ পাও নাই?'

'না, মনে হচ্ছে ছেলেধরার পাল্লায় পড়েছে।'

'হায় ভগমান! অখন কী ওইব?'

'পুলিসে খবর দিয়েছি। তুই নজর রাখিস আমাদের পাড়ায় অচেনা সন্দেহজনক কোনো লোক ঘোরাফেরা করে কি না। দেখলে সোজা এসে খবর দিবি।'

'ঠিক আছে।' সায় জানালো নিতাই।

বাকের চাচাকেও একই কথা বললো ছোটন। সাইফ বাড়ি যেতে যেতে জিজ্ঞেস করলো— 'পাড়ায় তুমি সন্দেহজনক কাকে আশা করছো ছোটন?'

ছোটন গম্ভীর গলায় বললো, 'ইতু যদি ছেলেধরার খপ্পরে পড়ে ওরা নিশ্চয়

মুক্তিপণ চাইবে আমাদের কাছে।'

'মুক্তিপণ' কথাটা কিছুদিন আগে ইতুর মুখেই শুনেছে ছোটন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিজেদের ডেরায় নিয়ে আটকে রেখে ছেলেধরারা ওদের বাড়িতে চিঠি পাঠায় টাকা চেয়ে। বলে টাকা না দিলে কিংবা পুলিশে খবর দিলে নাকি মেরে ফেলবে।

ছোটন আশা করছিলো বাড়ি গিয়ে দেখবে ইতু এসে গেছে, না বলে বাইরে রাত কাটানোর জন্য বড় জেঠুর বকুনি খাচ্ছে। যদি তা না হয় তাহলে হয়তো দেখবে রক্তের ছাপমারা চিঠি হাতে চিন্তিত মুখে বসে আছে বাবা, কাকা, জেঠুরা— যে চিঠিতে ইতুর জন্য মুক্তিপণ চাওয়া হয়েছে।

বাড়ি এসে দেখলো বাইরের ঘরের আড্ডা ভেঙে গেছে। শুধু বড় আর মেজ জেঠু চুপচাপ বসে আছেন। ছোটনকে দেখে বড় জেঠু জিজ্ঞেস করলেন— 'খবর দেয়া হয়েছে?'

ছোটন মাথা নেড়ে সায় জানালো— 'হয়েছে।'

'কী বললো?'

'বললো, ইতু যেখানে থাকুক খুঁজে বের করবে।'

মেজ জেঠু আপনমনে বললেন, 'পুলিস সবসময় এরকম কথা বলে।'

ছোটন আবার বললো, 'এস পি সাহেব বিকেলে আসবেন।'

'এস পি নিজে আসবেন?' বড় জেঠু একটু অবাক হলেন।

'হ্যাঁ, সাইফ ভাইর খুব পরিচিত।'

'ঠিক আছে।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বড় জেঠু বললেন, 'মাকে গিয়ে বল্। মা একেবারে ভেঙে পড়েছেন।'

দিদা ওঁর ঘরে একা শুয়েছিলেন। ছোটনকে দেখে উঠে বসলেন— 'কোনো খবর পাওয়া গেছে?'

'না দিদা।'

কথাটা শুনে দিদা আবার শুয়ে পড়লেন। ছোটন বললো, 'বিকেলে এস পি সাহেব নিজে আসবেন।'

'পুলিসকে কি নেকলেস চুরির কথা বলেছিস?'

'বলেছি দিদা।'

'বলে দিস নি তো ছোটকা ওটা নিয়েছে?'

'না দিদা।'

'দরজাটা টেনে নিয়ে নিজের কাজে যা।' গম্ভীর গলায় কথাগুলো বলে দিদা পাশ ফিরে শুলেন।

ছোটন ওপরে এসে দেখলো সবাই ওর জন্য অপেক্ষা করছে। ও চিলেকোঠার ঘরে ঢুকতেই সবাই একসঙ্গে জানতে চাইলো কী হয়েছে।

এসপি'র সঙ্গে কী কথা হয়েছে, নিতাই আর বাকের চাচাকে কী বলেছে সব ওদের জানালো ছোটন। সিমকি ওকে বললো, 'বড় জেঠু হুজুরকে ইতুর কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন মাগরেবের পর বলতে পারবেন ইতু কোথায় আছে। আমি ঠিকই বলেছিলাম। হুজুর বলেছেন এর পেছনেও নাকি খাবিস জিনটা আছে।'

রন্টু বললো, 'এহতেশাম ভাইয়া এসেছিলো কিছুক্ষণ আগে। ইতুর কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেছে। বলল, পুলিসের ওপর মহলে নাকি ভালো জানাশোনা আছে। কাকে নাকি ফোন করবে।'

এস পি আমিন আহমেদ এলেন ঠিক সন্ধ্যের সময়। সঙ্গে সূত্রাপুর থানার দারোগা আর দুজন পুলিস অফিসার। ওঁরা নাকি ডিটেকটিভ ব্র্যাঞ্চের। কাজের লোকদের জেরা করার জন্য ডাকার সময় ধরা পড়ল দুখির মা পালিয়েছে। বাবুর্চি হামিদ আলী আর সেজ কাকির আয়া বশিরন বলল, দুপুরে খাওয়ার সময়ও দুখির মাকে নাকি দেখে নি। ভেবেছে বাড়ি গেছে, ছেলের অসুখ বেড়েছে হয়তো।

দিদা শক্ত গলায় বশিরনকে বললেন, 'দুখির মা পালিয়েছে আমাকে এতক্ষণ বলিস নি কেন?'

বশিরন ঢোক গিলে বললো, 'আফনের শরীল ভালা না হুইন্যা আমি ছোড মারে কইছি। মনে করছি হাইনঝের আগে আইয়া পড়ব।'

দিদা দারোগাকে বললেন, 'যেখানেই পালাক ওকে খুঁজে বের করা চাই।'

দারোগা ব্যস্ত গলায় বললেন, 'আপনি ব্যস্ত হবেন না, হারামজাদিকে আমি চব্বিশ ঘণ্টার ভেতর এনে হাজির করবো। ওর একটা ছবি দিন মা।'

'চাকর বাকরের ছবি কোন্ আহ্লাদে রাখতে যাবো শুনি? ছবি-টবি হবে না।'

'ঠিক আছে মা। ছবি না হলেও চলবে। ওর ঠিকানাটা কি জানা আছে?'

'কোন্ বস্তিতে থাকে বাবুর্চিকে জিজ্ঞেস করো বাছা। ইতুর তো ছবি দেয়া হয়েছে। ওর কি কোনো হদিস পেয়েছো?'

'পেয়ে যাবো মা। বজ্জাত বেটিটাকে ধরলে পারলে সব খবর পাওয়া যাবে।'

এসপি অন্যঘরে বড় জেঠুর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বললেন। একবার দোতালায় গিয়ে ধ্যানে-বসা মুশকিল আসানকেও দেখে এলেন। যাওয়ার সময় দিদাকে বললেন, 'আপনি ভেঙে পড়বেন না। চোখকান খোলা রাখুন, যেন আর কিছু ঘটতে না পারে। ইতুকে আমরা শিগগিরই খুঁজে বের করবো।'

'দুখির মা নচ্ছারটার কথাও যেন মনে থাকে।' দিদার ধমক খেয়ে এসপি কাষ্ঠ হাসলেন।

বাঘের গুহায় ইতু

মুশকিল আসান যখন ইতুর হদিশ জানালেন, রাত তখন বারোটা। বাড়ির সবাই রাতের খাওয়া সেরে তাঁর চারপাশে গোল হয়ে বসেছিলো। পাড়ার কয়েকজন মহিলা কৌতূহলী হয়ে থাকতে চেয়েছিলেন। জেঠিমা মিষ্টি হেসে শক্ত গলায় ওদের বিদায় করেছেন। রিমকিদের নানি অবশ্য সন্ধ্যার পরই চলে গিয়েছিলেন।

মুশকিল আসান অনেকক্ষণ ধরে ধূপ পোড়ালেন। ধূপের ঝাঁঝালো গন্ধভরা ধোঁয়ায় গোটা বারান্দা অন্ধকার হয়ে গেলো। তাঁর সামনে একটা আয়না রাখা। আয়নার ওপর ভুসোকালি মাখানো। তাঁর চোখ দুটো বোজা ছিলো। কখনো বিড়বিড় করে। কখনো শব্দ করে কী সব আরবি দোয়া পড়েছিলেন।

ঠিক বারোটার সময় তিনি বাংলা কথা বললেন, 'বাঘের গুহায় আটকা পড়েছে। পালানোর কোনো পথ নেই।'

ইতুর মা কাঁদোকাঁদো গলায় বললেন, 'বাঘের গুহা কোথায়, সুন্দরবনে?'

'একটা ঘরের মধ্যে আছে। কোনো জানালা নেই, দরজায় ডবল তালা দেয়া। বাইরে পাহারাও আছে। বাচ্চাটা ঘুমোচ্ছে।'

'এখান থেকে কতদূরে জায়গাটা?'

কিছুক্ষণ চুপ থেকে আয়নার ভেতর কী যেন দেখার চেষ্টা করলেন মুশকিল আসান। তারপর চিন্তিত গলায় বললেন, 'রাস্তাটা মা চেনা যাচ্ছে না। পুরোনো একটা গলি। বাড়িটাও পুরোনো। গলির মাথায় সাদা গম্বুজওয়ালা মসজিদ দেখতে পাচ্ছি।'

'রাস্তা চেনা না গেলে বাছার কাছে যাবো কীভাবে?' বলতে গিয়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন ইতুর মা।

'উতলা হবে না বেটি। সবর করো, আল্লাহকে ডাকো। আমার পোষা জিনকে পাঠিয়ে সঠিক খবর আনতে হবে। খবিসটাকে ও ছাড়া আর কেউ শায়েস্তা করতে পারবে না।'

জেঠিমা বললেন, 'আপনার পোষা জিন বসে আছে কেন হুজুর? ওকে বলুন না এখনই গিয়ে ইতুকে নিয়ে আসুক।'

'ও তো এখন এখানে নেই মা। সফরে গেছে। কাল বাদ এশা ফিরবে। তার আগে কিছুই বলা যাবে না।'

মেজো ফুপি বললেন, 'দুখির মা বজ্জাতটা কোথায় আছে, জানার কোনো উপায় নেই হুজর?'

'নিশ্চয়ই আছে। একটু অপেক্ষা করো' — বলে আবার চোখ বুজে ধ্যানে বসলেন মুশকিল আসান।

ছোটদের ভেতর মিতু আর রন্টু, ঝন্টু খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলো। ধূপের ঘন সাদা ধোঁয়ার ভেতর লম্বা চুলদাড়িওয়ালা মুশকিল আসানকে মনে হচ্ছিলো এ-পৃথিবীর বাসিন্দা নয়। তিনি কথাও বলছিলেন টেনে টেনে, যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসছে তাঁর গলা। ছোটন লক্ষ্য করলো, বড়দি, ভূপালী জেঠিমা আর দিদা ছাড়া বাড়ির সবাই বারান্দায় বসে আছে। এমনকি ছোটকাও ভালো মানুষের মতো মুখ নিয়ে বসে আছে বড়দার পাশে, যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না।

অনেকক্ষণ বিড় বিড় করার পর মুখ খুললেন মুশকিল আসান— 'মেয়েটা খুব ভয় পেয়েছে। পালাচ্ছে গ্রামের পথে। বাঁশবনের ভেতর ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না। সঙ্গে আরো দুজন আছে।'

'দুখি আর দুখির বাপ।' চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন মেজো জেঠিমা— 'পালিয়ে কোথায় যাচ্ছে বলা যাবে না হুজুর?'

'এখনো তো ওরা পথে। কোথাও না যাওয়া পর্যন্ত কী করে বলি কোথায় যাচ্ছে!'

মুশকিল আসানের আসর ভাঙতে রাত একটা বাজলো। তাও ভাঙতো না, যদি না তিনি জোর করে সবাইকে উঠিয়ে দিতেন। বললেন, ফজর পর্যন্ত তিনি হালকায়ে জিকিরে বসবেন। এ সময় কারো কাছে থাকা চলবে না।

মিতু, রন্টু, ঝন্টু ওদের ঘরে এসে ঘুমিয়ে পড়লো। বাড়ির অন্য সবাই যে যার ঘরে গিয়ে বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়েছে। ঘুম আসছিলো না ছোটনের। বিছানায় শুয়ে শুধু ছটফট করলো। ইতু কোথায় আছে, কীভাবে আছে, যারা ওকে আটকে রেখেছে তারা ওকে খেতে দিচ্ছে কিনা, মারধোর কি বেশি করেছে— এসব কথা সারাক্ষণ দাপাদাপি করছিলো ওর মাথায়।

অনেকক্ষণ ধরে বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে শেষে উঠে বসলো ছোটন। ঝন্টু বাতি নিভিয়ে দিয়েছিলো। অন্ধকারে বিছানা থেকে উঠে ছাদে গেল ছোটন।

চাঁদ ডুবে গেছে অনেক আগে। দমকল অফিসের পেটাঘড়িতে এরই ভেতর দুটোর ঘণ্টা বেজেছে। চাঁদ না থাকলেও সারা আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে ছিলো হীরের

কুচির মতো তারার মেলা। তারার আবছা আলোয় ফিনফিনে কুয়াশার ভেতর গায়ে আলোয়ান জড়িয়ে ছোটন ছাদের ওপর পায়চারি করতে লাগলো। মুশকিল আসান যে বলেছেন রাতে কেউ ঘর থেকে বেরোবে না, বেরোলে ভয়ানক বিপদ হতে পারে— ওসব কথা ছোটনের মনেই নেই। হাঁটতে হাঁটতে একসময় ছাদের পশ্চিম কিনারে এসে দাঁড়ালো। তখনই ওর চোখে পড়লো গলির মোড়ে বাকের চাচার পান-দোকানের সামনে তেরপল ঢাকা তিনটা ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। কুয়াশার ভেতর বোঝা গেলো না ট্রাক থেকে মাল নামানো হচ্ছে না তোলা হচ্ছে। লাইটপোস্টের মিটমিটে আলোয় মনে হলো ও বুঝি কোনো নির্বাক বায়স্কোপ দেখছে। কোথাও কোনো শব্দ নেই, কালো কালো কয়েকটা মানুষ ট্রাকের চারপাশে শুধু বাক্স মাথায় আনাগোনা করছে। একবার ভাবলো কাছে গিয়ে দেখবে, পরে ইতুর কথা মনে হলো। ইতুকে ছাড়া একা কোনো এ্যাডভেঞ্চারের কথা ওর ভাবতে ইচ্ছে করলো না।

পুরো তিরিশ ঘণ্টা পর ইতুর যখন জ্ঞান ফিরলো তখন ওর চারপাশে ঘুটঘুটে অন্ধকার। প্রথমে মনে হলো ওদের চিলেকোঠার খাটে বুঝি শুয়ে আছে ও, হাত বাড়ালে ছোটনকে ছুঁতে পারবে। কথাটা মনে হতেই দিব্যি ঘুমিয়ে যাচ্ছিলো। ঘুম আসার ঠিক আগে মনে পড়লো ও জেগেছিলো পানি খাওয়ার জন্য। তেষ্টায় গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। ওর ঘুমঘুম ভাবটা চলে গেলো। উঠে বসতেই টের পেলো এটা ওদের জাজিম বিছানো খাট নয়। শক্ত কাঠের তক্তপোষের ওপর একটা কম্বল বিছানো। বালিশটাও শক্ত আর তেলতেলে। মাঝারি আকারের বদ্ধ ঘরের ভেতর ভ্যাপসা একটা গন্ধ। ঘরের কোনো জানালা নেই। দুটো দরজা বাইরে থেকে বন্ধ। ইতু এখানে এলো কী করে? ভাবতে গিয়ে ওর মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠলো। কয়েক মুহূর্ত চোখ বুজে রইলো। তারপর ধীরেধীরে ওর সব কথা মনে পড়লো।

সন্ধ্যেবেলা বর্মণদের দোকানে বসে ইতু তাকিয়েছিলো ওদের গলির মুখের দিকে। ভাবছিলো কাজের লোকদের কেউ যদি সন্দেহজনকভাবে গলি থেকে বেরোয় তাহলে তাকে লুকিয়ে অনুসরণ করবে। অনেকক্ষণ পর বনমালীকে বেরোতে দেখে ইতুর চোখ দুটো চকচক করে উঠলো। রাস্তার এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে কী যেন খুঁজলো বনমালী। তারপর রাস্তা পেরিয়ে বাকের চাচার পান-দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালো। দোকানের খদ্দের বিদেয় না হওয়া পর্যন্ত বনমালী দাঁড়িয়ে রইলো। এর ভেতর কয়েকবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে কাউকে যেন খুঁজলো। ইতুর মনে পড়লো পিকনিকের দিন ওদের বাড়িতে অসুস্থ ভূপালী জেঠিমা আর দুখির মা ছাড়া অন্য কেউ ছিলো না। হতে পারে, দুপুরে খেয়ে দেয়ে জেঠিমা ঘুমিয়েছেন আর দুখির মার তো রোজ দুপুরে দু'ঘণ্টা না ঘুমোলে

নাকি পেটের ভাত হজম হয় না। সেই ফাঁকে বনমালী গিয়ে যদি হীরের নেকলেসটা চুরি করে, ধরার কারো সাধ্য নেই। বনমালী জানে বাড়িতে যে মুশকিল আসান এসেছেন— ভূপালী জেঠিমা বলেছেন চব্বিশ ঘণ্টার ভেতর নাকি তিনি চুরি-যাওয়া হারের সন্ধান দিতে পারবেন। বনমালী নিশ্চয়ই বুঝেছে হারটি বাড়িতে রাখা নিরাপদ নয়। রাত পোহাবার আগেই ওটা কোথাও পাচার করে দিতে হবে। এত দামী হার চট করে তো বিক্রিও করা যাবে না। খোঁজখবর নিয়ে বিক্রি করতে এক-দুমাস লেগে যেতে পারে।

বাকের চাচাকে একা পেয়ে বনমালী নিচু গলায় কী যেন বোঝাচ্ছিলো। তাকে বাকের চাচা বারবার মাথা নেড়ে বারণ করছিলো। তবে কি বাকের চাচা হারটা রাখতে রাজি হচ্ছে না? ইতু মনে-মনে সিদ্ধান্ত নিল বনমালী এরপর যেখানে যাক ওকে অনুসরণ করবে। বনমালী আর বাকের চাচা নিবিষ্ট মনে কথা বলছিলো।

বর্মণদের দোকানে বসে থাকতেও অস্বস্তি লাগছিলো ইতুর। এর ভেতর বর্মণদের ম্যানেজার রহমতউল্লাহ দুবার ওকে জিজ্ঞেস করেছে, 'কি ইতুমিয়া, সাইজের কালে এইহানে একলা বয়া বয়া মাক্ষি মারতাছ কেলা?' পরে আবার বলেছে— 'রাইত ওইয়া গেল, বাড়িত যাও না ক্যান, কেউ বকা-উকা দিছে?'

বনমালী আর বাকের চাচা তখনো কথা বলছিলো। রাস্তায় গাড়িঘোড়ার শব্দে শোনার কোনো উপায় নেই— ওরা কী নিয়ে কথা বলছে। বনমালী গলি থেকে বেরোবার আধঘণ্টা পরে ইতু দেখলো মীর্জা এহতেশামের লম্বা সাদা গাড়িটা গলির মুখে এসে থেমেছে। গাড়ি চালাচ্ছিলো ড্রাইভার। ইতু ধরে নিয়েছিলো এহতেশাম ভাইয়া ওদের বাড়িতেই যাচ্ছে। কিন্তু না, ওদের গলিতে ঢোকার বদলে এহতেশাম মোড়ের ডিস্পেন্সারিতে গিয়ে ঢুকলো। বর্মণদের লোহার দোকান থেকে ডিস্পেন্সারির ভেতরটা পরিষ্কার দেখা যায়। মীর্জা এহতেশাম ডিস্পেন্সারির মালিকের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বললো। একসময় তাকে বেশ উত্তেজিত মনে হলো। মালিককে কিছু বোঝাতে চাইছে, ও বুঝতে চাইছে না, বিরক্ত হচ্ছে— কথা না শোনা গেলেও হাত আর মুখ নাড়া থেকে ইতু এটুকু বুঝতে পেরেছিলো। শুধু বুঝতে পারছিলো না কী এমন ঝামেলায় পড়েছে মীর্জা এহতেশাম।

ইতুর হঠাৎ মনে হলো এহতেশামের কোনো বিপদ হতে পারে। বনমালীর কথা ভুলে গিয়ে ও তাকিয়ে রইলো ডিস্পেন্সারির দিকে, যেখানে আরো উত্তেজনাকর দৃশ্যের অভিনয় হচ্ছিলো। মালিককে মনে হল খুবই রেগে গেছে। এহতেশামকে আঙুল তুলে শাসালো কয়েকবার। তারপর ইতু যা দেখলো— ওর হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেলো। পকেট থেকে এহতেশাম ছোট্ট একটা পিস্তল বের করে মালিককে কী যেন বললো। ভয় পেয়ে মালিক দুহাত ওপরে তুলেছিলো, এহতেশামের ধমক খেয়ে আবার হাত নামালো। তারপর ভয়ে ভয়ে ডিস্পেন্সারি

থেকে বেরিয়ে এসে ঝাঁপ নামিয়ে বন্ধ করে দিলো। মনে হলো সুযোগ পেলেই ও ঝাঁপিয়ে পড়বে এহতেশামের ওপর। আড়চোখে এহতেশামের দিকে তাকাতে তাকাতে ওর ফোর্ড গাড়িতে গিয়ে উঠে বসলো। এহতেশাম ওর পিস্তলটা মালিককে একবার দেখিয়েই পকেটে পুরে ফেলেছিলো। মালিকের পেছন-পেছন এহতেশাম গাড়িতে গিয়ে উঠে বসলো।

ইতু সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিল বনমালীকে নয়, এই মুহূর্তে এহতেশামকেই অনুসরণ করা উচিত। হীরের নেকলেসের চেয়ে বড়দির কথাই ভাবলো। মনে হলো ডিস্পেন্সারির মালিকটা নিশ্চয় খারাপ লোক, এহতেশামকে কোনো ব্যাপারে ঠকিয়েছে। আজ কায়দা-মতো পেয়ে ওকে কোথাও নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যাচ্ছে কোথায়? উল্টো কোনো বিপদে পড়বে না তো? আর কদিন বাদে বড়দির সঙ্গে মীর্জা এহতেশামের বিয়ে। যদি ওর কোনো বিপদ হয়— ভাবতেই শিউরে উঠলো ইতু।

নিতাইকে ডেকে চাপা গলায় ইতু বললো, 'তোর সাইকেলটা নিচ্ছি। কাল ফেরত পাবি।'

নিতাই কী যেন বলতে যাচ্ছিলো, ওকে কোনো সুযোগ না দিয়ে ইতু সাইকেল চালিয়ে অনুসরণ করলো এহতেশামের সাদা ফোর্ড গাড়িটাকে। এদিকের রাস্তাঘাট বেশ সরু। রাত তখন সাড়ে আটটা হলেও রাস্তায় রিকশা, ঘোড়াগাড়ি, সাইকেল আর পথচারী খুব কম ছিলো না। সাইকেলে করে ফোর্ড গাড়ি অনুসরণ করতে ইতুর কোনো অসুবিধে হলো না।

দু'তিনটে রাস্তা পেরিয়ে ফোর্ড গাড়িটা ফরাশগঞ্জ এসে দিলীপদের পুতুলওয়ালা বাড়ির পাশে দাঁড়ালো। এই রাস্তা, এই বাড়ি ইতুর অচেনা নয়। দিলীপ আর ও এক ক্লাসে পড়ে। ক্লাস ফাইভ-সিক্সে থাকতে যখন ও স্বপনকুমার সিরিজ পড়তো তখন প্রায়ই দিলীপের বাসায় আসত বই বদলাবার জন্য।

দিলীপদের বিশাল জমিদারবাড়ির বাঁ-পাশ দিয়ে সরু অন্ধকার একটা গলি চলে গেছে ভেতরের দিকে। ইতু আগে কখনো এ গলিতে ঢোকে নি। অবাক হয়ে ও দেখলো ডিস্পেন্সারির মালিক আর মীর্জা এহতেশাম গাড়ি থেকে নেমে ওই গলির ভেতর ঢুকলো। ইতু সাইকেলটা দিলীপদের দারোয়ানের কাছে রেখে পায়ে হেঁটে অনুসরণ করলো ওদের।

গলিটা বেশ অন্ধকার। আশেপাশের বাড়ির জানালা থেকে আসা সামান্য আলোয় কালো পথটুকু শুধু দেখা যাচ্ছিলো। দিলীপদের ছ'টা বাড়ি পরে বড় আঙিনাওলা একটা পুরোনো বাড়িতে ঢুকলো মীর্জা এহতেশাম আর ডিস্পেন্সারির মালিক। বাড়িটার চেহারা এমন যে পূর্ণিমার আলোয় রীতিমতো ভুতুড়ে বাড়ির মতো দেখাচ্ছিলো। ভূতের ভয় না থাকলেও ওদের পেছন পেছন বাড়ির আঙিনায় পা রাখতেই ইতুর শিরদাঁড়া বেয়ে সরসর করে ঠাণ্ডা রক্তের স্রোত বয়ে গেলো।

মনে হলো সামনে ভয়ঙ্কর বিপদ! দোতালার দুটো কামরায় শুধু আলো জ্বলছে, সারা বাড়ি অন্ধকার। জানালা থেকে একটুকরো আলো আঙিনায় এসে পড়েছে। গুণ্ডাদের আস্তানা হওয়ার জন্য এরকম হানাবাড়ি আদর্শ জায়গা।

বাড়ির আঙিনায় ঢোকার পর এহতেশামকে বেশ নার্ভাস মনে হচ্ছিলো। কয়েকবার আশেপাশে তাকালো, পেছনেও তাকালো। আঙিনার আলোয় দাঁড়িয়ে তাকিয়েছিলো বলে গলির অন্ধকারে ইতুকে দেখতে পেলো না। ইতুর মনে হলো মীর্জা এহতেশাম এতক্ষণে নিশ্চয় বুঝতে পেরেছে একা গুণ্ডাদের আস্তানায় এসে বোকামি করেছে। এসে যখন পড়েছে পালিয়েও যাওয়া যাবে না। এটা ভেবে একরকম মরিয়া হয়েই সে ভেতরে ঢুকলো। ইতু যথারীতি অনুসরণ করলো ওকে, এহতেশাম ঘুণাক্ষরেও টের পেলো না।

দোতালায় ওঠার সিঁড়ির কাছে এসে ইতু টের পেলো বাড়িতে আরো লোকজন আছে। দোতলায় কয়েকজনের গলা শোনা যাচ্ছিলো। কাঠের সিঁড়ির ওপর পা রাখতেই ক্যাঁচ করে একটা শব্দ হলো। ভীষণ ঘাবড়ে গেলো ইতু। সব কটা সিঁড়ি যদি ওর পায়ের ভারে শব্দ করে তাহলে বাড়িসুদ্ধ সবাই টের পেয়ে যাবে। দ্বিতীয় সিঁড়িতে খুব সাবধানে পা ফেললো। কোনো শব্দ হল না। ইতুর বুকের ভেতর ঢিবঢিব করছিলো। চুপচাপ দোতালায় উঠতে না পারলে ওর দশাও নির্ঘাত মীর্জা এহতেশামের মতো হবে। ওর কপাল ভালো, মাঝের একটা সিঁড়ি ছাড়া আর কোনো সিঁড়িতে শব্দ হলো না।

দোতালায় উঠে আশেপাশে তাকিয়ে দেখলো ইতু। সামনে টানা-বারান্দা, ডান দিকটা খোলা, বাঁ-দিকে ঘরের দরজাগুলো সব বন্ধ। শেষ মাথায় ঘরের দরজা সামান্য ফাঁক করা। সেই ঘরেই আলো জ্বলছিলো। বারান্দায় দরজার ফাঁক দিয়ে সরু একচিলতে আলো এসে পড়েছে বারান্দায়। পা টিপে টিপে সেই ঘরের দিকে এগিয়ে গেলো ইতু।

ঘরের ভেতর চাপা উত্তেজিত গলায় কারা যেন কথা বলছে। ইতু আরো কাছে যেতেই একটা কথা পরিষ্কার শুনতে পেলো— 'বাঘের গুহায় পা দিয়ে কেউ জান নিয়ে ফিরে যেতে পারবে না।' কথাটা যে মীর্জা এহতেশামকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, বুঝতে অসুবিধে হল না ওর। ইতু কী করবে, ঘরের ভেতর ঢুকবে না দৌড়ে পুলিসে খবর দেখে? কথাটা ভাবতে না ভাবতেই পেছন থেকে সাঁড়াশির মতো শক্ত দুটো হাত ওকে জাপ্টে ধরলো। চমকে উঠে ঝটকা মেরে নিজেকে ছাড়াতে গিয়ে টের পেল ওকে যে ধরেছে তার গায়ের জোর ওর চেয়ে দশগুণ বেশি। ঠিক তখনই আরেকজন ভেজা একটা রুমাল ওর নাকে চেপে ধরল। ক্লোরোফর্মের গন্ধে ও জ্ঞান হারাবার আগে মীর্জা এহতেশামের কথা শুনেছিলো। কথাটা ছিল চমকে ওঠার মতো, ইতু অন্ধকার ঘরে শক্ত তক্তপোশে বসে মনে করতে পারলো না এহতেশাম কী বলেছিল।

বিছানা থেকে নেমে দাঁড়ালো ইতু। বন্ধ দরজার পাশে টেবিলের ওপর হারিকেন আর একটা টিনের থালা রাখা রয়েছে। হারিকেনের আলোটা কমিয়ে রেখেছে। কাছে গিয়ে দেখল থালায় শুকনো দু'খানা আটার রুটি ছাড়া আর কিছু নেই। পাশে ময়লা তোবড়ানো জগে পানিও রয়েছে। কোনো কিছু না ভেবে ইতু অর্ধেকটা পানি খেয়ে ফেললো। এতক্ষণ ধরে যে অস্বস্তিটা ছিলো সেটা খানিকটা কাটলো। রুটি দেখে মনে হলো ওর ভীষণ খিদে পেয়েছে। একটুকরো রুটি ছিঁড়ে মুখে দিলো। বাসি শুকনো আটার রুটি যে খেতে এত উপাদেয় এটা ওর আগে জানা ছিলো না। আস্তে আস্তে দুটো রুটির সবটাই খেয়ে ফেললো ও। জগ থেকে আরো পানি খেলো। তারপর তক্তপোশের ওপর বসে ভাবলো এটাই তাহলে বাঘের গুহা। বাড়ির কথা মনে হলো ওর। ছোটনরা কী করছে এখন? কতক্ষণ এখানে আটকে আছে ও? বাড়িতে নিশ্চয় হইচই শুরু হয়ে গেছে। মুশকিল আসান যদি লুকোনো নেকলেসের কথা বলতে পারেন ওর সন্ধানও দিতে পারবেন।

কোথাও কোনো শব্দ নেই। বোঝার কোনো উপায় নেই বাইরে এখন রাত না দিন। এটা কি দিলীপদের পাশের গলির সেই হানাবাড়ি না অন্য কোথাও— কিছুই বুঝতে পারলো না ইতু। শুধু এটুকু বুঝলো যারা আটকে রেখেছে তারা ওকে এখনই মেরে ফেলবে না। কারা এরা, ছেলেধরা গুণ্ডা না অন্য কিছু? ভাবতে গিয়ে ইতুর আবার ঘুম পেলো।

সব ভালো যার শেষ ভালো

ছোটন যখন ঘুমিয়েছে তখন বাড়ির মসজিদে ফজরের আজান হচ্ছিলো। ঘুম ভাঙল দিদার ডাকে। চাপা গলায় দিদা ওকে বলছিলেন, 'ওরে ছোঁড়া ওঠ না, আর কত ঘুমোবি?'

চোখ মেলে তাকাতেই দিদা বললেন, 'এক্ষুনি নাশতা করে নে, আমার সঙ্গে এক জায়গায় যাবি।'

ঝন্টু, রন্টু আর মিতু আগেই উঠে গেছে। দিদাকে খুব উত্তেজিত মনে হচ্ছিলো। ছোটন বললো, 'ইতুর কোনো খোঁজ পেয়েছো দিদা?'

'কোনো কথা নয়।' চাপা গলায় দিদা বললেন, 'যা বলছি তাই কর। নাশতা করে আমার ঘরে আয়।'

নিচে এসে ঝটপট মুখহাত ধুয়ে নাশতা করে ছোটন দিদার ঘরে এলো। পরনের কাপড় বদলে গায়ে শাল জড়িয়ে তিনি ওর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। বললেন, 'রিমকিদের বাসায় চল্, ডাক্তার ছোঁড়ার সঙ্গে জরুরী কথা আছে।'

ছোটনদের হাত ধরে দিদা বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ছোটন অবাক হয়ে বললো, 'কী হয়েছে দিদা, কিছু বলছো না কেন?ছোটকা কি হীরের নেকলেসটা বেচে দিয়েছে?'

'আঃ চুপ চুপ! নেকলেস নিয়ে কোনো কথা নয়!'

বাইরের রোয়াকে বসেছিলো রন্টু, ঝন্টু আর মিতু। দিদা আর ছোটনকে বেরোতে দেখে ওরা কোরাসে জানতে চাইলো— 'কোথায় যাচ্ছো দিদা?'

ছোটন দিদার মুখের দিকে তাকালো। দিদা অসহায় গলায় বললেন, 'রিমকিদের বাড়িতে।'

'আমরাও যাব।'

'আস্তে বল্।' চাপা গলায় ধমক দিলেন দিদা— 'যেতে চাইলে যাবি। ডাক্তারের সঙ্গে আমার প্রাইভেট কথা আছে। ওখানে কারো থাকা চলবে না।'

ওরা তিনজন অবাক হয়ে দিদা আর ছোটনের সঙ্গী হলো। রিমকির নানিও কম অবাক হলেন না দিদাকে দেখে। বললেন, 'কোনো বিপদ হয় নি তো বুবু?'

কাষ্ঠ হেসে দিদা বললেন, 'মাথার ওপর পাহাড় সমান বিপদ। কোন্ বিপদটা হতে বাকি আছে বোন? আগে আমি একটা প্রাইভেট টেলিফোন করবো। তারপর ডাক্তারের সঙ্গে কিছু কথা বলবো।'

'ওপর থেকে ওদের দেখে রিমকি-সিমকি নেমে এসেছে। রিমকির নানি দিদাকে নিয়ে গেলেন। রিমকি অবাক হয়ে বললো, 'দিদা কেন এসেছেন? ইতুর কিছু হয় নি তো?'

ছোটন বললো, 'ইতুর খবর পাই নি। সাইফ ভাইর সঙ্গে দিদা কী প্রাইভেট কথা বলবেন তাও জানি না।'

'দিদার চেহারা দেখে মনে হলো সাংঘাতিক কিছু একটা তিনি জেনে ফেলেছেন।' বিজ্ঞের মতো বললো রিমকি।

'কী জেনেছেন?' জানতে চাইল ঝন্টু।

'ইতু কিংবা নেকলেস চুরির কোনো ব্যাপার।'

ছোটন চিন্তিত গলায় বললো, 'আমি ভাবছি বাড়িতে টেলিফোন থাকতে দিদা এখানে কেন ফোন করতে এলেন?'

'তোমাদের টেলিফোন খারাপও তো হতে পারে।'

'তা না হয় হলো, প্রাইভেট কথা কার সঙ্গে বলবেন?'

সবজান্তার মতো রিমকি বললো, 'মনে হচ্ছে দিদা কোনো প্রাইভেট ডিটেকটিভের সঙ্গে কথা বলতে চান।'

রন্টু বললো, 'এহতেশাম ভাইয়ার সঙ্গেও কথা বলতে পারেন। তাঁর নাকি ওপর মহলের লোকজনদের সঙ্গে ভারি খাতির।'

ছোটনরা কথা বলছিলো রিমকিদের বসার ঘরে। ছোটন যেখানে বসেছিলো সেখান থেকে দোতালার ওঠার সিঁড়ি দেখা যায়। রিমকিদের সঙ্গে কথা বলার সময় ও লক্ষ্য রাখছিলো দিদা কখন নিচে নামেন।

খুব বেশি হলে পনের মিনিট দোতালায় ছিলেন দিদা। তারপর রিমকির মা আর সাইফকে নিয়ে নিচে নামলেন। ছোটন বুঝলো দিদার প্রাইভেট কথা শেষ হয়েছে। সাইফের সঙ্গে কথা বলছিলো দিদা। শুধু ওঁর শেষ কথাটাই ওদের কানে এলো— 'সাবধান, কাকপক্ষীটিও যেন টের না পায়।'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন দিদা। যেভাবে বলেছেন সবকিছু সেভাবেই হবে।' এই বলে সাইফ কাউকে আর কিছু না বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলো।

ছোটনদের ওপর চোখ পড়লো দিদার। মুখ টিপে হেসে বললেন, 'এরই মধ্যে আড্ডায় জমে গেছিস মনে হচ্ছে!'

সিমকি পুট করে বললো, 'আমরা কি এখন ক্যারাম খেলতে পারি দিদা?'

'খুব পারিস। তবে ক্যারাম খেলতে নিশ্চয় পাঁচজন লাগে না! ছোটন আমার সঙ্গে আয়।'

ক্যারাম খেলতে ছোটনেরও ইচ্ছে ছিলো না। ওর মনে হল দারুণ উত্তেজনাকর কিছু ঘটতে যাচ্ছে বাড়িতে। দিদার সঙ্গে আসতে পেরে ও খুশিই হলো।

ঘরে এসে দিদা সবেমাত্র পানের বাটা নিয়ে বসেছেন— হন্তদন্ত হয়ে ঢুকলেন ভূপালী জেঠিমা। বললেন, 'বহুৎ মসিবত হয়ে গেল চাচিজান। আপনি ছিলেন না। একটু আগে ভূপাল থেকে জরুরি টেলিফুন আসল। আপনার ভান্‌জার তবিয়ৎ বহুৎ খারাপ আছে। আমাকে তুরন্ত্ যেতে বলেছে।'

দিদা উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, 'সে কি রাঙা বউ! কী হয়েছে আশফাকউদ্দিনের?'

ভূপালী জেঠিমা কাঁদোকাঁদো গলায় বললেন, 'মালুম না আছে চাচিজান। আমাদের এক পড়োসান বলল, বহুবিবি জলদি চলা আও, ভাইসাব কি তবিয়ৎ নামাজ হ্যায়। তারপর টেলিফুন লাইনটা কেটে গেল।'

'একবার কি তুমি ট্রাঙ্ককল করবে?'

'না চাচিজান। দো রোজ লেগে যাবে লাইন পেতে। আমার বহুৎ পেরেশান লাগছে। আপনি মেহেরবানি করে কাউকে বলুন আমার টিকেটটা আজ নয়তো কালকের করিয়ে দিতে।'

'ওটা করা যাবে রাঙাবউ। কিন্তু জাহানারার বিয়েতে তুমি থাকবে না,

ভাবতেই যে খারাপ লাগছে আমার।'

'আমি খাসদিল থেকে দোয়া করব জাহানারা বিটিয়াকে। ও বহুৎ আচ্ছা লাড়কি আছে চাচিজান। মীর্জা এহতেশামের সাথে শাদি হলে ও হামেশা খুশ থাকবে।'

'ঠিক আছে রাঙাবউ। তোমার এতবড় বিপদ জেনে আর বিয়ে খেতে বলবো না। টিকেটটা দাও, আমি কলিমউদ্দিনকে পাঠাচ্ছি এয়ার ইন্ডিয়ার অফিসে।'

টিকেট ভূপালী জেঠিমার হাতেই ছিলো। ওটা ছোটনকে দিয়ে দিদা বললেন, 'কলিমউদ্দিনকে নিয়ে এক্ষুনি যা। আজকের সিট পেলেই সবচেয়ে ভালো হয়।'

কলিমউদ্দিন মানে ছোটকা। হীরের নেকলেসের ঘটনা জানার পরও দিদা কেন ছোটকাকে নিয়ে যেতে বলছেন কিছুই বুঝতে পারলো না ছোটন। ভূপালী জেঠিমার ট্রাঙ্ককল আসা মানে বাড়ির টেলিফোন ঠিকই আছে। তবু দিদা ফোন করতে কেন গেলেন রিমকিদের বাড়িতে? কার সঙ্গে দিদা এমন কী কথা বলেছেন যা নিজেদের টেলিফোনে বলা যেতো না? মাঝেমাঝে দিদার আচরণ বাড়ির সবার কাছেই রহস্যময় মনে হয়।

এয়ার ইন্ডিয়ার সন্ধ্যার ফ্লাইটে একটাই সিট খালি ছিল। কাউন্টারের মহিলাটি মিষ্টি হেসে বললেন, 'আপনদের কপাল ভালো। একঘণ্টা আগে এলেও পেতেন না। একটু আগে একজন জানিয়েছেন, তিনি যেতে পারবেন না।'

বাড়ি ফেরার পথে ছোটকা একগাল হেসে ছোটনকে বললেন, 'আমাদের কেন কপাল ভালো হতে যাবে? কপাল ভালো ভূপালী জেঠিমার। ওঁর এবাদত-বন্দেগির কী রকম তেজ দেখেছিস! আজ যেতে চাইলেন, অমনি একজন প্যাসেঞ্জার টিকেট বাতিল করলো।' কথা বলার সময় ভঙ্গিতে ছোটকার গলা গদগদ করছিলো।

সেদিন নেকলেস নিয়ে ওঁকে স্বর্ণকারের দোকানে যেতে দেখার পর থেকে ছোটন ওঁর সঙ্গে সহজভাবে কথা বলতে পারছিলো না। কিন্তু বাড়িতে সবাই ছোটকার এই কথায় খুব গুরুত্ব দিলো। গম্ভীর হয়ে বড় ফুপি বললেন, 'হবে না কেন, কত বড় পীর বংশের মেয়ে!'

ভূপালী জেঠিমা চলে যাচ্ছেন— এ-খবর পাড়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। বেশ কয়েকজন বয়স্ক মহিলা ওঁকে ঘিরে বসে আছেন। দুখির মা পালিয়ে যাওয়ার পর সকাল থেকে কাজে লেগেছে বদনার মা। দফায় দফায় চা দেয়ার জন্য দোতালায় উঠলেও ওর মুখে হাসি মাখানো ছিলো। সকালে এসেই ও শ্বশুরের বাতের জন্য তেল পড়িয়ে নিয়েছে ভূপালী জেঠিমার কাছ থেকে। এ-সুযোগ গিরিবালা ধোপানিও ছাড়ে নি। ভূপালী জেঠিমা ঘন ঘন রুমালে চোখ মুছছেন, পাড়ার গরিব মানুষদের আনা ঘটির পানি আর বাটির তেলে দোয়া পড়ে ফুঁ দিচ্ছেন। পাড়ার মহিলারা দুঃখী মানুষের জন্য ওঁর দয়াময়া দেখে অভিভূত হয়ে গেলো।

ছোটনকে দিদা বললেন, 'আজ সারাদিন কেউ চিলেকোঠার ঘরে যাবি না।'

'কেন দিদা?' অবাক হলো ছোটন।

'এখানে লোকজনের হইচই বেশি। মুশকিল আসান ওখানে বসেছেন। রাতে ওঁর পোষা জিন আসবে। তাই নিরিবিলি জায়গা দরকার।'

খবরটা শোনামাত্র ছোটন ছুটলো রিমকিদের বলার জন্য। সিমকি উত্তেজিত হয়ে বললো, 'তার মানে, পোষা জিন আজই ইতুকে নিয়ে আসবে!'

ঝন্টু শুকনো গলায় বললো, 'দিদার মাথায় কি কোনো বুদ্ধি নেই? কোন্ আক্কেলে মুশকিল আসানকে আমাদের ঘরে পাঠালেন পোষা জিন আনার জন্য? বাড়িতে আর কোনো ঘর ছিলো না?'

রিমকি একটু বিরক্ত হয়ে বলল, 'পোষা জিন নিশ্চয় তোমার ঘাড় মটকাতে আসবে না। ওটা আসবে ইতুকে আনার জন্য।'

ছোটন ফোঁড়ন কাটলো— 'ইতুর জন্য ওর কোনো দরদ থাকলে তো!'

'হুঁ, যত দরদ সব তোরই আছে!' মুখ কালো হয়ে গেলো ঝন্টুর।

ছোটন একটা শক্ত কথা বলতে যাচ্ছিলো, তখনই রিমকির নানি আর মা এসে ঘরে ঢুকলেন। নানি ছোটনকে বললেন, 'হ্যাঁরে, গিরিবালার কাছে শুনলাম তোদের ভূপালী জেঠি নাকি আজই চলে যাবেন?'

মাথা নেড়ে সায় জানিয়ে ছোটন বললো, 'ঠিকই শুনেছেন। সন্ধ্যে ছটার ফ্লাইটে যাচ্ছেন। ভূপালী জেঠুর নাকি খুব অসুখ করেছে।'

রিমকির মা বললেন, 'মা চলো, এ বেলা গিয়ে ওঁর দোয়া নিয়ে আসি।'

'চল্ বাছা।' হতাশ হয়ে নানি বললেন, 'হাঁপানির জন্য আমাকে একটা তাবিজ দিতে চেয়েছিলেন। সেটা বুঝি আর কপালে জুটলো না।'

ওঁরা দুজন বেরিয়ে যাওয়ার পর ছোটন রিমকিকে জিজ্ঞেস করলো, 'সাইফ ভাইকে দিদা কোথায় পাঠিয়েছেন কিছু জানতে পেরেছো?'

ফিক করে হেসে সিমকি বললো, 'ছোট্‌পা গিয়েছিলো মাকে জিজ্ঞেস করতে। ধমক খেয়ে ফিরে এসেছে। মা বলেছে বড়দের ব্যাপারে ছোটদের নাক গলানো মোটেই ভালো নয়।'

রিমকির গম্ভীর চেহারা দেখে ছোটনের মায়া হলো। বলল, 'পৃথিবীর সব খারাপ কাজ বড়রাই করে। হীরের নেকলেসটা তো ছোটরা নেয় নি, বড়দেরই একজন সরিয়েছে ওটা।'

ছোটনের এক কথায় রিমকির মন ভালো হয়ে গেলো। উত্তেজিত গলায় জানতে চাইলো, 'কে নিয়েছে ওটা?'

ছোটন বললো, 'ইতু ফিরে আসুক। সব জানতে পারবে।'

রিমকি বললো, 'আমার মন বলছে ইতু আজই ফিরে আসবে।'

ছোটরা অনেক কিছুই আগে থেকে বুঝতে পারে, বড়রা যা পারে না। দিদা যে বলেন— ছোটরা হল ফেরেশতা, সে তো মিছে কথা নয়। ইতু ঠিকই ফিরে এলো সন্ধ্যার পর।

বিকেলে ভূপালী জেঠিমা বাড়িসুদ্ধ সবাইকে কাঁদিয়ে নিজেও কাঁদতে কাঁদতে চলে গেছেন। কাঁদেন নি শুধু দিদা। বড় ফুপি আড়ালে গিয়ে রিমকির নানিকে বলেছেন, হীরের নেকলেস চুরির শোকে নাকি দিদা পাথর হয়ে গেছেন। ছোটরা অবাক হয়েছিলো— ভূপালী জেঠিমা চলে যাচ্ছেন, অথচ মীর্জা এহতেশামের কোনো খবর নেই! সেই সকালে বেরিয়ে সাইফও লাপাত্তা হয়ে গেছে।

ভূপালী জেঠিমা চলে যাওয়ার পর রিমকির মা আর নানিও চলে যাচ্ছিলেন। দিদা ওদের আটকে রেখেছেন এই বলে— 'রাতে মুশকিল আসানের পোষা জিন ইতুকে আনবে। না দেখে চলে যাওয়া কি ঠিক হবে?'

অগত্যা থেকেই যেতে হলো ওঁদের। ইতু ফিরে আসবে জেনে রিমকি-সিমকির আনন্দ উত্তেজনাও কম নয়।

ঠিক ছটার সময় সাইফ এলো ইতুকে নিয়ে। সঙ্গে এসপি আমিন আহমেদ। ইতুর মা ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলেন উস্কখুস্ক চেহারার ইতুকে। দিদা সাইফের থুতনি নেড়ে আদর করে বললেন, 'এটা বুঝি মুশকিল আসানের পোষা জিন! দেখলেই যে আদর করতে ইচ্ছে করে!'

বাড়ির সবাই তখন বাইরের বসার ঘরে। কেউ সোফায় বসা, কেউ চেয়ারে, কেউ মাটিতে, কেউ দাঁড়িয়ে। বড় জেঠু অবাক হয়ে একবার এসপিকে বললেন, 'কোথায় পেলেন ইতুকে?' আরেকবার সাইফকে বললেন, 'তুমি কবে থেকে মুশকিল আসানের পোষা জিন হলে?'

সাইফ দিদার দিকে তাকালো, মুখে মিটিমিটি হাসি। দিদা ওকে চোখ টিপলেন— 'যা জানো বলে ফেলো বাপু ঝটপট। সব কথা না শুনে বৌমারা এখান থেকে নড়বে না। তোমাদেরও চা-নাশতা জুটবে না। সারাদিন ধকল তো কম যায়নি!'

সাইফ বললো, 'ইতুকে উদ্ধার করার ব্যাপারে আমার কিংবা আমিন ভাইর তেমন কোনো ভূমিকাই নেই। কৃতিত্বটা ষোলআনা দিদার।'

দিদা চোখ মটকে সাইফকে বললেন, 'আমাকে কেন তেল দিচ্ছো বুঝতে বাকি নেই বাছা!'

বড় জেঠু এমনই উত্তেজিত ছিলেন যে দিদাকেই ধমক দিয়ে বসলেন— 'আহ্ মা, কথার মাঝখানে কথা বোলো না তো!'

দিদাকে এভাবে কেউ ধমক দিতে পারে দেখে ফুপি, জেঠিমা, কাকিমাদের মুখ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেলো। শুধু দিদা হাসি চেপে বললেন, 'ঠিক আছে বাপু, এই আমি মুখে কুলুপ আঁটলাম। শেষে আমায় কিছু বলতে পারবে না।'

সাইফ মৃদু হেসে বললো, 'সকালে দিদা এসে বললেন, ইতুকে মীর্জা এহতেশাম কিডন্যাপ করেছে। ও কাল রাতে এসেছিলো ভূপালী জেঠিমার কাছে। বাড়ির সবাই তখন মুশকিল আসানকে নিয়ে ব্যস্ত। ও সোজা ভূপালী জেঠিমার ঘরে ঢুকে তাকে নিচে ডেকে নিয়ে বললে, ছোঁড়াটাকে নিয়ে খুব বিপদ হচ্ছে। অনেক কথা জেনে ফেলেছে। দলের সবাই চাইছে মেরে ফেলতে। ভূপালী জেঠিমা ওকে বলেছেন, কিছুদিন লুকিয়ে রাখো। তোমাদের বিয়েটা আগে হয়ে যাক। তারপর যা ভালো মনে করো করবে। দিদা আড়ালে থেকে ওদের কথা শুনে যা বোঝার ঠিক বুঝে নিলেন। সকালে আমাকে বললেন, এক্ষুনি এসপিকে গিয়ে বলো মীর্জা এহতেশামকে এ্যারেস্ট করতে। ধরে পিটুনি দিলেই বলে দেবে ইতুকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে। আমার কাছে সব শুনে আমিন ভাই নিজেই ফোর্স নিয়ে এহতেশামের বাড়িতে গেলেন। ওকে এ্যারেস্টের কথা বলাতে প্রথমে কী হম্বিতম্বি। নাকি আইজিকে ফোন করবে, মিনিস্টারকে ফোন করবে। এস পির চাকরি খাবে। থানায় নিয়ে জেরা করে কথা বের করতেই বিকেল হয়ে গেলো। তারপর ওকে নিয়ে ফরাশগঞ্জের একটা বাড়ি রেইড করে ইতুকে উদ্ধার করেছি। এহতেশামের ছিল নকল ওষুধের কারখানা। যে-বাড়িতে ইতুকে ওরা লুকিয়ে রেখেছিলো সেটা ছিলো ওদের গুদাম। ওর লোকজনদের ধরার জন্য আরো কয়েকটা জায়গা রেইড করতে হয়েছে।'

সাইফের কথা শোনার সময় কারো চোখের মণি ঠিকরে বেরিয়ে আসার দশা হলো, কারো চোয়াল ঝুলে গেলো। ওর কথা শেষ হওয়ার পর কয়েক মুহূর্ত কেউ কোনো কথা বললো না। সবাই ইতুর দিকে এমনভাবে তাকিয়েছিলো যেন ও ভিন্ন কোনো গ্রহ থেকে এসেছে। বড় জেঠু ভাঙা গলায় ওকে বললেন, 'তুই কী করে জানলি এহতেশামের নকল ওষুধের কারখানা আছে?'

'আমি তো নেকলেস চোর ধরার জন্য বসেছিলাম বর্মণদের দোকানে।' লাজুক হেসে ইতু ওর অভিযানের ঘটনাটা খুলে বললো। হানাবাড়িতে ক্লোরোফর্মের গন্ধে জ্ঞান হারাবার আগে যে কথাটা শুনে ও চমকে গিয়েছিলো, পরে ওর মনে পড়েছে। সেটা ছিল এহতেশামের গলা, কাকে যেন বলছিলো— 'তোমার কোনো কথা শুনবো না। এবার নকল ওষুধের লেবেল আমরা বড় প্রেস থেকে ছেপেছি। লেবেল দেখে কেউ ধরতে পারবে না। কোন্‌টা আসল কোন্‌টা নকল।'

ছোটন উত্তেজিত গলায় বললো, 'কাল মাঝরাতে গলির মোড়ে ট্রাক থেকে মাল ওঠানামা করতে দেখেছি। ওগুলো নির্ঘাত এহতেশামের ট্রাক ছিলো।'

ছোটনের মা রেগে গিয়ে বললেন, 'মাঝরাতে তুই ছাদে গেলি কোন্ সাহসে? হুজুর বলেন নি এশার নামাজের পর সব খারাপ জিনরা ঘুরে বেড়ায়?'

ছোটন শুকনো গলায় বললো, 'ইতুর জন্য খুব খারাপ লাগছিলো মা। ঘুম

আসছিলো না। জিনের কথা তখন মনে ছিলো না।'

ছোটনের কথা শুনে ইতুর বুকের ভেতর কেমন যেন করতে লাগলো। বললো, 'কিসের জিনের কথা বলছেন সেজো কাকিমা? ওটা হচ্ছে মুশকিল আসানের বুজরুকি। ও এহতেশামের দলের লোক। জিনের কথা বলেছে— রাতে যেন কেউ ঘর থেকে না বেরোয়। ওতে মাল সাপ্লাই দিতে সুবিধে হয়।'

সাইফ দিদাকে বললো, 'হীরের নেকলেস কীভাবে উদ্ধার করলেন, এ-কথা কিন্তু সকালে আমার জানা হয় নি। আমিন ভাইও কিছু জানেন না।'

বড় জেঠু চোখ কপালে তুলে বললেন, 'হীরের নেকলেস কোথায় পেলে মা, কিছু তো বলো নি?'

মুখ টিপে হেসে দিদা বললেন, 'একটু আগে আমাকে ধমক খেতে হল কথা বলার জন্য। কোন্ মুখে আবার কথা বলি বাছা!'

বড় জেঠু লজ্জা পেয়ে বললেন, 'তুমি যে কি মা! ছোটদের সামনে আমাকে এভাবে জব্দ করা ঠিক হচ্ছে?'

ইতু ছুটে এসে দিদাকে জড়িয়ে ধরে বললো, 'বড় জেঠুকে না বললেও আমাকে বলতে হবে। তোমার নেকলেসের জন্য গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে আর একটু হলে জানটা যেতো।'

ইতুকে আদর করে চুমু খেয়ে দিদা বললেন, 'তোর শত্তুরদের জান যাক। তুই একশ' বছর বাঁচবি। তবে গোয়েন্দাগিরিতে ছোটন পাস করবে কিনা সন্দেহ!'

ছোটন অবাক হয়ে বললো, 'ওটা যে ছোটকা নিয়েছে তোমাকে বলি নি বুঝি?'

ছোটকা আরো অবাক হয়ে বললেন, 'তুই বলছিস কি ছোটন! হীরের নেকলেস আমি নিয়েছি?'

'তুমি বুঝি পরশু রাতে ওটা বিক্রি করার জন্য স্বর্ণকারের দোকানে যাও নি?' মরিয়া হয়ে বললো ছোটন।

ছোটকা অসহায় গলায় বললেন, 'হায় আল্লাহ্, এ ছোঁড়া বলে কি মা?'

মৃদু হেসে দিদা ছোটনকে বললেন, 'কলিমউদ্দিনকে আমিই পাঠিয়েছিলাম স্যাকরার দোকানে। ভূপালী বউ জাহানারাকে যে জড়োয়া সেটটা দিতে চেয়েছিলো, সেটা খাঁটি না মেকি যাচাই করে দেখার জন্য।'

বড় ফুপি অবাক হয়ে বললেন, 'ওটা কি মেকি ছিলো?'

'হ্যাঁ বাছা।' সায় জানিয়ে দিদা বললেন, 'তখনই আমি বুঝলাম হীরের নেকলেসটা ভূপালী বউই সরিয়েছে।'

'কীভাবে সরালো মা?' প্রশ্ন করলেন মেজো ফুপি।

'যেদিন আমরা পিকনিকে গেছি সেদিনই সরিয়েছে। এহতেশাম ওকে সাহায্য করেছে। ও তো নিজেই বলেছিলো দুপুরে এহতেশাম আসবে।'

'তুমি সেটা উদ্ধার করলে কীভাবে?'

'অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। গোবিন্দ মিস্ত্রিকে এনে লুকিয়ে ওর ট্রাঙ্কের চাবি বানিয়েছি। কাল রাতে ও যখন এহতেশামের সঙ্গে নিচে বসে শলা করছিলো তখন ট্রাঙ্ক খুলে ওটা উদ্ধার করেছি। জিনিসটা যখন পাওয়াই গেছে তখন আমি চাই নি এ নিয়ে আত্মীয়-কুটুম্বদের ভেতর কথা উঠুক। তাই ওকে তড়িঘড়ি পাঠিয়ে দিলাম।'

ছোটন অবাক হয়ে বললো, 'তার মানে সকালে তুমিই রিমকিদের বাসায় বসে ভূপাল থেকে জেঠিমাকে ফোন করেছিলে?'

একগাল হেসে দিদা বললেন, 'ঠিক ধরেছিস! আমিই ওর পড়োসান হয়ে ফোন করেছিলাম। অবশ্য চোরাই নেকলেস হারাবার দুঃখে ও এমনিতেই চলে যেতো। যখন ও দেখেছে ওটা ট্রাঙ্কে নেই তখনই বুঝে নিয়েছে ওর চালবাজি শেষ। বিয়ের আগে এহতেশামের পাকাপাকিভাবে শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার খবর পেলে ও হার্টফেলও করতে পারতো। তাই ওকে পাঠিয়ে দিতে হলো।'

এসপি আমিন আহমেদ দিদাকে বললেন, 'মুশকিল আসানটাকে ঠিকমতো আটকে রেখেছেন তো?'

দিদা হেসে বললেন, 'দরজার বাইরে তালা দিয়েছি। ছাদ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে মরতে না চাইলে ওকে ঘরেই পাবে। যাওয়ার সময় নিয়ে যেও।'

বড় জেঠু কী বলতে যাবেন তখনই ঘরে ঢুকলো সূত্রাপুর থানার দারোগা। মোটাসোটা মানুষটা হাঁসফাঁস করে দিদাকে বললো, 'বলি নি বজ্জাত বেটি আমার চোখে ফাঁকি দিয়ে পালাতে পারবে না! ঠিকই ধরে ফেলেছি ফতুল্লা থেকে।'

দারোগার পেছনে দাঁড়িয়ে ফোঁৎফোঁৎ করে কাঁদছিল দুখির মা। দিদা ছুটে গিয়ে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন— 'আর কাঁদিস না বাছা! কাল থেকে তোর কথা ভেবে মনটা পেরেশান হয়ে আছে। পালিয়েছিলি কেন, ভূপালী বউয়ের কথায়?'

'হ বড়মা।' দিদার আদর পেয়ে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলো দুখির মা— 'রাঙা বিবি আমারে কয় খবিস জিনডার নজর বলে আমার উপরে পড়ছে। এ-বাড়ির দশ মাইলের ভিতরে থাকলে আমার বাঁচন নাই, গুষ্টি সুদ্দা মরণ লাগব। এই কথা কাউকে কইলেও বলে জিন লাইগা যাইব। হেই ডরে আমি পুলিসেরও কিছু কই নাই গো। হাউ হাউ হাউ!'

মেজো ফুপি বললেন, 'তোকে এসব কথা বলার কারণটা কী? তুই কি নেকলেস সরাতে দেখেছিলি?'

'দেখতেও পারতো।' দিদা সোফায় বসে শান্ত গলায় বললেন, 'সেদিন ও কিছু দেখেছে কিনা ভূপালী বউ তো জানে না। ওর ভয় ছিলো দুখির মাকে

নিয়ে। ওকে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়েছে পুলিসের জেরায় যেন ও বেফাঁস কিছু বলে না ফেলে। তাছাড়া ও পালালে নেকলেস চুরির দায়টাও ওর কাঁধে ফেলা যাবে।'

'কী সাংঘাতিক!' এতক্ষণ পর মুখ খোলেন রিমকির নানি— 'ভাগ্যিস জাহানারার বিয়ের আগে এদের শয়তানিটা ধরা পড়ল।'

'জাহানারার বিয়ের তারিখ কিন্তু ঠিকই থাকছে।' মুখ টিপে হেসে দিদা রিমকির নানি আর সাইফকে দেখলেন। তারপর বললেন, 'শুধু বরের নামটা কার্ডে পাল্টানো হবে।'

জেঠিমা, কাকিমারা সবাই হইচই করে উঠলো— 'এসব কী মা! আমরা তো কিছুই জানি না! বরের জায়গায় কার নাম বসবে?'

জাহানারা দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিলো। ওর বিয়ে নিয়ে বড়দের এ-ধরনের হইচই করতে দেখে লজ্জা পেয়ে পালালো। দিদা বললেন, 'বৌমারা যতক্ষণ মিষ্টি না খাওয়াচ্ছে, বিয়ের ব্যাপার নিয়ে কোনো কথা নয়।' তারপর ছোটনদের দিকে তাকালেন— 'তোরাও এখন পালা। বড়দের বিয়ের কথায় থাকতে নেই। মিষ্টির ভাগ ঠিকই পাবি। সেজো বউ ইতুকে আগে একগ্লাস দুধ দাও।'

জেঠিমা, কাকিমাদের পেছন-পেছন ছোটরাও সবাই বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে। সাইফকে বসে থাকতে দেখে দিদা বললেন, 'তুমি তো বাছা তোমার ছাত্রীর ঘরে যেতে পারো। নিজের বিয়ের কথা কি নিজের কানে না শুনলে নয়?'

দিদার কথায় জেঠুরা, কাকারা সবাই ঘর ফাটিয়ে হাসলেন। বেচারা সাইফ তখন লাল-টাল হয়ে পালাবার পথ খুঁজে পায় না। দোতালায় সিঁড়ি বেয়ে উঠতে-উঠতে রিমকি ইতুর কানে কানে বললো, 'খুব খুশিখুশি লাগছে না ইতু?'

ইতু মৃদু হেসে রিমকির হাত ধরলো।

হানাবাড়ীর রহস্য

অলংকরণ : আফজাল হোসেন

নতুন বইয়ের লিস্টি দেয়া হয় নি বলে

বড়দিনের লম্বা ছুটির পর নতুন বছরে স্কুলের নতুন ক্লাসে ঢোকার আনন্দই আলাদা। অন্য স্কুল থেকে বদলি হয়ে দু'একজন নতুন ছেলে আসে। নতুন টিচাররা আসেন। নতুন বইয়ের লিস্টি না দেয়া পর্যন্ত শুধু গল্প করেই শেষ হয় ক্লাসের পিরিয়ডগুলো।

রাতুলরা সেবার নাইনে উঠে বাংলা সেকেণ্ড পেপারের ক্লাসে পেলো শুভদারঞ্জন স্যারকে। সেভেন—এইটে থাকতে ওরা দু'বার কি তিনবার পেয়েছিলো এই স্যারকে। অন্য কোনা স্যার না আসাতে তিনি ওদের দু'তিনটে ক্লাস নিয়েছিলেন। ওতেই ওরা মেতে গিয়েছিলো। কি দারুণ সব ভূতের গল্প আর অলৌকিক, রোমহর্ষক কাহিনী জানেন শুভদারঞ্জন স্যার! আর বলেনও এমনভাবে—বিশ্বাস না করে পারা যায় না।

'আত্মা অবিনশ্বর।' এই বলে গল্প শুরু করতেন তিনি। গোল রোলগোল্ডের চশমার ভেতর দিয়ে গোল গোল চোখ দুটো সবার মুখের ওপর বুলিয়ে দেখতেন কথাটা সবাই বুঝতে পেরেছে কিনা। তারপর একটু সহজ করে বলতেন, 'মানুষের দেহের মৃত্যু হয়, আত্মার মৃত্যু নেই।' এরপর গলাটা এক ধাপ নামিয়ে বলতেন, 'আমাদের চারপাশে লক্ষ কোটি আত্মা মুক্তির আশায় ছটফট করে ঘুরছেন। এঁদের কারো বয়স হাজারের কোঠা পেরিয়ে গেছে। মুক্তি না পেয়ে সারাক্ষণ দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন। কখনো মুক্তির আশায় কারো শরীরে ভর করছেন।' তারপর নিজেই চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতেন, 'কে জানে হয়তো এখানেও কোনো অতৃপ্ত আত্মা ঘুরছেন। আমাদের চিত্ত অস্থির, অপবিত্র, তাই ওঁদের দেখি না।' এটুকু বলে জোড় হাতে অদৃশ্য আত্মার উদ্দেশে প্রণাম জানাতেন— 'যাঁরা মহাপুরুষ, যাঁদের চিত্ত পবিত্র, তাঁরা সব ঠিকই দেখেন।'

গন্ধীবাবা আর মছলীবাবা নামের সিদ্ধপুরুষদের নানারকম অলৌকিক ক্ষমতার কথাও বলতেন শুভদারঞ্জন স্যার। আরও বলতেন কালীনাথ তান্ত্রিক, সিধু ফাঁসুড়ে আর তারাময়ী ব্রহ্মচারিণীর অদ্ভুত, বিচিত্র সব গল্প।

পীর-ফকিরে বিশ্বাস রহমতুল্লা স্যারেরও কম ছিলো না। 'তোমরা তো দাদাজী কেবলার কথা শোন নাই।' শুদ্ধ বাংলা বলার যথাসাধ্য চেষ্টা করেও তিনি বলতে পারতেন না। তবে তার জন্য গল্পের রোমাঞ্চে কোনো ঘাটতি ছিলো না। 'দাদাজী কেবলার নফর আছিলো দুইটা জ্বীন। দাদাজীরে খুব ডরাইতো। জ্বীনগো আল্লাপাকে আগুন দিয়া বানাইছে। তেনাগো শরীর ভরা রাগ, মগার দাদাজীরে জ্বীনেরা খুব মানতো। আমি দেখছি ওনাগোরে। অজগর সাপের সুরত ধইরা শুইয়া আছিলেন আব্বা হুজুরের মাজারে। একবার এক নালায়েক খাদেম বিনা ওজুতে খানকা শরিফে আসছিলো। দুই জ্বীনের তখন গোস্বা হইছিলো খুব। দাদাজী বুঝাইয়া অগোরে ঠাণ্ডা করেন।' এরপর খাবিস জ্বীন কি করে বশ করতে হয় সেসব বলতেন রহমতুল্লা স্যার। ছিলেন ড্রইং-এর টিচার। হাতের লেখা মুক্তোদানার মতো জ্বলজ্বল করতো।

স্কাউট টিচার নিকোলাস স্যার ক্লাস এইটে ভুগোল পড়াবেন শুনে রাতুলরা আহ্লাদে আটখানা হলো। ক্লাসে যখন পড়ানোর কিছু থাকে না, তিনি বিদেশ ঘোরার গল্প বলেন। স্কাউটিং করার সুবাদে বহু দেশ ঘুরেছেন তিনি। ইন্দোনেশিয়ার কোন দ্বীপে একবার মানুষখেকো মানুষের পাল্লায় পড়ে কিভাবে বেঁচে এসেছিলেন সে গল্প তিনি যতোবার শোনান ততোবারই রোমাঞ্চ হয় ক্ষুদে শ্রোতাদের। রেঙ্গুনের এক বুড়িকে মা ডেকে কুক্‌রির কোপ খেতে খেতে অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচেছিলেন—সে গল্পও কখনো পুরোনো হয় না। কোরিয়াতে দুই অমায়িক বুড়ো তাঁকে লাউডগা সাপের সুপ না খাইয়ে কিছুতেই ছাড়বেন না। শেষে অক্টোপাসের ঝোল খেয়ে ওদের অভিমান ভাঙাতে হয়েছিলো। অক্টোপাস আর জেলি ফিশ খেতে নাকি রবারের মতো, মোটেই উপাদেয় নয়—একথা তিনি ছেলেদের এমনভাবে বুঝিয়েছেন, জীবনে কেউ এ দু'টি প্রাণী খাওয়ার কথা মুখে আনবে না।

প্রথম দিকে নিরানন্দের মনে হয়েছিলো কামেলালি স্যারের ক্লাস। ব্ল্যাকবোর্ডে হাতের লেখা লিখতে দিয়ে টেবিলে পা তুলে ঝিমুতেন তিনি। দু'দিন না যেতেই ছেলেরা আবিষ্কার করে ফেললো, এই ক্লাসে পরম নিশ্চিন্তে কাটাকুটি খেলা যায়, স্যারের কার্টুন আঁকা যায়, নিচু গলায় গল্প করা যায়, ইচ্ছে করলে প্রহেলিকা বা রোমাঞ্চলহরী সিরিজের গল্পের বইও পড়া যায়; কেউ বারণ করবে না। বলা বাহুল্য কামেলালি স্যারের ক্লাসটিও রাতুলদের জন্য ভারি সুখের ছিলো।

এ কথা তো সবাই জানে বেশিদিন একটানা সুখের ভেতর কাটালে সুখও একঘেয়ে মনে হয়। গল্প শুনে আর গল্প করে যখন ক্লাস শেষ হতো, শীতের বিকেলে নরোম রোদে রবির সঙ্গে হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফেরার সময় রাতুলের আর বলার কিছু থাকতো না। ছোড়দির দেবর রবি গত বছর বরিশাল থেকে এসে ওদের ক্লাসে ভর্তি হয়েছে। নেহাত বৃত্তি পেতো বলেই ভর্তি হতে পেরেছিলো,

নইলে রাতুলদের মিশনারি স্কুল মফস্বল থেকে কেউ এসে পড়ার সুযোগ পাবে এমন কথা কেউ বলতে পারে না। প্রথম দিকে রবি খুব উত্তেজিত ছিলো। পরে রাতুলদের কাছে যখন সব কিছু একঘেয়ে মনে হতে লাগলো, রবিও ভাবলো নিকোলাস স্যারের মতো বিদেশে ঘুরতে না পারলে জীবনের কোনো দামই নেই। অনেক সময় মনে হতো সত্যিই কি তিনি এতো সব দেশ ঘুরেছেন? রাতুল অবশ্য বলেছে নিকোলাস স্যার ভ্রমণকাহিনী লিখলে আট-দশটা মোটা মোটা বই লিখতে পারবেন। ওর কথারই বা বিশ্বাস কি! রাতুল নিজেও তো গপ্পো মারার সুযোগ পেলে ছাড়ে না।

স্কুল থেকে ফিরে কুমোরটুলির বাড়ির বিরাট ছাদের এক কোণে বসে ওরা দু'জন ভাবে, অ্যাডভেঞ্চার ছাড়া জীবন অসার। নিচে সেজদা ছোড়দার বন্ধুদের নিয়ে ব্যাডমিন্টন খেলে, ছাদের কোণ থেকেও ওদের হল্লা শোনা যায়। দূরে বাদামতলি ঘাট দেখা যায়, সূর্যটা নবাববাড়ির গম্বুজের আড়ালে চলে গেলে বরিশাল খুলনার স্টীমারের ডাক শোনা যায়। রাতুল বলে, 'কোথাও যদি যাই জাহাজেই যাবো।'

রবি বলে, 'আমিও জাহাজের কথা ভেবেছি।'

'তুই কখন ভাবলি? তোকে তো আমিই প্রথম ট্রেজার আইল্যাণ্ড আর সুইস ফ্যামিলি রবিনসন পড়তে দিয়েছি?'

'তুই জাহাজে চড়বি, সাঁতার জানিস? কোনা দিন তো লঞ্চেও চড়িস নি। শুধু বই পড়ে অ্যাডভেঞ্চার হয় না।'

'সবই যদি জানিস তবে একাই যা না!'

'আমি বুঝি তাই বলছি! তুই আমার চেয়ে বই অনেক বেশি পড়েছিস, এ কথা কি অস্বীকার করেছি?'

'তোদের গ্রামের বাড়িতে গেলে আমাকে সাঁতার শিখিয়ে দিস।'

'তোর আর যাওয়া হয়েছে! গরমের ছুটিতে কতো করে বললাম চল, তুই তো কানেই তুললি না।'

'তুই তো জানিস, ছোড়দিকে এখনো তোর মা যেতে বলেন নি।'

'বেনুদা মাকে না জানিয়ে তোর ছোড়দিকে বিয়ে করেছে বলেই না মা একটু চটেছিলেন। গরমের ছুটিতে গিয়ে দেখেছি, বউ দেখার জন্য মা ছটফট করছেন, আবার লজ্জায় বলতেও পারছেন না।'

'বেনুদা বুঝি সেজন্যে বাড়ি গেছে?'

'তবে আর বলছি কি! মা'র রাগ পড়ে গেছে। বেনুদা ফিরে এসে ভাবীকে নিয়ে যাবে।'

রাতুলদের বাড়িতে ওর বাবা, কাকা, জ্যাঠা, তাদের ছেলেমেয়ে আর আত্মীয়স্বজন মিলে বিরাট সংসার। দুঃখের বিষয় হলো, রবি আসার আগে

রাতুলের কাছাকাছি বয়সের একজনও ছিলো না। ছোড়দি যদি এতো নাটক করে বেনুদাকে বিয়ে না করতো, রবির সঙ্গেও এ জন্মে দেখা হতো না।

ছোড়দির বিয়ে নিয়ে সে এক দারুণ কাণ্ড! বেনুদা ছিলো সেজদার বন্ধু, মাত্র ডাক্তারি পাস করেছে। বাড়ির ছেলের মতোই আসা-যাওয়া করে, তাস খেলে, ব্যাডমিন্টন খেলে, ছোড়দি-মেজদিদের নিয়ে সিনেমায় যায়। কেউ জানতেও পারে নি কোন ফাঁকে বেনুদার সঙ্গে ছোড়দির এতো জানাশোনা হলো। তবে রাতুলের কথা আলাদা।

গত শীতে একদিন স্কুল থেকে ফিরে এসে রাতুল দেখে সারাবাড়ি থমথম করছে। দু'একজনকে জিজ্ঞেস করলো—কি হয়েছে? কেউ কিছু বলে না। রাঙা নানী রাতুলদের দুঃখিনী রাজকন্যার আর ঘুঁটে কুড়োনির গল্প বলতেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করতেই চাপা গলায় রাগে ফেটে পড়লেন—'হবে আবার কি? যা হবার নয় তাই হয়েছে। তোমাদের ছোড়দি ডাক্তার ছোঁড়াকে বিয়ে করবে বলে বায়না ধরেছে। ছিঃ ছিঃ কি লজ্জার কথা, আমি কোনোদিন এমন কথা মুখ ফুটে বলতে পারতাম!'

সেজদা কোথায় যেন যাচ্ছিলো। রাঙা নানীর শেষের কথা শুনে গম্ভীর হয়ে বললো, 'তোমার কি আর বিয়ের বয়স আছে যে এসব কথা তোমাকে বলতে হবে! বয়স থাকলে ঠিকই বলতে।'

রাঙা নানী বললেন, 'চোরের মা'র দেখি বড় গলা! ওই ছোঁড়াকে তুই-ই এনেছিস এ বাড়িতে। হাবুকে বলবো যাবার আগে তোকে সায়েস্তা করতে।'

'এনেছিলাম বলেই না অতো ভালো জামাই পেলে।' এই বলে সেজদা চলে গেলো।

রাতুল জানতো এরকম কিছু একটা ঘটবে। ছোড়দি নিজের পছন্দের কথা নিজে বলাতে বড়দের সবার মুখ ভার। তবে সেজদা-মেজদা কাউকে বুঝিয়ে, কাউকে ভয় দেখিয়ে, রাজি করিয়েছে।

রাগ বেনুদার মা'রও কম নয়। শরীর ভালো নয় বলে বিয়েতে এলেন না। বেনুদার বাবা নেই। থাকে হোস্টেলে। বরিশাল থেকে কাকারা এসে বিয়ে দিলেন।

বিয়ের পর বেনুদা যখন বাড়ি ভাড়া করে ছোড়দিকে নিয়ে যাবে বললো, বড়দের তখন সে কি রাগ! বলা হলো—'আগে পশার-টসার জমুক, তারপর দেখা যাবে।' ঠিক হলো ছোড়দির পরীক্ষা পর্যন্ত বেনুদাকে এ বাড়িতে থাকতে হবে। বেনুদা তবু গাঁইগুঁই করলো। ছোট ভাইর নাকি গ্রামের স্কুলে পড়াশোনা হচ্ছে না। ওকে আনতে হবে। আলাদা বাসা না করলেই নয়। শুনে রাঙা নানী ধমক লাগালেন—'এমনিতে বাপু ঢের অপকম্মো করেছো। মুরুব্বিদের কথা মান্য করতে শেখো। তোমার ভাই এমন কোন নবাবের নাতি যে, ওর জন্যে আলাদা

বাসা লাগবে? ও আমাদের রাতুলের সঙ্গে থাকবে। এ বাড়িতে রাতুল ছোঁড়ার সঙ্গী কেউ নেই। একসঙ্গে পড়াশোনা করবে। ওরও উপকার হবে।'

রাঙা নানীর কথা কেউ অমান্য করে না। বেনুদা আপত্তি করলেও রবিকে আসতে হলো। রাতুলও ভারি খুশি। দু'দিনেই ওরা দু'জন বুঝে ফেললো, ওদের মতো বন্ধু পৃথিবীতে দুটো নেই। আর এ বাড়িতে ওরা অন্য সবার চেয়ে আলাদা।

রোজকার মতো সেদিন সন্ধে অব্দি ছাদে বসে গল্প শেষ করে রাতুলরা নিচে নেমে শুনলো ছোড়দি নাকি শ্বশুরবাড়ি যাবে। বাবা অফিস থেকে ফিরে চা খেয়ে দোতলার ঘরে ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে খবরের কাগজ দেখছেন—জেঠিমা এসে বললেন, 'বেনুর মা'র মান ভেঙেছে। চিঠি লিখেছেন তাঁর বউমাকে পাঠাতে। বেনু বরিশালে ওদের জন্যে অপেক্ষা করবে, রবি যেন নীনাকে নিয়ে যায়।'

বাবা মৃদু হেসে বললেন, 'ভালোই তো। কালই পাঠিয়ে দাও।'

জেঠিমা একটু ইতস্তত করে বললেন, 'আমি বলি কি, রবির সঙ্গে রাতুলও যাক না। মেয়েটা প্রথমবার শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে।'

জেঠিমার কথা শুনে আনন্দ আর উত্তেজনায় রাতুলের বুক ঢিবঢিব করতে লাগলো। বরিশাল থেকে ষাট মাইল দুরে সমুদ্রের কাছে এক অজ পাড়াগাঁয়ে রবিদের বাড়ি। জীবনে লঞ্চে ওঠে নি রাতুল। এ সুযোগ স্টীমারেও ওঠা হবে। কি মজাই না হবে।

হঠাৎ বাবার কথা শুনে রাতুলের সব আনন্দ মুহূর্তের ভেতর কর্পূরের মতো উবে গেলো। বাবা জেঠিমাকে বললেন 'স্কুল খুলে গেছে। খামোকা দু'জনের পড়া নষ্ট করার কি দরকার। রবি একাই যাক। পরে রাতুলের কাছ থেকে ক্লাসের পড়া জেনে নেবে।'

ক্লাসে যে এখন পড়াশোনা কিছু হয় না, কথাটা বাবাকে জানানো দরকার। রাতুল ঘরে ঢুকে এটা-সেটা নাড়তে লাগলো। বাবা বললেন, 'এখানে ঘুরঘুর করছিস কেন, পড়ালেখা নেই?'

'লুডুঘর খুঁজছি,' বলে রাতুল মিছেমিছি তাকের ওপর খুঁজতে লাগলো।

'পড়ার সময় লুডুঘর কেন?'

যে কথা বলার জন্যে রাতুল ঘরে ঢুকেছিলো, টপ করে বলে ফেললো, 'বুকলিস্টের পাত্তাই নেই! কবে দেয় তারও ঠিক নেই।'

'তাহলে আর অসুবিধে কি।' জেঠিমা বললেন বাবাকে— 'বইয়ের লিস্টি দিলেও পড়া শুরু হতে আরও আট-দশদিন, ওরা খুব বেশি হলে দিন পনেরো থাকবে।'

রাতুল ভালোমানুষের মতো— যেন কিছুই জানে না, জেঠিমাকে জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায় যাবো জেঠিমা?'

জেঠিমা বাবাকে পানের খিলি সাজিয়ে দিয়ে, নিজে একটা মুখে পুরে চিবুতে

চিবুতে বললেন 'তোদের ছোড়দি বরিশাল যাবে। রবি নিয়ে যাবে। সঙ্গে তুইও যাবি। কাল তোদের ইশকুলে গিয়ে কাজ নেই। সব গোছগাছ করতে হবে। রবিকে বলে ধোপাবাড়ির কাপড়গুলো আলাদা করে রাখিস।'

রাজবাড়ি বললেও আসলে হানাবাড়ি

'খুব পুরোনো বাড়ি?'

'তোকে আর বলছি কি! আসলে কতো পুরোনো মা'র দাদুও বলতে পারবে না। সবাই ওটাকে পুরেনো রাজবাড়ি বলে।'

স্টীমারের ডেকে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলো রাতুল আর রবি। ভোর ছ'টায় স্টীমার ছেড়েছে বাদামতলি ঘাট থেকে। এখন এগারোটা বাজে। এর ভেতর একবারও ওরা কেবিনে যায় নি। ছোড়দি সেখানে একা বসে বেগম পত্রিকা পড়ছে। দু'বার উঠে এসে ওদের ডেকেছিলো ভেতরে যাওয়ার জন্যে। রাতুল যায় নি, রবিকেও যেতে দেয় নি। ছোড়দি বলেছে বাড়ি ফিরে নাকি জেঠিমাকে বলে মার খাওয়াবে। অমন অনেক কথাই ছোড়দি বলে। মার খাওয়ানো অতো সোজা নয়। তখন বেনুদা থাকবে। বিয়ের আগে লুকিয়ে বেনুদার চিঠি এনে ছোড়দিকে দিতো বলে, ওকে একটু বেশি আদর করে বেনুদা। যেমন ছোড়দি বেশি আদর করে রবিকে।

নিজেদের বাড়ির গল্প বলতে গিয়ে রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলো রবি। রাতুলকে এসব কথা আগে কখনো বলে নি। ভেবেছে, রাতুল যদি ওকে অহংকারী ভাবে! আড়চোখে একবার রবির দিকে তাকিয়ে রাতুল বুঝলো, আরো কথা বলার জন্য ও মুখিয়ে আছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে সন্দেহের গলায় বললো, 'তাহলে তুই বলতে চাস তোরা আগে রাজা ছিলি!'

রবি একটু অপ্রস্তুত হলো—'ঠিক রাজা নয়, আমাদের পূর্বপুরুষরা বড় জমিদার ছিলো। ওই তল্লাটে অতো বড় বাড়ি কোথাও ছিলো না বলে সবাই ওটাকে রাজবাড়ি বলতো। এখন অবশ্য কিছুই অবশিষ্ট নেই। ছোটবেলায় সদর দরজার পাশে দুটো শ্বেতপাথরের সিংহ দেখেছিলাম। সেগুলো পর্যন্ত চুরি হয়ে

রবিকে বললো, 'মনে কর আমরা তোদের পুরোনো বাড়িতে এক কলসি মোহর পেলাম। কেমন হবে বল তো?'

'তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে?' রবি চোখ দুটো মোহরের মতো গোল করে বললো, 'ভয়ে এখনো রাজবাড়ির ধারে-কাছে খুনে ডাকাত পর্যন্ত যায় না, আর তুই যাবি মোহর আনতে? মাঝে মাঝে তুই এমন উল্টোপাল্টা কথা বলিস, শুনলেই ভয় করে।'

'অমন করে তাকাস না রবি। চোখের মণি দুটো ঠিকরে বেরিয়ে যাবে।'

রবি গম্ভীর হলে বললো, 'এসব কথা আমাদের বাড়িতে গিয়ে কাউকে বলিস না। পুরোনো বাড়ির জ্বীনরা বিরক্ত হয়—এমন কাজ কেউ কখনো করে না।'

'কি করে বুঝলি, সাপগুলো যে জ্বীন?'

'বাবার দাদু, আমাদের বড়বাবা মস্তবড় কামেল ছিলেন। একবার দেখেছিলেন তিনি। সন্ধেবেলা গোরস্থানে কার কবর জেয়ারত করে ফেরার সময় শোনেন পুরোনো বাড়িতে কিসের যেন শব্দ হচ্ছে, অনেকটা দরুদ পড়ার মতো। কাছে গিয়ে দেখেন, অনেকগুলো সাপ কাতার বেঁধে নামাজ পড়ছে। বড়বাবাকে দেখে ওদের একজন মানুষের চেহারা ধরে বেরিয়ে এলো। বললো, হুজুর আপনি বুজুর্গ মানুষ। আপনার আব্বা হুজুরের কাছে আমরা কোরান শরীফ পড়েছি। আমরা আপনাদের খেদমতগার। মানুষের অত্যাচারে লোকালয়ে বসে আল্লার এবাদত করতে পারি না। তাই এই বিরান বাড়িতে এসে থাকছি। আপনার কাছে আমাদের আরজি, এখানে কোনো আদমের আওলাদ যেন আমাদের বিরক্ত না করে। শুনে বড়বাবা বললেন, ঠিক আছে, আমি বলে দেবো সবাইকে। তবে তোমাদেরও বলছি, তোমরা এ বাড়ি ছেড়ে লোকালয়ে এসো না। আমাদের ছেলেমেয়েরা সব সময় পাক-সাফ থাকে না। দেখলে তোমাদের রাগ হতে পারে। জ্বীন বললো, না হুজুর, আমরা এ বাড়ির বাইরে যাই না। জেনেশুনে কেউ আমাদের ক্ষতি না করলে আমরা কারো ক্ষতি করি না। এই বলে জ্বীনটা বড়বাবাকে সালাম দিয়ে বাতাসে মিলিয়ে গেলো।'

রবির কথা শুনে রাতুলের খাবি খাওয়ার দশা হলো—'বলিস কি! সত্যি সত্যি তোর বড়বাবা জ্বীনের সঙ্গে কথা বলেছিলো?'

রবি গম্ভীর হয়ে বললো, 'মুরুব্বিদের নিয়ে আমরা কখনো মিছে কথা বলি না। আমার বড়দাদুর কাছে দুটো জ্বীন এসে কোরান শরীফ পড়তো। সেজন্যে জ্বীনরা আমাদের বাড়ির কাউকে এখনো কিছু বলে নি।'

'তুই যে বললি ও বাড়ির জিনিসপত্র সব চোরে নিয়ে গেছে। জ্বীনের ভয় থাকলে চোর ঢোকে কি করে?

রবি কাষ্ঠ হেসে বললো, 'তোর মতো অবিশ্বাসী মানুষের তো অভাব নেই! চুরি যারা করেছে তারা ফলও ভোগ করেছে। শ্বেতপাথরের সিংহ দুটো

নিয়েছিলো সর্দার বাড়ির খুনে ছেলে ছানাউল্লা। দু'বার খুনের দায়ে জেল খেটেছে। ডরভয় বলতে কিছু ছিলো না। নিয়মিত শহরে যেতো, ভেবেছিলো শহরে নিয়ে বিক্রি করতে পারলে ভালো দাম পাবে। সঙ্গে এক চ্যালা নিয়ে সিংহ দুটো বস্তায় পুরে নৌকায় উঠেছে। শীতের সময়, ঝড়-তুফানের নাম-নিশানা নেই। নৌকা যখন মাঝনদীতে, হঠাৎ কোত্থেকে একটুকরো মেঘ এসে আকাশ অন্ধকার করে ফেললো। শুরু হলো ভীষণ ঝড়। ঘনঘন বাজ পড়তে লাগলো। একবার ভীষণ শব্দে একটা বাজ পড়লো নৌকার ওপর। মাঝি ছিটকে পড়লো নদীর ভেতর। সাঁতার কাটতে কাটতে মাঝি দেখলো, বস্তা ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়লো দুটো সাদা সিংহ। চোখের পলকে ভয়ঙ্কর এক ডাক ছেড়ে ছানাউল্লা আর তার চ্যালাকে মুখে তুলে নিয়ে শূন্যে লাফ দিলো। তারপর আর কিছু দেখে নি মাঝি। একটু পরেই দেখে ঝড় থেমে গেছে, আকাশের সব মেঘ বাতাসে উড়ে গেছে। বিকেলের শান্ত নদীতে নৌকা ভাসছে। মাঝি নৌকায় উঠে দেখলো, পাটতনের ওপর ছেঁড়া বস্তা দুটো পড়ে আছে, এখানে-সেখান রক্তের দাগ। দাদা তখন বেঁচে ছিলেন। মাঝি ফিরে এসে সোজা দাদার পায়ের উপর পড়লো হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বললো, বস্তায় করে ওরা রাজবাড়ির সিংহ নিচ্ছে, ও জানতো না। ওরা তো পাপের ফল ভোগ করেছে, ওর যেন কিছু না হয়। দাদা বললেন, তোর কিছু হলে তখনই হতো। বাড়ি যা। যাবার পথে মাজারে ক'টা মোমবাতি দিয়ে যাস। এরপর অবশ্য পুরোনো বাড়ির কোনো জিনিস খোয়া গেছে বলে শুনি নি।

রবি যেভাবে কথাগুলো বলছিলো, রাতুল বিশ্বাস করে ফেলেছিলো। তবে বাড়িতে বড়দা মেজদা যেভাবে জ্বীন-ভূত নিয়ে হাসিঠাট্টা করে, শুনতে শুনতে এটাও ওর মনের ভেতর শেকড় গেড়ে বসেছিলো, পৃথিবীতে অলৌকিক বলে কিছু নেই। নিকোলাস স্যারও ক্লাসে বলেন, মানুষ যখন কোনো কিছুর ব্যাখ্যা করতে পারে না, যখন বলতে পারে না কেন এমন হলো, তখনই বলে অলৌকিক কোনো কারণে ঘটেছে। শুভদারঞ্জন স্যারের কথা তিনি হেসে উড়িয়ে দেন। এ নিয়ে অবশ্য শুভদারঞ্জন স্যার সামনে কিছু না বললেও আড়ালে বলেন, 'নাস্তিক।' রহমতুল্লা স্যার বলেন, 'নাসারা।'

ছানাউল্লার সিংহ চুরির ঘটনা সত্যি হলেও ঝড়-তুফানের গল্পটা বানানোও হতে পারে। কে জানে দলে হয়তো মাঝিও ছিলো। বিক্রি করে লাভের বখরা নিয়ে গণ্ডগোল হয়েছে, ছানাউল্লা আর তার চ্যালাকে মেরে নদীতে ফেলে দিয়েছে। মাঝি জানে রাজবাড়ির কর্তারা ওর সহায় থাকলে থানা-পুলিশ কিছু করতে পারবে না। তাই ঝড়-তুফানের গল্প ফেঁদে রবির দাদাকে পটিয়েছে।

রাতুল হঠাৎ বললো, 'আচ্ছা রবি, সেই মাঝিটা এখন কোথায় রে?'

'ওরা গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে। যে বছর দাদা মারা গেলেন, সে বছরই চলে

গেলো। বললো, হুজুর নেই আমাকে কে বাঁচাবে? বাবা তো চাকরির সুবাদে বাইরে বাইরে থাকতেন।'

রাতুল আপন মনে বললো, 'মাঝি ঠিকই বলেছে। তোর দাদা ছাড়া ওকে আর কেউ বাঁচাতে পারতো না।'

রবি বললো, 'এতোক্ষণে আমার কথা বুঝি তোর বিশ্বাস হলো?'

রাতুল মৃদু হেসে কথা পাল্টালো—'তুই হানাবাড়ি বইটা পড়েছিস রবি?'

অবাক হয়ে রবি বললো, 'না, পড়ি নি। কেন, কার লেখা? কি আছে ওতে?'

'প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখা হানাবাড়ি। আমার শেলফে আছে, পড়িস।' আপন মনে কথাগুলো বললো রাতুল— 'মনে হচ্ছে তোদের রাজবাড়িটা হানাবাড়ির মতোই একটা কিছু হবে।'

জ্বীনর আলো নয়—ওটা আলেয়া

দুপুরের পর রাতুলদের লঞ্চ বরিশাল ছেড়েছে। তুষখালি আসতে আসতে সন্ধে পেরিয়ে গেলো। দুপুরের পর থেকে রাতুল আর রবি ডেকে বসে যে গল্প শুরু করেছে টেরও পায় নি কখন সূর্য ডুবে গেছে। সূর্য ডোবার পরই সাদা কুয়াশার চাদরে ঢাকা পড়েছে বলেশ্বরী নদী, তীরের গাছপালা আর ঘরবাড়ি। মাঝখানে বেনুদা ওদের ভেতরে ডেকেছিলো চায়ের জন্য। চায়ের সঙ্গে খাওয়ার জন্য ছোড়দি টিন থেকে ক্রিমক্র্যাকার বিস্কিট বের করে দিয়েছিলো। ঝটপট চায়ের পাট চুকিয়ে দিয়ে আবার ডেকে রাখা চালের বস্তার ওপর বসেছে ওরা।

তুষখালি নামেই ঘাট। আশেপাশের জন-মানুষের কোন সাড়াশব্দ নেই। বেনুদা বললো, 'হাটের দিন ছাড়া লোকজন থাকে না।'

ওদের চারজনকে জনশূন্য ঘাটে নামিয়ে দিয়ে খকখক করে কাশতে কাশতে বুড়ো লঞ্চটা সাঁঝরাতের অন্ধকার আর কুয়াশার ভেতর হারিয়ে গেলো। একটু পরে সেই কাশির শব্দও মিলিয়ে গেলো।

ছোড়দি বললো, 'লোকজন না থাক, একটা কুকুর-বেড়ালও কি থাকতে নেই!'

বেনুদা কাষ্ঠ হাসলো—'লোকজন না থাকলে কুকুর-বেড়াল আসবে কোত্থেকে! শুনলাম ক'দিন ধরে ডাকাতিও নাকি বেড়েছে।'

রবি বললো, 'বেনুদা, এই রাতে বাড়ি না গিয়ে ডাকবাংলোয় থেকে গেলে হয় না! মা তো সবসময় বলে ঘাটে সন্ধ্যে হয়ে গেলে যেন ডাক বাংলোয় থেকে যাই।'

'আমিও ভাবছি। লঞ্চটা আজ এক ঘন্টা দেরি করেছে, জোয়ারের উল্টোদিকে আসতে হয়েছে বলে।' এই বলে বেনুদা ছোড়দির দিকে তাকালো—'কি বলো, থাকবে নাকি ডাকবাংলোয়? এখান থেকে দশ মিনিটের পথ।'

ছোড়দি বললো, 'তোমাদের বাড়ি এখান থেকে কদ্দুর?'

'মাইল তিনেকের মতো হবে। ঘন্টাখানেক লাগবে যেতে।'

'মোটে তিন মাইল? তাই বলো! এক ঘন্টার পথ গল্প করেই চলে যেতে পারবো।'

বেনুদা কাষ্ঠ হেসে বললো, 'যেতে পারলে তো ভালোই।'

আমরা যে যার ব্যাগ কাঁধে নিয়ে রওনা হবো এমন সময় কুয়াশা ফুঁড়ে, আগাগোড়া চাদর মুড়ি দিয়ে মাঝবয়সী একটা লোক হারিকেন হাতে উপস্থিত। খসখসে গলায় বললো, 'বড়মেঞা আইয়া পড়ছো নিহি। মুই তো দুইবার ঘুইরা দেইহা গেছি। লঞ্চ দেরি করছে মনে হয়!'

লোকটাকে দেখে বেনুদার দুশ্চিন্তা কেটে গেলো—'এই যে বনমালি, তোমাকে না দেখে আমরা তো বাড়ির দিকে রওনা হচ্ছিলাম।'

বনমালি আঁতকে উঠলো—'হেইয়া কি কও বড়মেঞা! ব্যাগাম সাবে হুনলে মোরে জানে মাইরা ফালাইবে। লও ডাকবাংলায় যাই। সুটকিসডা মোরে দ্যাও দেহি।'

এই বলে বেনুদার হাত থেকে সুটকেসটা নিয়ে বনমালি হাঁটতে শুরু করলো।

বেনুদা একটু অপ্রস্তুত হয়ে ছোড়দিকে বললো, 'এ হচ্ছে ডাক বাংলোর চৌকিদার। চলো, রাতটা এখানে থেকে যাই। সকালে গরুগাড়ি পাওয়া যাবে।'

'বলো কি!' আঁতকে উঠলো ছোড়দি, 'আমি গরুগাড়িতে উঠবো? মরে গেলেও না। একবার চড়ে আমার সারাজীবনের শিক্ষা হয়ে গেছে।'

বেনুদা শুকনো গলায় বললো, 'দিনের বেলা তুমি হেঁটে যাবে কি করে? মা শুনলে আস্ত রাখবেন না আমাকে। গ্রামের লোকজন সবাই আমাদের বাড়ির নতুন বউকে দিনের আলোয় দেখবে—এটা মা কখনো পছন্দ করবেন না।'

'সেজন্যেই বলছি রাতেই চলো যাই। গরুগাড়িতে উঠতে ডাক্তার আমাকে বারণ করেছে, মাকে বুঝিয়ে বললেই হবে।' এই বলে ছোড়দি মুখ টিপে হাসলো।

বনমালি এতোক্ষণ চুপ করে ছিলো। ছোড়দির কথা শুনে কাঁচুমাচু করে বললো, 'মুই একটা কথা কই মা জননী, কিছু মনে কইরো না। গরুগাড়িতে উঠতে অসুবিধা হইলে মুই পালকির ব্যবস্থা করমুহনে। রাইতে এই গেরামে পুরুষমানুষই বাইর হয় না, মাইয়ামাইনষের তো কতাই ওডে না। কষ্ট কইরা রাইতটুকু ডাকবাংলায় থাহেন। মুই হগল ব্যবস্তা কইরা দিমু।'

রাতুল বেনুদাকে বললো, 'আপনি কি আমাদের ভূতের কথা বিশ্বাস করতে বলছেন? এ কথা মেজদারা শুনলে কি বলবে!'

বেনুদা আগের মতো শুকনো গলায় বললো, 'আমি কাউকে কিছু বিশ্বাস করতে বলছি না। আমি শুধু বলতে চাই, যেখানে যে নিয়ম, সে নিয়ম মেনে চলা উচিত।'

রাতুলের মতো ছোড়দিও ডাক বাংলোতে থাকতে রাজি নয়। বললো, 'নিয়ম তো আমরাই বানাই। ও নিয়ে তর্ক করে লাভ নেই। তুমি তো জানো আমার শরীর বেশি ভালো নয়। এক ঘন্টার জায়গায় দু'ঘন্টা হাঁটতে হলেও আমি বাড়ি যাবো। গরুগাড়ির চেয়ে পালকিতে সফোকেশন বেশি হবে। প্লীজ, চলো দেরি না করে বাড়ি যাই।'

বেনুদা কাষ্ঠ হেসে বললো, 'ঠিক আছে, চলো।'

বনমালি হাউমাউ করে উঠলো—'ও বড়মেঞা, তোমার মাতাডা খারাপ হইছে নিহি। হেইয়া কও কি তুমি! মোরে ব্যাগাম সাবে কাইট্যা গাঙ্গে ভাসাইয়া দেবো। মোর কতা হোন ভাইডি। নতুন বউয়ের সর্বনাশ কইরো না।' কথা বলার সময় বনমালি বারবার ভয়ে শিউরে উঠলো।

বেনুদা ওর পিঠে হাত রেখে সান্ত্বনা দিলো,—'ঠিক আছে বনমালি, মাকে আমি বুঝিয়ে বলবো। তুমি যে মানা করেছো সেটাও বলবো। বউয়ের শরীর বেশি ভালো নয়। ডাক বাংলোয় ওর দেখাশোনা করার অসুবিধে। তুমি মন খারাপ কোরো না।'

বনমালি তবুও ফোঁপাতে লাগলো—'বেয়ানে দারোগা সাবে আইবো আনে। নাইলে মুই তোমাগ লগে যাইতাম আনে। রাইতে একলা আইমু কেমনে?'

'তোমাকে আসতে হবে না।' বেনুদা ওকে আশ্বস্ত করলো—'আমরা চারজন আছি। তুমি বাংলোয় ফিরে যাও।'

বনমালি দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে বিড়বিড় করে বললো, 'দুগ্‌গা, দুগ্‌গা।'

আকাশে চাঁদ উঠেছে। কুয়াশার জন্য ঘোলাটে মনে হচ্ছিলো চাঁদের আলো। এতো ঘন কুয়াশা যে দূরের জিনিস দেখা যাচ্ছিলো না। ইউনিয়ন বোর্ডের কাঁচা রাস্তা ধরে হাঁটছিলো ওরা চারজন। বেনুদা আর ছোড়দি সামনে। বেনুদার হাতে ছোড়দির সুটকেস। পেছনে রাতুল আর রবি। ওদের গায়ে গরম কোট, কোটের নিচে পুলোভার, পরনে গরম প্যান্ট। মাঝে মাঝে কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস

চোখে-মুখে সূঁচ ফোটাচ্ছিলো।

উঁচু রাস্তার দু'পাশে ন্যাড়া ধানক্ষেত। অল্প দূরে ছড়ানো-ছিটানো আবছা বাড়িগুলোকে কুয়াশার সমুদ্রে ভেসে থাকা ছোট ছোট দ্বীপের মতো মনে হচ্ছিলো। কুয়াশাভেজা চাঁদের আলোয় গোটা পরিবেশটা রীতিমতো ভৌতিক হয়ে উঠেছে। দিনের আলোয় রবির সব কথা হেসে উড়িয়ে দিলেও রাতুলের মনে হলো এমন পরিবেশে ভূত, জ্বীন, অশরীরী সবকিছুই থাকতে পারে।

অনেকক্ষণ পর ছোড়দি বললো, 'এতোটা পথ এলাম, একটা মানুষের মুখও দেখলাম না।'

বেনুদা কাষ্ঠ হাসলো, 'দেখা না হলেই বাঁচি।'

ছোড়দি অবাক হয়ে বললো, 'ও কথা বলছো কেন?'

'এ গাঁয়ের একটা বিশেষ ধরনের ব্যাপার আছে। রাতে মানুষজন কেউ পথে বেরোয় না।'

'কেন বেরোয় না?' ভয়ের কথা রাতুল জানলেও ছোড়দিকে কেউ বলে নি।

বেনুদা শুকনো গলায় বললো, 'চোর-ডাকাতের ভয় তো আছেই। তাছাড়া—'

রবি বাধা দিয়ে বললো, 'এসব কথা এখানে বলার কি দরকার বেনুদা? বাড়ি গিয়েও তো বলা যাবে।'

বেনুদা একটু অপ্রস্তুত হলো—'ঠিক আছে। বাড়ি গিয়ে তোর ভাবীকে সব খুলে বলিস।'

রাতুল বললো, 'বেনুদা যে একটু আগে লোকজনের কথা বললেন, দেখা না হলেই বাঁচি, আপনি কি চোর-ডাকাতের কথা বলছিলেন?'

বেনুদা বললো, 'চোর-ডাকাত বাড়িতে লুকিয়ে চুরি করতে পারে। ক'দিন আগে করেছেও। সামানা-সামনি আমাদের মুখোমুখি হওয়ার সাহস ওদের হবে না।'

'তবে কার কথা বলছিলেন?'

রবি বললো, 'লঞ্চে আসার সময় তোকে বলেছি না? তেনারা অনেক কিছুর রূপ ধরতে পারেন।'

ঠিক তখনই রাতুলের মনে হলো চৌদ্দ-পনেরো হাত সামনে একজন মানুষ হেঁটে যাচ্ছে। রবিকে ফিসফিস করে বললো, 'দ্যাখ, কে যেন যাচ্ছে?'

রবি সঙ্গে সঙ্গে রাতুলের একটা হাত আঁকড়ে ধরে বিড়বিড় করে দোয়া-দরুদ পড়তে লাগলো। আর কি আশ্চর্য, কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেই লোকটা কুয়াশার ভেতর হারিয়ে গেলো।

ছোড়দি প্রসঙ্গ পাল্টে বললো, 'যাই বলো, আমার কিন্তু হাঁটতে বেশ ভালো লাগছে। কতদিন গ্রাম দেখি নি!'

বেনুদা এবার স্বাভাবিক গলায় বললো, 'শীতকালে এসেছো বলে হাঁটতে ভালো লাগছে। বর্ষাকালে কাদায় হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যায়।'

একটু ভয়ভয় করলেও হাঁটতে রাতুলেরও ভালো লাগছিলো। তবে এটাও বুঝতে পারছিলো, এভাবে আসাটা রবি, বেনুদা কেউ পছন্দ করে নি। ওদের ভয়টাকে অবশ্য একটু বাড়াবাড়ি মনে হচ্ছিলো রাতুল আর ছোড়দির। তবে এ নিয়ে বেনুদারা কথা বলতে চায় না বলে ওরা চুপ করে ছিলো।

মাইল দুয়েকের মতো হাঁটার পর ওরা একটা মস্তবড় বটগাছ পেরুলো। বটগাছের তলায় পাথরের মতো জমাট বাঁধা কালো অন্ধকার। বটগাছটার কাছাকাছি আসার পরই রবি ফিসফিস করে রাতুলকে বলছিলো, 'মনে মনে সুরা এখলাস, নয় সুরা ইয়াসিন পড়। উল্টোপাল্টা কোনো কথা বলিস না।'

রবি নিজেও বিড়বিড় করে সুরা পড়ছিলো। বটগাছের তলায় এসে রাতুলের মনে হলো পৃথিবীর বাইরের কোনো জগতে বুঝি পা দিয়েছে। এতো জমাটবাঁধা অন্ধকার মনে হয় ধাক্কা না দিয়ে সরালে বুঝি হাঁটা যাবে না। অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে ছিলো সেই অন্ধকার।

বটগাছের তলা থেকে আবার খোলা জায়গায় এসে হাঁপ ছাড়লো রাতুল। বুকের ওপর ভারি পাথরের মতো জমাট বেঁধে বসেছিলো সেই কালো ছায়া। ঠিকমতো যেন নিঃশ্বাস নিতে পারছিলো না। রাতুলের মতো রবিও খোলা বাতাসে বুক ভরে শ্বাস নিলো। আর ঠিক তখনই শুনলো সেই শব্দ।

ওদের পায়ে চলার শব্দ ছাড়া এতোক্ষণ আর কোনো শব্দ ওদের কানে যায় নি। এমনকি কুকুর কিংবা কোনো নিশাচর পাখির ডাকও নয়। ওরা কান খাড়া করে শুনলো, কাপড়ের খসখস শব্দ আর জুতো পায়ে হাঁটার শব্দ ছাড়াও পরিষ্কার আলাদা এক শব্দ। মনে হচ্ছে ঘষটাতে ঘষটাতে কিছু-একটা যেন ওদের অনুসরণ করছে। রাতুল একবার পেছনে তাকিয়েছিলো। কিছুই দেখা গেলো না। রবি ভয়-পাওয়া যায় চাপা গলায় বললো, 'পেছনে তাকাবি না। সুরা পড়।'

ছোড়দি বেনুদাকে বললো, 'কিসের যেন শব্দ হচ্ছে, শুনতে পাচ্ছো?'

বেনুদা বললো, 'কথা বোলো না। ও কিছু নয়।'

ছোড়দি কি যেন বলতে গিয়েও বললো না। রাতুল আর রবি বেনুদার কাছাকাছি হাঁটছিলো। রাতুলের একবার মনে হলো, সুন্দরবনের এতো কাছে বাঘ কিংবা কোনো বন্যজন্তু বেরোয় নি তো? রবি আর বেনুদা সত্যি সত্যি ভীষণ ভয় পেয়েছে। একনাগাড়ে বিড়বিড় করে সুরা পড়ছে রবি। এক হাতে খামছে ধরেছে রাতুলের হাত। রীতিমতো কাঁপছিলো ওর হাত। রাতুলের মনে হলো ঘামছেও। বেনুদা হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিয়েছে। অন্যদেরও একইভাবে জোরে হাঁটতে হচ্ছে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে মনে হলে শব্দটা আর শোনা যাচ্ছে না। বেনুদার হাঁটার

গতি স্বাভাবিক হলো। রবি বিড়বিড় করে বললো, 'একটা ফাঁড়া কাটলো।'

রাতুল অবাক হয়ে জানতে চাইলো, 'কিসের ফাঁড়া?'

'বাড়ি গিয়ে শুনিস কিসের ফাঁড়া। একথা কাউকে বলিস না।'

বেনুদা এক ঘন্টার কথা বলেছিলো। রাতুল ওর হাতঘড়ি দেখলো, এক ঘন্টা পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে। রবিকে বললো, 'আর কতদূর?'

রবি স্বাভাবিক গলায় বললো, 'আর বেশি দূর নয়। মিনিট পনেরোর পথ।'

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশা কিছুটা হালকা হলো। চাঁদের আঁলোয় অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিলো। বেশ দূরে কোথাও কুকুরের ডাক শোনা গেলো। শব্দ শুনে মনে হলো কুকুরটা কাঁদছে। কাঁপা কাঁপা শব্দটা বাতাসে গুমরে মরছে। ডেকেই চলেছে একটানা। দূরে তাকিয়ে দেখলো রাতুল উঁচু টিলার মতো কি যেন। রবিকে বললো, 'উঁচু মতো ওটা কি-রে।'

'ওটাই আমাদের পুরোনো বাড়ি। সেই রাজবাড়ি, যার কথা তোকে বলেছি।'

রবির কথা শুনে রোমাঞ্চ হলো রাতুলের। ভালো করে তাকাতেই হঠাৎ চোখে পড়লো একটা আলো দু'বার দপ করে জ্বলে উঠে নিভে গেলো। চাপা উত্তেজিত গলায় রবিকে বললো, 'দেখেছিস?'

রবি শক্ত করে রাতুলের হাত আঁকড়ে ধরে ভয়-পাওয়া গলায় বললো, 'ওটা জ্বীনের আলো। মাঝে মাঝে দেখা যায়। গ্রামের অনেকে দেখেছে।'

'কি করে বুঝলি ওটা জ্বীনের আলো?'

'আমার দাদা বলেছিলেন।'

'তোর দাদা কি করে বুঝলেন?'

'তোকে বলি নি দাদা খুব এবাদত-বন্দেগী করতেন? দাদা তেনাদের চিনতেন। পরে তোকে সব বলবো।'

'জ্বীনেরা আলো দিয়ে কি করবে?'

'জানি না। এসব কথা এখন থাক না! বললাম তো পরে বলবো।'

রাতুল কিছুক্ষণ চুপ করে কি যেন ভাবলো। তারপর বললো, 'তোদের পুরোনো বাড়ির আশেপাশে কোনো পুরোনো জলা আছে?'

'বিল আছে একটা। অনেক পুরোনো। আগের দিনে ডাকাতরা মানুষ মেরে লাশটা ওটার ভেতর ডুবিয়ে দিতো।'

রাতুল মৃদু হেসে বললো, 'ওটা জ্বীনের আলো নয়। ওটা আলেয়া।'

কে চোর আর কে ভূত বলা কঠিন

বেনুদার মা অতো রাতে সবাইকে দেখে মহা হৈচৈ জুড়ে দিলেন—'যার ন'বছরের হয় না, তা নব্বুইতেও হয় না। তোকে না হাজারবার বললাম, রাতে বাংলোতে থাকিস। বনমালিকে বলে আমি রান্নার ব্যবস্থাও করে দিয়েছি। দেখো তো কান্ড নবুর মা। বউয়ের এক গা গয়না। গেলো বিষ্যুৎবারে বাড়িতে এমন একটা ডাকতি হয়ে গেলো। বেনুটার মাথায় যদি একটুকু বুদ্ধি থাকতো!'

একটানা চেঁচিয়ে যাচ্ছিলেন বেনুদার মা। এরই ফাঁকে ছোড়দি টুপ করে ওর পা ছুঁয়ে সালাম করলো। পেছন পেছন রাতুলও। বেনুদার মা ছোড়দিকে বুকে নিয়ে সমানে বলে চললেন, 'থাক, থাক, বেঁচে থাকো বউমা! কতোদিন ধরে বসে আছি তোমাকে দেখবো বলে। বেনুর বউ দেখার জন্য আল্লা আমাকে এখনো বাঁচিয়ে রেখেছেন। এটি কে? কী সুন্দর ছেলে। তোমার ভাই বুঝি? কী নাম?'

নাম শুনেই, 'ভারি সুন্দর নাম রাতুল। বেঁচে থাকো বাবা। তোমার কথা রবি সবসময় লেখে। তুমি না থাকলে ওর কী যে হতো! কই-রে, তোরা সব গেলি কোথায়! গোসলখানায় গরম পানি দে। ওরা সব হাত-মুখ ধোবে। এতোটা পথ এসেছে। দেখো তো বেনুর কাণ্ড!'—কথা বলতে বলতে বেনুদার মা ভেতরে চলে গেলেন।

রবি একটু হেসে বললো, 'মা একটু বেশি কথা বলে।'

ছোড়দি ওকে আস্তে করে বকুনি দিলো—'ছিঃ, বড়দের কথার খুঁত ধরতে হয় না।'

কথা বলতে বলতে বেনুদার মা আবার এলেন। তাঁর সমবয়সী একজনকে বললেন, 'তোমাকে বলি নি নবুর মা, বেনুর কোনো কথা খেয়াল থাকে না। কি করে যে ও একবারে ডাক্তারি পাস করেছে এখনো আমি ভেবে পাই না।'

রাতুলের ভীষণ হাসি পেলো। ও জানে ডাক্তারি পরীক্ষায় বেনুদার রেজাল্ট খুবই ভালো ছিলো। বেনুদার অসহায় মুখের দিকে তাকিয়ে যেই হাসতে যাবে, ছোড়দির রামচিমটি খেয়ে চেপে গেলো।

নবুর মা গোলগাল চেহারার মোটাসোটা মানুষ। বেনুদাকে বললেন, 'যাই বলো বেনু, কাজটা তুমি ভালো করো নি। তুমি তো সবই জানো। ডাকাতের কথা বাদই দাও না। রাত-বিরেতে তেনাদের নাম নিতে নেই। নজরে পড়তে কতোক্ষণ! তার ওপর পরীর মতো দেখতে বউ।' এই বলে তিনি পাশের বুড়োমতো একজনকে বললেন, 'অ খালা, আমার তো ওজু নেই। সিন্দুকের তাকে মাজারের তাগা তোলা আছে। দোয়া পড়ে বউয়ের গলায় একখানা বেঁধে দিও।'

'নে, আর সঙের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। বউমাকে ঘরে নিয়ে যা। রবি, রাতুলকে তোর ঘরে নিয়ে যা। আবেদালিকে বল দোতলার গোসলখানায় পানি দিতে। কাপড় বদলে মুখ-হাত ধুয়ে নিচে খেতে আয়। কি আক্কেল তোদের!' বেনুদা আর রবিকে ধমক লাগিয়ে বেনুদার মা বোধ হয় রান্নাঘরের দিকে গেলেন।

রবি বলেছিলো নতুন বাড়ি। দেখে মনে হলো বাড়িটার বয়স আশির কম হবে না। দোতলা বাড়ি, উঁচু ছাদ, সিলিঙে মোটা মোটা বরগা আর কড়িকাঠ। দেয়ালে সুড়কির পলেস্তারার ওপর চুনকাম করা। দেয়ালগুলোও কম মোটা নয়। বড় বড় দরজা-জানালা। জানালায় মোটা লোহার শিক বসানো।

এতোক্ষণ ঘরে ঘরে হারিকেন জ্বলছিলো। রাতুলরা আসাতে কে যেন হ্যাজাক বাতি জ্বালিয়েছে। তাতেও নিচের বড় ঘরটার সবটুকু আলো হয় নি। কোণায় অন্ধকার জমে রইলো। রবি রাতুলকে বললো, 'আমার ঘর দোতালায়। চল ওপরে যাই।'

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে টানা বারান্দার শেষ মাথায় রবির ঘর। রাতুলকে ঘরে বসিয়ে ও নিচে গেলো। শীতের জন্য জানালাগুলো বন্ধ ছিলো। পুরোনো দিনের কাঠের শাটার্সওয়ালা বড় জানালা। রাতুল উঠে দক্ষিণের জানালাটা খুলে দিলো। ঘরের এক কোণে এতোক্ষণ একটা হারিকেন সামান্য আলো দিচ্ছিলো। জানালা খুলে দিতেই চাঁদের ঠাণ্ডা নরোম আলোয় ঘর ভেসে গেলো। চাঁদের আলোয় রাতুল দেখলো জানালার কাছে মস্ত বড় সেকেলে চেহারার মেহগিনি কাঠের পালঙ্ক। মোটা জাজিমের ওপর তোষক, তার ওপর সাদা চাদর বিছানো। বিছানায় বসে বাইরে তাকাতেই ওর মনটা ভরে গেলো। আকাশের কুয়াশা কেটে গেলেও নিচের সব কিছু সাদা কুয়াশার ফিনফিনে চাদরে ঢাকা পড়েছে। দূরের গাছগুলোকে মনে হচ্ছে কুয়াশার সমুদ্রে দ্বীপের মতো ভাসছে।

নিচের তলায় লোকজন ব্যস্ত গলায় এ ওকে ডাকাডাকি করছে, হারিকেন হাতে ছোটাছুটি করছে। নিজেদের রীতিমতো গুরুত্বপূর্ণ মনে হলো রাতুলের। ওদের জন্য সারা বাড়িতে ব্যস্ততার ঢল নেমেছে।

বেনুদার মা বলেছিলেন রাতে নাকি রাতুলদের জন্য ডাকবাংলায় খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। ঘন্টা দেড়েক পর খেতে বসে ওর মনে হলো এ বাড়িতে

বুঝি সকাল থেকে ওদের জন্য রান্নার আয়োজন শুরু হয়েছে। কয়েক পদের মাছের রান্না, মুরগি, ডাল, ভাজি সব মিলিয়ে দশ-বারোটা আইটেম তো হবেই। রাতুলের খাওয়া দেখে নাদুখালা চোখ কপালে তুললেন, 'পাখির বাচ্চার মতো খুঁটে-খুঁটে কী খাচ্ছো?'—বলে ওর প্লেটে বড় রুই মাছের আস্ত মুড়ো তুলে দিলেন—'না, না বললে তো শুনবো না। বেয়ান শেষে বলুক হাভাতের দেশে মেয়ের বিয়ে দিয়েছি! এক মাসে আমাদের নবুর মতো শরীর বানিয়ে দেবো।'

রাতুল কিছুই বলতে পারলো না। ওর করুণ মুখ দেখে রবির মায়া হলো। হেসে বললো, 'ঠিক আছে আমি অর্ধেক নিচ্ছি, বাকিটা তুই খা। নইলে খালার মন খারাপ করবে।'

ওই অর্ধেকটুকু খেতে গিয়ে রাতুলের খাবি খাওয়ার দশা। সবশেষে পায়েশ খেতে গিয়ে ও রীতিমতো বিদ্রোহ ঘোষণা করলো। বললো, 'কিছুতেই খেতে পারবো না। পেটে এক ফোঁটা জায়গা নেই।' বেনুদা তখন ওকে রক্ষা করলেন—'থাক মা, এখনো লজ্জা কাটে নি। আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে। একদিনে এতো বোঝা চাপিও না।'

রাতুলের মনে হলো, অতি উপাদেয় খাওয়ার ব্যাপারটাও কখনো নিরানন্দের হতে পারে। রবি আর বেনুদাকে বলতে হবে, এরকম জবরদস্তি চালানো হলে ও দু'দিনেই কেটে পড়বে।

খাওয়ার পর ভারি শরীরটা টেনে দোতলায় নিয়ে গিয়ে রবির বিছানার ওপর বসে রাতুল বললো, 'তুই তো জানিস রবি, বাড়িতে আমি কতটুকু খাই। সবার সঙ্গে তুইও অমন করলি!'

রবি একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললো, 'নাদুখালা সবার সঙ্গে ওরকম করেন। মাকে আমি বলে দেবো। এমনটি আর হবে না।'

'না হলেই বাঁচি।' এতোক্ষণ পর রাতুলের মুখে হাসি ফুটলো।

বেনুদা বলেছিলো বটে ঘাট থেকে ওদের বাড়ি তিন মাইল। রাতুলের মনে হলো পাঁচ-ছ'মাইলের কম হবে না। পা দুটো রীতিমতো টনটন করছে। একটানা এতোটা পথ আগে কখনো হাঁটে নি।

রাতের পোশাক পরে রাতুল শুতে যাবে—এমন সময় দেখে মুশকো একটা লোক মস্ত বড় কাঁচের গ্লাসে করে দু'গ্লাস দুধ এনেছে। দেখেই ও আঁতকে উঠলো—'রবি, আমি যদি হার্টফেল করে না মরি তাহলে আত্মহত্যা করবো।' এই বলে চোখের পলকে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লো।

রবি হেসে বললো, 'আজ রাতে দুধ খাবো না আবেদালি। কাউকে বলার দরকার নেই। দু'গ্লাসই তুমি খেয়ে ফেলো।'

একগাল হেসে চলে গেলো আবেদালি। বিছানায় উঠে রবি বললো, 'দুধ খাওয়ার ব্যাপারে আবেদালি কখনো আমার সঙ্গে বেইমানি করে নি। যখনই বলি

খেয়ে নেয়। কি স্বাস্থ্য দেখেছিস?'

লেপের তলা থেকে মুখ বের করে রাতুল বললো, 'তোদের আবেদালির মতো ভালো মানুষ পৃথিবীতে মনে হয় খুব কমই আছে।'

হঠাৎ খোলা জানালার দিকে চোখ পড়লো রবির, 'জানালা খুললি কেন? কিভাবে শীত আসছে টের পাচ্ছিস না?'

রাতুল হেসে বললো, 'শীতের চেয়ে বেশি আসছে ভয়। কথাটা পষ্ট করে বলতে লজ্জা পাচ্ছিস কেন?'

রবি সত্যি সত্যি লজ্জা পেলো—'আসলে তুই না থাকলে আমি নবুকে বলতাম থাকতে। আগে সবসময় নবু থাকতো আমার সঙ্গে।'

'নবু কে?'

'নাদুখালার ছেলে। আমাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয় হয়। খালু মারা যাবার পর নবু আর নাদুখালাকে মা এখানে নিয়ে এসেছেন। মা'র খুব ভালো বন্ধু নাদুখালা।'

'আর নবু তোর বন্ধু? ওর কথা তো আগে বলিস নি?'

'কে বললে নবু আমার বন্ধু! আমার চেয়ে এক-দেড় বছরের বড় হবে। এবার ক্লাস নাইনে ওঠার কথা, বাবু পরীক্ষায় ফেল মেরে বসে আছেন।'

'মনে হলো অনেক লোক থাকে তোদের বাড়িতে?'

'অনেক লোক আর কোথায়! নবুরা ছাড়া মা'র এক দূর সম্পর্কের খালা থাকেন, আমরা ডাকি বুঁচি নানী। আর থাকে পুষ্পদি। বিয়ের পর বুজি খুলনা চলে গেছে। কালেভদ্রে আসে। বাকি সব তো কাজের লোক।'

'তোর মা তখন তোদের বাড়িতে ডাকাতির কথা কি বলছিলেন যেন। সত্যি সত্যি ডাকাত পড়েছিলো?'

'তোকে তো বলাই হয় নি।' উত্তেজনায় শোয়া থেকে উঠে বসলো রবি। 'গত বিষ্যুৎবারে ডাকাত এসেছিলো আমাদের বাসায়। বেনুদা ছিলো বরিশালে। প্রথম কেউ টের পায় নি। নতুন বউয়ের জন্যে মা ট্রাঙ্কে দু'সেট গয়না তুলে রেখেছিলেন। একটা ছিলো জড়োয়ার সেট। তার ওপর এক ট্রাঙ্ক শাড়ি। ট্রাঙ্কসুদ্ধো নিয়ে গেছে। যাওয়ার সময় কিসের শব্দে নাদুখালার ঘুম ভেঙে গেছে। তাকিয়ে দেখেন কালো কালো কতোগুলো ভূতের মতো মাথায় কি নিয়ে যেন উঠোনে চলাফেরা করছে। দেখেই উনি ফিট হয়ে গেছেন। কাউকে ডাকতেও পারেন নি।'

'পুলিসে খবর দেয়া হয় নি?'

'সে তো দিয়েছেই। দিলেইবা কি। পুলিস কবে চোর-ডাকাত ধরেছে বল!'

'তোর নাদুখালার অতোবড় শরীর। ডাকাত দেখে স্রেফ ফিট হয়ে গেলেন?'

'ফিট হয়েছিলেন বলে জানে বেঁচেছেন। চেঁচিয়ে জান খোয়াবেন নাকি?

ওগুলো সত্যিকারের ডাকাত হলেও রক্ষা ছিলো না।'

'সত্যিকারের ডাকাতই ছিলো ওগুলো। জ্বীনরা নতুন বউয়ের গয়না চুরি করেছে, এ কথা যদি ওদের কানে যায়, তাহলে তোকে আর ওরা আস্ত রাখবে না।'

শুকনো গলায় রবি বললো, 'সব জ্বীন ভালো, তোকে কে বলেছে? খাবিস জ্বীনও আছে! ওরা সব সময় মানুষের অনিষ্ট করার ফিকিরে থাকে।'

'তুই দেখছি রীতিমতো জ্বীনবিশারদ হয়ে গেছিস। তোদের রাজবাড়ি না হানাবাড়ির ভালো জ্বীনদের বল না, গয়নাগুলো কে নিয়েছে ধরিয়ে দিতে।'

'তুই ঠাট্টা করছিস। আগের দিন হলে ঠিকই ওদের বলা যেতো। তোকে বলি নি আমার বড়দাদুর কাছে দুটো জ্বীন পড়তো।!'

'কি পড়তো? বাংলা, ইংরেজি না অঙ্ক?'

'তুই জ্বীনদের নিয়ে ঠাট্টা করিস না। ওরা বাংলা, ইংরেজি পড়তে যাবে কেন? ওরা পড়তো কোরান শরীফ। বড়দাদুর মতো কোরান শরীফের তফসীর কেউ করতে পারতো না।'

'পড়াশোনা শেষ করে কি করলো ওরা? নিশ্চয় চাকরি-বাকরি খুঁজতে বেরোয় নি।'

'ওদের চাকরির দরকার হবে কেন! ওরা তো সবসময় আল্লার এবাদত-বন্দেগী করে। তবে বড়দাদুর কাছে যারা পড়তো, ওরা পড়া শেষ না করেই চলে গিয়েছিলো।'

'কেন, ছাত্র হিসেবে বুঝি সুবিধের ছিলো না? খুলেই বল না!'

'কি যে বলিস!' কাষ্ঠ হেসে রবি বললো, 'আসলে বড়দাদুর কাছে অনেক দূর থেকে তালেব এলেমরা আসতো কোরানের তফসীর শোনার জন্য। আমাদের বাড়িতেই থাকতো। আমার দাদা তখন ছোট ছিলেন। জ্বীন দুটোকে নিজ চোখে দেখেছেন। ধবধবে ফর্সা ছিলো গায়ের রঙ। চামড়া ছিলো মাখনের মতো মোলায়েম। বড়দাদু প্রথমটায় বুঝতে পারেন নি ওরা যে জ্বীন। জানেন দূরে কোথাও থেকে এসেছে। অন্য সবার চেয়ে পড়াশোনার দিকে মন বেশি। একদিন আর সবাই চলে গেছে। বড়দাদু আর ওরা দু'জন বসে কথা বলছে। বড়দাদু কি কার জন্য একটা তাবিজ লিখতে বসলেন। লিখতে লিখতে বললেন, পাশের ঘর থেকে কোরান শরীফটা এনে দাও তো। সঙ্গে সঙ্গে কোরান শরীফ এসে গেলো। বড়দাদুর কেন যেন মনে হলো ওদের কেউ বসা থেকে ওঠে নি। লেখার কাজ শেষ করে আবার বললেন, যাও, রেখে এসো। এই বলে আড়চোখে তাকিয়ে দেখেন, ওরা বসেই আছে। একজনের হাতখানা লম্বা হয়ে গেলো। বসে থেকেই পনেরো হাত দূরে তাকের ওপরে কোরান শরীফ রাখলো। তারপর আবার হাত খানা আগের মতো। বড়দাদু কাজ শেষ করে বললেন, তোমাদের একটা কথা

জিজ্ঞেস করবো, আশা করি সত্যি জবাব দেবে। ওরা বললো, আমরা মিছে কথা বলি না হুজুর! বড়দাদু বললেন, তাহলে সত্যি করে বলো তোমরা কে। তোমরা তো মানুষ নও। ওরা বললো, হুজুর, আমরা জ্বীন। বড়দাদু বললেন, এতোদিন নিজেদের পরিচয় লুকিয়ে রেখেছিলে কেন? কাঁচুমাচু করে জ্বীন বললো, আমরা ভেবেছিলাম, আমাদের পরিচয় জানলে আপনি পড়াবেন না।

'বড়দাদু বললেন, পরিচয় যখন জেনেছি তখন সত্যি সত্যি তোমাদের পড়াতে পারবো না। ওদের তখন সে কি কাকুতি-মিনতি। বড়দাদু ছাড়া আর কারো কথা ওদের জানা নেই। বললো, কোনো বেয়াদবি করবে না। বড়দাদু তবুও রাজি হলেন না। বললেন, দেখ বাপু, আমি জানি তোমাদের গা-ভর্তি রাগ। আল্লাহ্তালা তোমাদের আগুন দিয়ে বানিয়েছেন। আমার এখানে আদমের আওলাদরা সব পড়ে। ওদের কে কখন বিনা ওজুতে থাকে, না জানি কি বেয়াদবি করে, তোমরা সহ্য করতে পারবে না। ঠিক মেরে ফেলবে। না বাছা, তোমরা চলে যাও। ওরা তো কিছুতেই যাবে না। বড়দাদুর পা ধরে পড়ে রইলো। শেষে বড়দাদু বললেন, ঠিক আছে, তোমরা পুরোনো বাড়িতে গিয়ে থাক। সবার সঙ্গে তোমাদের পড়াবো না। রাতে মসজিদে আমি যখন একা থাকবো তখন গায়েবী শরীরে এসো। যা পড়তে চাও পড়িয়ে দেবো। তবে তোমাদের ততোটুকু পড়াবো, যতোটুকু তোমাদের জানা উচিত। তোমরা তো জানো, কোরান শরীফের সবটুকু তোমাদের পড়ানো যাবে না। ভালোই করেছো পরিচয় দিয়ে। নয়তো অন্য সবার সঙ্গে তোমাদের কি না কি পড়িয়ে দিতাম, পরে আল্লাহ্পাকের কাছে আমাকে কৈফিয়ত দিতে হতো। এরপর অবশ্য বেশিদিন ওরা পড়ে নি। তবে দাদুর কাছে শুনেছি কারা নাকি মাঝে মাঝে উঠোনে অসময়ের আর অচেনা সব ফল রেখে যেতো। দাদু পরে বুঝেছেন এসব জ্বীনদের কাজ।'

বিশ্বাস না হলেও রবির গল্প শুনে রাতুলের রোমাঞ্চ হলো। কললো, 'হ্যাঁরে, এতো সুন্দর বলিস তুই, গল্প লিখিস না কেন?'

রবি মৃদু হাসলো, 'এ-সব কথা বহুবার আমরা দাদুর কাছে শুনেছি। এ বাড়ির সবাই জানে।'

খোলা জানালা দিয়ে হু হু করে কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস আসছিলো। তবে ভারি লেপের তলায় শীত ঢোকার কোনো রাস্তা ছিলো না। চাঁদ পশ্চিম আকাশে হেলে পড়েছে। চাঁদের আলো না থাকলেও জানালা দিয়ে আসা আবছা আলোয় ঘরের জিনিসপত্রের কালো অবয়ব বোঝা যাচ্ছিলো। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রাতুলের মনে হলো, সত্যি যদি কোনো জ্বীন লম্বা হাত বাড়িয়ে দেয়! কথাটা মনে হতেই রবিকে বললো, 'জানালা দিয়ে কেউ যদি লম্বা একটা হাত বাড়িয়ে দেয় তাহলে তুই কি করবি, বল তো?'

রবি লেপ টেনে মুখ ঢেকে বললো, 'মিছেমিছি ভয় দেখাবি না বলে দিচ্ছি। কাল নবু এলে তোকে একা পাশের ঘরে শুতে পাঠাবো। তখন বুঝবি কেমন লাগে!'

রাতুল গম্ভীর হয়ে বললো, 'তোকে ভয় দেখাবার জন্য বলছি না। সেদিন একটা বইয়ে পড়েছি, চোরেরা বাঁশের গায়ে কাপড় পেঁচিয়ে, মাথায় একটা হুক বেঁধে জানালা দিয়ে ঘরের জিনিসপত্র সব বের করে নেয়। একজন সাহস করে বাঁশটা ধরে চিৎকার দিতেই, চোর বাঁশ ফেলে দৌড়। এমন যদি হয় কখনো চ্যাঁচাবি না। বাইরে গিয়ে চুপিচুপি জাপটে ধরতে হবে চোরটাকে।'

'তোর সাহস থাকে তো তুই ধরিস।'

'তুই অতো ভয় পাচ্ছিস কেন? ভূতের কথা বলছি না। বলছি চোর ধরার কথা। সেদিন তোদের বাসায় এতো বড় চুরি হলো, ফের যদি আসে?'

'আমাদের এখানে কারা চোর, কারা ভূত একথা কেউ হলপ করে বলতে পারবে না।'

'তুই কি বলতে চাস ভূত চুরি করে?'

'ওদের যখন যা ইচ্ছে তখন তাই করে। নিকেরিরা বলে, রাতে পাহারা না দিলে ওদের সব মাছ মেছো-ভূত চুরি করে নিয়ে যায়।'

'কেন, চোর-ডাকাতের বুঝি মাছ খেতে ইচ্ছে করে না?'

'সারা রাত বকবক না করে ঘুমোতে দে।'

রবি পাশ ফিরে শুলো। রাতুল ওর বুকের ঢিবঢিব শব্দ শুনতে পাচ্ছিলো। মনে হলো রবিদের গোটা বাড়িটাকে কেউ যেন ভয়ের কালো আলখাল্লা দিয়ে মুড়ে দিয়েছে।

একমাত্র সাহসী ছেলে নবুর সঙ্গে পরিচয়

রবিদের গোটা বাড়িতে রাতুল একমাত্র সাহস দেখলো নবু নামের ছেলেটার। রবি ওর কথা যতোটা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলেছিলো, ওকে দেখার পর রাতুলের ধারণা পাল্টে গেলো। বয়সে সামান্য বড় হবে, চমৎকার পেটানো

শরীর। আর রবিদের বড় পুকুরটা আধঘন্টার ভেতর সাঁতার কেটে দু'বার এপার-ওপার করে। কাঠবেড়ালির মতো তরতর করে নারকেল গাছ বাইতে পারে। নৌকা চালায় ঝড়ের মতো।

ওর সঙ্গে রাতুলের দেখা হলো এ বাড়িতে আসার দু'দিন পর। নবু মঠবাড়িয়া গিয়েছিলো ফুটবল খেলতে। সন্ধেবেলা এলো সারা গায়ে ধুলো-কাদা মেখে। রাতুলকে দেখে একটু অপ্রস্তুত হয়ে হাসলো। সঙ্গে সঙ্গে রাতুলেরও ওকে ভালো লেগে গেলো।

গত দু'দিন ধরে রোজ সন্ধেবেলা দোতলার বারান্দায় বসে নাদুখালা পান চিবুতে চিবুতে ভূতের গল্প শোনান। যেদিন নবু এলো সেদিনও রাতুলরা বারান্দায় মাদুর পেতে ভূতের গল্প শুনছিলো। আস্ত একটা পান মুখে ফেলে খানিকটা চিবিয়ে ঢক করে পিকটুকু গিলে ফেলে নাদুখালা বললেন, 'তোমরা হলে শহরের ছেলে। তেনাদের দেখবে কি করে। গাঁয়েও কি সবাই দেখে নকি! দেখেছিলেন নবুর দাদা। এক রাতে ঘাটে বসে এশার নামাজের ওজু করছেন। আকাশে ফকফকে জোছনা ছিলো। হঠাৎ দেখেন পুরোনো গোরস্থানের ভেতর একজন মানুষ হাঁটছে। ভাবলেন অন্য গাঁয়ের কেউ হবে, পথ ভুলে সেখানে চলে গেছে। নিশ্চয়ই বেরিয়ে আসবে। এ গাঁয়ের কেউ রাতে পুরোনো গোরস্থানে যায় না। নবুর দাদা ঘাটের ওপর উঠে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে গো, কোত্থেকে এসেছো, যাবে কোথায়? লোকটা কোনো কথা না বলে রাজবাড়ির দিকে হাঁটতে লাগলো। সাহস ছিলো বটে নবুর দাদার। বদনা হাতে লোকটার পিছু নিলেন। বারবার বললেন, তুমি কথা কও না কেন? ওদিকে কেন যাচ্ছো? লোকটা তবু কথা বলে না। হাঁটছে তো হাঁটছেই। পুরোনো বাড়ির কাছে যখন এসেছে তখন নবুর দাদার ভারি রাগ হলো। পা চালিয়ে কাছে গিয়ে বললেন, তুমি চোর না ডাকাত! রা করো না কেন? এমন সময় মানুষটা ফিরে তাকালো। আল্লা গো! তিনি তখন দেখেন লোকটার কোনো চোখ নেই। চোখের জায়গাটা সমান। লোকটা মাথা নোয়ালো। নবুর দাদা পষ্ট দেখলেন, মাথা ভর্তি অনেকগুলো চোখ জ্বলজ্বল করছে। সে কি চাহুনি! নবুর দাদাকে যেন গিলে খাবে। বদনাটা লোকটার দিকে ছুঁড়ে মেরে চিৎকার করে তিনি বাড়ির দিকে ছুটলেন। ঘরের দরজার ওপর এসে বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। সবাই ধরাধরি করে বিছানায় এনে শোয়ালো। তিনি সেই যে বিছানা নিলেন আর উঠলেন না। দু'বছর পর বেহেশতে চলে গেলেন।'

গল্প শেষ করে মস্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নাদুখালা আরেক খিলি পান মুখে দিলেন।

আমাদের সঙ্গে গল্প শুনতো আবেদালি। রবিদের অনেকগুলো গরু ছিল। সেই গরুদের দেখাশোনা করতো আবেদালি। বিরাট দশাসই শরীর। গায়ে ভীষণ

জোর। দাঁত দিয়ে নারকেল ছিলতো, ঘুষি মেরে কাঁচা ডাব ফাটাতো। সেই লোকটা ভূতের গল্প শুনে এতো ভয় পেতো যে, দেখে রাতুলের মায়া হতো। গল্প শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে ওর মনে হতো এই বুঝি আবেদালি ভির্মি খাবে। বুকে থুথু ছিটিয়ে বিড়বিড় করে কি যেন বলতো। কখনো ও নিজেই বলতো রাজবাড়ি আর পুরোনো গোরস্থানের ভূতের গল্প। গল্প শেষ না হতেই বলতো, 'মুই আর কইতে পারুম না। নাদুখালা আপনেই কন।'

সেদিন এমনি এক জমজমাট গল্পের আসরের মাঝখানে এলো নবু। নাদুখালা বেনুদার মা'র মতো নবুকে নিয়ে পড়লেন—'রাত-বিরেতে না এলে বুঝি ঘুম হতো না। যে চুলোয় দু'রাত থাকা হয়েছে, সেখানে কি তিনরাত থাকা যেতো না! তোকে এতোবার বলেছি সন্ধ্যের পর বাড়ি ফিরবি না, একদিনও কি আমার কথা কানে তুলতে নেই?'

নবু আড়চোখে একবার রাতুলের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমার কিছু হবে না মা। তুমি মিছেমিছি ভয় পাও।'

'ফের তর্ক করিস? তোকে আমি খড়মপেটা করবো। তোর জুলপি ছিঁড়ে ফেলবো। ফুটবলটাকে বটি দিয়ে কুচি কুচি করে কাটবো। তবে যদি আমার রাগ যায়।'

'তাতেও রাগ যাবে না। ওসব কাজ পরে কর। আগে খেতে দাও। ভীষণ খিদে পেয়েছে।' এই বলে নবু আমাদের সঙ্গে বসলো।

নাদুখালা গজগজ করতে করতে উঠে গেলেন। রাতুলের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো নবু। বললো, 'তুমি নিশ্চয়ই রাতুল। খালাকে রবি যতোগুলো চিঠি লিখেছে, সবগুলোতে তোমার কথা আছে।'

রবি মুখ গোমড়া করে বললো, 'আমার চিঠি তোকে কে পড়তে দিয়েছে শুনি? মাকে বলে তোকে যদি মার না খাওয়াই।'

নবু হাসলো—'মার খাওয়া যে আমার জন্য ডালভাত, তুই ভালো করেই জানিস।' এরপর নবু গম্ভীর হয়ে বললো, 'শহরে গিয়ে তুই গ্রামের কথা একেবারে ভুলে গেছিস রবি।একটা চিঠিতেও আমার কথা জানতে চেয়ে লিখিস নি।'

রবি অপ্রস্তুত হয়ে বললো, 'তোর কথা জানতে চাওয়ার আগেই তো মা সব লিখে জানিয়ে দেন। এই যে তুই পরীক্ষায় ফেল করলি—মা গত চিঠিতেই লিখেছিলেন।'

ফেলের কথা শুনে নবুর অপ্রস্তুত হওয়ার পালা—'আমাকে কতো কাজ করতে হয় জানিস? ঠিকমতো পড়ার সময় পেলে তো!'

'কাজ তো শুধু ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো। কার আছাড় খেয়ে কোমর ভেঙেছে, সদরে নিয়ে যাও। কার মামলার তারিখ পড়েছে, সদরে নিয়ে যাও। কোথায় জমি নিয়ে মারপিট হবে, লাঠি নিয়ে যাও। সারা বছর এসব

করলে পড়ার সময় পাবি কখন?

নবু গম্ভীর হয়ে বললো, 'তুই ভালো করেই জানিস, মানুষের আপদে-বিপদে কেউ ডাকলে আমি না গিয়ে পারি না।'

রবি ফোড়ন কাটলো, 'পৃথিবীর সব আপদ যদি তুই দুর করবি—ফেল করার জন্যে দুঃখ করিস কেন?'

রাতুল এতোক্ষণ চুপ করে ছিলো। রবি যেভাবে নবুকে খোঁচাচ্ছিলো, ওর ভালো লাগছিলো না। রবিকে বললো, 'তুই কিন্তু নবুর কথা আগে কখনো আমাকে বলিস নি।' তারপর নবুকে বললো, 'এ বাড়িতে এসে অব্দি ভূতের গল্প শুনতে শুনতে হয়রান হয়ে গেছি। তোমার খেলার খবর বলো। জিতলে না হারলে?'

নিজের বাড়িতে নবু এই প্রথম এমন একজনের দেখা পেলো, যে ওর খেলার খবর জানতে চেয়েছে। ভাবলো, 'রাতুলের মতো আমার যদি একটা বন্ধু থাকতো!' সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, ওরা শহরের ছেলে, ওর মতো গেঁয়ো ছেলেকে পছন্দ করবে কেন? রাতুলের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলো, সেও ওর দিকে তাকিয়ে আছে। মৃদু হেসে বললো, 'ফুটবলে আমাদের তুষখালিকে হারাবে এ তল্লাটে কেউ আছে নাকি! খেলতে গেছি মঠবাড়িয়ায়। সেখানেও রাজবাড়ির ভূত। ওদের গেম টিচারকে বলতে শুনেছি, আমার ওপর নাকি রাজবাড়ির ভূত সওয়ার হয়েছিলো। নইলে ডবল হ্যাট্রিক করলাম কি করে!'

রবি রাতুলকে বললো, 'নবু তোর মতো, জ্বীন ভূত বিশ্বাস করে না।'

আবেদালি এতোক্ষণ ওদের কথা শুনছিলো। রবির কথা শুনে ওর রাগ হলো—'তেনাগো নিয়া মশকরা হরণ ভালো না। যেদিন অপঘাতে মরবেহ্ হেইদিন নবুদাদা বুজবেহেনে।' এই বলে সে উঠে চলে গেলো।

আবেদালির কথার ধরন দেখে নবু আর রাতুল কোরাসে হাসলো। রবিও হাসলো, যদিও ওর মোটেই হাসি পাচ্ছিলো না। মনে মনে ও কিছুটা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠছিলো এই দুই অবিশ্বাসীকে নিয়ে। নবু একা হলে নাদুখালাকে বলে শায়েস্তা করা যেতো। রাতুলকে কিছু বললে বেনুদা আস্ত রাখবেন না। তাছাড়া ও এ বাড়ির মেহমান। মনে মনে ও রাজবাড়ির জ্বীনের উদ্দেশ্যে বললো, 'আপনাদের নিয়ে আমি কখনো হাসি-ঠাট্টা করি নি। আমার ওপর আপনারা রাগ করবেন না।'

নবু রাতুলকে উৎসাহী শ্রোতা পেয়ে বিকেলের ফুটবল ম্যাচের কথা বলছিলো। এমন সময় বেনুদা এসে বললো, 'মুন্সিবাড়িতে রাতে মিলাদের দাওয়াত। আমাদের নেমন্তন্ন করেছে।'

মিলাদে যাওয়ার কথা শুনলে রাতুলের গায়ে জ্বর আসে। মুখ কালো করে বললো, 'আমারা না গেলে হয় না বেনুদা? শরীরটা বেশি ভালো লাগছে না।'

বেনুদা মৃদু হাসলো, 'বুঝেছি। তোমার ছোড়াদিও যাচ্ছে না। রবি তৈরি হয়ে নে।' এরপর কৈফিয়তের সুরে বললো, 'আমাদের পীরের বংশ। কারো বাড়ির মিলাদে না গেলে গ্রামে দশ কথা উঠবে।'

রাতুল ব্যস্ত গলায় বললো, 'না না, ঠিক আছে। আপনারা যান। নবুও যাবে নাকি?'

নবুর অবশ্য মিলাদে যেতে আপত্তি নেই। তবে রাতুল যাবে না শুনে ও বেনুদাকে বললো, 'রাতুল বাড়িতে একা থাকবে। আমি কি যাবো?'

'তুই থাক তাহলে।' এই বলে বেনুদা রবিকে নিয়ে চলে গেলো।

নাদুখালা উঠে যাওয়ার পরই গল্পের আসর ভেঙে গেছে। রবি চলে যাওয়ার পর দোতালার বারান্দায় রাতুল আর নবু ছাড়া আর কেউ রইলো না। রাতুল বললো, 'মিলাদের উপলক্ষটা কি?'

নবু হাসলো, 'এ গাঁয়ে মিলাদ পড়ানোটা রুটিন। খাবিস জ্বীনের আসর থেকে বাঁচার জন্য যাদের সামর্থ্য আছে তারা ফি হপ্তায় মিলাদ পড়ায়। আমাদের মসজিদের হুজুর ইমামতি করে যা পান, সারা মাস মিলাদ পড়িয়ে তার চেয়ে বেশি পান।'

রবিদের সদর পুকুর পাড়ের মসজিদে এশার নামাজের আজান পড়লো। নিচের তলা থেকে নাদুখালা ডাকলেন, 'নবু, রাতুলকে নিয়ে খেতে আয়।'

নবুর সঙ্গে খেতে বসে রাতুলের মুখে হাসি আর ধরে না। নাদুখালা যতোবার ওর পাতে খাবার তুলে দেন, রাতুল লুকিয়ে সেগুলো নবুর পাতে পাচার করে দেয়। নবুর পাতের দিকে নাদুখালার মোটেই নজর নেই। জানেন, ওকে তুলে দিতে হয় না। খাওয়ার পর নাদুখালা মুখ টিপে হেসে বললেন, 'এ্যাদ্দিনে রাতুলকে খাইয়ে সুখ পেলাম।'

নবু হাসতে গিয়ে বিষম খেলো। নাদুখালা ওর মাথায় থাবড়া মারতে মারতে বললেন, 'অসময়ে কোন মুখপোড়া তোর কথা মনে করলো! খবরদার, রাতুলরা যদ্দিন আছে কোথাও যাবি না।'

নবুর বিষম খাওয়ার কারণ রাতুলের জানা থাকলেও, মুখখানা এমন ভালো মানুষের মতো করে রাখলো, যেন ও কিছুই জানে না।

খেয়ে উঠে ওরা দোতলার ছাদে গিয়ে বসলো। নবু বললো, 'রবি আসার আগে নিচে নেমে যেতে হবে। রাতে ছাদে উঠেছি জানলে মা আমাকে আস্ত রাখবে না।'

নবুর মার খাওয়ার কথা রবিও কয়েকবার বলেছে। ওর জন্য রাতুলের মনটা খারাপ হয়ে গেলো। বললো, 'তোমাকে বুঝি নাদুখালা খুব মারেন?'

'বারে, কথা না শুনলে মারবে না! পরীক্ষায় খারাপ করেছি বলে বেনুদা কি কম মেরেছে?'

'পরীক্ষায় ভালো করলে না কেন নবু?'

রাতুলের সমবেদনাভরা কথা নবুর মন ছুঁয়ে গেলো। বললো, 'রবি কি বললো, শোন নি?'

'শুনেছি। মানুষের বিপদে তুমি সাহায্য করো, এটা খুবই ভালো কথা। তবে লেখাপড়া শিখে যখন নিজের পায়ে দাঁড়াবে, তখন অনেক বেশি সাহায্য করতে পারবে।'

রাতুলের কথা শুনে ম্লান হাসলো নবু। বললো, 'তোমাকে আমার ভালো লেগেছে বলেই বলছি রাতুল। রবিদের বাড়িতে আমরা আশ্রিতের মতো আছি। বেনুদা, রবি শহরে থাকে। এ বাড়ির খাজনা, কাচারি, মামলা সব কাজ নিয়ে আমাকেই সদরে দৌড়াতে হয়। পরীক্ষার ক'দিন আগেও তিনদিন সদরে গিয়ে থাকতে হয়েছিলো। কাজ করতে আমার এতোটুকু কষ্ট হয় না। তবে পড়ার সময় ইচ্ছে করলেই পাওয়া যায় না। এবার অঙ্ক পরীক্ষার আগের দিন শুনি নিকেরিপাড়ায় কলেরা লেগেছে। ওরা বললে আসবে না, তই গঞ্জে গিয়ে আমাকেই ডাক্তার আনতে হলো। এ গাঁয়ে লেখাপড়ার চল মাত্র চার-পাঁচটা বাড়িতে আছে। যারা লেখাপড়া করে তারা সবই হয় বরিশাল, নয় ঢাকায় গিয়ে থাকে। রবিকেই দেখ না। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেয়ার আগেই গাঁ ছেড়ে চলে গেলো।'

রাতুল বললো, 'তোমার ইচ্ছে করে না শহরে গিয়ে পড়াশোনা করতে?'

'ইচ্ছে তো করেই। ম্যাট্রিকে ভালো করতে পারলে ডাক্তারি পড়বো আমি। তবে বেনুদার মতো শহরে চাকরি করবো না। গাঁয়েই থাকবো। আমার তো বেশি পয়সা কামানোর দরকার নেই। মা আর আমি—মাত্র দু'জন।' এই বলে একটু ইতস্তত করলো নবু। তারপর বললো, 'তুমি যদি কিছু মনে না করো আমি একটা সিগারেট খাবো। বাড়িতে লুকিয়ে খেতে হয়।'

রাতুল হেসে বললো, 'খেতে পারো। মনে করার কি আছে। একবার আমি বড়দার কৌটো থেকে একটা টেনে দেখেছিলাম।, ভালো লাগে নি।'

নবু সিগারেট ধরিয়ে বললো, 'রবিকে আবার বলে দেবে না তো?'

'আমাকে তোমার ওরকম মনে হয় নাকি!'

'না না, এমনি বললাম।'

'রবি কিন্তু জানে তুমি যে সিগরেট খাও!'

'তোমাকে বলেছে বুঝি! কি জানি, কখনো আড়াল থেকে দেখেছে হয়তো।'

'ও তো বাড়িতে বলে দিতে পারে।'

'এমনিতে বলবে না। আমি ওর কোনো কথা না শুনলে বলতে পারে। আর বললেই বা কি। একটু পিটুনি খেতে হবে। ওসব আমার গা-সহা হয়ে গেছে।'

'না খেলেই তো পারো।'

'আসলে কি জানো, সারাক্ষণ আমাদের কাদা-পানিতে থাকতে হয়। তাই একটু বিড়ি-তামাক না খেলে শরীরে জুত লাগে না। গাঁয়ে সাধারণ মানুষের ঘরে আমার বয়সী তুমি একজনও পাবে না, যে বিড়ি-তামাক খায় না।'

নবু বুঝতে পারলো ওর সিগারেট খাওয়াটা রাতুলের পছন্দ হয় নি। তাই একটু পরে হেসে বললো, 'যখন শহরে যাবো, তখন সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দেবো।'

রাতুলের খুব ভালো লাগলো, ওর পছন্দ-অপছন্দকে নবু গুরুত্ব দিচ্ছে বলে। হাত বাড়িয়ে হেসে বললো, 'কথা দিচ্ছো তাহলে।'

রাতুলের হাতে হাত রেখে নবুও হেসে ফেললো—'কথা দিলাম।'

দু'দিনের ভেতর রাতুলের সবচেয়ে কাছের মানুষ হয়ে গলো নবু।

রবিকে জব্দ করার ষড়যন্ত্র

নবুর সঙ্গে রাতুলের বেশি মেলামেশা রবির মোটেই ভালো লাগে নি। ওর ভয় নবু রাতুলকে সিগারেট খাওয়া শেখাবে, নিকেরিপড়ায় নিয়ে গিয়ে আজেবাজে লোকের সাথে মিশবে, খারাপ খারাপ কথা বলবে, রাজবাড়ির জ্বীনদের নিয়ে হাসিঠাট্টা করবে। এসব ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠলো রবি। রাতুলের যদি কিছু-একটা হয়ে যায়, ওদের বাড়ি গিয়ে মুখ দেখানো যাবে না।

নবু যখন ছিলো না, আবেদালি রাতুলকে সাঁতার শেখাতে নিয়ে যেতো, বিকেলে নৌকায় করে বেড়াতে নিয়ে যেতো। বলা ছিলো আবেদালি যেন সব সময় রাতুলের সঙ্গে থাকে। নবু আসার পর আবেদালি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। ওর কাজগুলো মহা আনন্দে নবু নিজের ঘাড়ে তুলে নিলো। রবি বহুদিন পরে বাড়ি এসেছে। ওকে প্রায় আত্মীয়-স্বজন কিংবা প্রতিবেশীদের বাড়িতে দাওয়াত খেতে যেতে হয়। রাতুল মাত্র দু'রাত গিয়েছিলো, তাও ছোড়দির বকুনির পর।

যেদিন রবিদের চরের জমি নিয়ে কি-এক পুরানো মামলার শুনানির জন্য ও আর বেনুদা দু'দিনের জন্য বরিশাল গেলো—নবু-রাতুলকে পায় কে! রবি অবশ্য রাতুলকেও নিয়ে যেতে চাইলো। বললো, 'তোর কোনো অসুবিধা হবে না।

কাকাদের বিরাট বাড়ি রয়েছে বরিশালে। একবয়সী ছেলেমেয়েও পাবি। মেজকাকার মেয়ে আছে একটা। ক্লাস এইটে পড়ে। ভীষণ সুন্দর দেখতে, চমৎকার গান গায়। চল, পরিচয় করিয়ে দেবো।'

রাতুল তবু যায় নি। বলেছে, 'তোদের বাড়িতে যে ক'দিন আছি সাঁতার আর নৌকা চালানোটা ভাল করে শিখতে চাই। তাছাড়া সবাই চলে গেলে ছোড়দি একা হয়ে যাবে।'

শুনে রবির ভারি রাগ হলো। মনে মনে বললো, 'ছোড়দির চিন্তায় যে ঘুম হচ্ছে না সে তো ভালো করেই জানি। আল্লা জানে দুই শয়তান মিলে কি অঘটন ঘটায়!'

রবি চলে যেতেই রাতুল আর নবু হি হি করে হেসে গড়িয়ে পড়লো। নবু বললো, দু'দিন মন খুলে কথা বলা যাবে।' রাতুল বললো, 'যা খুশি তাই করা যাবে।'

নবু বললো, 'এতোদিন খালে নৌকা বেয়েছি। আজ চলো নদীতে যাই।'

'বেশ তো চলো।' নবুর কোনো কথাতেই রাতুল গর-রাজি নয়।

দুপুরে খেয়েই ওরা দু'জন বেরিয়ে পড়লো। রবিদের বাড়ি থেকে মাত্র দশ মিনিটের পথ মরাখাকি খাল। আবেদালির কাছে রাতুল শুনেছে এই খালের পাড়ে হিন্দুদের শ্মশানঘাট ছিলো। এখান থেকে অবশ্য বেশ দূরে। যারা গরিব, ভালোমতো পোড়াতে পারতো না, আধপোড়া করে খালে ভাসিয়ে দিতো। মড়া খাওয়ার জন্য নদী থেকে কুমির চলে আসতো খালে। তখন থেকে এই খালের নাম মরাখাকি। একবার নিকেরিদের জালে ধরা পড়েছিলো একটা বুড়ো কুমির। এখন অবশ্য শ্মশানঘাট সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলেশ্বরীর তীরে।

পৌষের শেষে ভরদুপুরেও রোদের এতোটুকু তেজ নেই। দু'পাশে ন্যাড়া ধানক্ষেতের ভেতর খালটা নদীতে গিয়ে মিশেছে। নবুই বৈঠা বাইছিলো। রাতুলের হাতের ব্যালেন্স মোটামুটি ঠিক হলেও বৈঠা মারার কায়দা এখনো পুরো রপ্ত করতে পারে নি। বৈঠা বেশি ডুবিয়ে ফেলে বলে অল্পক্ষণের ভেতর ওর হাঁপ ধরে যায়, নৌকাও চলে আস্তে।

আধঘন্টার মধ্যে ওদের নৌকা বলেশ্বরীতে এসে পড়লো। বেশ চওড়া নদী। ঢাকার বুড়িগঙ্গার চারগুণ হবে।

নবু বললো, 'সুন্দরবন এখান থেকে বেশি দূরে নয়।'

রাতুল বললো, 'রবি যে বলছিলো, নদীর ওপারেই সুন্দরবন?'

'ঠিক ওপারে নয়।' নবু মৃদু হেসে বললো, 'এখান থেকে নৌকায় এক ঘন্টা ভাটির দিকে যেতে হবে।'

রাতুল বুঝলো, রবির একটু বাড়িয়ে কথা বলার স্বভাব আছে। বললো, 'ওদের রাজবাড়িটা কি নদী থেকে দেখা যায়?'

'এখনো কিছুটা যায়।' মাথা নেড়ে সায় জানালো নবু।' শুনেছি যখন ওটা বানানো হয়, তখন নাকি নদীর ওপরই ছিলো।'

'একবার যাবে ওখানে?'

নবু মুখ টিপে হেসে বললো, 'ভয় পাবে না তো!'

'কেন, কিসের ভয়!'

'রবি তোমাকে বলে নি জ্বীন থাকে ও-বাড়িতে!'

'তুমি জ্বীন-ভূত বিশ্বাস করো?'

নবু আগের মতো হেসে বললো, 'আল্লাকে যখন মানি, জ্বীন অবিশ্বাস করি কি করে! জ্বীনের কথা কোরানেও আছে।'

'তুমি কি মনে করো রাজবাড়িতে জ্বীন আছে?'

'আমি কখনো কিছু দেখি নি। কয়েকবার গিয়েছিলাম ওদিকটায়।'

'নৌকা নিয়ে চলো না, গিয়ে দেখি।'

'ওদিকেই যাচ্ছি। তবে নামতে পারবে না। নদীর ধারটায় অসম্ভব কাঁটাঝোপ। সাপের ভয়ানক উৎপাত।'

'রবি তো বলে ওগুলো সাপ নয়, জ্বীন। জ্বীনরা নাকি সাপের চেহারা ধরে রাজবাড়িতে থাকে।'

'লোকজন ওরকমই বলে। তবে যে যাই বলুক, সাপের জাতটাকে আমি বিশ্বাস করি না। গত বর্ষায় দুটো গোখারো মেরেছি।'

'তুমি কি কোনো কিছুকেই ভয় পাও না নবু?'

'কে বললে পাই না?' হেসে নবু বললো, 'অঙ্ক ভীষণ ভয় পাই। অঙ্কের স্যারকে আরো বেশি।'

নবুর কথার ধরন দেখে রাতুলও হো হো করে হেসে উঠলো। নদীর তীরে কাদার মধ্যে কয়েকটা বক একপায়ে দাঁড়িয়ে মাছ ধরার ধ্যানে মগ্ন ছিলো। ওদের হাসির শব্দে ওগুলো ঝটপট ডানা মেলে উড়ে গেলো। রাতুল মুগ্ধ চোখে সেদিকে তাকিয়ে রইলো।

একটু পরে নবু বললো, 'রাজবাড়ি দেখতে পাচ্ছো? বাঁ দিকের তালগাছগুলোর ওপাশে দেখো।'

ঘন গাছগাছালির জন্য ভালোমতো দেখা যাচ্ছিলো না। আট-দশটা তাল গাছ খুব কাছাকাছি বেড়ে উঠেছে। সেগুলোর ডানপাশ দিয়ে যাতোটুকু দেখা গেলো, সেটাকে রাজবাড়ি না বলে কোনো প্রাসাদের ধ্বংসস্তুপ বলা ভালো।

নবু বললো, 'দক্ষিণ পাশটা একেবারেই ধসে গেছে। উত্তর দিকের অংশে ওপরে নিচে কয়েকটা ঘর এখনো অক্ষত আছে।'

বাড়ি থেকে বেরিয়েছে প্রায় দেড়ঘন্টার মতো হবে। রাতুল বললো, 'এবার নৌকা ফেরাও নবু। বাড়ি যেতে যেতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে।'

দুপুরবেলা বেরিয়েছিলো বলে ওরা কেউ গরম কাপড় আনে নি। আকাশে রোদ থাকলেও নদীর কনকনে বাতাসে বেশ শীত করছিলো। নৌকো খালে ঢুকিয়ে নবু বললো, 'কিছুক্ষণ বৈঠা বাও, শীত লাগবে না।'

নবু একটা বৈঠা হালের মতো ধরে রইলো। রাতুল বৈঠা বাইলো। আধঘন্টার মধ্যে শীত কোথায় পালালো! রীতিমতো ঘেমে উঠলো রাতুল। নবু বললো, 'বৈঠা মারার কায়দা রপ্ত করতে আরে ক'দিন লাগবে।'

সূর্য ডোবার আগেই ওরা বাড়ি ফিরলো। তবু নাদুখালার বকুনি খেতে হলো—গরম কাপড় নিয়ে বেরোয় নি বলে। নবুকে বললেন, 'জানি, তোকে আজরাইলে নেবে না। শহরের কচি ছেলেটাকে কেন ঠাণ্ডার ভেতর তোর মতো সূতির জামা একটা পরিয়ে ঘোরাতে নিলি?'

রাতুল বললো, 'আমার একটুও শীত করছে না নাদুখালা।'

'তা তো বলবেই। নবুর পাল্লায় যখন পড়েছো তখন খালিগায়ে থাকলেও শীত করবে না। মুখ-হাত ধুয়ে ওপরে যাও। তোমাদের চা-নাশতা পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

বেনুদারা নেই। সন্ধ্যে না হতেই সদর দরজায় খিল পড়েছে। রাতুলকে বেনুদার মা আর নাদুখালা বারবার বলে দিয়েছেন সন্ধ্যের পর মুহূর্তের জন্যেও একা যেন বাড়ির বাইরে না যায়। এমনকি খিড়কির পুকুর ধারে যাওয়াও বারণ। আবেদালি ঘরে ঘরে দুটো করে হারিকেন জ্বেলে দিয়েছে। নিচে ছোড়দিকে দেখার জন্য রবিদের কোন আত্মীয়-কুটুম্ব এসেছে। বাড়িটা বেশ ভরা ভরা লাগছিলো, যদিও ওপরে ওরা দু'জন মাত্র। রাতে অবশ্য সিঁড়ির পাশের ঘরে আবেদালি আর কামলা সালাম থাকে। রাতুলের যদি কিছু দরকার হয় তাই এই ব্যবস্থা। নইলে আবেদালিও নিচে থাকে।

খাওয়ার জন্য শুধু রাতুলদের নিচে নামতে হয়। সেদিন রাতে ওরা তাড়াতাড়ি খেয়ে ঘরে এসে ভারি লেপের তলায় ঢুকলো। হঠাৎ করে শীত বেড়ে গেছে। রাতুল বললো, 'সাইবেরিয়া থেকে আসছে এই বাতাস।'

নবু বললো, 'মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে জাহাজে করে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে অজানা সব দেশে ঘুরি।'

রাতুল বললো, 'কি আশ্চর্য, আমারও তো তাই ইচ্ছে করে! রবি তো বলেছে বড় হলে ও জাহাজের ক্যাপ্টেন হবে।

নবু গম্ভীর হয়ে বললো, 'না না, রবির জাহাজে ওঠা যাবে না। ও যা ভীতু! নির্ঘাত আমাদের ডুবিয়ে মারবে।'

রাতুল ওর কথা শুনে হেসে গড়িয়ে পড়লো।

বেনুদারা যে দু'দিন বরিশাল ছিলো, সময় যে কিভাবে হুট করে ফুরিয়ে গেলো রাতুল টেরই পেলো না। পরদিন নবু ওকে নিকেরিপাড়ায় নিয়ে

গিয়েছিলো। নবুর সঙ্গে রাতুলকে দেখে ওরা ভারি খুশি। রাতুল ওদের মাছ ধরা দেখলো। আসার সময় বড়বাড়ির কুটুম্বের জন্য জোর করে মস্তবড় এক ভেটকি মাছ দিয়ে দিলো। মাছ দেখে নাদুখালাও খুশি।

এর পরদিন বিকেলে এলো রবি আর বেনুদা। রবি মহা উত্তেজিত—কাকাদের বাড়িতে ছেলেমেয়েরা সবাই নাকি নাটক করেছে। বললো, 'ভাবী এসেছে শুনে সবাই বেনুদাকে ধরেছে সামনের সপ্তায় লঞ্চ রিজার্ভ করে আসবে। এখানে এসে নাটক দেখাবে।'

এতোবড় উত্তেজনার খবর শুনে রাতুল মোটেই উত্তেজিত হলো না। রবির মান রাখার জন্য শুধু বললো, 'তোর জন্য পার্ট রাখবে না?'

শুনে রবি আরো উত্তেজিত—'আমার পার্ট আমি লিখে নিয়ে এসেছি। কলকাতা থেকে মেজকাকার ছেলে মণিদা ডি এল রায়ের শাহজাহান নাটক এনেছে। ওটাই করা হবে।'

নবু বললো, 'ওসব হচ্ছে বড়লোকী নাটক। গত শীতে আমরা আমাদের স্কুলে শরৎচন্দ্রের মহেশ করেছিলাম।'

রবি টিটকিরি মেরে বললো, 'মহেশের পার্ট নিশ্চয়ই তুই করেছিলি?'

নবু অপ্রস্তুত হয়ে বললো, 'কি যা তা বলছিস! আমাদের বাংলার স্যার ওই গল্পটাকে নাটক বানাতে গিয়ে অনেক বাড়িয়েছিলেন। আমি করেছিলাম কারখানার শ্রমিকের পার্ট।'

'মণিদাদের নাটক দেখলে তোর চোখ ট্যারা হয়ে যাবে।'

'ঠিক আছ দেখা যাবে,' বলে মুখ টিপে হেসে নবু নিচে নেমে গেলো।

গত দু'দিনে রাতুল আর নবুর অন্ধুত্ব কতো গভীর হয়েছে, রাতে টের পেলো রবি। ও যখন ছিলো না, তখন নবু ওপরে রাতুলের সঙ্গে থেকেছে, এমনিতে নবু নিচে থাকে। খেয়ে উঠে ওরা তিনজন রবির ঘরে এসে বসলো আড্ডা দেয়ার জন্য। রবি ভেবেছিলো শোয়ার সময় হলে নবু নিচে চলে যাবে। তার আগে রাতুল ওকে বললো, 'রবি, নবু আমাদের সঙ্গে থাকুক না। এতোবড় খাট, চারজনও শুতে পারবে।'

রবি মনে মনে বিরক্ত হলেও বললো, 'থাক না, অসুবিধে কি! তবে নাদুখালা নিচে একা থাকবেন।'

নবু বললো, 'মাকে তাহলে বলে আসি। আমি যখন তোকে পাহারা দেয়ার জন্য ওপরে থাকি, তখন যে পুষ্প বুজি মা'র কাছে থাকে, ভুলে গেছিস বুঝি!'

নবু আসার সময় ওর লেপ নিয়ে এলো। রবি বললো, 'জানালা খোলা থাকলে আমি ঘুমোতে পারবো না। নবু, জানালা বন্ধ করে দে।'

গত দু'দিন রাতুল জানালা খুলে শুয়েছিলো। রবির কথা শুনে নবু রাতুলের দিকে তাকালো। রাতুল বললো, 'ঠিক আছে, বন্ধ করে দাও। রবির যখন এতো

ভয়, কি করা যাবে।'

রবি বললো, 'কাল থেকে কেমন শীত পড়েছে টের পাচ্ছিস না?'

নবু জানালা বন্ধ করে খাটের এক কিনারে এসে শুলো। মাঝখানে শুলো রাতুল। হঠাৎ ওর মনে পড়লো, রবি যে রাজবাড়ির গুপ্তধনের কথা বলেছিলো, সে কথা নবুকে বলা হয় নি। এ দু'দিন একবারও মনে হয় নি কথাটা। নবুকে বললো, 'রাতে কখনো পুরোনো গোরস্থানে গিয়েছো?'

নবু বললো, 'রাতে যাবার কথা কখনো ভাবি নি। তবে দিনে অনেক গেছি। শেয়াল আর ভাম ছাড়া কিছু দেখি নি।'

রবি বললো, 'নাদুখালা যে বলে তোর দাদা ভূত দেখেছিলো?'

'দাদা রাতে এমনিতেই চোখে কম দেখতো।' নবু বললো, 'চোর-ছ্যাঁচড় কিছু দেখেছিলো হয়তো।'

রাতুল আবার নবুকে প্রশ্ন করলো, 'কখনো রাজবাড়ি গিয়েছো?'

'ভেতরে ঢুকি নি। বাইরে থেকে দেখেছি। একেবারেই জঙ্গল হয়ে গেছে জায়গাটা। এতোটুকু পা ফেলার জায়গা নেই।'

'আমার কিন্তু যাওয়ার ইচ্ছে করছে!'

'কেন বল তো?'

'রবি বলছিলো ও-বাড়িতে খুঁজলে নাকি গুপ্তধন পাওয়া যাবে। ওদের পূর্বপুরুষেরা নাকি পুঁতে রেখে গেছে।'

রবি শুকনো গলায় বললো, 'আসলে পুঁতে যেমন রেখেছে, তেমনি ওদের পোষা জ্বীনরা বসে বসে পাহারাও দিচ্ছে। আমাদের এক পূর্বপুরুষ তান্ত্রিকের পাল্লায় পড়ে একটা ছেলেকে মেরে যখ বানিয়েছিলো দেয়ালের ভেতর লুকানো মোহরর ঘড়া পাহারা দেয়ার জন্য। কেন, নবু শুনিস নি?'

নবু হাই তুলে বললো, 'যখের কথা জানি না। তবে পুরোনো জমিদার বাড়িতে ওসব থাকাটা বিচিত্র কিছু নয়। তার ওপর তোরা আবার ডাকাতের বংশ।'

রাতুল ওদের ঝগড়া থামানোর জন্য বললো, 'যাই বলো নবু, আমার কিন্তু পুরোনো রাজবাড়িটা দেখতে ভীষণ ইচ্ছে করছে।'

ওরা তিনজন টেরও পায় নি কখন আবেদালি ওদের জন্য তিনগ্লাস দুধ এনে দাঁড়িয়ে আছে। নাদুখালা নিয়ম বেঁধে দিয়েছেন, রোজ শোয়ার আগে সবাইকে একগ্লাস করে দুধ খেতে হবে। রাতুলের কথা শেষ হতেই টেবিলের ওপর ঠকাস করে দুধের গ্লাসের ট্রে নামিয়ে রেখে আর্তনাদ করে উঠলো আবেদালি—'রাতুল দাদা, আপনে কও কি? রাজবাড়িতে কোনো মানুষ যাইতে পারেহ্।'

সমর্থন পেয়ে রবি তড়বড় করে বললো, 'আমিও তো তাই বলি আবেদালি। ওখানে যে যখ আছে এ কথা কে না জানে!'

নবু গম্ভীর হয়ে বললো, 'শুধু যখ কেন, আরো অনেক কিছু থাকতে পারে।'

আবেদালি ভয়-পাওয়া শুকনো গলায় বললো, 'তোমরা গেরামের মানুষ। তোমরা ঠিহিই বুইজবে। রাতুল দাদারে বুজায়ে কও। শেষে কোলাম জানডা খোয়াইতে হইবেহেনে।'

রাতুল বুঝলো কথা বাড়তে দিলে এটা গোটা বাড়িতে মস্ত আলোচনার বিষয় হয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি বললো, 'বোঝাতে হবে না আবেদালি। আমি এমনি ঠাট্টা করছিলাম। আমার কি জানের ভয় নেই? ভূত না হোক সাপখোপ তো কম নেই। কে যাবে ওর ভেতর মরতে। তার চেয়ে তুমি বরং আমাদের মাছের চার বানিয়ে দিও। কাল সকালে আমরা মাছ ধরবো। বিকেলে নৌকা বাইবো।'

'হেয়া ওইবে নে। তয় কতা ওইলো তেনাগো নিয়া মশকরা হরণ ভালো না।' এই বলে আশ্বস্ত হয়ে চলে গেলো আবেদালি।

ওকে কাটাতে পেরে রাতুল খুব খুশি। নবু আস্তে করে ওকে চিমটি কেটে গোপনে জানিয়ে দিলো, রাতুল ভালো বলেছে।

রবি বললো, 'জানিস, আমাদের মসজিদের হুজুরও জ্বীন দেখেছেন। একদিন মাগরেবের নামাজের সময় ওজু করে তিনি মসজিদে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ দেখেন পুরোনো গোরস্থানের ভেতর দুটো লোক হাঁটছে। নবুর দাদার কথা হুজুরের জানা ছিলো। তাই তিনি আর ওদের পেছনে যান নি। হঠাৎ ওর চোখের সামনেই ভোজবাজির মতো লোক দুটো বাতাসে মিলিয়ে গেলো। একটু পর শোনেন ফোঁস ফোঁস শব্দ। তাকিয়ে দেখেন দুটো সাপ তাঁর দিকেই আসছে। সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে পালিয়ে এসেছেন।'

রাতুল মুখ টিপে হেসে বললো, 'তোদের এই ভয়-পাওয়াদের দলে একখানা হুজুরও আছে তাহলে? তবে আর কি, জুজুর ভয়ে গর্তে লুকিয়ে থাক।'

রাতুলের টিটকিরি শুনে রেগে গেলো রবি—'সাহস থাকে তো যা না। ভালোর জন্য বলছি—শুধু শুধু ইয়ার্কি!' এই বলে ও পাশ ফিরে শুলো।

একটু পরেই রবি ঘুমিয়ে গেলো। নবু ফিসফিস করে রাতুলকে ডাকলো, 'রাতুল, ঘুমিয়ে পড়েছো'?

রাতুল বললো, 'না'।

'চলো, বাইরে গিয়ে বসি।' বলে উঠে বসলো নবু।

দু'জন দুটো নরোম কাঁথা গায়ে জড়িয়ে বারান্দায় এসে বসলো। নবু একটা সিগারেট ধরিয়ে বললো, 'রবিকে আর মানুষ করা গেলো না। এতো ভয় নিয়ে ও কি করে যে সংসারে চলবে, ভেবে পাই না।'

রাতুল বললো, 'বেনুদা পাস করা ডাক্তার হয়ে যদি জ্বীনভূত বিশ্বাস করে, রবির কি দোষ বলো?'

'বিশ্বাসের সঙ্গে ভয়ের কি সম্পর্ক? জ্বীন তো আমিও বিশ্বাস করি। তাই বলে

ওদের মতো ভয় পাই নাকি!'

'তুমি কখনো জ্বীনভূতের পাল্লায় পড়েছিলে?'

'একেবারে পড়ি নি বলাটা বোধ হয় ঠিক হবে না।' একটু ভেবে বললো নবু—'গত বর্ষায় একটা মেয়েকে জব্দ করার জন্য খিড়কি পুকুরে নেমেছিলাম। ভেবেছিলাম ডুব-সাঁতার দিয়ে ঘাটে এসে ওকে ভয় দেখাবো। সাঁতার যে আমি ভালো পারি সে তো দেখেছো। পুকুরের মাঝামাঝি এসেছি, হঠাৎ মনে হলো পা'টা কে টেনে ধরেছে। যতো ছাড়াতে যাই, আর ছাড়ে না, টেনে নিচের দিকে নিয়ে যেতে চায়। আমি জানি, মাথা গরম করলেই বিপদ। মনে মনে তিনবার কুলহুয়াল্লা পড়ে উল্টো দিকে সাঁতার দিতেই পা'টা ছুটে গেলো। এ কথা কাউকে বলি নি। মেয়েটাও জানে না।'

রাতুল রহস্যভরা গলায় বললো, 'মেয়েটা কে জানতে পারি?'

নবু লজ্জা পেলো—'না, মানে-পুষ্প বুজির ননদ। নাম হচ্ছে পারুল। পাশের গ্রামে থাকে। ক্লাস এইটে পড়ে। ভালো গান জানে। আমাদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলো। সেবারই প্রথম আলাপ।'

'তারপর নিশ্চয়ই আরো কয়েকবার ওদের বাড়ি গেছো!' রাতুলের গলায় তখনো রহস্যের ছোঁয়া।

নবু হেসে ফেললো—'কি করে বুঝলে?'

'প্রথম আলাপে কি জানা যায়, কোন মেয়ে কি রকম গান গায়?'

'না, মানে—আসলেই ভালো মেয়েটা!'

'আহ, আমি কি বলেছি খারাপ! ছোড়দিকে দেখার জন্য নিশ্চয়ই আসবে?'

'আসবে না আবার! খালা তো দুনিয়ার যতো আত্মীয়-কুটুম্ব আছে সবাইকে দাওয়াত পাঠানো শুরু করেছে। আর মাত্র তিনদিন বাকি।'

'আমি তখন বলে দেবো তুমি ওকে ভয় দেখাতে চেয়েছিলে।'

'ভালো হবে না বলছি।' রাতুলের পিঠে থাপ্পড় মেরে নবু বললো, 'তোমার মতলবটা কি শুনি?'

রাতুল নিরীহ গলায় বললো, 'আমার কোনো খারাপ মতলব নেই। তোমার পারুল তোমারই থাকবে। আমি ভাবছি অন্য কথা।'

'কি?'

'রবিকে একবার ভয় দেখালে কেমন হয়?'

'ও হার্টফেল করবে।'

'না, সে রকম সিরিয়াস কিছু নয়। ওর ভয় ভাঙাবার জন্য। ও যাতে বুঝতে পারে, চোখে দেখার ভুলে অনেকে অনেক কিছু দেখে।'

'ভালো বলেছো তো! তুমি কিছু ভেবেছো?' উৎসাহিত হয়ে উঠলো নবু।

'ভেবেছি।' বললো রাতুল।

বাইরে কুয়াশাভেজা ম্লান চাঁদের আলো। হু হু করে বইছে ঠাণ্ডা বাতাস। টানা বারান্দার এক কোণে কাঁথা গায়ে জড়োসড়ো হয়ে বসে রাতুল নবুকে বললো ওর পরিকল্পনার কথা। ঘরের ভেতরে কিছুই টের পেলো না রবি।

ভয় দেখাতে গিয়ে ভয়ানক বিপদ

রাতুল আর নবু ঘুমিয়েছিলো অনেক রাতে। কতো যে কথা ওদের, কিছুতেই শেষ হতে চায় না। ঘুম ভাঙতেও দেরি হলো। ওদের গভীর ঘুম দেখে রবি আগেই উঠে নিচে চলে গেছে।

সকালের সূর্যের আলো যখন খোলা জানালা দিয়ে এসে রাতুলের চোখের পাতায় চুমো খেলো, তখন ওর ঘুম ভাঙলো। ঘড়িতে তাকিয়ে দেখে সাড়ে ন'টা বাজে। হাই তুলে নবুকে ডাকলো, 'এই নবু উঠবে না! আর কতো ঘুমুবে?'

নবু চোখ মেলে তাকালো। রাতুলকে দেখে মৃদু হাসলো—'ঘুমোলাম কোথায়! শুয়েছি তো সাড়ে তিনটায়।'

'এখন সাড়ে ন'টা বাজে।'

'তাই নাকি!' লাফ দিয়ে উঠে বসলো নবু—'মা নির্ঘাত পিঠে খড়ম ভাঙবেন।' বলেই শর্টস পরে রোজকার মতো ব্যায়াম শুরু করলো।

রাতুল বিছানায় শুয়ে নবুর ব্যায়াম করা দেখতে দেখতে বললো, 'নাদুখালা সব সময় ওরকম বলেন।'

গুণে গুণে একশটা বুকডন আর পাঁচ শ' বার স্কিপিং করে ঘাম ঝরিয়ে নবু ব্যায়াম থামালো। ওর বুকের মাপ চল্লিশ ইঞ্চি, রাতুলের পঁয়ত্রিশ! স্কুলে রাতুল মাঝে মাঝে বাস্কেট বল আর টেবিল টেনিস খেলে। খেলার সময় কোথায় ওর! স্কুল ছুটির পর যতোক্ষণ ওদের লাইব্রেরি থাকে খোলা ততোক্ষণ মুখ গুঁজে বই পড়ে। লাইব্রেরি বন্ধ হওয়ার আগে ওটা শেষ করে নতুন আরেকটা বই ইস্যু করিয়ে বাড়ি ফেরে। একবারে একটার বেশি বই নেয়া যায় না। ওই একটাও দু'ঘন্টার ভেতর শেষ হয়ে যায়। তারপর রাতুলকে বাধ্য হয়ে পড়ার বই নিয়ে বসতে হয়।

নবু রাতুলের চোখে প্রশংসা দেখতে পেয়ে লজ্জা পেলো—'তোমারও ব্যায়াম করা উচিত রাতুল। এই শরীর নিয়ে এতো এ্যাডভেঞ্চার করবে কি করে? কাল রাতে তো কতো কি প্ল্যান করলে!'

রাতুল হেসে বললো, 'রবির চেয়ে অনেক শক্ত আছি। তুমি বরং ওকে গড়েপিটে মানুষ করার চেষ্টা করো।'

রবিদের বাড়িতে আসার পর থেকে রোজ দুপুরে এক ঘন্টা পুকুরে সাঁতার কেটে, বিকেলে নৌকা চালানো শিখতে গিয়ে-ব্যায়াম রাতুলেরও কম হচ্ছে না। শরীরের ভেতর শক্তি যে আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে এটা ও নিজেই বুঝতে পারে। নবু বললো, 'তোমার বডি-স্ট্রাকচার কিন্তু খুব সুন্দর। কয়েকটা ফ্রি হ্যাণ্ড শিখিয়ে দেবো তোমাকে, আরো সুন্দর হয়ে যাবে।'

রাতুল হাই তুলে বললো, 'কার জন্য সুন্দর হবো বলো! আমার তো আর পারুল নেই!'

'দেবো এক থাপ্পড়।' এই বকে নবু যেই হাত তুলেছে নিচের তলা থেকে তখনই হন্তদন্ত হয়ে রবি এসে হাজির।

'এতোক্ষণে তোদের ঘুম ভাঙলো! নিচে দারোগা এসেছে তদন্ত করতে। মা তোদের নাশতা নিয়ে বসে আছে। শিগগির আয়।' উত্তেজিত গলায় কথাগুলো বলে রবি যেভাবে এসেছিলো সেইভাবেই চলে গেলো।

নবু বললো, 'চুরি গেছে পনেরো দিন আগে, আজ এসেছে তদন্ত করতে। পুলিসের এই অকর্মা লোকগুলোকে দেখলে ইচ্ছে করে ওদের মুণ্ডু দিয়ে ফুটবল খলি।'

রাতুল হেসে বললো, 'তাহলে তোমাকে কয়েক শ' বছর আগে ইংল্যাণ্ডে জন্মাতে হতো!'

'কেন?' অবাক হয়ে জানতে চাইলো নবু।

'চামড়ার ফুটবল আবিষ্কারের আগে ইংল্যাণ্ডে মড়ার খুলি দিয়ে ফুটবল খেলা হতো। শত্রুদের খুলি দিয়ে ওরা ফুটবল খেলতো।'

'এ কথা কখনো শুনি নি তো! তুমি জানলে কিভাবে?'

'বইয়ে পড়েছি। ফুটবল না খেললেও খেলার খোঁজখবর কিছু রাখি।' এই বলে রাতুল নবুকে তাড়া লাগালো, 'নাও উঠো এবার। ক্ষিদে পেয়েছে।'

মুখ-হাত ধুয়ে ওরা নিচে নেমে দেখলো, বৈঠকখানায় বসে মোটাসোটা দারোগা নিয়ম মাফিক জেরা করছে। টেবিলে বিস্তর খাবার। আবেদালি বিগলিত হয়ে- এটা খান, ওটা খান করছে। আর দারোগা খেতে খেতে হুঙ্কার ছাড়ছে—'বল তুই কোথায় ছিলি?'

দারোগার সামনে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছে শুঁটকো লিকপিকে একটা লোক! নবু বললো, ওটা নাকি ধলাপাগলা। রাতে ওদের নিচের বারান্দায়

ঘুমোয়।

নাদুখালা মাথায় কাপড় টেনে একপাশে একটা চেয়ারে বসেছিলেন। এক সময় বিরক্ত হয়ে বললেন, 'ও পাগল-ছাগল মানুষ, ওর ওপর এতো হম্বিতম্বি কেন বাছা! এ্যাদ্দিন পর এসেছো ভালোমন্দ যা কিছু আছে খেয়ে যাও। গয়না পেতে হলে পোদ্দার পাড়ায় নজর রাখো।'

নাদুখালার কথা দারোগার পছন্দ হলো না—'আপনি জানেন না খালা, এরা পাগল সেজে থাকে। আর এ্যাদ্দিন পর বলছেন বুঝি! চৌধুরীদের বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে—গত এক মাসে যাবার সময় পেয়েছি! রোজ যদি এলাকায় একটা-দুটো খুন আর চার-পাঁচটা ডাকাতি হয়—কয় জায়গায় হাজিরা দেয়া যায় আপনিই বিবেচনা করুন।' এই বলে আবার ধলাপাগলাকে ধমক— 'বল তুই কোথায় ছিলি?'

নাদুখালা উঠে দাঁড়ালেন—'আমাকে যদি বিবেচনার ভার দাও তাহলে এমন কথা বলবো বাছা, তোমাদের একটুও পছন্দ হবে না। তাই বিবেচনার কথা আর বলছি না। জেরা-টেরা সেরে দুপুরে খেয়ে যেও। গয়না না পাই, তবু যে এসেছো একি কম ভাগ্য!'

দারোগা একগাল হেসে বললো, 'আপনি খালা মিছেমিছি রাগ করছেন। আমরা আপনাদের বাড়ির ছেলের মতো। যখন বলবেন তখনই খেতে বসবো। তবে চোর আপনাকে ঠিকই ধরে দেবো।' এরপর আবার ধলাপাগলাকে—'বল তুই কোথায় ছিলি?'

রাতুলের হাত ধরে ওকে পেছনের পুকুরঘাটে নিয়ে এলো নবু। বললো, 'নসু দারোগার বল তুই কোথায় ছিলি—শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। রবি বসে বসে ওর জেরা শুনুক। আমরা বরং বড়শি দিয়ে মাছ ধরি।'

মাছ ধরার ব্যাপারে রাতুলের উৎসাহের অন্ত নেই। দুপুর পর্যন্ত ওরা দু'জন মিলে গোটা তিরিশেক বড় বড় ট্যাংরা আর পাবদা ধরলো। নবু আড়াই সেরি একটা শোল মাছও ধরেছে। রবি তখনো বৈঠকখানায় বসে নসু দারোগার জেরা করা দেখছে।

বিকেলে রবিকে নিয়েই নৌকা নিয়ে বেরুতে হলো। আবেদালি আসে নি। ও গেছে এক কাঁদি ডাব আর দুটো কলার ছড়া নিয়ে দারোগার সঙ্গে, লঞ্চে তুলে দেবে বলে।

জেরা করে কিছু বের করতে না পেরে যাওয়ার সময় নসু দারোগা ধলাপাগলাকে কোমরে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে গেছে। ও নাকি খুব ফেরোশাস টাইপের লোক। নাদুখালা অবশ্য পই পই করে বলে দিয়ছেন, 'যদি শুনি ধলাকে থানায় নিয়ে মারধার করেছো, আমি তোমার নামে কেস করবো।'

দারোগা রহস্য হেসে বলেছে, 'মারধোর করবো কেন! দেখবো শুধু ওর

জামিনের জন্য কারা আসে।'

নৌকা চালাতে চালাতে নবু বললো, 'নসু দারোগার তদন্ত করার বহর দেখেছো! দু'দিন পর মা আর খালার তাড়া খেয়ে বেনুদাই তো যাবেন ধলাপাগলাকে আনতে।'

রবি বললো, 'আমাদের মসজিদের হুজুর বলেছে, ধলাপাগলা নাকি জ্বীন দেখে পাগল হয়ে গেছে। এখনও নাকি ওর কাছে জ্বীনরা আসে। নসু দারোগা এবার টের পাবে মজাটা।'

রবির কথা শুনে রাতুলও মনে মনে হাসলো। রাতে রবিকে যে মজা টের পাওয়ানোর প্ল্যান ওরা করেছে সেটা যদি ও জানতো!' রাতুলের মনের খবর জানতে পেরে নবু ওকে চোখ টিপলো। হাসি চেপে রাতুল আকাশের দিকে তাকালো। রবি বললো, 'কতো বক দেখেছিস!'

রাতুল গম্ভীর হয়ে বললো, 'কে জানে ওগুলো সত্যি সত্যি বক কিনা। জ্বীনরা তো বকের ছবি ধরেও ওভাবে একপায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে!'

রবি রাগতে গিয়ে হেসে ফেললো—'যখন ঘাড় ঘটকাবে তখন টের পাবি!'

রাতে যথারীতি বেনুদাদের আত্মীয়-স্বজনরা এসেছে নতুন বউ দেখার জন্য। গত ক'দিন ধরে রোজ এরকম হচ্ছে। ওদের ছেলেমেয়েদের চ্যাঁচামেচি, কাজের লোকদের ছুটোছুটি আর হাঁকডাকে বাড়ি জমজমাট। সবাই নিচের তলায় ব্যস্ত। রাতুল এক ফাঁকে রবিকে ডেকে বললো, 'সকালে মাছ ধরতে গিয়ে আমড়া গাছের তলায় কোথায় যেন আমার স্যাণ্ডেল জোড়া ফেলে এসেছি। চল না ভাই, আমার সঙ্গে খুঁজবি।'

রবি ওকে এড়াবার জন্য বললো, 'নবুকে নিয়ে যা না। বড় কাকার শ্বশুর বাড়ির লোকরা এসেছে। আমাকে ওদের কাছে থাকতে হবে যে!'

রাতুল বললো, 'নবু বিমলদের বাড়ি গেছে। তুই চল না! কতোক্ষণ আর লাগবে!'

'তাহলে আবেদালিকে ডেকে দি। আসলে রাতে আমি আমড়া তলায় যাবো না।' এই বলে রবি গেলো আবেদালিকে ডাকতে।

রাতুল মনে মনে প্রমাদ গুণলো। আবেদালি সঙ্গে থাকলেও রবি যদি না যায় তাহলে তো সব প্লান মাটি! ভাগ্য ভালো রাতুলের! আবেদালিকে অনেক ডাকাডাকি করেও কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না! নাদুখালা বললেন, 'ক'দিন ধরে দেখছি গরু তুলে আবেদালি কোথায় যেন আড্ডা মারতে যায়। আসুক আজ, ওর আড্ডা মারা বের করছি।'

রাতুল একটু বিরক্ত হয়ে রবিকে বললো, 'ঘর ভর্তি এতো লোক। তবু তুই ভয়ে সিঁটিয়ে আছিস! এতো যদি ভয় তাহলে আসার সময় আমাকে বারণ করলে পারতি! বেনুদাকে বলে কালই আমি চলে যাবো। থাক তুই তোদের জ্বীনভূত

নিয়ে। কাউকে কোথাও যেতে হবে না।'

রাতুল একবার রেগে গেলে সহজে যে ওর রাগ ভাঙানো যায় না—রবি খুব ভালো করেই জানে। আমতা আমতা করে বললো, 'আমি কি তাই বলছি! চল কোথায় যাবি। দাঁড়া, টর্চটা নিয়ে আসি।'

বেনুদার ঘর থেকে টর্চ এনে রবি এসে রাতুলের হাত ধরলো—'তুই মিছেমিছি রাগ করছিস। চল যাই।'

রবিদের বাড়ির খিড়কিপুকুরের কাছেই কয়েকটা আমড়া গাছ ঘন হয়ে বেড়ে উঠেছে। জোরে ডাকলে বাড়ি থেকে শোনা যায়। এটুকু পথ যেতে রবি শক্ত করে রাতুলের হাত আঁকড়ে ধরেছে। মনে মনে বেদম হাসছিলো রাতুল।

নবু আগে থেকেই একটা সাদা লুঙ্গি পরে, সাদা চাদরে গা মুড়ি দিয়ে আমড়া তলায় বসেছিলো। রবিই প্রথম দেখলো ওকে। দাঁড়িয়ে পড়ে ফিসফিস করে বললো, 'ভালো করে দেখ তো, সাদা মতো কি যেন দেখা যাচ্ছে ওখানটায়!'

রাতুল ভালো করে দেখার ভান করে বললো, 'কোথায় সাদা মতো কি দেখছিস? ওখানে কিছুই নেই।'

'আহ্, ভালো করে দেখ না! ওই গাছ দুটোর আড়ালে।'

'তোর চোখ খারাপ হয়েছে নাকি! সারাক্ষণ মাথায় ওসব ঘোরে—আমার স্যাণ্ডেল না খোঁজার ফন্দি খাটাচ্ছিস বুঝি! তখন বললেই পারতি! না, এখানে এসে যতো উল্টোপাল্টা কথা!'

রাতুলের কথা শুনে রবির ভয় আরো বেড়ে গেলো। ও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, অথচ রাতুল দেখছে না— তার মানে ওসব না হয়ে যায় না। ওদের যে সবাই দেখতে পায় না এ কথা তো জানাই আছে। রাতুল অবিশ্বাসী বলে ওকে ওরা দেখা দিচ্ছে না। মনে মনে তিনবার কুলহুয়াল্লা পড়ে বুকে তিনবার ফু দিলো রবি। তারপর শুকনো গলায় রাতুলকে বললো, 'চল তাহলে।' ও ধরে নিলো কাছে গেলে বুঝি ওটা বাতাসে মিলিয়ে যাবে।

না, ওটার অদৃশ্য হওয়ার কোনো লক্ষণই দেখা গেলো না। রবির পা দুটো সিসার মতো ভারি মনে হলো। বুকের ভেতর কেউ যেন ধপধপ করে ঢেঁকি কুটছে। অথচ রাতুল নির্বিকার হেঁটে যাচ্ছে।

নবু আর রাতুল প্ল্যান করেছিলো, রবিকে এনে দেখাবে—কেউ ইচ্ছে করলে সারারাত বাগানের অন্ধকারে একা থাকতে পারে, ভয়ের কিছু নেই। আমাড়া গাছের কাছে এসে রাতুল যেই রবিকে বলতে যাবে—'দ্যাখ, কাকে দেখে তুই কি ভাবছিস...' তখনই নবু হাঁড়ির ভেতর মুখ নিয়ে খোনা গলায় বললো, 'এঁলে নাঁকি তোঁমরা! কঁতদিন মাঁনুষের রঁক্ত খাঁই নাঁ।'

নবু যে এমন শয়তানি করবে রাতুর ভাবতেই পারে নি। তাই ও নিজেও চমকে উঠলো। আর রবি সঙ্গে সঙ্গে টর্চ ফেলে দুই হাতে রাতুলকে জড়িয়ে

ধরে—'ও মা গো! বাবা গো, খেয়ে ফেললো গো!' বলে বিকট চিৎকার।

রবির এই চিৎকারের পরিণতির কথা ভেবে রাতুল ভয়ে কাঠ হয়ে গেলো। ওকে কোনো কথা বলার সুযোগই পেলো না।

চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির ভেতর থেকে সবাই হারিকেন হাতে—'কী হলো, কী হলো,' বলে ছুটে এলো। কারো হাতে লাঠিও। সবাই মিলে হাজারটা প্রশ্ন।

জবাবে রবি শুধু বললো, 'ভূত!' ওর চোখের দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত।

'কোথায়?'

রবি আমড়া গাছের দিকে আঙুল তুলে দেখালো। সবাই হারিকেন তুলে দেখলো, কোথাও কিছু নেই। রাতুলকে কে যেন প্রশ্ন করলো, 'ছোড বেআই, তুই দ্যাখছো?'

রাতুল ঢোক গিলে মাথা নাড়লো।

হঠাৎ একজন বললো, 'আমবাগানে দ্যাহো তো, কেডা জানি হাডে?'

'কোই, কোনহানে?' কোরাসে বললো সবাই।

দূরে আমবাগানে দেখা গেলো আবছা সাদা কি যেন একটা হেঁটে যাচ্ছে গোরস্থানের দিকে। একজন বললো, 'চোর-ডাহাইতে হইতে পারে। লও গিয়া দেহি!'

ভিড়ের ভেতর গুঞ্জন উঠলো। কেউ যেতে চায় না। পেছনে যারা ছিলো, তারা গুটি গুটি পায়ে বাড়ির দিকে গেলো। একজন বললো, 'নইমদ্দি, মোর লগে লও দেহি, কেডা?'

নইমুদ্দি চিঁচিঁ করে বললো, 'মোর কোমরে বাত। সালাইম্মারে লইয়া যাও।'

সালাম বললো, 'ক্যা সালাইম্মা ক্যা? মোর কি জানের ডর নাই?'

শেষ পর্যন্ত চারজন সাহসী লোক লাঠি হাতে হারিকেন নিয়ে আমবাগানে ঢুকলো। বাকি সব দাঁড়িয়ে রইল, পুকুরঘাটের পাশে। কিছুক্ষণ পর ওরা ফিরে এসে বললো, সাদা মতো ওটা নাকি রাজবাড়ির দিকে যেতে যেতে হঠাৎ বাতাস মিলিয়ে গেছে।

একথা শুনে কয়েকজন বিড়বিড় করে দোয়া-দরুদ পড়তে লাগলো। সবার সঙ্গে রাতুলকেও ঘরে ফিরতে হলো। নবু আমবাগানে রয়ে গেছে একথা ওর বুকের ভেতর খচমচ করতে লাগলো। রবির ওপর এতো রাগ হলো যে ওর সঙ্গে কথা বলতেই ইচ্ছে হচ্ছিলো না।

রাতে খাওয়ার সময়ও নবু এলো না। রাতুল মনে মনে হিসেব করলো দু'ঘন্টা পেরিয়ে গেছে। ওকে আর রবিকে খেতে দিয়ে নাদুখালা বললেন, 'নবু কোথায়?'

রবি বললো, 'বিমলদের বাড়ি গেছে।'

নাদুখালা বিরক্ত হলেন—'তবেই হয়েছে। ও বাড়িতে গেলে ওর আর ফেরার

কথা মনে থাকে না। তোমরা খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়ো গে। রাত অনেক হয়েছে।'

খাওয়ার পর রবিকে কিছু না বলেই রাতুল ওর ঘরে চলে এলো। একটা চেয়ার টেনে দক্ষিণের জানালার কাছে বসলো। খিড়কিপুকুরের পশ্চিমে আমবাগান, জানালা থেকে দেখা যায়। নবু নিশ্চয় এতোক্ষণে কোথাও চলে গেছে। রাতুলের রাগ হচ্ছিলো রবির ওপর। এভাবে না চ্যাঁচালেই কি চলতো না? ভয়ে যদি মূর্ছা যেতো তাহলেও রক্ষা ছিলো। তা নয়, ষাঁড়ের মতো চ্যাঁচাতে লাগলো! নবু ফিরে আসুক। রবিকে ভালোমতো জব্দ করতে হবে।

কিছুক্ষণ পর রবি এলো। রাতুলের চেহারা দেখে আগেই বুঝেছে, ও যে রাগ করে আছে। ততোক্ষণ খাটের ওপর চুপ করে বসে রইলো। মনে মনে চাইছিলো রাতুল কিছু বলুক। ওকে ওভাবে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে না পেরে বলেই ফেললো, 'তুই কি সত্যিই ভয় পেয়েছিস? আমি তো তোকে আগেই বলেছিলাম আমড়াতলায় কি যেন বসেছিলো। ওরা যে সত্যি সত্যিই আছে—কথা শুনে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেছিস! শুধু আমরা কেন, অন্য সবাইও তো দেখেছে।'

রাতুল ওকে ধমক দিয়ে বললো, 'বাজে বকিস না তো!'

রবি মাথা নিচু করে বসে রইলো। নাদুখালা ওদের জন্য দুধ নিয়ে এলেন। বললেন, 'তোমরা আর নবুর জন্য রাত জেগো না। বিমলদের বাড়ি গেলে ও অনেক সময় থেকে যায়। যেতে হয় পুরোনো গোরস্থানের পাশ দিয়ে। তাই ওকে বারবার বলে দিয়েছি বিমলদের বাড়ি রাত হয়ে গেলে ওখানে থেকে যাস। তোমরাও তো কি-সব দেখলে। না ফিরে ভালোই করেছে ছোঁড়া। দুধটুকু খেয়ে শুয়ে পড়ো।'

টেবিলে রাখা দুধ টেবিলেই পড়ে রইলো। রাতুল ফিরেও তাকালো না। রবি একবার বললো, 'দুধ খাচ্ছিস না? ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

রাতুল ওর কথার জবাব দিলো না। দেয়াল ঘড়িতে বারোটার ঘন্টা বাজলো। নবু এখনো এলো না—এই একটা কথাই সারাক্ষণ ওর মাথার ভেতর ঘুরছে। একবার ওর মনে হলো, নবুর কোনো বিপদ হয় নি তো! জ্বীন ভূতের কথা বাদ দিলেও সাপ-খোপের ভয় তো আছে! যদি ডাকাতের খপ্পরে পড়ে? অন্ধকার গোরস্থানে একা নবুও তো ভয় পেতে পারে? এসব কথা ভাবতে গিয়ে রাতুলের বুকের ভেতরটা শিরশির করতে লাগলো। চোখ জ্বালা করে কান্না এলো। কাল রাতে এই সময় ওরা দু'জন বারান্দায় বসে গল্প করছিলো। নবু ওর হাতে হাত রেখে বলছিলো, 'রাতুল ঢাকা গিয়ে আমাকে ভুলে যাবে না তো? রাতুল জবাব দিয়েছিলো, 'যতোদিন বেঁচে থাকবো, ততোদিন তোমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু থাকবো।' নবুকে পেয়ে রাতুলের মনে হয়েছে এতোদিন ওর মতো একজন বন্ধুর অপেক্ষায় ছিলো ও। নবুর সঙ্গে পরিচয়ের আগে রবি ছিলো ওর সবচেয়ে কাছের বন্ধু। মাত্র কয়েকদিনের ভেতর রবির কাছ থেকে ও দূরে সরে গেছে। বারবার

মনে হচ্ছে আর বুঝি কোনোদিন নবুকে দেখবে না। রাতুল টেরও পেলো না—চোখের পানিতে ওর গাল ভেসে যাচ্ছে।

রবি উঠে এসে কাঁদো কাঁদো গলায় বললো, 'রাতুল তোর মন খারাপ কেন? কি হয়েছে তোর, আমাকে বলবি না? তোর জন্য আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে।'

কান্না সামলে রাতুল বললো, 'তোকে একট কথা বলবো। আগে বল কাউকে ঘুণাক্ষরেও বলবি না?'

রাতুলের কাঁধে হাত রেখে রবি বললো, 'তোর গা ছুঁয়ে বলছি, কাউকে কিছু বলবো না। কি হয়েছে বল।'

রাতুল আস্তে আস্তে বললো, 'আমড়াতলায় তুই যাকে ভূত ভেবেছিলি, ওটা ভূত নয়— নবু।'

'বলিস কি!' চমকে উঠলো রবি।

'হ্যাঁ রবি।'

'নবু তাহলে বিমলদের বাড়ি যায় নি?'

'না।'

'তোরা দু'জন মিলে আমাকে ভয় দেখাতে চেয়েছিলি?'

'ভয় দেখাতে নয়, তোর ভয় ভাঙাতে চেয়েছিলাম। তুই যে চেঁচিয়ে এমন কাণ্ড বাঁধাবি কে জানতো।!'

'আমি কি জানতাম ওটা নবু! 'আমি তো সত্যি সত্যি ভয় পেয়েছিলাম।'

বিরক্ত হয়ে রাতুল বললো, 'এবার তো ভয় ভেঙেছে। যা, ঘুমোতে যা।'

'তুই ঘুমোবি না?'

'আমি পরে ঘুমোবো।'

রবি কোনো কথা না বলে বিছানার ওপর থেকে একটা কাঁথা এনে রাতুলের গায়ে জড়িয়ে দিলো। খোলা জানালা দিয়ে হু হু করে কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকছে। রাতুলের গায়ে জামার ওপর পাতলা হাতকাটা একটা সুয়েটার মাত্র।

রবি ওর গায়ে কাঁথা জড়িয়ে দেয়ার পর রাতুল টের পেলো এতোক্ষণ খোলা জানালার পাশে বসে থেকে ওর হাত-পা সব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। এই শীতের ভেতর নবুর গায়ে কোনো সুয়েটার নেই, শুধু একটা খদ্দরের চাদর গায়ে দিয়ে বসেছিলো ও। কথাটা ভাবতে গিয়ে আবার কান্না পেলো রাতুলের।

রবি ওর কাছে একটা চেয়ার টেনে এসে বসলো। কিছুক্ষণ পর সমবেদনা ভরা গলায় বললো, 'তুই কি নবুর কথা ভাবছিস রাতুল?'

রবির মুখের দিকে তাকালো রাতুল। রবিকে আর দূরের মনে হলো না। রবি ঠিকই বুঝতে পেরেছে রাতুল কি ভাবছে।

রবি দেখলো রাতুলের দু'চোখে কান্নার দাগ। বললো, 'এতো ভাবছিস কেন রাতুল! নবু বুদ্ধিমান ছেলে। এতো গণ্ডগোল দেখে ও ইচ্ছে করেই বাড়ি ফেরে

নি। ও তো সত্যি সত্যি বিমলদের বাড়ি যেতে পারে।'

কথাটা রাতুলেরও মনে হয়েছিলো একবার। মনে মনে ভাবলো, রবির কথাই যেন সত্যি হয়। তারপর আবার মনে হলো, নবু বলেছিলো ফিরে এসে রবিকে বলবে, 'হানাবাড়ির অতৃপ্ত আত্মা কেমন দেখলি বল!' রবিকে নিয়ে রগড় করার এতোবড় একটা সুযোগ কি ও ছেড়ে দেবে? বললো 'ও বিমলদের বাড়ি যাবে একথা বলে নি।'

'হৈচৈ দেখে ঘাবড়ে গেছে নিশ্চয়ই। ধরা পড়লে ওর কি অবস্থা হতো ভেবে দেখেছিস?'

হতেও পারে। মনে মনে ভাবলো রাতুল। বললো, 'সকালের ভেতর নবু না ফিরলে আমি একাই তোদের হানাবাড়ি যাবো ওকে খুঁজতে।'

রবি কিছুক্ষণ হাত ধরে বসে রইলো। তারপর শান্ত গলায় বললো, 'তুই যদি একা যেতে পারিস আমিও তোর সঙ্গে যেতে পারবো।'

রবির কথা শুনে রাতুল কিছুটা হালকা বোধ করলো। দেয়াল ঘড়িতে ঢং করে একটা বাজলো। রবি বললো, 'এবার শুতে চল রাতুল।'

বিপদের বেড়াজালে আটকে পড়ছে নবু

আমড়াতলায় রবির মরণ চিৎকার শুনেই নবুর মনে হয়েছিলো মাটির হাঁড়ির ভেতর মুখ ঢুকিয়ে বিকট শব্দে কথা বলাটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। আসলে এটা ওদের প্ল্যানের ভেতরও ছিলো না। তবে ঘটনা যা ঘটার ছিলো ঘটে গেছে। এরপর পালানো ছাড়া আর কোনো পথ সামনে খোলা নেই। নবুকে সেই পথই নিতে হলো। রবিকে বলার সময়ও পেলো না, ও যে মিছেমিছি ভয় পেয়েছে।

আমবাগানের ভেতর দিয়ে হেঁটেই যাচ্ছিলো নবু। প্রথমে ভেবেছিলো ওর পেছনে আসার সাহস কারো হবে না। আমবাগান পেরিয়ে পুরোনো গোরস্থানে ঢুকতেই পেছনে দেখলো চার-পাঁচজন লোক ওর দিকে আসছে। আর ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না ভেবে দৌড় লাগালো নবু।

অনেকখানি জায়গা জুড়ে পুরোনো গোরস্থান। গাছপালা বেশ ফাঁকা ফাঁকা।

মানুষ সমান ছনঘাসে ঢাকা। পৌষ মাসের শেষে ছন শুকিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়েছে। ভয়ে কেউ কাটতেও আসে না। কোথায় রাস্তা, কোথায় কবর অন্ধকারে কিছু ঠাহর হচ্ছিলো না নবুর।

গোরস্থানের ভেতর দৌড়ে পালাতে গিয়ে হঠাৎ খেয়াল হলো ও কোন দিকে যাচ্ছে? তখনো চাঁদ না উঠলেও পৌষের পরিষ্কার আকাশে ছিলো লক্ষ তারার মেলা। নবু তারার ফ্যাকেসে আলোয় দেখলো ও রাজবাড়ির দিকে দৌড়াচ্ছে। চমকে উঠলো সে। এদিকে তো যাওয়ার কথা নয়। বিমলদের বাড়ির উল্টো দিকে। মনে হলো যেন ও নিজে থেকে যাচ্ছে না, কোনো অদৃশ্য শক্তি ওকে টানছে কয়েক শ' বছরের পুরোনো অভিশপ্ত বাড়িটার ধ্বংসস্তুপের দিকে। নবুর মনের ভেতর কে যেন বললো, 'ওদিকে যেও না। বিপদ আছে।'

নবু জানে বিপদে পড়লে সবার আগে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়। প্রথমে থমকে দাঁড়ালো ও। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে চাইলো, এখন কি করবে। ঠিক তখনই নবু শুনলো, ভেতর থেকে আবার যেন ওকে কেউ বলছে, 'এখানে দাঁড়াবে না, পালিয়ে যাও।'

প্রথমে নবু ঠিক করলো বিমলদের বাড়ির দিকে যাবে। পরে ভাবলো যা হবার হবে ওদের বাড়িতেই ফিরে যাবে। রান্নাঘর দিয়ে ঢুকলে কেউ টেরও পাবে না। একথা ভেবে যেই ডানদিকে ঘুরতে যাবে অমনি চারপাশ থেকে সাদা কুয়াশা এসে ওকে ঘিরে ধরলো। ভীষণ অবাক হলো নবু। এতোক্ষণ আকাশ ছিলো পরিষ্কার। কুয়াশা ছিলো খুবই হালকা। হঠাৎ কুয়াশা এতো ঘন হয়ে গেলো কি করে? শুধু কুয়াশা নয়, যেন ঠাণ্ডা বাতাস বরফের মতো জমাট বেঁধে ওকে চেপে ধরতে চাইছে। মনে হলো ঠাণ্ডায় জমে যাবে ও। কুয়াশা এতো ঘন যে নিজের হাত-পা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। কুয়াশার সঙ্গে সঙ্গে ওর বুকের ভেতর ভয়ও জমতে লাগলো। এখান থেকে কি কখনো বেরুতে পারবে না? নবু আবার অনুভব করলো সেই অদৃশ্য শক্তি ওকে হানাবাড়ির দিকে টানছে।

না, হতে পারে না। মনের ভেতরে সাহস আনলো নবু। রাতুল ওর জন্য অপেক্ষা করছে। ও ফিরে না গেলে রাতুলের ঘুম হবে না। রবির ভয় ভাঙবে না। এই রাতে একা হানাবাড়িতে ও যাবে না। মনে মনে বললো, 'আমি তোমাদের ভয় পাই না। এখন আমি বড়ি ফিরে যাবো।'

নবু পেছন ফিরে এক পা দু'পা করে বাড়ির দিকে এগোতে গিয়ে অনুভব করলো, ওর পা দুটো এত ভারি মনে হচ্ছে যে কোনদিনই বাড়ি ফিরতে পারবে না। নিয়মিত ফুটবল খেলে নবু। একবার মনে হলো বেমক্কা দৌড়াতে গিয়ে মাসল পুল হয়েছে। খেলার সময় মাঝে মাঝে এরকম হয়। ভাবলো আর দৌড়ে কাজ নেই, হেঁটেই যাবে, ঘরে গিয়ে একটু ম্যাসেজ করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো এটা মাসল পুল নয়। সেরকম হলে ব্যথা লাগতো।

ওর পায়ে কোনো ব্যথা নেই। তবে পা দুটো ঠিক নিজের মনে হচ্ছে না। যেন অন্য কারো পায়ের উপর ভর দিয়ে হাঁটছে ও।

'বাড়ি ফিরে যেতেই হবে।' মনে জোর আনার জন্য দাঁতে দাঁত চেপে বললো নবু। আরো কয়েক পা এগোলো। মাটিতে শোয়া শুকনো ছন আর কাঁটাঝোপের জন্য হাঁটতে আরো অসুবিধে হচ্ছে। তখনো কুয়াশার দেয়াল ওকে ঘিরে রেখেছে। পৃথিবীর কোনো শব্দ ওর কানে আসছে না। যেন অন্য কানো গ্রহে এসে পড়েছে ও।

প্রাণপণ শক্তিতে পা দুটোকে টেনে নিয়ে আরো দু'পা এগোলো নবু। তৃতীয়বার পা ফেলতে গিয়েই বুঝলো ভুল জায়গায় পা ফেলেছে। কিন্তু কিছুই করার নেই। কলজের ভেতরটা ধক করে উঠলো। পুরোনো কোন ভাঙা কবর হবে বোধ হয়। পা ফেলতেই কে যেন টেনে নিচে নিয়ে গেলো ওকে। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারালো ও।

যেটাকে পুরোনো কবর ভেবেছিলো ওটা আসলে ছিলো একটা পরিত্যক্ত কুয়ো। পানি বহু আগেই শুকিয়ে গেছে। তলায় শুকনো ঘাস পাতার স্তূপ জমাতে তেমন কোনো আঘাত লাগে নি ওর। কয়েক মিনিটের ভেতর ওর জ্ঞান ফিরলো। হাতের কনুই দুটো ঘষা লেগে ছড়ে গেছে। পড়ার সময় অবচেতন মনে গর্তের পাড় ধরতে গিয়ে এমনটি হয়েছে। কনুইতে চিনচিনে ব্যথা ছাড়া আর কোথাও কোনো ব্যথা নেই। মাথাটা শুধু ঝিমঝিম করছিলো।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে হাত-পা নেড়ে দেখলো নবু, সব ঠিক আছে। ওপরে তাকিয়ে দেখলো আঠারো উনিশ হাত গভীর হবে গর্তটা। পড়ে যাওয়ার সময় ঘাস সরে যাওয়াতে গর্তের মুখের এক কোণে একটুখানি কালো আকাশ দেখা যাচ্ছিলো। চারপাশে হাতড়িয়ে দেখলো, গর্তের দেয়ালে ইটের গাঁথনি। বহুদিনের অব্যবহার ফাঁকে ফাঁকে ঝোপঝাড় গজিয়ে শুকিয়ে খড় হয়ে গেছে।

হঠাৎ নবুর খেয়াল হলো ওর জামার সাইড পকেটে দেয়াশলাই থাকার কথা। সঙ্গে সঙ্গে পকেটে হাত দিয়ে দেখলো ওটা জায়গা মতোই আছে। বের করে একটা কাঠি জ্বালালো। হিসেব করে খরচ করতে হবে। মাত্র অল্প ক'টা কাঠি আছে।

দেয়াশলাইর আলোয় চারপাশের কয়েক হাত অন্ধকার কেটে গেলো। হাতে ছ্যাঁকা না লাগা পর্যন্ত জ্বলন্ত কাঠিটা ধরে রাখলো নবু। আবছা আলোয় দেখলো ওর বাঁ পাশে দেয়ালের গায়ে একটা সুড়ঙ্গের মতো চলে গেছে। কুয়োর মুখের চেয়ে সরু, মাথা নিচু করে ঢুকতে হবে। সুড়ঙ্গের মুখে পা রেখে আরেকটা কাঠি জ্বালালো নবু। সুড়ঙ্গের চারপাশে কুয়োর মতো ইটের গাঁথুনি। সম্মোহিতের মতো অদৃশ্য কোনো শক্তির আকর্ষণে নবু সুড়ঙ্গের ভেতর ঢুকে গেলো।

ভেতরে অন্ধকার নিরেট কালো পাথরের মতো। দেয়াশলাইর তৃতীয় কাঠিটা

নিভে যাওয়ার পর নবু ঠিক করলো আর কাঠি খরচ করবে না। সুড়ঙ্গের দেয়ালে এক হাত রেখে আরেক হাত সামনে বাড়িয়ে অন্ধকার ভেদ করে সে এগিয়ে চললো।

অনেক লম্বা সুড়ঙ্গ। প্রথম দিকে দেয়াল শুকনো ছিলো। মিনিট দশেক পর হাতে ভেজা ভেজা লাগলো। নবুর মনে হলো আস্তে আস্তে যেন ওপরের দিকে যাচ্ছে। আরো কিছুদূর যাওয়ার পর দেয়াল শেষ হলো। নবু চতুর্থবার দেয়াশলাই জ্বালালো। দেখলো, বাঁ দিকে সুড়ঙ্গের একটা শাখা চলে গেছে। সামনের অংশ আস্তে আস্তে ওপরের দিকে উঠে গেছে। নবু বাঁ দিকে ঘুরলো। দেখলো এই অংশটা বেশ পরিষ্কার। আলো নিভে যাওয়ার পর আবার আগের মতো ঘোরের ভেতর সামনে এগিয়ে গেলো। তখন ওর নিজের বাড়ি-ঘর, রাতুল, রবি কারো কথাই মনে নেই। অদৃশ্য থেকে কে যেন নিঃশব্দে ওকে ডাকছে 'আয় আয়' বলে।

আরো মিনিট দশেক হাঁটার পর একটা পচা গন্ধ ওর নাকে এসে লাগলো। প্রথমে কম ছিলো, যতো সামনে এগোলো, গন্ধটা ততো বাড়তে লাগলো। শেষে এমন হলো যে দুর্গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইলো। নাকে চাদর চেপে কিছুটা পথ যাওয়ার পর আবার সুড়ঙ্গের দেয়াল শেষ হলো। নিঃশ্বাস বন্ধ করে নবু দেয়াশলাইর কাঠি জ্বালালো। বাঁ পাশে দেখলো একটা কুয়োর মতো, হাত দশেক ওপরে খোলা মুখ দিয়ে নক্ষত্রের আবছা আলো ভরা আকাশ দেখা যাচ্ছে। কুয়োর তলায় নজর পড়তেই নবুর হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেলো। সে এক বীভৎস দৃশ্য। দেয়াশলাইর কাঠিটা ওর অজান্তেই হাত থেকে পড়ে গেলো।

যতোটুকু দেখার এরই ভেতরে নবুর দেখা হয়ে গেছে। পাঁচ-ছ'হাত নিচে কুয়োর তলায় কয়েকটা মানুষের কঙ্কাল। দুটোর গায়ে এখনো এখনে—সেখানে মাংস লেগে আছে। কয়েকটা ছুঁচো আলোর আভাস পেয়ে চিকচিক করে ছুটোছুটি করতে লাগলো। আবার দেয়াশলাই জ্বালালো নবু। না, চেনার কোনো উপায় নেই। একটাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলা হয়েছিলো। দেখে মনে হয় পাঁচ-ছ'মাস আগের ফেলা। সামনে তাকিয়ে দেখলো সুড়ঙ্গটা ডান দিকে মোড় নিয়েছে।

নিজেকে আর সামলে রাখতে পারলো না। সেখানে বসেই হড়হড় করে বমি করে ফেললো নবু। তারপর নাক চেপে টলতে টলতে সামনের দিকে এগিয়ে গেলো। দুর্গন্ধটা আস্তে আস্তে কমে এলেও নবুর মনে হলো নাকের ওপর থেকে চাদর সরালেই বুঝি ওটা ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

আচ্ছন্নের মতো আরো কিছুটা পথ যাওয়ার পর নবু হঠাৎ চমকে উঠলো। দূরে সুড়ঙ্গের দেয়ালে একা জ্বলন্ত হারিকেন ঝোলানো। সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়ালো সে।

হারিকেন যেখানে ঝোলানো সেখানে সুড়ঙ্গটা দুটো শাখায় ভাগ হয়ে গেছে। ঝোলানো হারিকেনের একটাই অর্থ—কাছাকাছি মানুষ আছে। আর তারা যে খারাপ মানুষ, এটা বলার অপেক্ষা রাখে না।

'কারা থাকে এখানে?' মনে মনে প্রশ্ন করলো নবু। উত্তর পাওয়ার জন্য আস্তে আস্তে সামনে এগিয়ে গেলো। হারিকেনের কাছে এসে দেখলো বাঁ দিকের সুড়ঙ্গ অন্ধকার, ডান দিকে পনেরো হাত দূরে আরেকটা হারিকেন জ্বলছে। এবার কোন দিকে যাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ভাবলো নবু। ওর নিজের উপস্থিতি ওদের টের পেতে দেবে না। তবে এখান থেকে বেরুবার আগে জানতে হবে এরা কারা! নবু মাথার ওপর ঝোলানো হারিকেনটা আস্তে নিভিয়ে দিলো। দূরের অন্ধকার থেকে কেউ ওকে দেখে ফেলতে পারে। এতোক্ষণ যেরকম ঘোরের ভেতর ছিলো সেটা কেটে গেছে ওর। উত্তেজনায় বুকটা ঢিবঢিব করছে। পা টিপে টিপে ডান দিকের সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে সামনে এগিয়ে গেলো নবু।

হারিকেন ওপরে ঝোলানো থাকায় ওটার তলায় অন্ধকার ছিলো। আলোর কাছাকাছি এসে নবু মাথা নিচু করে হাঁটলো যেন ওর গায়ে আলো না পড়ে। দ্বিতীয় হারিকেনের তলায় এসে সেটাও নিভিয়ে ফেললো।

এরপর সুড়ঙ্গ আবার ডান দিকে বাঁক নিয়েছে। তবে এখন আর ওটাকে সুড়ঙ্গ বলা যাবে না। দু'পাশে দেয়াল, ওপরে ছাদ। দেয়ালের আস্তর খসে ইট বেরিয়ে পড়লেও সেখানে ঝোপঝাড় গজায় নি। নিয়মিত লোকজন চলাফেরা করলে যা হয়।

কিছুদূর যেতেই মানুষের গলা শোনা গেলো। নিঃশব্দে সেদিকে এগিয়ে গেলো নবু। বাঁ পাশে একটা ঘরের ভেতর থেকে কথা আসছে, ঘরে দরজা ভেজানো। ফাঁক দিয়ে ভেতরের কিছুটা অংশ দেখা যাচ্ছে। বেশ বড় ঘর। চার-পাঁচজন লোক বসে আছে হারিকেনের চারপাশে। পরনের কাপড়-চোপড় দেখে মনে হয় কামলা-টামলা হবে। এ গাঁয়ের বা আশেপাশের কেউ নয়। কাছাকাছি দু'চার গাঁয়ের সব মানুষকে নবু চেনে।

একজন বললো, 'যাই কও ব্যাডা, পনেরো টাহায় পোষায় না। চাইলের স্যার পাঁচ টাহা, ছয় টাহা—।'

আরেকজন বললো, 'দুবলার চরের হ্যারাই ভাল আছে। দশখান হরিণ মারলে কয় নয়খান মারছি। একখান নিজেগো মইদ্যে ভাগ কইরা লয়।'

'খালি হরিণ কও ক্যা।' আরেকজন বললো, 'গত বছর বাঘ মারছেলে ছয়হান, হ্যারা কইছে পাঁচহান। একহান বাঘের চামড়া জায়গামতো বেচতে পারলে দশ হাজার টাহা।'

প্রথমজন বিরক্ত হয়ে বললো, 'মোগো আর কততখন বআইয়া রাখপে! অ ভাইডি দ্যাহ না, বর মেঞায় কয় কি?'

যাকে উদ্দেশ্য করে কথাটা বলা হলো সে খেঁকিয়ে উঠলো, 'ক্যা, মোরে যাইতে কও ক্যা? গাইলমন্দ ব্যাবাক মুই এ্যাল্লা খামু? হাউশ হয় নিজে যাও।'

পেছনের দরজা দিয়ে ভারিক্কি চেহারার একজন ঢুকে ধমকের গলায় বললো, 'এ্যাতো চিল্লাচিল্লি কিয়ের হুনি? ক্যাঠায় চিল্লায়?'

প্রথমজন কাঁচুমাচু করে বললো, 'না ছোডমেঞা, রোস্তইম্যায় কয়, কামে কহন যাওন লাগবে—আবার না দেরি ওইয়া যায়—'

'যেসুম কমু হেসুম যাবি। চিল্লাবি না। কাকায় চিল্লানি হুনলে তগোরে দিয়া কুমির খিলাইবো। জানস না কাকার হাটের বিমারি আছে?'

যে জোরে কথা বলছিলো সে মিনমিন করে বললো, 'মুই তো হেইয়াই কইতে গেছি—'

'খামুস মাইরা বইয়া থাক।' এই বলে সর্দার গোছের লোকটা চলে গেলো।

নবু বুঝতে পারলো এটা ছোট সর্দার। ওর ওপরও কাকা নামের একজন আছে। ওদের কাজটা কি শুধু লুকিয়ে সুন্দরবনের বাঘ হরিণ মারা? নাকি অন্য কিছু? এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে কাকার কথাবার্তা শোনা দরকার। কিন্তু কিভাবে যাবে সেখানে?

এ নিয়ে নবুকে বেশিক্ষণ ভাবতে হলো না। চুপিসারে দু'জন মুষকো জোয়ান কখন ওর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে—ঘুণাক্ষরেও টের পায় নি। লোহার মতো শক্ত দুটো হাত যখন নবুর দু'হাত চেপে ধরলো তখন চমকে উঠে ঝটকা মেরে ছাড়াতে গিয়েছিলো, কিন্তু ওর মতো শক্তিশালী ছেলেও লোক দুটোকে একচুল নড়াতে পারলো না। একজন বললো, 'আবে রোস্তইম্যা, হেরিকেনটা আন তো। চিড়িয়া ধরচি।'

গলা শুনে নবু বুঝলো একটু আগে এই লোকই ঘরে ওদের ধমকাচ্ছিলো।

রোস্তম হারিকেন হাতে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো। উঁচু করে ধরলো নবুর মুখের ওপর। অবাক হয়ে বললো, 'অ ছোড কত্তা, এইডা কেডা!'

নবু মনে মনে ঠিক করে ফেললো, ওর পরিচয় এদের জানানো যাবে না। ছোট সর্দার মালায়েম গলায় বললো 'অই তুই ক্যাঠা। এহানে আইছস কেমতে!'

নবু হাউমাউ করে বললো, 'মুই কিছু জানি না কত্তা। মোরে ছাইড়া দ্যান। কাম না পাইয়া দুইদিন উপাস দিছি। গিরস্তের বাড়িতে ভাত চাইতে গিয়া খ্যাদান খাইছি। এক ব্যাডায় তো মোরে রাইতে বাড়ির কাছে শুরতে দেইখা চোর মনে কইরা কইছে—মোরে থানায় দেবে। মুই পলাইতে যাইয়া গাতায় পড়ছি। মোরে ছাইড়া দ্যান। মুই আর এই গ্যারামে আহুম না।'

'তুই চুরি করনের লাইগা বাইর ওইছিলি?' জানতে চাইলো ছোট সর্দার।

'মুই চোর না কত্তা। মুই হালুডি করি। পেন্দনের কাপড় ছেলে না, হেই পানে মুই গিরস্ত গো বাড়ি গনে তপনহান আর চাদইরহান নেছেলাম। মোরে থানায়

দিয়েন না কত্তা। বাড়িতে ছোড বাই-বইনগুলা না খাইয়া মরবে হেনে।'

ছোট সর্দার কয়েক মূহূর্ত কি যেন ভাবলো। তারপর বললো, 'তুই বাঘের গরে হান্দাইছস। বাইর অন মুসকিল ওইবো। আমগো ওস্তাদে আহুক। কি কয় হুনি। ছাড়তে কইলে ছাড়া পাবি। নাইলে কুমিররে খিলামু। তয় তোরে থানায় দিবো না এইডা কইবার পারি।' এরপর রোস্তমকে বললো, 'যা পোলারে লাইলনের দড়ি দিয়া হাত-পা বাইন্ধা রাখ। গায়ে তাগদ আছে কইলাম। তুই বইয়া পাহারা দিবি। পালাইলে অর বদলে তরে কুমিরের খাড়ির ভিতরে ফালামু।'

ভেতর থেকে একগোছা মোটা নাইলনের দড়ি এনে নবুকে দু'জনে ধরে হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধলো। ঘরের ভেতর নিয়ে একটা তক্তপোষের ওপর বসিয়ে পা দুটোও বাঁধলো।

নবু একবার বললো, 'মোরে এট্টু পানি দেন ভাইডি।'

একজন ছোট সর্দারের দিকে তাকালো। ইশারায় সম্মতি পেয়ে পাশের ঘর থেকে মাটির সানকিতে পানি এনে ওর মুখের কাছে ধরলো। সবটুকু পানি সে এক নিঃশ্বাসে খেয়ে ফেললো। ওভাবে পানি খেতে দেখে ছোট সর্দারের প্রাণে বুঝি মায়া হলো। বললো, 'ছ্যারারে একখান রুটি আইনা দে। দড়ি খুলনের কাম নাই, ধইরা খিলাইয়া দে। আমি গিয়া কাকারে খবর কই!'

ছোট সর্দার বেরিয়ে যাওয়ার পর তার সঙ্গী অন্যদের বললো, ওরা কিভাবে নবুকে ধরেছে। 'হেরিকেন নিভাইনা দেইখা আমার সন্দ ওইছিলো। আইয়া ছোট সদ্দাররে কইলাম। ছোট সদ্দার তহন এই গরের থেইকা বাইর ওইয়া উপরে ম্যালা করছিলো। আমার কতা হুইনা নাইমা আইলো। দেহি দরজার ফাঁক দিয়া ছ্যামরায় ফুক্কি মারতাছে।' এই বলে হা হা করে হেসে নবুর দিকে তাকালো।

একজন দুটো রুটি এনে নবুকে খাওয়ালো। খেতে খেতে নবু বললো, 'মেঞা বাই, মোরে আপনে গো এইহানে একখান কাম দ্যান। যা কইবেন হেয়াই করুম।'

লোকটা বললো, 'হেয়া মুই কই ক্যামনে? যারা মোগো কাম দিছে হ্যাগো কও। হ্যাগো মনে ধরলে দেবেনে।'

নবুর খাওয়া শেষ হওয়ার পর একজন এসে বললো, 'রোস্তইম্যা বাদে ব্যাবাকটিরে ছোড কত্তায় ডাহে।'

সবাই উঠে চলে গেলো। রোস্তম বিড়বিড় করে বললো, 'যতো ভোগান্তি দুনিয়ায় আছে ব্যাবাকই রোস্তইম্যার ভাইগ্যে ল্যাহা আছিলে?'

নবু মনে মনে ভাবলো, যেভাবেই হোক এখান থেকে পালাতে হবে। মানুষ খুন করা এদের জন্য কোনো ব্যাপারই নয়। সুড়ঙ্গের পাশে কুয়োর ভেতর যে মানুষের পচা লাশ আর কঙ্কাল দেখেছে সে সব যে এদের কাজ এ কথা বলার

অপেক্ষা রাখে না। অনেকক্ষণ পর বাড়ির কথা মনে হলো। বাড়ি থেকে বেরিয়েছে খুব বেশি হলে ঘন্টা তিনেক হবে। অথচ ওর মনে হচ্ছে কতদিন কেটে গেছে। রাতুল, রবি কি করছে? রাতুল যদি কিছু না বলে সবাই ধরে নেবে সে বিমলদের বাড়িতে থেকে গেছে। রাতুলকে বলেছিলো খোঁজ করলে তাই বলতে। ও এখন কি করছে?

একবার ভাবলো, যদি কখনো এখান থেকে বেরুতে না পারে! রাতুল কি করে জানবে ও কোথায়? পারুলের কথা মনে পড়লো। গতবার যখন ওদের বাড়ি গিয়েছিলো, পারুল বলেছিলো, ওর জন্য পাকা কুল নিয়ে যেতে। বেনুদা ঢাকা থেকে দুটো নারকেলি কুলের গাছ এনে লাগিয়েছিলো। সারা গাছ ছেয়ে আছে কাঁচা-পাকা কুলে। আমবাগানের কাছে বলে কেউ পাড়তে যায় না। মাঝে মাঝে নবুই পেড়ে এনে দেয় সবাইকে।

নবু কি কুল নিয়ে কোনাদিন পারুলদের বাড়ি যেতে পারবে? সাতদিনে একবার অন্তত নবুকে দেখা চাই ওর। নইলে গাল ফুলিয়ে কথা বলা বন্ধ করে দেয়। আর তিনদিন পরই তো ওরা আসবে রবিদের বাড়িতে দাওয়াত খেতে। বরিশাল থেকে রবির কাকারা আসবে। ওদের ছেলেমেয়েরা নাটক করবে। শুধু নবু থাকবে না ওদের সবার ভেতর। অন্য কেউ ওর অভাব না বুঝলেও পারুল আর রাতুলের নিশ্চয়ই মন খারাপ করবে। ওরা তখন কি করবে? এসব কথা ভাবতে গিয়ে নবুর বুকের ভেতরটা হু হু করে উঠলো।

রোস্তম আড়চোখে নবুকে দেখে একটা বিড়ি ধরালো। অর্ধেক টেনে নবুকে বললো, 'খাবা?'

নবু মাথা নেড়ে সায় জানালো। কোনোভাবে যদি লোকটার সঙ্গে খাতির করা যায়। নবুর শরীর বলিষ্ঠ হলেও ওর চোখের ভেতর এমন একটা নরোম ভাব আছে দেখলে মায়া লাগে। নবুকে দেখে রোস্তমের নিজের ছেলের কথা মনে হলো। তিন বছর আগে বাওয়ালিদের সঙ্গে সুন্দরবন গিয়ে বাঘের পেটে গেছে। বেঁচে থাকলে এই ছেলেটার মতো হতো। নিজের অর্ধেক খাওয়া বিড়িটা ও নবুর ঠোঁটের ফাঁকে গুঁজে দিলো।

লোকটার আন্তরিকতা নবুর মন স্পর্শ করলো। ভাব জমানোর জন্য বললো, 'চাচা এইডা কোন জায়গা?'

'এই গ্যারামের নাম তুষখালি। মোরা এহন আছি রাজবাড়ির মাডির নিচের কোডায়।'

নবু ভয় পাওয়া গলায় বললো, 'হেইয়া কও কি চাচা! মুই হুনছি রাজবাড়িতে জ্বীন থাহে।'

রোস্তম শুকনো গলায় বললো, 'জ্বীন থাহে গোরস্থানে। মুই দেখছি।'

'তোমাগো ডর করে না?'

'ডর করলে কি প্যাডে মানবে? প্যাডের জ্বালায় কত আকাম-কুকাম করতে অয়! মোর পোলাডারে বাঘে ধইরা নেছে। বাড়িতে আট-দশটা মানুষ। হ্যাগো খাওয়াইতে ওইবে না?'

একটু ইতস্তত করে নবু বললো, 'চাচা, তোমরা কি মোরে মাইরা হালাইবা?'

'মুই ক্যামনে কমু বাপ! মোরে যা হুকুম পাড়ে মুই হেয়া করি। হ্যাগো কতা যদি কেউ না হোনে কাইট্টা গাঙ্গে ভাসাইয়া দ্যায়। কুমিরের ঘেরের ভিতরে ফেলাইয়া দ্যায়। তোমারে কি হরবে হেইয়া কি মুই কইতে ফারি!'

কাঁদো কাঁদো গলায় নবু বললো, 'চাচা মুই মইরা গেলে মোর ছোড বাইবইনগুলা না খাইয়া মইরবে। মোর মা পাগল ওইয়া যাইবে। মুই তো হ্যাগো কোনো ক্ষেতি করি নাই। মোরে মারবে ক্যা?'

নবুর কথা শুনে রোস্তমের মায়া হলো। কিন্তু ওর কিছুই করার নেই। ওর পাহারা থেকে যদি ছেলেটা পালায় তাহলে ওকেই মেরে ফেলবে। ছোট সর্দার অযথা হুমকি দেয়ার লোক নয়। বললো, 'মোর কিছুই হরনের নাই। যা কওনের হ্যাগো ধারে কইও। এ্যাহন আল্লারে ডাহ। আল্লা ছাড়া তোমারে কেউ বাঁচাইতে পারবে না।' এই বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো—'আল্লা মাবুদ রহম কর।'

আল্লাকে ডাকতে নবুর আপত্তি নেই। তবে এটাও জানে আল্লা আকাশ থেকে নেমে এসে ওর দড়ি খুলে দেবে না। একবার রাগ হলো জ্বীনদের ওপর। জ্বীনরা যে কেন রাজবাড়ি ফেলে গোরস্থানে আড্ডা দিচ্ছে! ওরা যদি রাজবাড়িতে থাকতো তাহলে এভাবে গুণ্ডা—বদমাশদের হাতে পড়ে ওকে বেঘোরে প্রাণটা খোয়াতে হতো না। মনে মনে ভাবলো, রাতুল যদি বুদ্ধি করে বেনুদাকে বলে তাহলে হয়তো দিনের বেলা লোকজন নিয়ে বেনুদা খুঁজতে বেরুবে। কিন্তু ততক্ষণ ওকে কি বাঁচিয়ে রাখবে!

নবুকে খুঁজতে গিয়ে আরেক বিপদ

রবি যতোই নলুক নবুর জন্য ভাবতে হবে না, রাতুল সারারাত ওর কথা ভেবে ঘুমোতে পারে নি। শেষরাতে একটু তন্দ্রামতো এসেছিলো, দুঃস্বপ্ন দেখে

জেগে গেছে। দুঃস্বপ্নও নবুকে নিয়ে। মস্ত উঁচু এক পাহাড়ের ওপরে বিকট চেহারার—পুরোনো গোরস্থানে নবুর দাদা যেমন দেখেছিলো, ওরকম কারা যেন ঘিরে রেখেছে নবুকে। ও চিৎকার করছে—রাতুল বাঁচাও বলে। রাতুর ছুটে যাওয়ার আগেই পাহাড়ের ওপর থেকে লাফ দিয়েছে নবু।

বিছানায় উঠে বসেও রাতুল যেন নবুর আর্তচিৎকার শুনতে পাচ্ছিলো। বাইরে তাকিয়ে দেখলো, আকাশের অন্ধকার ভাব কেটে গেছে। একটু পরেই সূর্য উঠবে। একটা দুটো পাখি মাঝে মাঝে ডাকছে। রবিদের বাড়িতে আসার পর এই প্রথম পাখির ডাক শুনলো রাতুল। উঠে জানালার কাছে এসে দাঁড়ালো। রবি তখন গভীর ঘুমে অচেতন। আকাশের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে রাতুল বললো, 'নবু যেখানেই থাক, ভালো থাকুক।'

রবির ভোরে ওঠার অভ্যাস। সেদিন রাতুলকে আগে উঠতে দেখে অবাক হলো। নবুর কথা ভেবে খানিকটা হিংসেও হলো। ওরই জন্যে রাতুল এতো ভোরে উঠেছে। বললো, 'কখন উঠেছিস রাতুল?'

রাতুল গম্ভীর হয়ে জবাব দিলো, 'এই তো কিছুক্ষণ।'

রাতুলের কথার ধরন দেখে রবি আর কিছু বললো না। চুপচাপ মুখ ধুয়ে নিচে গেলো নাশতা কদ্দুর হয়েছে দেখতে।

আধঘন্টা পর এসে রাতুলকে নাশতা খাওয়ার জন্য ডাকলো। খেতে বসে দেখা গেলো, কাল রাতের মতো রাতুল কিছু খাচ্ছে না। ভাগ্যিস নাদুখালা সামনে ছিলেন না। ওদের নাশতা বেড়ে দিয়ে পাশের বাড়ি গিয়েছেন কার যেন অসুখ করেছে—দেখতে। শুধু রবি একবার বললো, 'কিছুই তো খাচ্ছিস না রাতুল! শরীর খারাপ করবে যে।'

রাতুল ওর কথার কোনো জবাব দিলো না। চা খেয়ে দু'জন চুপচাপ ওপরে উঠে এলো।

জানালা দিয়ে ভোরের এক টুকরো মিষ্টি রোদ ঘরের মেঝের ওপর শুয়ে আছে। রাতুল চেয়ার টেনে জানালার কাছে বসলো। তখনো কুয়াশা পুরোপুরি কাটে নি।

কিছুক্ষণ পর রবি আস্তে আস্তে বললো, 'নবুকে খোঁজার জন্য কোথায় যাবি বলছিলি?'

রাতুল এবার রবির দিকে তাকালো। বললো, 'যেখানে যেখানে ও যেতে পারে সব জায়গায় খুঁজবো। গোরস্থান রাজবাড়ি কোনোটাই বাদ যাবে না।'

রবি বললো, 'তাহলে চল বিমলদের বাড়ি থেকে শুরু করি। এ গাঁয়ে নবুর সবচে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হলো বিমল।'

রাতুলের মনে হলো রবি যেন ওকে খোঁচা মারার জন্য 'ঘনিষ্ঠ বন্ধু' কথাটা বললো। রবি কি জানে পারুলের কথা? কিংবা রাতুলের সঙ্গে নবুর কি কথা হয়?

রবি যে ওর সঙ্গে নবুর বন্ধুত্ব ভালোভাবে দেখছে না এটা অনেক আগেই বুঝে গেছে। নবুকে খুঁজতে ওর সঙ্গে আসছে অনেকটা দায়ে পড়ে। তবু এ নিয়ে আর কথা বাড়ালো না রাতুল।

বিমলদের বাড়ি গিয়ে রাতুল যা আশঙ্কা করেছিলো তাই শুনলো। নবু ওদের বাড়ি যায় নি। বিমল দু'দিন হলো মঠবাড়িয়া গেছে ওর পিসির বাড়িতে। ওর ছোট বোন চিনু রবিকে বললো, 'নবুদা সেই যে বল খেলার পর একবার এসেছিলো তারপর আর আসে নি। দাদা বললো, শহর থেকে আসা নতুন বন্ধু পেয়ে নবুদা সব নাকি ভুলে গেছে।' এই বলে আড়চোখে রাতুলের দিকে তাকালো।

রবি কাষ্ঠ হেসে বললো, 'শহরের বন্ধুর জন্যই তো নবুর এই দশা।'

বিমলের মা ওদের কথা শুনে বললেন, 'নবুর কি কোনো ঠিক আছে? কখন কোথায় যায় কাউকে কি বলে যায় বাবা? ওর সঙ্গে থেকে আমার বিমলও হয়েছে তেমনি। তোমরা ভেবো না। দু'দিন পর দেখবে ঠিকই এসে হাজির হয়েছে। তোমরা বসো। চা খাও।'

রবি একবার রাতুলের মুখের দিকে তাকালো। ওর মুখ থমথম করছে। বললো, 'আজ আর চা খাবো না মাসিমা, নিকেরিপাড়ায় যাবো।'

রাতুল কারো সঙ্গে কোনো কথা না বলে বেরিয়ে এলো। রবি ওর সঙ্গে নিকেরিপাড়ার পথে হাঁটতে হাঁটতে বললো, 'ওদের ওপর রাগ করে কি লাভ। ওরা কি করেছে?'

রাতুল শক্ত গলায় বললো, 'তোর কি ধারণা নবুর বাড়ি না ফেরার জন্য আমি দায়ী?'

'বারে, একথা আমি কখন বললাম?'

'ওই মেয়েটাকে তখন যে বললি, শহরের বন্ধুর জন্য নবুর এই দশা—এ কথার মানে কি?'

আমতা আমতা করে রবি বললো, 'আমি তো বলছিলাম—কাল রাতে তোরা প্ল্যান করে আমাকে ভয় দেখাতে না চাইলে নবুকে ওভাবে পালাতে হতো না।'

'ও কি আমার প্ল্যান মতো পালিয়েছে, না তোর চ্যাঁচানোর জন্য?'

'তোরা তো ভালো করেই জানতি অমন করলে আমি ভয় পাবো। আর ভয় পেলে আমি চ্যাঁচাবো না?'

'তুই যদি ভেবে থাকিস নবুর হারিয়ে যাওয়ার জন্য আমি দায়ী, তাহলে আমার সঙ্গে তোর আসার দরকার নেই। আমি একাই খুঁজবো ওকে।'

'কোথায় খুঁজবি?'

'নিকেরিপাড়ায় না পেলে পুরোনো গোরস্থানে খুঁজবো। তোদের হানাবাড়িতে খুঁজবো।'

শুকনো গলায় রবি বললো, 'আমি জানি, আমাকে তোর ভালো লাগছে না। নবুকে খুঁজতে গিয়ে তুই যদি হারিয়ে যাস, আমার কি দশা হবে ভেবে দেখেছিস?'

'আমি কেন হারাবো?'

'তুই আমাদের গাঁয়ে নতুন এসেছিস। কিছুই চিনিস না। তাছাড়া এ জায়গাটা আর দশটা জায়গার মতো নয়। এখানকার সব কথা তুই জানিস না। অনেক কিছু এখানে ঘটে যেতে পারে।' একটু থেমে রবি বললো, 'ঠিক আছে নবুকে তুই-ই খুঁজবি। আমি তোকে শুধু পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবো। প্লীজ, আমার ওপর রাগ করিস না।' বলতে বলতে রবির গলা বুজে এলো।

'তুই অমন উল্টোপাল্টা কথা বলে মেজাজ খারাপ করে দিস কেন?'

রবি দেখলো রাতুলের গলায় তখনো রাগের ঝাঁঝ। ওর খুব কষ্ট হলো। বললো, 'রাতুল, তুই নবুকে বন্ধু ভাবিস, আমি কিছু বলতে যাবো না। তুই ছাড়া আমার আর কোনো বন্ধু নেই শুধু এটা মনে রাখিস।'

রাতুলের মনে হলো রবির ওপর এতোটা রেগে যাওয়া ঠিক হচ্ছে না। কিছুক্ষণ পর আস্তে আস্তে বললো, 'তুই তো বুঝতে পারছিস আমার কি রকম খারাপ লাগছে। মাথার ভেতর মনে হচ্ছে সব তালাগোল পাকিয়ে গেছে। কি বলতে কখন যে কি বলছি নিজেও জানি না।'

নবুকে নিকেরিপাড়ায় না পেয়ে রাতুল আর রবি যখন পুরোনো গোরস্থানে এলো বেলা তখন এগারোটা বাজে। সকালের দিকে আকাশ কিছু সময়ের জন্য পরিষ্কার ছিলো। দশটার পর থেকে সূর্য মেঘের আড়ালে চলে গেছে। কোত্থেকে ছাই রঙের মেঘ এসে গোটা আকাশে ছেয়ে ফেলেছে। এলোমেলো বাতাসও বইতে শুরু করেছে।

রাতুলরা যখন গোরস্থানে ঢুকলো আবহাওয়া তখন আরো বদলে গেলো। চারদিক থেকে ঘন সাদা কুয়াশা এসে ঢুকলো গোরস্থানে, সেই সঙ্গে কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস। রাতুল আর রবির গায়ে যদিও উলের মোটা পুলোভার ছিলো, শীতের কামড় এড়ানো গেলো না।

রাতুলের মনে হলো শীতের সময় দক্ষিণের সমুদ্রের কাছের আবহাওয়া বোধ হয় এমনই হয়। এ নিয়ে ও কিছু বললো না। অস্বাভাবিকতাটুকু ধরতে পারলো রবি। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে ওর হাত-পা আরো ঠাণ্ডা হয়ে গেলো।

ছোটবেলায় রবি অনেকের কাছে শুনেছে অনেক আগে ওদের গাঁয়ের একটা ফুটফুটে সুন্দরী মেয়েকে জ্বীন উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলো এই গোরস্থান থেকে। পরে ফেরতও দিয়ে গেছে। সেই মেয়ে নাকি বলেছিলো, হঠাৎ চারপাশ থেকে ঠাণ্ডা কুয়াশার মতো কি যেন ওকে জড়িয়ে ধরলো। তারপর মিষ্টি একটা গন্ধ পেলো। ব্যস এইটুকুই, আর কিছু ওর মনে ছিলো না। তবে জ্বীনরা নিয়ে গিয়ে

ওর সঙ্গে কোনো দুর্ব্যবহার করে নি। ভালো ভালো সব খাবার খাইয়েছে, এতো ভালো যে, জীবনে কখনো এমনটি খায় নি। সুন্দর কাপড় পরতে দিয়েছে। দুধের মতো সাদা আর বকের পালকের মতো নরোম বিছানায় শুতে দিয়েছে। বলেছে আমাদের কাছে থাকো, আমরা মানুষদের জানতে চাই। মেয়েটা থাকে নি। বাপ-মার জন্য সারাক্ষণ কান্নাকাটি করেছে। শেষে ওরা বিরক্ত হয়ে ওকে ওদের বাড়িতে রেখে গেছে। মসজিদের ইমাম সাহেব আর দু'জন মুসল্লি মাগরেবের নামাজের পর দেখেছেন হঠাৎ এক ঝলক আলো আকাশ থেকে নেমে এলো। আলোর সঙ্গে সঙ্গে ঘন সাদা কুয়াশা। কুয়াশার ভেতর রূপোলি রঙের মস্ত বড় একটা তশতরি ভাসছিলো। সেই তশতরির ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো মেয়েটা। সঙ্গে সঙ্গে তশতরি আর কুয়াশা মিলিয়ে গেলো। মেয়েটা ফিট হয়ে পড়ে ছিলো সেখানে। ওরা ধরাধরি করে ওকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছে। মেয়েটা দু'মাস ছিলো জ্বীনদের কাছে, এর ভেতর ওর গায়ের রঙ আরো সুন্দর হয়েছে। এতো সুন্দর যে মনে হতো গা দিয়ে আলো বেরুচ্ছে। ওই মেয়ের আর বিয়ে হয় নি। বিড়বিড় করে মাঝে মাঝে নাকি কাদের সঙ্গে কথা বলতো। আপনমনে হাসতো, গুনগুন করে গান গাইতো, শেষে একদিন পুকরে ডুবে মরে গেলো। মরার পরও নাকি মুখে হাসি লেগে ছিলো।

ছোটবেলা থেকে রবি এসব শুনে বড়ো হয়েছে। অস্বাভাবিক কোনো কিছু দেখলে সবসময় মনে হয়, এর পেছনে নিশ্চয়ই অলৌকিক কোনো শক্তি কাজ করছে। সেদিন পুরোনো গোরস্থানে চারপাশে ঘন সাদা কুয়াশা আর কনকনে ঠাণ্ডা বাতাসের ভেতরে হাঁটতে হাঁটতে ওর মনে হলো এভাবে রাতুলের একগুঁয়েমিকে প্রশ্রয় দেয়া মোটেই উচিত হয় নি। ক্লাসে শুভদারঞ্জন স্যার কতোদিন বলেছেন অতৃপ্ত আত্মাদের কথা, শত শত বছর ধরে যারা মুক্তির আশায় ঘুরছে, অথচ কেউ ওদের মুক্তি দিচ্ছে না। মৃত্যুর সময় মানুষ যদি সব রকমের বন্ধন—মায়া, মমতা, লোভ, হিংসা, ক্রোধ পরিত্যাগ করতে না পারে তাদের আত্মা নাকি মুক্তি পায় না। সারা পৃথিবীতে শত কোটি আত্মা রয়েছে, যারা অনবরত মুক্তির জন্য ছটফট করছে।

জ্বীনদের কথা বাদ দিলেও পুরোনো গোরস্থান যে সেই সব অতৃপ্ত আত্মাদের সবচেয়ে বড়ো ঘাঁটি, এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। ডাকাত পূর্বপুরষরা কতো মানুষ মেরে এই গোরস্থানে কবর দিয়েছে কিংবা আদৌ কবর না দিয়ে শেয়াল-শকুন দিয়ে খাইয়েছে—কে তার হিসেব রেখেছে! তাদের অনেকেই প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে শত শত বছর অপেক্ষা করতে পারে! নেহাত রাজবাড়ির জ্বীনরা ওদের ওপর সদয় বলে এইসব আত্মা রবিদের বংশের কারো কোনো ক্ষতি করার সাহস পায় নি। কিন্তু কেউ যদি ওদের ঘুম ভাঙিয়ে বিরক্ত করে, তবু কি ওরা চুপচাপ কবরের ভেতর শুয়ে থাকবে? রবি মনে মনে ভাবলো, রাতুলকে

এসব বলে লাভ নেই। বললেও ও তো আর এসব বিশ্বাস করে না। শুধু নিজে একা এসব ভাবতে গিয়ে বারবার ভয়ে শিউরে উঠছিলো।

হঠাৎ রবির মনে হলো কানের কাছে কে যেন ফিসফিস করে বললো, 'নবুর ভীষণ বিপদ। তোমরা ঘরে ফিরে যাও!'

সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়ালো রবি। বুকের ভেতর ধড়াস করে উঠলো। একেবারে অচেনা গলা। কেমন যেন খসখসে ধাতব কণ্ঠস্বর। মনে হলো মানুষের নয়। চাপা গলায় রাতুলকে বললো, 'তুই কিছু শুনতে পেয়েছিস?'

রাতুল অবাক হয়ে বললো, 'কি শুনবো?'

'কারো কোনো কথা শুনতে পাস নি?'

'না তো! কি কথা?'

'আমার মনে হলো কে যেন বললো, নবুর ভীষণ বিপদ, তোমরা ঘরে যাও। কেমন যেন গলাটা!'

রাতুল কান পেতে শোনার চেষ্টা করলো। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস, গাছের পাতা দুলিয়ে বয়ে যাওয়ার সময় শুধু সরসর শব্দ হচ্ছে। এছাড়া কোথাও কোনো শব্দ নেই। বললো, 'নবু যে বিপদে পড়েছে, এটা আমারও মন বলছে। তুই যেতে চাস না, সেজন্য তোর ঘরে ফিরে যাওয়ার কথা মনে হচ্ছে।'

রবি একটু অসহিষ্ণু গলায় বললো, 'আমার মনের কথা নয় এটা। আমি পরিষ্কার শুনেছি।'

'তুই পরিষ্কার শুনলি আর তোর পাশে থেকে আমি কিছুই শুনবো না—এটা হতে পারে?'

'কাল রাতেও তো তুই বলেছিলি আমড়াতলায় তুই কিছু দেখতে পাস নি।'

'এটা ঠাট্টা-ইয়ার্কির সময় নয় রবি।' রাতুল বিরক্ত হয়ে বললো, 'তোকে তো বলেছি, তোর যদি ইচ্ছে না হয় আমার সঙ্গে আসিস না।'

রাতুলের কথায় রবি আরো ভয় পেলো। ওর কথা শুনে মনে হচ্ছে, সত্যি সত্যি ও কিছু শোনে নি। ধাতব কণ্ঠস্বরের অদৃশ্য অধিকারী কি শুধু ওকেই ওর কথা শোনাতে চায়? রবির হঠাৎ মনে হলো বাতাসের সঙ্গে কেমন অদ্ভুত একটা গন্ধ ভেসে আসছে। গন্ধক পোড়ালে যেমন হয়, অনেকটা সেরকম কটু গন্ধ। জোরে জোরে শ্বাস টানলো। কোনো সন্দেহ নেই। বেশ তীব্র গন্ধ। রাতুলকে বললো, 'দাঁড়া, একটা অদ্ভুতরকম গন্ধ পাচ্ছি।'

রাতুলও ওর মতো জোরে শ্বাস নিলো। এবার রবি একা নয়। বাজে রকমের একটা গন্ধ রাতুলেরও নাকে এসে লাগলো। বললো, 'গোরস্থানে এরকম আজেবাজে গন্ধ থাকা অস্বাভাবিক নয়। শেয়াল-টেয়াল হয়তো কোনো কবর খুঁড়ে পচা লাশ বের করেছে।'

রবি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললো, 'রাতুল, এটা পুরোনো গোরস্থান।

চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরের ভেতর এখানে কাউকে কবর দেয়া হয় নি। এখনকার কবর দেয়া হয় নতুন গোরস্থানে, এখান থেকে আধ মাইল দূরে।'

রাতুল চিন্তিত গলায় বললো, 'তাহলে গন্ধ কিসের?'

'সেটাই তো বলছি আমি। এখানে এমন অনেক কিছু ঘটে যার কারণে কেউ বলতে পারে না। প্লীজ রাতুল, তোর পায়ে পড়ি, যে আমার সঙ্গে কথা বলেছে সে আমাদের ভালো চায় বলেই অমন বলেছে। ঘরে ফিরে চল। বেনুদাকে গিয়ে সব খুলে বলি! এখানে আর কিছুক্ষণ থাকলে আমি দমবন্ধ হয়ে মরে যাবো।'

জ্বীনভূত বা অলৌকিক কিছু বিশ্বাস করে না রাতুল। বড়দা-মেজদারা নানাভাবে ওদের বুঝিয়ে দিয়েছে এসব যে নেই। তবু সেদিন মেঘলা দুপুরে পুরোনো গোরস্থানের ভেতর ঘন সাদা কুয়াশার দেয়ালে ঘেরা, কটু গন্ধভরা পরিবেশটাকে ভীষণ অচেনা আর অস্বস্তিকর মনে হলো। গন্ধটা এমনই যে, গা গুলিয়ে বমি আসতে চাইছিলো। তাই রবির কথার আর প্রতিবাদ করলো না। বললো, 'ঠিক আছে চল, বেনুদাকে বলি গে।'

ওরা গোরস্থান থেকে বেরুতে বেরুতে লক্ষ্য করলো বাজে গন্ধটা কমে আসছে আর কুয়াশা কেটে যাচ্ছে। আমবাগানের কাছে এসে দেখলো অদ্ভুত ব্যাপার-এদিকে কোনো কুয়াশা নেই, শুধু গোরস্থানটা কুয়াশায় ঢাকা। তবে আকাশে তখনো ঘন ছাই রঙের মেঘের পাহাড়।

রাতুলের মাথায় সারাক্ষণ নবুর চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিলো বলে এই ব্যাপারটা ওকে তেমন নাড়া দিলো না। ও ভাবছিলো বেনুদা শুনে কি যাচ্ছেতাই ছেলে মনে করবে ওকে। অথচ বেনুদাকে জানানো দরকার। নইলে নবুর কিছু হলে ওকে চিরদিনের জন্য অপরাধী হয়ে থাকতে হবে। মনে মনে শুধু বললো, 'নবুর যেন কিছু না হয়।'

আমবাগান পেরিয়ে ওরা খিড়কি পুকুরের কাছে এসেছে, হঠাৎ ভূত দেখার মতো চমকে উঠলো। আমড়াতলায় জলজ্যান্ত নবু দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক সেখানে, যেখানে কাল রাতে রবিকে ভয় দেখানোর জন্য বসে ছিলো। নবুর মুখ শুকনো, চুল উসকোখুসকো, চোখ দুটো লাল। পরনের কাপড়-চোপড় সব ভেজা। কেমন যেন অন্যরকমভাবে তাকাচ্ছিলো। রাতুলকে বললো, 'ওদিকে কোথায় গিয়েছিলে?'

'তোমাকে খুঁজতে। সারারাত কোথায় ছিলে তুমি?' উদ্বিগ্ন উত্তেজিত গলায় জানতে চাইলো রাতুল।

'পরে বলবো। বেনুদা কোথায়?' নবুর গলায় ব্যস্ততা।

রবি বললো, 'বোধ হয় চিলেকোঠার ঘরে। সকালে মিস্তিরি এসেছিলো। দেখেছি কি-সব বানাচ্ছে ওখানে।'

নবু রবিকে বললো, 'রাতুলকে নিয়ে এক্ষুনি খেয়ে নে। বেরুতে হবে। আমি কাপড় বদলে বেনুদার সঙ্গে জরুরী কথা সেরে আসি।'

নবুর কথা শুনে রাতুল আর রবি মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলো। সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ না করে নবু ছুটলো চিলেকোঠার দিকে, পেছন পেছন রাতুলরাও।

নাদুখালা খাবার আয়োজন করছিলেন। রাতুলদের দেখে বললেন, 'এই মেঘলায় গোসল করে কাজ নেই। মুখ-হাত ধুয়ে খেয়ে নাও।'

রবি ফস করে বললো, 'নবু এসেছে।'

ভুরু কুঁচকে নাদুখালা বললেন, 'কোথায়?'

'বেনুদার সঙ্গে জরুরী কথা বলতে গেছে।'

'তাই বুঝি! তোমরা খেয়ে নাও। বাবুর যখন ক্ষিদে পাবে তখন ঠিকই খেতে আসবে। ওর জন্যে সবার বসে থাকতে হবে না।'

রাতুল আর রবি ঝটপট মুখ-হাত ধুয়ে খেতে বসে গেলো। ওদের খাওয়া দেখে নাদুখালা বললেন, 'এতো তাড়া কিসের, ঘাটে লঞ্চ ছেড়ে দেবে নাকি!'

রাতুল বললো, 'আজ আমরা বিমলদের বাড়ি বেড়াতে যাবো।'

নাদুখালা বললেন, 'ভালোই হলো। ভাবছিলাম আমি যাবো। রবি শোন, বিমলের মাকে বলবি আমি ওর কাছে এক বয়েম জলপাইর আচার পাই। দু'দিন বাদে বাড়িতে জেয়াফত। আচারটা যেন তোদের হাতে দেয়।'

খাওয়া সেরে রাতুলরা ছাদে উঠতে যাবে—দেখে বেনুদা আর নবু নামছে। ওদের দেখে নবু বললো, 'চল বেরুই।'

সিঁড়ির গোড়ায় আসতেই সবাই নাদুখালার মুখোমুখি। নবুকে দেখে নাদুখালার মেজাজ সপ্তমে উঠলো— 'বাবুর ফেরা হয়েছে দেখছি। চেহারার ছিরি দেখো না! বলে গেলেই হয় রাতে ফেরা হবে না, সারারাত বেতো শরীর নিয়ে জাগতে হয় না। তোর পিঠে যদি আমি আস্ত খড়ম না ভাঙি, জুলপিগুলো যদি—'

বেনুদা ব্যস্ত গলায় বাধা দিলো—'এখন একটু থামো নাদুখালা। আমরা বেরুচ্ছি। মাকে বলে দিও রাতে আমার কয়েকজন বন্ধু খাবে।' এরপর নবুর কানে কানে বললো, 'খুব সাবধান, কেউ টের না পায়।' বলে আর ও দাঁড়ালো না।

বেনুদা পার পেলেও নাদুখালা নবুকে ঠিকই আটকালেন—'আবার কোথায় যাওয়া হচ্ছে শুনি? না খেয়ে বাড়ির বাইরে এক পা যদি রেখেছিস তবে—'

'ঠিক আছে খেতে দাও।' বলে ঝাঁঝিয়ে উঠলো নবু। বেনুদাকে বললো, 'আপনি চলে যান, আমি রাতুলদের সঙ্গে বেরুবো।'

নাদুখালা নবুকে খাবার বেড়ে দিয়ে চলে গেলেন। ওর খাওয়া দেখে রাতুল বুঝে ফেললো, কাল দুপুরের পর থেকে পেটে কিছু পড়ে নি। বললো, 'অস্তে আস্তে খাও নবু এতো তাড়া কিসের!'

নবু এতক্ষণ পর একটু হাসলো—'সত্যিই তাড়া আছে রাতুল। এখন আমাদের দম ফেলার সময় নেই।'

অবশেষে হানাবাড়িতে অভিযান

খেয়ে উঠে বাইরে এসে নবু যে কথাটা বললো, শুনে রবির দম আটকে যাওয়ার দশা—'বলিস কি, রাজবাড়ি যাবি? তোর মাথা খারাপ হলো নাকি! রাতে পাগলা শেয়াল-টেয়াল কামড়ায় নি তো?'

নবু ধমক দিয়ে বললো, 'হ্যাঁ, রাজবাড়ি যাবো। এখনই। তুই ওভাবে তাকাচ্ছিস কেন, তোকে তো যেতে বলছি না। আমি আর রাতুল যাবো।'

রবির মুখের দিকে তাকিয়ে রাতুলের মনে হলো নবুর ধমক খেয়ে ও বুঝি কেঁদে ফেলবে। নবুকে বললো, 'রবি আমাদের সঙ্গে আসুক না।'

নবু রবির চোখে চোখ রেখে শক্ত গলায় বললো, 'কাল রাতে তুই অমন করে লেজ মাড়ানো কুত্তার মতো চেঁচিয়েছিলি কেন?'

রবি গাল ফুলিয়ে চুপ করে রইলো। রাতুল বললো, 'ওর ভয় কেটে গেছে। ওকে নিতে পারো নবু।'

নবু কয়েক মুহূর্ত কি যেন ভাবলো। তারপর মুখ টিপে হেসে বললো, 'ঠিক আছে আসতে বলো ওকে। এবার ভয়-টয় পেলে ওকে রাজবাড়ির জ্বীনদের কাছে রেখে আসবো।'

রাতুল রবির কাছে এসে ওর কাঁধে হাত রেখে নরোম গলায় বললো, 'রাগ করছিস কেন? তোর চ্যাঁচানোর জন্য মনে হচ্ছে নবুর ওপর দিয়ে ধকল কম যায় নি। তাই ওর মেজাজ অমন তিরিক্ষি হয়েছে। চল যাই।' এরপর রবির কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো, 'ভয় পাওয়া একেবারেই চলবে না।'

রবি কোনো কথা না বলে ওদের সঙ্গে হাঁটতে লাগলো। নবু বললো, 'নদীর ধার দিয়ে ঘুরে যাবো। আমবাগান দিয়ে গেলে বাড়ির কেউ দেখে ফেলতে পারে। বিশেষ করে আবেদালি দেখলে বিপদ হবে।'

রাতুল বললো, 'কাল রাতে কোথায় ছিলে বললে না তো!'

নবু এক কথায় জবাব দিলো, 'রাজবাড়ি।'

'সে কি! সারারাত ওখানে ছিলে?'

রহস্য হেসে নবু মাথা নেড়ে সায় জানালো। রবি ওর সঙ্গে কথা না বললেও শোনার জন্য কান দুটো খাড়া করে রেখেছিলো।

'ওখানে কি কিছু দেখেছো?'

'চুপ!' চাপা গলায় বললো নবু—'আবেদালি আসছে।'

রাতুল সামনে তাকিয়ে দেখলো নদীর কিনার থেকে আবেদালি উঠে আসছে। ওদের দেখতে পেয়ে খুবই অবাক হলো সে। কাছে এসে প্রশ্ন করলো, 'দাদারা এই মুহি কোই যাও?'

রাতুল বললো, 'নিকেরিপাড়ায় মাছ ধরা দেখতে যাবো।'

আবেদালি অবাক হয়ে বললো, 'অ মোর খোদা, মাছ ধরা আবার দেহার জিনিস নিহি?'

নবু মুখ টিপে হেসে বললো, 'ওরা শহরের মানুষ। কোনোদিন দেখেছে নাকি এসব! তা, তুমি এদিকে কোথায় গিয়েছিলে?'

'মুই গেছিলাম গরু টোহাইতে। মোগো ধলা গরুডা এ মুহি কই জানি গেছে। আপনেরা যাওনের কালে দেইখ্যো—।'

'ঠিক আছে তুমি বাড়ি যাও। বিকেলে বেনুদার মেহমানরা আসবে। তোমাকে ঘরে থাকতে বলেছে।'

আবেদালি চলে যাওয়ার পর নবু যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

যেতে যেতে রাতুল মুখ টিপে হেসে নবুকে বললো, 'সারারাত রাজবাড়িতে ছিলে, ভরদুপুরে যাদের নাম নিতে নেই—তেনাদের দেখো নি?'

নবু আড়চোখে একবার রবিকে দেখলো। তারপর নিরীহ গলায় বললো, 'দেখবো না কেন, দেখেছি, কথা শুনেছি।' তারপর গম্ভীর হয়ে বললো, 'ঠাট্টা নয় রাতুল, এখনো যে আমি বেঁচে আছি—নেহাত পূর্বপুরুষদের সৎকাজের জন্য। পরে সব বলবো। এখন পা চালিয়ে হাঁটো।'

গাঁয়ের গেছো ছেলে নবু। লম্বা পা ফেলে দশ-পনেরো মাইল হাঁটা যার কাছে কিছুই না—ওর সঙ্গে পা মিলিয়ে হাঁটতে গিয়ে রাতুল কেন, রবি পর্যন্ত হাঁপিয়ে উঠলো।

নদীর ধার দিয়ে রাজবাড়ি যেতে ওদের এক মাইলের ওপর হাঁটতে হলো। আকাশ তখনো মেঘলা, তবে কুয়াশা নেই, কনকনে ঠাণ্ডা বাতাসও নেই। হাঁটতে ওদের বেশ আরাম লাগছিলো। রাজবাড়ির কাছে এসে অবশ্য রাতুল ঘাবড়ে গেলো। এখানে-সেখানে এতো ঘন কাঁটাঝোপ যে গা বাঁচিয়ে চলা মুশকিল। কাঁটার খোঁচা লেগে ওর হাতের কয়েক জায়গা ছড়ে গেলো। পুলোভারের উল খুলে গেলো। এর ভেতর টেরও পায় নি কখন থেকে দুটো চিনে জোঁক স্যাণ্ডেলের ফাঁক দিয়ে ওর পা কামড়ে পড়ে আছে। রবির চোখে পড়েতেই ও বললো, 'রাতুল একটু দাঁড়া।'

জোঁক দেখে রাতুল রীতিমতো লাফাতে লাগলো। নবু বললো, 'দাঁড়াও বীরপুরুষ, তুলে দিচ্ছি।'

অবলীলাক্রমে জোঁক দুটোকে টেনে তুলে রবারের মতো টান মেরে ছিঁড়ে ফেললো নবু। রাতুলের পায়ের যে জায়গাটায় জোঁক লেগেছিলো সেখান থেকে রক্ত বেরুতে দেখে ঘাস চিবিয়ে লাগিয়ে দিলো। বললো, 'রক্ত বেশি খায় নি। খেলে আপনা থেকেই ঝরে যেতো।'

রাতুলের সারা শরীর অস্বস্তিতে শিরশির করছিলো। ওর মনে হচ্ছিলো প্যান্টের ভেতর একটা-দুটো ঢুকে পড়াও বিচিত্র কিছু নয়। নবু আর রবিকে দেখলো।—কোনো বিকার নেই, কায়দা করে দু'হাত দিয়ে কাঁটাঝোপ সরিয়ে এগিয়ে চলেছে। জোঁকের ভয়ে রাতুলও পা চালালো।

কাঁটাঝোপ ঠেলে বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর ছোট-বড় তিনটা উঁচু ঢিবি পেরুতে হলো ওদের। রাতুল বুঝলো, এগুলো রাজবাড়ির ধ্বংসস্তুপের অংশ, গাছপালা গজিয়ে গেছে, ফাঁকে ফাঁকে ইট-সুরকি দেখা যাচ্ছিলো। রাজবাড়ির চারভাগের তিনভাগ মাটিতে মিশে গেছে। শুধু গোটা চারেক ছোট বড় মোটা থাম আর উত্তর দিকে নিচের তলার কয়েকটা ঘর এখনো পুরোপুরি ধসে পড়ে নি, যদিও দরজা-জানালার জায়গাগুলো গর্তের মতো মনে হচ্ছে। একটা অশ্বত্থ গাছ একপাশের দেয়াল বেয়ে উঠেছে।

অনেক দিনের চেনা জায়গার মতো এতোটুকু ইতস্তত না করে নবু একটা গর্তের ভেতর ঢুকে গেলো। রাতুল আর রবি বিস্ময় চেপে অনুসরণ করলো ওকে। ভাঙাচোরা কয়েকটা ঘর পেরিয়ে নবু একটা আস্ত ঘরে এসে বসে থামলো। রহস্যময় গলায় বললো, 'কি মনে হচ্ছে?'

অবাক হয়ে চারপাশে তাকিয়ে দেখে রাতুল বললো, 'তুমি কি এখানে ছিলে? মনে হয় এখানে লোকজন থাকে!'

নবু মুখ টিপে হাসলো, 'তোমার প্রথম কথার জবাব—না। দ্বিতীয় কথার জবাব—হ্যাঁ।'

'কারা থাকে?'

আড়চোখে রবির দিকে এবার তাকিয়ে নবু বললো, 'কারা আবার! রবি যাদের জ্বীন মনে করে, যখ মনে করে, তারা!'

'আহ্, খুলেই বলো না ছাই।' রাতুল অধৈর্য হয়ে উঠলো।

'রাজবাড়ি এখন ডাকাতদের ঘাঁটি।'

'তুমি জানলে কি করে?'

'আগে কিছুটা অনুমান করেছিলাম। তবে সব টের পেয়েছি কাল রাতে।'

'কিভাবে?'

'বলবো। এখন নয়, পরে। বেশিক্ষণ এখানে কথা বলা ঠিক হবে না।

যে-কোনো সময়ে যে-কেউ আসতে পারে। এখন এদিকে এসো।'

নবু পাশের ঘরে ঢুকলো। এ ঘরটা বেশ পরিষ্কার। ধুলোবালি নেই। কয়েকটা হোগলাপাতার চাটাই বেছানো। ঘরের এক কোণে মস্ত বড় একটা সিন্দুক। নবু বললো, 'এটা খুলতে হবে।'

তিনজনে মিলে মহাকষ্টে সিন্দুকের ভারি ঢালাটা খুললো। ঘরের ভেতরটা রীতিমতো অন্ধকার। স্পষ্ট কিছু দেখা যাচ্ছিলো না। নবু এক লাফে সিন্দুকের ভেতর ঢুকে গেলো। কোণা হাতড়ে বের করে আনলো একটা ন্যাকড়ার পুঁটলি। রাতুলের হাতে দিয়ে বললো, 'ধরো এটা।'

তিনজনে মিলে সিন্দুকের ডালা বন্ধ করে ঘরের বাইরে খোলা জায়গায় এলো। রাতুলের হাত থেকে পুঁটলিটা নিয়ে নবু ওটা খুললো। সঙ্গে সঙ্গে রাতুল আর রবির চোখ ছানাবড়া।

'এ কি!' চমকে উঠে রাতুল বললো, 'এ যে সব সোনার গয়না। কোত্থেকে এলো?'

নবু রহস্য হেসে রবিকে বললো, 'দ্যাখ তো, চিনতে পারিস কিনা?'

রবি মাথা নাড়লো। নবু বললো, 'তুই না চিনলেও খালা ঠিক চিনবে। এগুলো তোদের বাড়ির চুরি যাওয়া গয়না।'

গহনার ভেতর ছ'টা মোহরও দেখতে পেলো রাতুল। আরবীতে কি যেন লেখা। বললো, 'এগুলো মনে হচ্ছে সোনার মোহর!'

'হ্যাঁ, মোহরই বটে। তবে কার—এখনো জানতে পারি নি।'

রাতুল অধৈর্য হয়ে বললো, 'নবু, তুমি কি দয়া করে সব খুলে বলবে? টেনশনের চোটে আমার নার্ভ-টার্ভ সব ছিঁড়ে যাবে।'

'ঘরে গিয়ে বলবো। এখানে আর থাকা ঠিক হবে না,' এই বলে নবু পুঁটলির ভেতর থেকে মোহরগুলো বের কের রাতুলের পকেটে ঢুকিয়ে দিলো— 'এগুলো আলাদা থাক।'

বাড়ি ফিরে কাউকে কিছু না বলে ওরা তিনজন ওদের ঘরে ঢুকে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে মোড়া টেনে গোল হয়ে বসলো। নবু কিভাবে আমড়াতলা থেকে পালাতে গিয়ে সুড়ঙ্গে ঢুকলো আর ধরা পড়লো, একে একে সব বললো। এর পরের ঘটনা শুধু বিস্ময়কর নয়, রীতিমতো রোমহর্ষক।

হাত-পা বাঁধা অবস্থায় নবু রোস্তমের পাহারায় থাকার সময় মনে মনে ঠিক করেছিলো যেভাবে হোক পটিয়ে না পারলে রোস্তমকে ঘায়েল করেই ও পালাবে। নিজের ছেলের কথা ভেবে নবুর ওপর রোস্তমের মায়া পড়ে গেলেও এটাও রোস্তম ভালোভাবে জানতো—নবুর পালানো মানে ওর মৃত্যু। মৃত্যু মানে বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েদেরও মৃত্যু। বাড়ির সব কথা যদিও নবুকে বলেছে, ওকে ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে নিজের অক্ষমতার কথাও রোস্তম পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে।

শেষ রাতের দিকে নবুর তন্দ্রামতো এসেছিলো। এমন সময় শুনলো কে যেন ফিসফিস করে বলছে, 'ঘুমোবে না। উঠে পড়ো। দু'নম্বর ঘাঁটিতে নিয়ে তোমাকে মেরে ফেলবে। তুমি নৌকা থেকে যেভাবে হোক পালাবে।'

কথা শুনে নবুর তন্দ্রার ঘোর কেটে গেলো। তাকিয়ে দেখলো—হারিকেনটা জ্বলছে, দেয়ালে হেলান দিয়ে রোস্তম ঘুমোচ্ছে, ঘরে কেউ নেই। কে ওকে অমন কথা বললো? ও কি স্বপ্ন দেখছিলো? কিছুই বুঝতে পারছিলো না নবু। এ কি রকম স্বপ্ন দেখা? কিসের দু'নম্বর ঘাঁটি, কোথায় নৌকা—মাথায় ওর কিছুই ঢুকছিলো না।

এমন সময় নবু শুনতে পেলো, পাশের ঘরে কারা যেন কথা বলছে। গড়িয়ে গড়িয়ে ও দরজার কাছে গেলো। সেখানেই শুনলো বড়বাড়ির গয়না চুরির বৃত্তান্ত আর নতুন করে চুরির ষড়যন্ত্র। দরজার ফাঁক দিয়ে দেখলো আট-দশজন লোক হারিকেনের চারপাশে বসে। ওদের ভেতর তিনজন নবুর খুবই চেনা। ওরা বলছিলো—আজ রাতে আবার তারা বড়বাড়িতে হানা দেবে। নতুন বউ এসেছে অনেক গয়না নিয়ে। আজকের কাজ ভালোয় ভালোয় হয়ে গেলে কাল থেকে কিছুদিনের জন্য গা ঢাকা দেবে। দুই বাড়ির কাজ একরাতেই সারতে হবে। নইলে অন্যরা সাবধান হয়ে যাবে। ওরা ঠিক করেছে আজ রাতে ওরা চৌধুরী বাড়িতেও হামলা চালাবে। এই দুই বাড়ি থেকে কি পরিমাণ সোনা পাওয়া যাবে তারও একটা হিসেব করেছে ওরা। বিলি বন্দোবস্তের কথা বলতেই একজন ওপরের ঘর থেকে সিন্দুক খুলে এই গয়নাগুলো আনলো। বড়বাড়ির গয়না চিনতে নবুর এতোটুকু ভুল হয় নি। এরপর সে দরজার কাছ থেকে সরে গিয়ে আবার আগের জায়গায় গিয়ে বসলো।

নবুর কথা শুনে রবির চোখ দুটো মনে হলো ঠিকরে বেরিয়ে যাবে। চাপা উত্তেজিত গলায় বললো, 'তোর কানে কানে যে কথা বলেছে—মনে আছে গলাটা কি রকম ছিলো?'

একটু ভেবে নবু বললো, 'মনে আছে। গোরস্থানে থাকতে যে গলাটা শুনেছিলাম—আমাকে পালিয়ে যেতে বলেছিলো, ঠিক সেই গলা। কেমন যেন খসখসে, মনে হচ্ছিলো কোনো মেশিনের ভেতর থেকে বুঝি শব্দটা আসছে। কেন বল তো?'

'আমি আজ গোরস্থানে ঠিক সেরকম গলা শুনেছি।'

রাতুল রবিকে বাধা দিয়ে নবুকে বললো, 'তুমি যে বললে তিনজন তোমার চেনা—ওরা কারা?'

নবু একটু চুপ থেকে আস্তে আস্তে বললো, 'একজন আমাদের আবেদালি, একজন চৌধুরী বাড়ির রমজান, আরেকজন সরকার বাড়ির কানাই। আজ রাতে আবেদালি আর রমজান দুই বাড়ির দরজা খুলে দেবে। আগেরবার দরজা খুলতে

আবেদার্লি দেরি করেছে বলে বকুনিও খেলো।'

'কি সর্বনাশ! আজ রাতেই বাড়িতে ডাকাতি হবে?'

মাথা নেড়ে সায় জানালো নবু।

'বেনুদা কোথায় গেছেন?'

'চৌধুরীদের বাড়িতে।'

রবি বললো, 'থানায় খবর দিলে ভালো হতো না?'

'না।' শক্ত গলায় নবু বললো, 'থানায় ওদের লোক আছে। সেখানে গেলেই ওরা টের পেয়ে যাবে। বেনুদার সঙ্গে আমি কথা বলেছি। ঠিক হয়েছে চৌধুরীদের আগে সাবধান করে দিতে হবে।'

রাতুল বললো, 'তারপর কি হলো বলো না! তুমি ওখান থেকে পালালে কিভাবে?'

কাষ্ঠ হেসে নবু বললো, 'সেটাই তো আসল রহস্য।'

দরজার কাছ থেকে সরে এসে নবু আগের জায়গায় বসেছে। হঠাৎ পেছনে দরজা খোলার শব্দ পেয়ে চোখ বুজে ও ঘুমের ভান করলো। কে যেন এসে পা দিয়ে পিঠে খোঁচা মেরে বললো, 'এ্যাই ওঠ।'

নবু তখন চমকে উঠে পেছনে তাকিয়ে দেখে ছোট সর্দার। ছোট সর্দার বললো, 'তরে মনে অয় বাচাইবার পারুম না। কাকায় কইছে তরে দুই নম্বর ডেরায় লয়া যাইতে। পায়ের বন্ধন খুইলা দিতাছি। উল্টাসিদা কাম করবি না। তয় কইলাম রাস্তার মইদ্যে তর প্যাটটা নামায়া দিমু ড্যাগার দিয়া।'

এই বলে কোমরে গোঁজা ড্যাগার দিয়ে নবুর পায়ের বাঁধন কেটে দিলো। নবু উঠে দাঁড়ালো। ছোট সর্দার বললো, 'ল, যাই, ম্যালা দূর যাঅন লাগবো নৌকায় কইরা।'

লোকটার কথা শুনে চমকে উঠলো নবু। এতোক্ষণ যেটাকে স্বপ্ন ভেবেছিলো সেটা কি তাহলে স্বপ্ন নয়? সত্যি সত্যি তাকে নৌকায় করে দু'নম্বর ডেরায় নিয়ে মেরে ফেলবে!

এ নিয়ে বেশিক্ষণ ভাববার সময় পেলো না নবু। ছোট সর্দার ওকে ধরে পাশের ঘরের ভেতর দিয়ে ওপরে উঠলো। ওপরেও ঘর, যে ঘরটায় ভারি সিন্দুকটা রাখা ছিলো সেইটা। তারপর ওকে নিয়ে লোকটা নৌকায় উঠলো।

ছইওয়ালা বেশ বড় নৌকা। একজন মাঝি হালের কাছে বসে ছিলো। ওরা নৌকায় উঠে বসতেই নঙ্গর তুলে মাঝি নৌকা দিলো বলেশ্বরীর ভাটির দিকে।

তখনও সূর্য ওঠে নি। আকাশের অন্ধকার ফ্যাকাসে হয়েছে মাত্র। ঘন কুয়াশা চারদিকে। ভাটার টানে নৌকা যেন তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছিলো। যদিও কুয়াশার জন্য দশ হাত দূরের জিনিস ভালো দেখা যাচ্ছিলো না।

হালে ছিলো মাঝি, ছইয়ের নিচে নবু। ছোট সর্দার বৈঠা বাইছিলো। হাত

দুটো যেরকম বেকায়দাভাবে পিছমোড়া করে বাঁধা, কিভাবে পালাবে কিছুই ভেবে উঠতে পারছিলো না নবু। মনে মনে চাইছিলো, একটা কিছু ঘটুক, একটা ঝড় উঠে নৌকাটা উল্টে যাক, কিংবা বাজ পড়ে গুণ্ডা লোকটা মরে যাক—এছাড়া পালাবার কোনো পথ নেই। একবার মনে হলো, স্বপ্নের সেই কণ্ঠস্বর যদি বলতো কিভাবে পালাতে হবে।

এ কথাটা নবুর মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নৌকাটা যেন জমাটবাঁধা কুয়াশার কোনো পাহাড়ের ভেতর ঢুকে গেলো। মাঝি, সর্দার, নৌকা সবকিছু ঢাকা পড়লো কুয়াশায়। নবুর মনে হলো, মুহূর্তের ভেতর বুঝি ও মেঘের রাজ্যে চলে গেছে। ঠিক তখনই শুনলো সেই ফিসফিসে বাতাসের মতো কণ্ঠস্বর—'তোমার দাদা আমাদের অনেক উপকার করেছিলেন। তুমি এর প্রতিদান পাবে। ভয় পেও না। নৌকা ডুবিয়ে দেবো। লোক দুটো মরে যাবে।'

নবু বলতে চাইলো, 'কিভাবে পালাবো, আমার হাত যে বাঁধা?'

সেই কণ্ঠস্বর আবার বললো, 'তোমার হাতের দড়ির বাঁধন খুলে গেছে। তৈরি হও।'

সঙ্গে সঙ্গে শোঁ শোঁ শব্দ শুনলো নবু। মনে হলো প্রচণ্ড গতিতে ছুটে আসছে ভীষণ ঝড়, সবকিছু যেন উড়িয়ে নিয়ে যাবে। বলেশ্বরী নদীতে বড়ো বড়ো ঢেউ উঠলো। নৌকা দুলতে লাগলো। আকাশে বিদ্যুৎ চমকালো, আর তার সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়া কাঁপিয়ে প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়লো। চোখ ঝলসানো বিদ্যুৎ আর কান ফাটানো সেই বাজ পড়ার শব্দের ঘোর কেটে যেতেই নবু দেখলো পেছনে হালের মাঝি ঠিকই আছে, গলুইয়ে বসা শয়তানটা শুধু নেই। আরো অবাক হয়ে দেখলো হাত থেকে দড়ির বাঁধন খসে পড়েছে।

এরপর এলো এক দমকা বাতাস। নৌকাটাকে মুহূর্তের ভেতর শুন্যে তুলে উত্তাল নদীতে আছাড় মারলো। ছিটকে বিশ-পঁচিশ হাত দূরে গিয়ে পড়লো নবু। বাঁচার তাগিদে প্রাণপণে তীরের দিকে সাঁতরাতে লাগলো। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝড় থেমে গেলো। কুয়াশাও কিছুটা হালকা হলো। তবু ভাটির টানে উজানে সাঁতার কাটতে খুব কষ্ট হচ্ছিলো নবুর। প্রায় ঘন্টাখানেক সাঁতারানোর পর তীরে এসে পৌঁছলো। পাড়ে উঠে অনেকক্ষণ চিৎ হয়ে শুয়ে ছিলো। ঘটনাটা কি ঘটলো, কিছুই ওর বোধগম্য হচ্ছিলো না। মাথাটা তখন থেকে ভার হয়ে আছে। নবু শুনছে অনেক মানুষ আছে যারা বিপদ আসার আগে নাকি আঁচ পায়। ওর ভেতর কি সেরকম কোনো ক্ষমতা আছে? নাকি সত্যি সত্যি রাজবাড়ির জ্বীনরা ওকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচালো? এ নিয়ে বেশিক্ষণ ভাবারও সময় পেলো না। আজ রাতে বাড়িতে ডাকাতি হবে। যেভাবেই হোক ঠেকানো দরকার। সবার আগে কথা বলতে হবে বেনুদার সঙ্গে। এ কথা মনে হতেই ও উঠে দাঁড়ালো।

মসজিদের কাছে এসে ও পুরোনো গোরস্থানে রাতুলদের দেখতে পেয়ে বাড়িতে না ঢুকে আমড়াতলায় এসে দাঁড়িয়েছিলো।

নবুর কথা শুনে রবির মনে রাজবাড়ির জ্বীনদের ওপর শ্রদ্ধা বেড়ে গেলো। ওরা সাহায্য না করলে নবুকে কেউ বাঁচাতে পারতো না।

রাতুল অবশ্য নবুর অলৌকিক ঘটনা নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাচ্ছিলো না। ও ভাবছিলো আজ রাতে এ বাড়িতে ডাকাতি হবে। ডাকাতদের লোক আবেদালি এ বাড়িতেই আছে। অস্বাভাবিক কিছু দেখলে আবেদালি ডাকাতদের সাবধান করে দেবে। নবুকে বললো, 'আজ রাতে ডাকাতদের ধরার ব্যাপারে কিছু ভেবেছো?'

নবু কিছুটা উদভ্রান্তের মতো বললো, 'আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না রাতুল। কিছুই ভাবতে পারছি না। ভীষণ ভার হয়ে আছে মাথার ভেতরটা।'

রাতুল বুঝলো, বেচারার ওপর দিয়ে কাল রাত থেকে ধকল তো কম যায় নি। ওর জায়গায় রবি হলে এতোক্ষণ ভয়েই হার্টফেল করতো। বললো, 'বিপদ হচ্ছে কাউকে কিছু বলা যাবে না। আমরা তিনজন আর বেনুদা ছাড়া কেউ জানলেই বিপদ। আবেদালি নিশ্চয়ই সবার ওপর নজর রেখেছে।'

নবু মাথা নেড়ে সায় জানালো—'ঠিক বলেছো।'

এমন সময় আবেদালি এসে ঘরে ঢুকলো। চোখ টিপটিপ করে ওদের তিনজনকে দেখে নিরীহ গলায় বললো, 'কি দাদারা, আইছ কুন কালে? নদীর ধারে কিছু দেখছো?'

আবেদালি কিছু শুনতে পায় নি তো? ওকে দেখে নবু আর রবি দু'জনেই থতমত খেলো। রাতুল বললো, 'দেখার সুযোগ পেলাম কই। রবিটা যা ভীতু! ও তো যেতেই দিলো না। বললো, ফিরতে ফিরতে নাকি সন্ধ্যে হয়ে যাবে। তারপর নাকি কারা সব বেরোয়! জোর করে চলে এলো। কাল তুমি যেও আমাদের সঙ্গে। রবিকে নিয়ে চলাই বিপদ।'

আবেদালি হেসে আদর করে রবির পিঠে হাত বুলিয়ে দিলো—'রবি দাদা ঠিক হরছে। দিনমানেও ওইসব খারাপ জায়গায় থাকতে নাই। কোনকালে কার নজর পড়ে হেইয়া কওয়া যায়?'

নবু বললো, 'আবেদালি, কাল যে বলেছিলে আমাকে ঘুড়ি আর নাটাই কিনে দেবে, আজ যাবে? পথে খাওয়ার জন্য তোমাকে একটা টাকা দেবো।'

আবেদালি মাথা নাড়লো—'আইজ পারুম না। সকাল থেইকা গাটা ম্যাজম্যাজ করতে আছে। অহন একটু ঘুম না দিলে কাইল ক্ষেতে কাম হরতে পারুম না। যাই গরুগুলানরে জাব কাইট্টা দেই।'

আবেদালি চলে যেতেই নবু বললো, 'দেখলে শয়তানটার কাণ্ড! রাতে জাগতে হবে তো তাই পৌষ মাসের বিকেলে ওর না ঘুমালে চলবে না।'

'আহা বেচারা, কালও তো সারারাত ঘুমোয় নি! পরপর রাত জাগলে অতো

বড়ো শরীরটা ভেঙে পড়বে না!' রাতুলের কাথা শুনে নবু আর রবি হো হো করে হেসে উঠলো।

হঠাৎ বুদ্ধিটা এলো রাতুলের মাথায়। চাপা গলায় নবুকে বললো, 'ঘুমোতে যখন চাইছে, বাছাধনকে এক ঘুমে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দেই, কি বলো?'

নবু আর রবি হুমড়ি খেয়ে পড়লো ওর ওপর। আইডিয়াটা খুলে বললো ওদের দু'জনকে। শুনে ওদের চোখ জ্বলজ্বল করতে লাগলো। নবু বললো, 'ঠিক বলেছো এছাড়া আর কোনো পথ নেই।'

ডাকাত ধরা পড়লেও রহস্য জানা গেলো না

চৌধুরীদের বাড়িতে খবর দিয়ে বেনুদা থানা হয়ে ফিরলো শেষ বিকেলে। ওরা তিনজন তখন ছাদে বসে দেখছিলো সন্দেহজনক কিছু দেখা যায় কিনা। রবি ভাবছিলো সকালে পুরোনো গোরস্থানে এ কি দেখলো ও। যাতোবার ও রহস্যময় কণ্ঠস্বরের কথা ভাবলো, ততোবারই রোমাঞ্চিত হলো।

রাতুলের মাথায় তখন শুধু ডাকাত ধরার চিন্তা। ভীষণ উত্তেজনা বোধ করছিলো। প্ল্যানমতো সব যদি না করা যায় তখন কি হবে? চৌধুরী বাড়িতে বেনুদা খবর দিতে গেছে। সেখান থেকেও তো জানাজানি হতে পারে। ওরা যদি নবুর আসল পরিচয় জানতে পারে, ওকে কি রাখবে?

নবু কোনো কিছুই ঠিকমতো ভাবতে পারছিলো না। কখনো ভৌতিক কণ্ঠস্বর, কখনো নৌকার ঘটনা আবার কখনো ডাকাত ধরার কথা ভাবতে গিয়ে সব গুলিয়ে যাচ্ছিলো। মাথা ধরা তখনো যায় নি। রাতুল অবশ্য কি একটা মলমের মতো কপালে লাগিয়ে দিয়েছিলো, ওর বড়দা নাকি ওটা চীন থেকে এনেছিলেন। ওতে কিছুক্ষণের জন্য আরাম লাগলেও আবার মাথা ধরেছে।

বেনুদা এসে বললো, 'ও বাড়ির সব ব্যবস্থা ঠিক করে এলাম। এবার আমরা কি করবো সেটা নিয়ে ভাবতে হবে।'

'ঠিক করে ফেলেছি কি করবো।' এই বলে রাতুল ওর পরিকল্পনার কথা খুলে বললো।

শুনে বেনুদা অবাক হলো—'কি আশ্চর্য, আমিও তো চৌধুরীদের একই প্ল্যান দিয়ে এসেছি।'

নবু বললো, 'আমাদের প্ল্যানটা রাতুলের মাথা থেকে এসেছে।'

বেনুদা ওর পিঠ চাপড়ে বললো, 'আমরা হলাম গ্রেট ম্যান—কি বলো?'

রাতুল গম্ভীর হয়ে বললো, 'আমাদের হাতে সময় বেশি নেই।'

নবু উঠে দাঁড়ালো—'আমি নিচে গিয়ে মাকে বলে আসি, আবেদালির হাতে আমাদের চাটা যেন ওপরে পাঠিয়ে দেয়।'

বেনুদা রাতুলকে বললো, 'তোমার জিনিস ঠিক আছে তো?'

রাতুল গম্ভীর হয়ে মাথা নেড়ে সায় জানালো।

নবু এসে হাসতে হাসতে বললো, 'আবেদালি বেচারা ঘুমিয়ে পড়েছিলো। মনে হয় ওর কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছি।'

রাতুল নিরীহ গলায় বললো, 'তাতে কি, আবার ঘুমোবে।'

একটু পরে মুখ কালো করে আবেদালি চায়ের ট্রে হাতে ছাদে এলো। বেনুদা ওকে বললো, 'তোমার শরীর খারাপ নাকি আবেদালি? মুখটা কেমন শুকনো শুকনো লাগছে!'

গলায় অসুখ অসুখ ভাব এনে আবেদালি বললো, 'হ বেনুদাদা। গাডা ম্যাজম্যাজ হরে।'

রাতুল সমবেদনা দেখিয়ে বললো, 'একটু চা খেয়ে নাও। ভালো লাগবে।'

আবেদালি রেগেমেগে বললো, 'হেই চা খাইতে যাইয়াই তো মুই বহাডা খাইলাম। নিত্য কি খাই? আইজ এটু চাইতে গেছি—'

বেনুদা হাঁ হাঁ করে উঠলো—'সে কি কথা আবেদালি, চা কেন দেবে না। ক্ষেমির মা বড় বাড় বেড়েছে দেখছি। তুমি এখানে বসে এক কাপ খেয়ে নাও।'

একগাল হেসে আবেদালি বললো, 'তা এট্টু খাইলে মন্দ অয় না। আপনেগো কাপে খামু নিহি?'

রাতুল বললো, 'তাতে কি! বসো, আমিই বানিয়ে দিচ্ছি। তুমি বরং সিঁড়ির দরজাটা বন্ধ করে দাও। ক্ষেমির মা আর দেখতে পাবে না।'

'ক্ষেমির মারে মুই ডরাই নিহি?' বলে গজগজ করতে করতে আবেদালি দরজা বন্ধ করতে গেলো। এই ফাঁকে আগে থেকে গুঁড়িয়ে রাখা গোটা দশেক ঘুমের বড়ি ওর কাপে ঢেলে চায়ের সঙ্গে মিশিয়ে দিলো।

নবু রাতুলকে বললো, আমি চা খাবো না। আমার কাপটা আবেদালিকে দাও।'

খুব আয়েশ করে চা খেলো আবেদালি। কিছুক্ষণ পর বললো, 'না গো বেনুদাদা, যুইত লাগে না। যাই গুরুগুলানরে ঘরে উডাইয়া এট্টু কাইত হই।'

আবেদালি চলে যাওয়ার পর সবাই একচোট হাসাহাসি করলো। বেনুদা

বললো, 'বেশি হেসো না, আসল কাজ এখনো বাকি। মাকে বলতে হবে আবেদালি ফিরে এলে যেন চিলেকোঠায় ঘুমোয়।'

ওরা এলো অনেক রাতে। অন্ধকারে বাইরের ঘরে বেনুদা, নবু, রবি আর রাতুল মোটা বাঁশের লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে ছিলো। কয়েকবার মহড়া দেয়া হয়ে গেছে।

টুক-টুক-টুক। দরজায় তিনটা শব্দ হলো। আস্তে বেনুদা দরজা খুলে দিলো। এক এক করে পাঁচজন ঢুকলো। সামনেরটা চাপা গলায় বললো, 'সব ঠিক আছে?'

বেনুদা বললো, 'হুঁ।'

তক্ষুণি সবাই মিলে সামনের লোকগুলোর ঘাড়ের ওপর লাঠি চালালো। মাথায় মারতে নিষেধ করেছিলো বেনুদা। সামনের লোকগুলো পড়তে না পড়তেই পেছনেরটাকেও বাড়ি মেরে শুইয়ে দেয়া হলো। সঙ্গে সঙ্গে আলো জ্বেলে সবাইকে ডাকা হলো। নবু আর বেনুদা মিলে সব ক'টাকে বেঁধে ফেললো।

চিলেকোঠার ঘরে তখন ভোঁস ভোঁস করে নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে আবেদালি। এতো কিছু হয়ে গেলো, কিছুই টের পেলো না ও।

ভোরবেলা দারোগা এলো। কোমরে দড়ি বেঁধে সব ক'টাকে গাড়িতে নিয়ে তোলা হলো। নাদুখালা সুযোগ পেয়ে দারোগাকে দু'কথা শুনিয়ে দিলেন। তবে দুপুরে ভরপেট না খাইয়ে ছাড়লেন না।

দারোগা আসার সময় ধলাপাগলাকে নিয়ে এসেছিলো। দশাসই আবেদালির ওপর সুটকো ধলার সে কি রাগ! অবশ্য ওর মার খেয়ে আবেদালির যে কিছুই হয় নি সে কথা বলাই বাহুল্য।

রবিদের হানাবাড়িতে রাতুলরা যে মোহর পেয়েছিলো সেগুলো দারোগাকে ফেরত দিতে হয়েছে। দারোগা দেখেই বললো, ওগুলো নাকি ছ'মাস আগে সরকার বাড়ি থেকে চুরি গেছে।

দারোগার যেতে যেতে বিকেল হয়ে গেলো। এরই মধ্যে খবর এসেছে চৌধুরীদের বাড়ি থেকে রমজান বাদে ধরা পড়েছে চারজন। একজন নাকি পালিয়েছে।

সন্ধেবেলা ছাদে বসে চা খেতে খেতে রাতুল বললো, 'বেনুদা দেখলেন তো, আপনাদের রাজবাড়িটাকে এই ডাকাতরা কিভাবে হানাবাড়ি বানিয়ে রেখেছিলো?'

বেনুদা কিছু বলার আগে গম্ভীর গলায় নবু বললো, 'রাজবাড়িতে ডাকাতদের ঘাঁটি আমিই দেখেছি। সেই সঙ্গে আরো কারো উপস্থিতি টের পেয়েছি। তোমাদের বলেছি সে কথা।'

'তুমি কি বলতে চাও তোমার কানে ফিসফিস করে যারা কথা বলেছে ওরা

জ্বীন ছিলো?' বেপরোয়া ভঙ্গিতে জানতে চাইলো রাতুল।

'হতে পারে জ্বীন। অন্য কিছুও হতে পারে। তবে কিছু—একটা তো বটেই। পুরোনো গোরস্থান আর রাজবাড়িতে চোখে দেখা যায় না এমন কেউ নিশ্চয়ই থাকে। যারা থাকে তারা ভবিষ্যতে কি ঘটবে সেটাও দেখতে পায়। নইলে আমাকে কিভাবে বললো, নৌকায় করে দু'নম্বর ঘাঁটিতে নেবে?'

'নবু, তুমি বলেছো, তখন তুমি তন্দ্রার ঘোরে ছিলে। এমনও তো হতে পারে তখন ওদেরই কেউ বলাবলি করছিলো এ নিয়ে—তোমার কানে এসেছে।'

'তুমি তর্ক করার জন্য এসব বলছো রাতুল। আমি পুরোনো গোরস্থানে থাকতেও ওদের কথা শুনেছি। নৌকার ভেতর যখন আমাকে হাত বেঁধে ছইয়ের নিচে ফেলে রেখেছিলো তখনও শুনেছি। তাছাড়া যেরকম ঝড়ের ভেতর পড়েছিলাম—তোমরা তো বললে কিছুই টের পাও নি।'

রবি বললো, 'আমরা তখন অন্য কিছু টের পেয়েছি। কথা আমিও শুনেছি। এখনো আমার কানে বাজছে—'নবুর ভীষণ বিপদ, তোমরা ঘরে ফিরে যাও। রাতুল সেই কথা না শুনলেও গন্ধটা তো টের পেয়েছিলে?'

দ্বিধাভরা গলায় রাতুল বললো, 'হ্যাঁ, বাজে একটা গন্ধ আমার নাকে লেগেছিলো। কিন্তু এ থেকে কি প্রমাণ হয়?'

এমন সময় একঝলক ঠাণ্ডা ভেজা বাতাস হু হু করে বয়ে গেলো। গায়ে গরম কাপড় থাকা সত্ত্বেও সবার হাড় পর্যন্ত কেঁপে উঠলো। বেনুদা বললো, 'চলো, নিচে গিয়ে বসি। ঝড় আসবে মনে হচ্ছে।'

আগের দিন থেকেই আকাশ মেঘলা ছিলো। সেদিন সন্ধের দিকে ঘন কালো মেঘে সারা আকাশ ছেয়ে গেছে। ওরা নিচে নামতেই শুরু হলো ঝড়ের মাতম। আকাশে ঘনঘন বিদ্যুতের ঝলকানি। প্রচণ্ড শব্দে কয়েকটা বাজ পড়লো কাছাকাছি কোথাও। জানালা-দরজা বন্ধ করে ঘরে বসলেও রাতুলরা ঠিকই টের পাচ্ছিলো। বাইরে ঝড়ের কি ভয়ঙ্কর তাণ্ডবলীলা চলছে।

বেনুদা বললো, 'রাতুল, তোমাকে আমি আগেও বলেছি আমি জোর করে কাউকে কিছু বিশ্বাস করতে বলি না। বিজ্ঞান আমিও পড়েছি। আমরা এ গাঁয়ে ছোটবেলা থেকে এমন অনেক কিছু দেখেছি যুক্তি দিয়ে যার ব্যাখ্যা করা যাবে না। সেই মেয়েটার কথাই ধরো না। বলা হয় যাকে জ্বীন নিয়ে গিয়েছিলো। ইমামরা বলেছিলো ওরা দেখেছে আকাশের ভেতর থেকে বিরাট তশতরির মতো নেমে এসেছিলো। আজকাল তো অনেকে ফ্লাইং সসার দেখছে। এমনও তো হতে পারে সেটা একটা ফ্লাইং সসার ছিলো। জ্বীনের কথা বাদ দাও, বিজ্ঞান তো এখন মহশূন্যের গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে মানুষ বা মানুষের চেয়ে উন্নত প্রাণীর অস্তিত্ব খুঁজে বেড়াচ্ছে। হতে পারে আমাদের এখানে তাদের কেউ রয়েছে। তারা চায় না আমরা তাদের বিরক্ত করি।'

নবু বললো, 'কোরান শরীফে জ্বীনের কথা বলা হয়েছে আগুন দিয়ে বানানো। আগুন মানে যদি এনার্জি হয় তাহলে অনেক জিনিসই আর রহস্যজনক মনে হবে না।'

'কথাটা ওভাবে বলা ঠিক না নবু।' বেনুদা বললো, 'জ্বীনরা এনার্জি হয়ে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে, আমরা পারি না। বস্তুকে শক্তিতে রূপান্তরের জন্য বিজ্ঞান এখন কাজ করছে। আমরা যদি শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারি তাহলে অনেক কিছু জানা হয়ে যাবে।'

রাতুল তবু বললো, 'জ্বীনভূতের অস্তিত্ব স্বীকার করাটা কি খুব জরুরী হয়ে পড়েছে?'

মৃদু হেসে বেনুদা বললো, 'তোমাকে জোর করছে কে? তবে তোমার ভেতর যদি বৈজ্ঞানিক মন থাকে, যে মন জানতে চায়, আবিষ্কার করতে চায়—তাহলে কখনোই কোনো বিশেষ ধারণা আঁকড়ে বসে থেকো না। সবসময় জানার চেষ্টা করো। একশ' বছর আগে মানুষের আকাশে ওড়া বা সমুদ্রের তলায় ঘোরা সায়েন্স ফিকশনের বিষয় ছিলো, এখন তা নয়। এখন ভিন্নগ্রহে উন্নত প্রাণীর অনুসন্ধান বা তাদের পৃথিবীতে আসা সায়েন্স ফিকশনের বিষয়, একশ' বছর পরে সেটা ফিকশন নাও থাকতে পারে।'

রাতুলদের জমজমাট আড্ডার ভেতর নাদুখালা এসে বললেন, 'ঝড় বাড়ছে। অবস্থা সুবিধের মনে হচ্ছে না। তোমরা খেয়ে শুয়ে পড়ো।'

বেনুদাও সায় জানালো—'পৌষের শেষে আমাদের দেশে এরকম ঝড়ের কথা শুনেছো রাতুল?' রাতুল মাথা নাড়লো।

বেনুদা বললো, 'আমাদের এখানে প্রায় প্রতি বছরই এসময়ে ঝড় হয়। শুধু আমাদের গাঁয়ে, আশেপাশের আকাশ শুধু মেঘলা থাকে, ঝড় হয় না।'

খেয়ে উঠে ওরা তিনজন তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লো। গত দু'রাতের উত্তেজনায় ওরা ভালোমতো ঘুমোতে পারে নি। তাই লেপের তলায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ওদের ঘুম এসে গেলো।

মাঝরাতে হঠাৎ বিকট এক শব্দে ওদের ঘুম ভেঙে গেলো। অনেকটা কামান দাগার মতো শব্দ। সারা বাড়ি থর থর করে কেঁপে উঠেছে সেই শব্দে। ঘরের দরজা-জানালা সব বন্ধ। বাইরে তখনো ঝড়ের তাণ্ডবলীলা চলছে।

নবু বিছানার ওপর উঠে বসে বললো, 'কিসের শব্দ ওটা?'

রাতুল বললো, 'বাজ পড়েছে বোধ হয়।'

'না, বাজের শব্দ এরকম হয় না।' বলে নবু বিছানা থেকে নামলো।

রবি ভয়ে ভয়ে বললো, 'তোরা কি এখন 'কিসের শব্দ' খুঁজতে বেরুবি?'

রাতুল মৃদু হেসে মাথা নাড়লো—'পাগল নাকি!'

নবু দক্ষিণের জানালার খড়খড়ি তুলে বাইরে তাকালো। ওইটুকু ফাঁক দিয়ে

ঝড়োবাতাস ঘরে ঢুকে সবকিছু এলোমেলো করে দিলো। হঠাৎ নবু চাপা গলায় ডাকলো—'রাতুল, দেখে যাও।'

রাতুল আর রবি ছুটে গেলো জানালার কাছে। নবু ওদের রাজবাড়ির দিকে দেখালো—'ওদিকের আকাশটা দেখো, কি রকম! নিচেও দেখো।'

রাতুল দেখলো চারদিকের আকাশ কালো হলেও দক্ষিণের এক কোণে আকাশ অস্বাভাবিক রকম লাল। জানালা থেকে ঘন গাছপালার জন্য রাজবাড়ি দেখা যায় না। তবে দূরে গাছের ওপর দিয়ে মনে হলো নিচে বোধ হয় কোনো জোরালো আলো জ্বলছে। কালো অন্ধকার ওখানটায় ফিকে হয়ে গেছে।

রাতুল বললো 'বেনুদাকে ডাকবো?'

'না থাক।' নবু মাথা নাড়লো। 'জানাজানি হলে মা আর খালা ধরবে আজান দেয়ার জন্য, রাত জেগে দোয়া-দরুদ পড়ার জন্য—ওসব আমার ভালো লাগে না।'

রাতুল বললো, 'কাল সকালে গিয়ে দেখতে হবে রাজবাড়িতে নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘটেছে।'

সকালে যখন ওদের ঘুম ভাঙলো, বাইরে তখন নতুন রুপোর টাকার মতো চকচকে সকাল। ঝলমলে রোদ উঠেছে, আকাশে মেঘের লেশমাত্র নেই। প্রচুর পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে। কে বলবে কাল রাতে এতো বড়ো একটা ঝড় হয়ে গেছে।

নাশতা খেতে নেমে শুনলো মাঝরাতে বাজ পড়ার শব্দ সবাই শুনেছে। ওরা আর কাউকে আলো দেখার কথা বললো না।

পরদিন বাড়িতে জেয়াফত হবে। বেনুদা লঞ্চঘাটে গেছেন কাকাদের আনার জন্য। বাড়িতে মহা হৈচৈ। ওরা তিনজন কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে পড়লো।

আমবাগানের ভেতর দিয়ে পুরোনো গোরস্থানে ঢুকে ওরা অবাক হয়ে গেলো। রাজবাড়ির আশেপাশে অনেকগুলো তালগাছ ছিলো। সবগুলো গাছের মাথা পুড়ে গেছে। কালো থামের মতো ন্যাড়া তালগাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে শুধু।

কাছে গিয়ে আরো অবাক হলো। কাঁটাঝোপের চিহ্নমাত্র নেই। পুড়ে সব ছাই হয়ে বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে গেছে। ওদের জন্য সবচেয়ে বড়ো বিস্ময় অপেক্ষা করছিলো আরো সামনে।

একদিন আগেও যেখানে পুরোনো রাজবাড়ির বিশাল ধ্বংসস্তুপ ছিলো, সেখানে এক টুকরো ইটের কণাও নেই। গোটা জায়গা জুড়ে বিরাট এক পুকুর। ঘোলাটে পানিতে ভরে আছে কানায় কানায়। চারপাশে অস্বাভাবিক নীরবতা।

ওরা তিনজন কোনো কথাই বলতে পারলো না—শুধু একে অপরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলো। তারপর সম্মোহিতের মতো এগিয়ে গেলো পুকুরের দিকে।

নবু পুকুরের পাড়ে বসে পানিতে হাত ডুবিয়ে ইলেকট্রিক শক খাওয়ার মতো চমকে উঠে সরে এলো। হাতটা নাকের কাছে এনে শুঁকলো। বিচ্ছিরি একটা গন্ধ।

রাতুল কাছে এসে বললো, 'কি হয়েছে নবু?'

নবু হতভম্ব হয়ে বললো, 'ভীষণ গরম পানি। আর এই গন্ধটা দেখ, কি বাজে!'

রাতুল নবুর হাত শুঁকে রবির দিকে তাকালো-'কি আশ্চর্য, সেদিন পুরোনো গোরস্থানে যে গন্ধটা পেয়েছিলাম, ঠিক সেই গন্ধ।'

ওরা টেরও পেলো না— চারপাশ থেকে ঘন কুয়াশার দেয়াল কখন এসে ওদের ঘিরে ফেলেছে।